সীরাতুল মুস্তফা সা.
৩য় খন্ড
আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.)

সীরাতুল মুস্তাফা

তৃতীয় খণ্ড

মূল

আল্লামা মুহাম্মদ ইদ্‌রীস কান্ধলবী

মাওলানা মোঃ সিরাজুল হক

ও

ডঃ মোঃ আবদুল হক

অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

সীরাতুল মুস্তাফা (সা) তৃতীয় খণ্ড

মূল: হযরত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র)

কালাম আযাদ অনূদিত

[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮৮

ইফা প্রকাশনা ২২৮৮/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0950-5

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৭

দ্বিতীয় প্রকাশ (উন্নয়ন)
আগস্ট ২০১৩
ভাদ্র ১৪২০
শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ২১৬.০০ (দুইশত ষোল) টাকা।

SEERATUL MUSTAFA (SM) : written by Hazrat Allama Idris Kandlavi in Urdu, translated by Kalam Azad in Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: 8181535, August 2013

E-mail : Directorpubif@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 216.00 ; US Dollar : 9.00

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি। মহানবী হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর পূত-পবিত্র কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই নয়, বরং অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও অনেকেই নবী জীবনী রচনায় ব্যাপৃত রয়েছেন। দুনিয়ার বুকে যতদিন মানব জাতির অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সীরাতচর্চাও অব্যাহত থাকবে।

আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র) প্রণীত 'সীরাতুল মুস্তাফা' গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে সমাপ্ত একটি প্রামাণ্য সীরাত গ্রন্থ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন -এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন জনাব মাওলানা মোঃ সিরাজুল হক ও ডঃ মোঃ আবদুল হক। সম্পাদনা করেছেন হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব এম.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম। তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের চেষ্টায় আমরা কোন ত্রুটি করিনি। তারপরেও সুধীজনের নজরে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেব ইনশাআল্লাহ্।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় আমরা লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদকসহ অনুবাদকর্মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাই।

পবিত্র সীরাতে রাসূল (সা) সম্পর্কিত জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশে আমাদের এই প্রয়াস মহান আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা

বিবরণ	পৃষ্ঠা

বিবরণ	পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

মক্কা মুকাররমা বিজয় (রমযানুল মুবারক, ৮ হিজরী)

হযরত রাসূল করীম (সা) এবং মক্কার কুরায়শদের মধ্যে যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে সন্ধির চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন অন্যান্য গোত্রকে এ সুযোগ প্রদান করা হয় যে, তারা যে কোন গোত্রের সাথে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। তদনুসারে বনূ বকর কুরায়শদের সাথে এবং বনূ খুযা'আ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়।

এ দু'টো গোত্রের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগ থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। এর কারণ ছিল এই যে, মালিক ইবন ইবাদ হাযরামী একবার ব্যবসার মালপত্র নিয়ে বনূ খুযা'আর এলাকায় প্রবেশ করে। খুযা'আ গোত্রের লোকজন তাকে হত্যা করে তাদের সমস্ত মালপত্র লুট করে নিয়ে যায়। বনূ বকর সুযোগ পেয়ে হাযরামীর বদলায় বনূ খুযা'আর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। বনূ খুযা'আ তাদের এক ব্যক্তির পরিবর্তে বনূ বকরের তিন নেতা যুওয়াইব, সালমা এবং কুলসূমকে আরাফাতের ময়দানে হেরেমের সীমানার নিকটে হত্যা করে।

আইয়্যামে জাহিলিয়াত থেকে নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকে। ইসলামের আবির্ভাবের পর ইসলামী বিধি-বিধান পালন করার ফলে এ ক্রমধারা বন্ধ হয়ে যায়।

হুদায়বিয়ায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি হওয়ার কারণে উভয় পক্ষ পরস্পর থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। বনূ বকর তাদের শত্রুতা সাধনের জন্য এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। সুতরাং বনূ বকর গোত্রের নওফেল ইবন মু'আবিয়া দায়লমী তার দলবল সহ 'ওয়াতির' (وتير) নামক একটি কূপের নিকট শায়িত বনূ খুযা'আর কতিপয় লোকের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করে।

কুরায়শদের মধ্যে সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, শায়বা ইবন উসমান, সুহায়ল ইবন আম্‌র, হুওয়াইতাব ইবন আবদুল উয্‌যা, মাকরায ইবন হাফস গোপনে বনূ বকরকে সাহায্য করে। বনূ খুযা'আ পলায়ন করে হেরেমে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তাদেরকে সেখানে হত্যা করা হয়।

কুরায়শগণ বনূ বকরকে অস্ত্র এবং যোদ্ধা সরবরাহ করে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। বনু খুযা'আর লোকজন মক্কায় বুদায়ল ইবন ওয়ারাকা খুযাঈর বাড়িতে আত্মগোপন করে কিন্তু বনূ বকর ও কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে হত্যা করে এবং মালামাল লুট করে। তারা এটা ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছবে না। ভোরে কুরায়শদের মনে এ ব্যাপারে অনুতাপ সৃষ্টি হয় এবং এটা উপলব্ধি করে যে, আমরা চুক্তিভঙ্গ করেছি। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে হুদায়বিয়ায় যে সন্ধি করেছি তা ভুলক্রমে ভঙ্গ করেছি।

আমর ইবন সালিম খুযাঈ চল্লিশজনের একটি দল নিয়ে মদীনায় নবী করীম (সা) এর দরবারে উপস্থিত হন। নবী (সা) এ সময় মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন। আম্‌র ইবন সালিম দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ

يارب انى ناشد محمداً * حلف ابينا وابيه الا تلدا

"হে আমাদের রব! আমি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ও দাদা আবদুল মুত্তালিব এর প্রাচীন অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এসেছি।" জাহেলিয়াতের যুগে বনূ খুযা'আ আবদুল মুত্তালিব -এর সাথে চুক্তিবদ্ধ (حليف) ছিল।[১]

انَّ قريشا اخلفوك الموعدا * ونقضوا ميثاقك المؤكدا

"নিশ্চয়ই কুরায়শগণ আপনার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে এবং আপনার শক্তিশালী ও কঠোর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।"

هم بيتونا بالوتير هجدا * وقتلونا ركعًا وسجداً

"তারা ওয়াতীর (وتير) নামক স্থানে শায়িত অবস্থায় রাতে আমাদের উপর আক্রমণ করে এবং রুকূ' ও সিজ্‌দার সময় তারা আমাদেরকে হত্যা করে। "(তাদের মধ্যে কিছু মুসলমান ছিল, নতুবা তারা নিজেরা মুসলমান ছিল না)।

وجعلوا لى فى كداءٍ رصدا * وزعموا ان لستُ ادعو احدا -

"কাদা নামক স্থানে লোকজন আমাদেরকে গুপ্তভাবে ঘাঁটির মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে এবং তাদের ধারণা ছিল এই যে, আমি কাউকে আমার সাহায্যের জন্য আহবান করব না।"

وهم اذل واقل عددا * قد كنتم ولداً وكنا والدا

"তারা সবাই ছিল হীন ও অপদস্থ এবং সংখ্যায়ও ছিল কম। আমরা হলাম পিতার স্থানে এবং আপনি সন্তানের স্থানে।"

---

১. এই প্রাচীন চুক্তির বিস্তারীত বর্ণনা আশ আরুস সাহাবা (اشعار الصحابه) এর শরাহ হুসনুস সাহাবা (حسن الصحابه) এর ১ম খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে।

ووالدا كنا وكنت الولدا * ثمت اسلمنا ولم ينزع يدا

"কেননা আবদ মান্নাফ এর মাতা ছিল খুযা'আ গোত্রের এবং কুসাই এর মাতা ফাতিমা বিনতে সা'দও ছিল খুযা'আ গোত্রের। এ সম্পর্কের কারণে আমাদেরকে সাহায্য করা আপনার উপর অবশ্য কর্তব্য, তা ছাড়া আমরা সর্বদা আপনার অনুগত ছিলাম। কখনো আপনার আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়নি। সুতরাং আপনার নিকট আমাদের আশা এই যে, আপনার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ও অঙ্গীকার রক্ষাকারীদেরকে সাহায্য করুন।"

فانصر هداك الله نصرا اعتدا * وادع عباد الله يأتوا مددا

"অতএব আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে সাহায্য করুন, আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করবেন, আল্লাহর খাস বান্দা অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামদেরকে নির্দেশ প্রদান করুন, যেন তাঁরা অবশ্যই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।"

অন্য এক সংস্করণে আছে فانصر رسول الله نصرا اعتدا "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে সাহায্য করুন।"

فيهم رسول الله قد تجردا ١* ان سيم خسفا وجهه تربدا

"যখন আল্লাহর বান্দা অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম (রা) আমাদের সাহায্যে আগমন করেন, তখন এই দলে রাসূলুল্লাহ (সা) অবশ্যই থাকবেন যিনি যালিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি রয়েছেন।" অর্থাৎ শুধু সারীয়া প্রেরণ করবেন না, বরং তিনি স্বয়ং আগমন করবেন। যদি ঐ যালিম আপনাকে কষ্ট দেয়, তাহলে নবী (সা)-এর পবিত্র চেহারা মর্যাদাবোধের কারণে রক্তিম হয়ে ওঠে।

فى فيلق كالبحر يجرى مزبدا

"এরূপ বাহিনী নিয়ে আগমন করেন যা সাগরের মত গর্জন করতে থাকে।"

এ বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে ইমাম তাহাভীর 'শারহে মা'আনীল আসার' সীরাতে ইবন হিশাম ও রওযুল উনূফ এবং যারকানীর শারহে মাওয়াহিবে উল্লেখ রয়েছে। সংক্ষিপ্ত আকারে ফাতহুল বারী গ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে।[২]

মাগাযী ইবন আয়েযে হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা) এ ঘটনা শ্রবণ করে বলেন ঃ نصرتَ ياعمرو بن سالم (হে আমর ইবন সালিম, তোমাকে সাহায্য করা হবে)। অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে সাহায্য করা হবে না, যদি তোমাকে সাহায্য না করি। অতঃপর নবী (সা) জিজ্ঞাসা করেন, সমস্ত বনূ বকর কি এতে অংশগ্রহণ করেছে? আমর ইবন সালিম বললেন, সবাই নয়, তবে বনূ বকর থেকে শুধু বনু নাফাসা এবং তাদের সর্দার নওফল এতে

---

১. কোন কোন গ্রন্থে قد تحددا হা মুহমিলার (حاء محمله) সাথে এসছে যার অর্থ ক্রোধান্বিত হওয়া

২. ফাতহুল বারী, ৭ম খ. পৃ. ৩৯৯

অংশগ্রহণ করে। নবী করীম (সা) তাদেরকে সাহায্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অতঃপর এ দলটি ফিরে যায়। এদিকে নবী (সা) মক্কার কুরায়শদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন এবং তাকে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাদেরকে এই সংবাদ অবহিত করবে যে, তাদেরকে তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের সুযোগ দেয়া হলো ঃ

১. খুযা'আ গোত্রের নিহত ব্যক্তিদের দিয়ত (মুক্তিপণ) আদায় করতে হবে।

২. অথবা বনূ নাফাসার চুক্তি ও অঙ্গিকার ছিন্ন করতে হবে।

৩. অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিলের ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

এ সংবাদ নিয়ে দূত তাদের নিকট পৌঁছলে কুরায়শদের পক্ষ থেকে কারতা ইবন আমর এই জবাব প্রদান করে যে, আমরা খুযা'আ গোত্রের নিহতদের মুক্তিপণ আদায় করব না এবং বনূ নাফাসা গোত্রের সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করব না, তবে হুদায়বিয়ার সন্ধি আমরা বাতিল করতে সম্মত আছি। কিন্তু দূত রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কুরায়শদের অনুশোচনা হয় এবং সাথে সাথেই আবূ সুফিয়ানকে সন্ধির সময় বৃদ্ধির জন্য মদীনায় প্রেরণ করে।[১]

চুক্তি নবায়নের জন্য আবূ সুফিয়ানের মদীনা গমন

আবূ সুফিয়ান চুক্তি নবায়নের জন্য মক্কা থেকে মদীনা যাত্রা করে। এদিকে নবী (সা) সাহাবাগণকে এ সংবাদ প্রদান করেন যে, আবূ সুফিয়ান সন্ধির সময় বৃদ্ধি ও চুক্তি নবায়নের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনায় আসছে। মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর উসফান নামক স্থানে খুযা'আ গোত্রের বুদাইল ইবন ওয়ারাকার সাথে আবূ সুফিয়ানের সাক্ষাত হয়। আবু সুফিয়ান বুদাইলকে জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে আগমন করছো? তিনি বলেন, নিকটবর্তী এক এলাকা থেকে আসছি। এটা বলেই তিনি মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে যান। এরপর আবূ সুফিয়ানের ধারণা হলো, বুদাইল নিশ্চয়ই মদীনা থেকে ফিরে আসছে। সুতরাং যে স্থানে বুদাইলের উট বসেছিল, সেখানে গিয়ে আবূ সুফিয়ান পর্যবেক্ষণ করল। বুদাইলের উটের মল ভাঙ্গার পর তার থেকে যে খেজুর বিচি বের হল তা মদীনার খেজুরের বিচি। আবূ সুফিয়ান বলল, আল্লাহর শপথ! বুদাইল নিশ্চয়ই মদীনা থেকে আগমন করেছে। আবূ সুফিয়ান মদীনা পৌছে প্রথমে তার কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে বলল, হে কন্যা! তুমি বিছানা উল্টে দিয়েছ। বিছানা কি আমার উপযুক্ত মনে করনি অথবা আমাকে বিছানার উপযুক্ত মনে করনি? হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বললেন, এটা হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিছানা। যে মুশরিক শিরকের মত অপবিত্রতার সাথে জড়িয়ে রয়েছে, সে এ বিছানায় বসতে পারে না। আবূ সুফিয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, হে কন্যা! আল্লাহ্র শপথ! তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অনিষ্টতার মধ্যে মগ্ন রয়েছ। উম্মে হাবীবা (রা) বললেন, অনিষ্টতার

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৪; যারকানী, ২ খ. পৃ. ২৯২।

মধ্যে নয়, বরং কুফরীর অন্ধকার থেকে ইসলামের আলো ও হিদায়াতের পথে প্রবেশ করেছি। আপনার প্রতি অবাক লাগে যে, আপনি কুরায়শদের সর্দার হওয়া সত্ত্বেও এরূপ পাথর পূজা করেন, যা না শ্রবণ করে, না দেখতে পায়।

আবূ সুফিয়ান সেখান থেকে উঠে মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমি কুরায়শদের পক্ষ থেকে চুক্তি নবায়ন ও সময়সীমা বর্ধিত করার জন্য আগমন করেছি। রাসূল (সা) কোন জবাব প্রদান করলেন না। আবূ সুফিয়ান এবার হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আমি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারব না। অতঃপর আবূ সুফিয়ান হযরত উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেন। হযরত উমর (রা) বলেন, আল্লাহু আকবার। আমি তোমার সুপারিশের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গমন করব? দুনিয়ায় যদি একটি লোকও পাওয়া না যায়, তবুও আমি একাই জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত আছি। এটা শ্রবণ করে আবূ সুফিয়ান নীরবে হযরত আলী (রা)-এর নিকট গমন করেন। এ সময় তাঁর নিকট হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রা) এবং হযরত হাসান (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। আবূ সুফিয়ান হযরত আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আবুল হাসান! আমি আপনার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়। আমি একটি জরুরী কাজ নিয়ে এসেছি। আশা করি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাব না। সুতরাং আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সুপারিশ করুন। হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূল (সা) এ ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কাজেই এ বিষয়ে রাসূল (সা) এর খেদমতে কিছু বলার সাহস কারো নেই। আবূ সুফিয়ান এটা শুনে এবং হযরত ফাতিমা (রা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা)-এর কন্যা! যদি আপনি হযরত হাসানকে এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি যেন এ আহ্বান রাখেন যে, আমি কুরায়শদেরকে নিরাপত্তা দান করলাম। তা হলে আরবের সর্দার হিসেবে তাঁকে সর্বকালের জন্য মেনে নেয়া হবে। হযরত ফাতিমা (রা) বলেন, প্রথমত, হাসান অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রদান করা বয়স্কদের কাজ। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মতের বিরুদ্ধে কে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে? আবূ সুফিয়ান হযরত আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলল, ঘটনা অত্যন্ত জটিল ও কঠোর হয়ে গিয়েছে। তবে আমাকে কিছু পন্থা শিখিয়ে দিন। হযরত আলী (রা) বলেন, যদি আপনি নিজের জন্য এটা ফলপ্রসূ ও কার্যকর মনে করেন, তাহলে মসজিদে গিয়ে এ ঘোষণা দিতে পারেন যে, আমি হুদায়বিয়ার চুক্তি নবায়ন ও সময়সীমা বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। এটা বলে আপনি নিজ শহরে গমন করুন। সুতরাং আবূ সুফিয়ান সেখান থেকে মসজিদে উপস্থিত হয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে, আমি চুক্তি নবায়ন এবং সময়সীমা বর্ধিত করার জন্য এসেছিলাম। অতঃপর তিনি মক্কা ফিরে যান।

আবূ সুফিয়ান মক্কা পৌঁছার পর নেতৃবৃন্দের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। কুরায়শরা বলল, হযরত মুহাম্মদ (সা) কি তোমার ঘোষণাকে বৈধতা দান করেছেন? আবূ সুফিয়ান বলল, না। তারা বলল, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সন্তুষ্টি ও সম্মতি ব্যতীত তুমি কিভাবে সম্মত হলে এবং নিরাপদ হয়ে গেলে? এরূপ বাতিল ও নিষ্ফল বস্তু নিয়ে ফিরে এসেছ যা ভঙ্গ করা তাঁর জন্য কঠিন নয়। আল্লাহর শপথ! হযরত আলী (রা) তোমার সাথে ঠাট্টা করেছে। তুমি সন্ধির এমন সংবাদ নিয়ে আগমন করনি যার ফলে নিরাপদ হওয়া যায় এবং এরূপ যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এসেছ যার জন্য আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা যায়। আবূ সুফিয়ানের ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাগণকে গোপনে মক্কা গমনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং এই তাকীদ ও সতর্ক করেন যে, বিষয়টি যাতে গোপন রাখা হয়, প্রকাশ করা না হয়। এছাড়া আশেপাশের গোত্রসমূহকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।[১]

হাতিব ইবন আবূ বালতা'আর ঘটনা

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ইতোমধ্যে হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ (রা) মক্কাবাসীর নিকট এটা বলে একটি পত্র প্রেরণ করেন যে, নবী (সা) মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। গোপনে একজন মহিলার হাতে এই পত্র দিয়ে তাকে মক্কায় প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবী করীম (সা)-কে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তিনি হযরত আলী, হযরত যুবায়র ও হযরত মিকদাদকে এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন যে, তোমরা সোজা রওযায়ে খাক নামক স্থানে গমন করে উটের উপর আরোহী অবস্থায় একজন মহিলাকে দেখতে পাবে। তার সাথে মক্কার মুশরিকদের নামে হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ কর্তৃক প্রেরিত একটি পত্র পাবে। তা ঐ মহিলার কাছ থেকে নিয়ে আসবে। হযরত আলী (রা) বলেন, সুতরাং রওযায়ে খাখে পৌঁছে আমরা মহিলাকে পেলাম। তার উট বসিয়ে আমরা খোঁজ করেও কোন পত্র পেলাম না। আমরা বললাম, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো ভুল বলতে পারেন না।

আমরা ঐ মহিলাকে বললাম, উত্তম হবে যে, স্ব-ইচ্ছায় ঐ পত্রটি আমাদের নিকট হস্তান্তর কর। অন্যথায় প্রয়োজনে যে কোন উপায়ে খোঁজ করে তা বের করব। ফলে ঐ মহিলা তার কোমর থেকে পত্র বের করল, আমরা তা নিয়ে নবী (সা)-এর নিকট হাযির হলাম। তিনি হাতিব ইবন আবূ বালতা'আকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যে কাজ করেছ এর কারণ কি? হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রুত শাস্তি প্রদান করবেন না। কুরায়শদের সাথে আমার কোন আত্মীয়তার বন্ধন নেই; শুধু চুক্তির সম্পর্ক রয়েছে। আমার পরিবারবর্গ বর্তমানে মক্কায় রয়েছে কিন্তু সেখানে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। পক্ষান্তরে মক্কায় মুহাজিরগণের আত্মীয়-স্বজন থাকায়

১. যারকানী, ২ খ. পৃ. ২৯৩।

তাদের পরিবারবর্গ নিরাপদে রয়েছে। যেহেতু কুরায়শদের সাথে আমার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, তাই আমি তাদের জন্য এমন কিছু কল্যাণকর কাজ করতে চেয়েছি যার ফলে তারা আমার পরিবারবর্গকে হিফাযত করবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি দীন থেকে মুরতাদ হয়ে এবং ইসলামের পর কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একাজ করিনি। আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যা আমি উল্লেখ করেছি। (সহীহ বুখারী)।

ইবন মারদুবিয়ার রিওয়ায়াতে হযরত উমর (রা) থেকে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ فكتبت كتابًا لايضر الله ورسوله

"অতঃপর আমি একটি পত্র লিখেছি (যাতে আমার এই ফায়দা রয়েছে) এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কোন ক্ষতি নেই।"

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ঘটনা শুনে বলেন ঃ اما انه قد صدقكم "সাবধান! নিশ্চয়ই সে তোমাদের নিকট সত্য কথা বলেছে।"

হযরত উমর (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ মুনাফিককে হত্যার অনুমতি প্রদান করুন। নবী করীম (সা) বলেন ঃ

انه قد شهد بدرًا ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم قد غفرت لكم -

"নিঃসন্দেহে হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। হে উমর! তুমি কি অবগত নও যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমতের দৃষ্টিতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণকে উদ্দেশ্য করে এই ঘোষণা প্রদান করেছেন যে, "তোমাদের যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

এ কথা শুনে হযরত উমর (রা)-এর চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি আরয করলেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূল অধিক জ্ঞাত আছেন।

অর্থাৎ যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি কখনো মুনাফিক হতে পারেন না। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এমন জীবনবাজী ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন যে, আরশ উত্তোলনকারী এবং নৈকট্যলাভকারী ফিরিশ্তাগণও আশ্চর্য এবং হতবাক হয়ে পড়েন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে, হোক সে পিতা, পুত্র, ভাই অথবা বন্ধু, নির্ভিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে তাদেরকে হতাহত করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতে তাঁরা এরূপ বিভোর ও মগ্ন ছিলেন যে, আপনজনও তাদের নিকট পর হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুফর ও শিরকের মূলে এরূপ আঘাত করেন, যার ফলে কুফর ও শিরকের মূলোৎপাটিত হয়।

এই বিমল কর্মকাণ্ডের ফলে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ এবং وَرَضُوْا عَنْهُ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ এই অমূল্য খেতাব তাঁদেরকে

দান করা হয় এবং ভবিষ্যতে যে পাপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তার অর্থ صيغه فماغفرت لكم صيغه مستقبل ماضى فقد غفرت لكم দ্বারা বর্ণনা করেছেন কিন্তু দ্বারা বর্ণনা করা হয়নি। যাতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের গুনাহ মাফ হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, তাঁদের মাগফিরাত অতীতকালের মত নিশ্চিত হয়ে যায়।

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ এর সম্বোধন দ্বারা মার্যাদা প্রদানের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এর দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সমস্ত লোক যা কিছু করুক না কেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই ক্ষমা ও মাগফিরাতের সীমা অতিক্রম করবে না। اعملوا ماشئتم -এর খেতাব গুনাহ্ -এর বৈধতা ও অনুমতির জন্য ছিল না। এরূপ সম্বোধন ঐ সমস্ত প্রিয়ভাজন ও অন্তরঙ্গ লোকজনের জন্য হয়ে থাকে যাঁদের দ্বারা স্বীয় মাহবূবের নাফরমানী সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ বাহ্যিকভাবে ছিল একটি নেককাজ কিন্তু বাস্তবে তা হলো অসংখ্য নেককাজের মুখবন্ধ বা উৎস এবং ঈমান ও ইহসান, সত্য ও ইসলামের একটি সনদ। সুতরাং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীর পক্ষ থেকে মানুষ হিসেবে যদি কোন ক্রটি প্রকাশ পায় তা হলেও এটা رضى الله عنهم ورضوا عنه এবং اولئك كتب فى قلوبهم الايمان এ দু'টো আয়াতের মর্মবাণীর সীমা অতিক্রম করতে পারে না। কেননা, এটা ঐ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সংবাদ, যাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত আছেন যে, তাঁদের থেকে এরূপ ক্রটি প্রকাশ পাবে। কিন্তু এই চিরন্তন জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরকে (সাহাবায়ে কিরামকে) رضى الله عنهم ورضوا عنه আয়াতের খেতাব দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ বিরাট হাসানা ও উত্তম কাজের পর তাঁদের থেকে এমন কোন ক্রটি প্রকাশিত হবে না, যা তাঁদের উক্ত নেক ও হাসানাকে মিটিয়ে দিতে পারে বরং এই মর্যাদা ও হাসানাই ভবিষ্যতের ক্রটির কাফ্ফারা হয়ে যেতে পারে। যেমন আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ "নিশ্চয়ই নেকীসমূহ গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়"। জনৈক কবি খুবই উত্তম কথা বলেছেন ঃ

اذ الحبيب اتى بذنب واحدٍ * جَاءت محاسنه بالف شفيع

"যদি বন্ধু থেকে কোন একটি ক্রটি প্রকাশ হয়ে যায়, তা হলে তার পূর্ববর্তী উত্তম কাজসমূহ অসংখ্য সুপারিশ নিয়ে সামনে উপস্থিত হয়।"

অন্তরে যদি কোন অনিষ্ট ও ক্ষতিকর কিছু না থাকে, তা হলে নাফরমানি তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না বরং অন্তরের ঈমানী শক্তি তাকে তাওবা ও ইসতিগফার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। যার ফলে তার পাপই শুধু ক্ষমা হয় না, বরং পাপ পূণ্যে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ـ

"কিন্তু যারা কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করেছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ এ সমস্ত লোকদের গুনাহ্কে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা ফুরকান ঃ ৭০)

বান্দা যখন তাওবা ও ইসতিগফার করেন তখন আল্লাহ তা'আলা তার পাপকে নেক দ্বারা এবং মন্দকে কল্যাণ দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।

مرکب توبہ عجائب مرکبست * برفلك تازديهبه يك لحظه زپست
چون برارنزاز پشیمانی اهنس * عرش لرزدازانین المذنبین

"তাওবা নামক বাহনটি এমন বিস্ময়কর বাহন যার গন্তব্য আকাশ পানে এবং নিমিষেই জিরো থেকে হিরোতে পৌঁছিয়ে দেয়।"

"যখন লজ্জিত হয়ে (তাওবাকারী ব্যক্তি) অশ্রু প্রবাহিত করে; পাপীদের সেই অশ্রুতে মহান সত্তার আরশ বিগলিত হয়ে যায়।"

উপরোক্ত আয়াত সাধারণভাবে সমস্ত মু'মিনের জন্য প্রযোজ্য। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ এজন্য সর্বাধিক যোগ্য ও হকদার। যার অন্তরে কোন অনিষ্টতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রবণতা বিদ্যমান থাকে কোন আনুগত্য ও ইবাদতই তার জন্য কোন ফলদায়ক হবে না। যেমন, অভিশপ্ত ইবলিস, খারেজী ও রাফিযী দল যতই নামায-রোযা ও ইবাদত করুক না কেন, যতক্ষণ অন্তরের পবিত্রতা অর্জিত না হবে এবং ফাসাদ সৃষ্টির প্রবণতা দূরীভূত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আনুগত্য ও ইবাদত ফলদায়ক ও উপকারী হবে না।

পিত্তজনিত রোগীকে অতি উত্তম খাদ্য প্রদান করা হলেও তার জন্য এটা বিষতুল্য বলে প্রতীয়মান হবে। যেমন, আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ১০)

সৎ ও সুস্থ মস্তিষ্কের কোন লোক যদি ভুলক্রমে কোন ত্রুটি করে, তা হলে এর জন্য কোন বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। তার স্বভাব বা চরিত্রই ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি দূর করতে পারে।

হযরত উমর (রা) হযরত হাতিব (রা)-এর ত্রুটিকে ষড়যন্ত্রমূলক মানসিকতা হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং নিফাকের দোষে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে হত্যার অনুমতি কামনা করেন। মহানবী (সা) জবাবে বলেন, হে উমর! হাতিবের অন্তর নিফাকের ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। এটা নিফাক নয় বরং উদাসীনতার কারণে

ক্রুটি হয়ে গিয়েছে। রূহানী মেযাজ বা অভ্যন্তরীণ মানসিকতা স্বাভাবিক আছে। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ তাঁদেরকে খাঁটি স্বর্ণে পরিণত করেছে। ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সুস্থ মানুষেরও কখনো কখনো সর্দি-কাশি হয়ে থাকে কিন্তু এটা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য তেমন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক প্রকৃতিই এই ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি দূরীভূত করতে পারে।

নবী করীম (সা) হযরত হাতিব (রা)-কে ডেকে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, হে হাতিব! এটা কিরূপ ঘটনা? এই আকস্মিক ঘটনা ও অভিযোগ এরূপ ফলদায়ক হলো যে, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ব্যাপারে আর কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে রাসূলুল্লাহ (সা) ইসকান্দরিয়ার বাদশাহ্র নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি পত্র দিয়ে হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ (রা)-কে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। সুবহানাল্লাহ! নবী করীম (সা)-এর দরবার কত মহান ছিল। একদিকে হযরত হাতিব (রা)-কে ভুল সংশোধনের তালীম দেয়া হচ্ছে, অপরদিকে হযরত উমর (রা)-কে রূহানী চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দান করা হচ্ছে, যাতে প্রয়োজনানুযায়ী হযরত উমর (রা) অপরাধ নির্ধারণ ও সংশোধনে ভুল না করেন।

হযরত হাতিব (রা) এর পত্রের বিষয়বস্তু

হযরত হাতিব (রা)-এর পত্রের বিষয়বস্তু দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর উদ্দেশ্য মুনাফেকী ছিল না। পত্রটি হলো ঃ

أما بعد يامعشر قريش فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فو الله لوجاءكم وحده لنصره الله وانجزله وعده فانظروا لانفسكم والسلام -

"হে কুরায়শ গোত্র! রাসূলুল্লাহ (সা) অন্ধকার রাতের মত ভয়াবহ এক বাহিনী নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করবেন যা বন্যার মত প্রবাহিত হবে। আল্লাহ্র শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং একাকীও তোমাদের নিকট আগমন করেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং বিজয় ও সাহায্যের জন্য যে ওয়াদা আল্লাহ পাক তাঁকে দিয়েছেন, তা অবশ্যই পূরণ করবেন।

অর্থাৎ তাঁর বিজয় সৈন্যসামন্তের ওপর নির্ভরশীল নয়। অতএব, তোমাদের পরিণাম তোমরাই ভেবে দেখ। ওয়াস সালাম।"

এই পত্রটি ইয়াহ্ইয়া ইবন সালাম স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, আল্লামা কাসতাল্লানী (র) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় কিতাবুল জিহাদে 'গুপ্তচরের বিধান অধ্যায়ে' পত্রটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ফাতহুল বারী গ্রন্থে 'গাযওয়াতুল ফাতহ' অধ্যায়ে এবং 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ, পৃ. ২০৪।

এই পত্রের বিষয়বস্তু فكتبت كتابًا لايضر الله ورسوله (আমি এরূপপত্র লিখেছি যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য অনিষ্টকর নয়) হযরত হাতিব (রা)-এর ওজরের স্পষ্ট ও সত্যতা প্রমাণ করছে।

ওয়াকিদীর রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, পত্রটি সুহায়ল ইবন আমর, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা এবং ইকরামা ইবন আবূ জাহলের নামে প্রেরণ করা হয়েছিল। এই তিনজনই মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

অপর এক রিওয়ায়াতে পত্রের বিষয়বস্তু এরূপ উল্লেখ রয়েছে–

أن محمدا قد نفر فاما اليكم واما الى غيركم فعليكم الحذر .

"নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ (সা) গাযওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করবেন। এটা জানা নেই যে, তিনি কোনদিকে গমন করবেন। তোমাদের দিকে, না অন্য দিকে। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিজেদের নিয়ে চিন্তা কর।" (যারকানী, ২য় খ, পৃ. ২৯৮)

আল্লাহ তা'আলা হাতিব (রা)-এর ঘটনাকে উল্লেখ করে সূরা মুমতাহিনা নাযিল করেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ـ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ কর, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা তারা অস্বীকার করছে।" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১)

আল্লাহ পাক এ আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান পেশ করেছেন।

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা

মহানবী (সা) ৮ হিজরীর ১০ রমযান বাদ আসর ১০ হাজার মুসলমানের এক বাহিনী নিয়ে মক্কা জয়ের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে যাত্রা করেন। উম্মুল মু'মিনীনগণের মধ্যে হযরত উম্মে সালামা ও হযরত মায়মূনা (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। (বুখারী ও ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ২)

নবী করীম (সা) যখন যুল-হুলায়ফা অথবা জুহফা নামক স্থানে পৌছেন তখন হযরত আব্বাস (রা) স্বীয় পরিবারবর্গসহ মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করে যাওয়ার পথে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়। নবী (সা) এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আব্বাস (রা) তাঁর আসবাবপত্র মদীনায় প্রেরণ করেন এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। হযরত আব্বাস (রা) পূর্বেই

১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ২৯৭।

ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তা কুরায়শদের নিকট গোপন রেখেছিলেন। নবী (সা) বললেন, হে আব্বাস! তোমার হিজরত হলো সর্বশেষ হিজরত, যেমন আমার নবুওয়াত হলো সর্বশেষ নবুওয়াত। নবী করীম (সা)-এর নির্দেশেই হযরত আব্বাস (রা) মক্কায় অবস্থান করেন, মক্কা থেকে নবী (সা)-কে কুরায়শদের সংবাদ প্রেরণ করতে থাকেন।

মুসনাদে আবু ইয়ালা এবং মু'জামে তাবারানী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মক্কায় অবস্থানকালে হযরত আব্বাস (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট মদীনায় হিজরতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন।

নবী (সা) এর জবাবে লিখেন, হে চাচা! আপনি আপনার স্থানে অবস্থান করুন, আল্লাহ পাক আপনার মাধ্যমে হিজরত সমাপ্ত করবেন, যেমন আমার উপর নবূওয়াত সমাপ্ত করেছেন। (যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩০০)

আবওয়া[১] নামক স্থানে আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস[২] এবং আবদুল্লাহ ইবন আবু উমাইয়া ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনা যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মুসলিম বাহিনীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব নবী (সা) এর চাচাত ভাই ব্যতীত তাঁর দুধ ভাইও ছিলেন। হযরত হালীমা সা'দীয়ার দুধ পান করেছিলেন, নবুওয়াতের পূর্বে নবী (সা) এর বন্ধু ছিলেন। কোন সময়ই নবী (সা) থেকে আলাদা হতেন না। নবুওয়াতের পর দোস্ত দুশমনে পরিণত হয়ে গেল। নবী (সা) এর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেন। হযরত হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) তার কবিতার জবাবে কবিতা রচনা করেন। আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস এর সাথে ছিলেন তার পুত্র জা'ফর।

আবদুল্লাহ ইবন আবূ উমাইয়া রাসূল (সা)-এর ফুফাত ভাই ছিলেন। অর্থাৎ তিনি নবী (সা)-এর ফুফু আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব-এর পুত্র ছিলেন। তিনিও রাসূল (সা) এর ঘোর বিরোধী ছিলেন, উভয়েই রাসূল (সা) এর মহান দরবারে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন, এ দু'ব্যক্তি দ্বারা রাসূল (সা) অনেক কষ্ট পেয়েছেন, ফলে তাদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করেননি। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) সুপারিশ করে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন হলো আপনার চাচাত ভাই আর অপরজন হলো আপনার ফুফাত ভাই। নবী (সা) বললেন, আমার চাচাত ভাই আমার অনেক অনিষ্ট করেছে। আর ফুফাত ভাই হলো এরূপ ব্যক্তি, যে মক্কায় এ কথা বলত যে, আল্লাহর শপথ! আমি কখনই তোমার উপর ঈমান আনয়ন করব না এমন কি তুমি সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে না চড়বে এবং আমি স্বয়ং চোখে প্রত্যক্ষ করব যে, তুমি আকাশ থেকে এক দস্তাবিজ নিয়ে চারজন ফিরিশতাসহ অবতরণ করছ এবং তারা সাক্ষ্য

---

১. الأبواء। হামযার উপর যবর এবং باء এর উপর সাকিন মক্কাও মদীনার মধ্যবর্তী একটি গ্রামের নাম।

২. ইনি হলেন আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস যিনি প্রখ্যাত আবু সুফিয়ান ব্যতীত অন্যজন।

দিচ্ছে যে, তোমাকে আল্লাহ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন কিন্তু তবুও তোমার উপর আমি ঈমান আনয়ন করব না।

হযরত উম্মে সালামা (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মহান চরিত্রের নিকট এ আশা পোষণ করা হচ্ছে যে, আপনার করুণা ও সহানুভূতি থেকে আপনার চাচাত ও ফুফাত ভাই কিছুতেই বঞ্চিত হবে না। কেননা আপনার করুণা ও দয়া যেহেতু সার্বজনীন, সুতরাং তারা কেন বঞ্চিত হবে।

اقربارا كجاكنى محروم * توكه بادشمنان نظردارى

"(হে মহান বনী) আপনি শত্রুদের যেখানে করুণা করে থাকেন, সেখানে আপন জনদেরকে কিভাবে বঞ্চিত করবেন।"

এদিকে আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস এই ঘোষণা করে যে, যদি আপনি (রাসূল সা.) আপনার মহান দরবারে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান না করেন তাহলে আমি আমার পুত্র জা'ফরকে নিয়ে কোন মরুভুমিতে চলে যাব এবং সেখানে ক্ষুধা ও পিপাসায় অভূক্ত থেকে মৃত্যুবরণ করব। রাসূল (সা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালামা (রা)-এর সুপারিশ এবং এই দু'ব্যক্তির অনুতাপ ও অনুশোচনা দেখে তাদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করেন। উপস্থিত হয়েই তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বাহিনীর সাথে মক্কা রওয়ানা হন।

হাফিয ইবন আবদুল বার এবং তাবারী কর্তৃক বর্ণিত, হযরত আলী (রা) আবূ সুফিয়ান ইবন হারিসকে এ পরামর্শ প্রদান করেন যে, নবী (সা)-এর পবিত্র চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে ঐ কথা বলবেন যা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইগণ তাঁকে বলেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর ভাইগণ হযরত ইউসুফ (আ)-কে বলেছিলেন ঃ

تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ

"আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে আমাদের উপর ফযীলত দান করেছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৯১)

হযরত আলী (রা) সামনে আসার পরামর্শ এজন্য দিয়েছেন যাতে নূরানী চেহারার প্রভাবে নবী (সা) এবং অসন্তোষের মধ্যে এক পর্দা বা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। বস্তুত ঘটনা এরূপ হলো যে, রাসূল (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে বের হলো ঃ

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

"আজ তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। তিনি সবচেয়ে বেশি করুণাময়।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৯২)

আবূ সুফিয়ানের ওজর ও প্রার্থনা গৃহীত হয় এবং হাদীসের বাণী الاسلام يهدم ماكان قبله (ইসলাম পূর্ববর্তী অপরাধ ও পাপ মিটিয়ে দেয়) অর্থাৎ ইসলামের আলো

আবূ সুফিয়ান ইবন হারিসের অন্তরকে এরূপ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন করে দেয় যে, তার মধ্যে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন ক্রোধ ও অসন্তোষ বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রইল না, বরং ঈমান, ইহসান ও ইখলাসে তাঁর অন্তর এরূপ পরিপূর্ণ হয়ে গেল যার ফলে কুফরের কোন ধূলিকণা তথা বৈশিষ্ট্য তাঁর অন্তরে পৌছতে পারল না এবং তখন থেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির পথে জীবন উৎসর্গ ও বিলিয়ে দেয়ার জন্য নবী (সা)-এর সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

কথিত আছে, আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস (রা) লজ্জার কারণে জীবনের শেষ মূহর্ত পর্যন্ত রাসূল (সা)-এর দিকে চোখ উঠিয়ে তাকাননি এবং নবী (সা) তাঁর জন্য বেহেশতের সুসংবাদ দান করতেন। (যারকানী, ২ খ. পৃ. ৩০০-৩০২)

আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস (রা) অতীত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

لعمرك انى يوم أحمل رأية * لتغلب خيل اللات خيل محمد

"শপথ আপনার পবিত্র জীবনের, নিশ্চয়ই আমি লাতের (দেবতার) বাহিনীকে মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিনীর উপর বিজয় লাভের জন্য যে দিন ঝাণ্ডা উড়িয়েছিলাম।"

لكا لمدلج الحيران اظلم ليله * فهذا اوانى حين اهدى واهتدى

"ঐ দিন আমি অন্ধকার রাতের পথচারীদের মত হয়রান পেরেশান ছিলাম, আল্লাহ পাকের প্রশংসা, তখন এমনি মুহূর্ত যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হিদায়াত প্রদান করা হচ্ছে এবং আমি হিদায়াতপ্রাপ্ত হচ্ছি।"

এ ছাড়াও তিনি অনুতপ্ত হয়ে আরো কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। (দেখুন সীরাতে ইবন হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩)

আবদুল্লাহ ইবন আবূ উমাইয়ার (রা) ইসলাম গ্রহণের পর অবস্থা এই হলো যে, লজ্জা ও অনুশোচনার কারণে চোখ উঠিয়ে রাসূল (সা)-এর দিকে তাকাতে পারতেন না।

নবী (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় সাহাবায়ে কিরামসহ সবাই রোযা অবস্থায় ছিলেন। কাদীদ[১] নামক স্থানে পৌঁছে সাহাবাদের কষ্ট অনুভব করে রাসূল (সা) রোযা ভঙ্গ করেন। সাহাবাগণও তাঁর অনুসরণ করে রোযা ভঙ্গ করেন।

প্রথমত, সফর তো এমনিতেই কষ্টকর। অন্যদিকে এই ছিল জিহাদের জন্য কিন্তু সময় হলো গ্রীষ্মকাল। ফলে দুর্বলতার কারণে আল্লাহর পথে জিহাদের ফরয যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হবে না। এ কারণে হাদীসে বর্ণিত আছে ليس من البر الصيام فى السفر (সফরে রোযা রাখায় কোন নেকী নেই) হ্যাঁ, সফর যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে না হয় এবং সফরে কোন কষ্ট না হয়, তাহলে রোযা রাখাই উত্তম। রমযানের রোযা যদিও কাযা করা সম্ভব কিন্তু রমযানের নূর ও তাজাল্লী, সর্বদা ফিরিশ্তাগণের উঠা

১. এ স্থানটি মক্কা মুকাররমা থেকে ৭২ মাইল দূরে অবস্থিত।

ও নাযিলের বরকত, শয়তানদের পায়ে বেড়ী লাগানো, বেহেশত ও রহমতের দরযাসমূহ খুলে দেয়া, দোযখের দরযা বন্ধ করে দেয়া, কুরআনে হাফিযদের দিবারাত্র আল্লাহর কালাম কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকা, ফিরিশ্তাগণের যিকিরের মজলিস এবং তাসবীহ্-তাহলীল এবং তিলাওয়াতে কুরআনের মাহফিল তালাশ করা– এ সমস্ত রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে কিভাবে পাওয়া যাবে। এ জন্য আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌلَّكُمْ অসুস্থ ও সফরকারীর জন্য যদিও রোযা ভঙ্গ করা জায়েয কিন্তু রোযা রাখাই উত্তম। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সফরে রোযা রাখা উত্তম।

মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যে দশ হাজার জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীর বাহিনী আল্লাহর পথে জিহাদ এবং তাওহীদের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সফর করছিল, তাঁদের জন্য প্রয়োজনে নামায বিলম্বও করা যেতে পারে যা রোযা থেকে নিঃসন্দেহে উত্তম, যা দীনের জন্য স্তম্ভ স্বরূপ এবং ঈমানের পর সবচেয়ে উত্তম আমল। সুতরাং জিহাদের সফরে রোযা না রাখা উত্তম, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথে জীবন উৎসর্গ করে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া এরূপ নিয়ামত, যার উপর আসমান ও যমীনের ফিরিশ্তাগণ ঈর্ষা করেন, এ অবস্থায় রোযা ভঙ্গের কারণে যদিও তাসবীহ্-তাহ্লীল, তাহ্মীদ এবং ফিরিশ্তা অবতরণের বরকত থেকে অধিক ফায়দা অর্জিত নাও হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রফুল্লচিত্তে সকাল-সন্ধ্যা চলার মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের লাখো মনযিল অতিক্রম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে হাজার বছর অব্যাহতভাবে তাসবীহ্-তাহলীল করেও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের এই স্তর সে অতিক্রম করতে পারবে না, যা জিহাদের উদ্দেশ্যে সামান্য পদক্ষেপে অর্জিত হয়ে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে (একজন মুজাহিদ) সাত মাইল অতিক্রম করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সপ্তম আকাশের উপর পৌঁছে। এদিকে বিক্ষিপ্ত ও জীর্ণ মাথার চুল, খোলা মাথা এবং অনাবৃত পা, নিজের প্রিয় জীবনকে বেহেশতের বদলে আল্লাহ পাকের হাতে বিক্রি ও সোপর্দ করার জন্য যাচ্ছে, যাতে দ্রুত ক্রেতার (আল্লাহ তা'আলার) নিকট অর্পণ করে এর মূল্য বাবদ বেহেশত আদায় করতে পারে। আল্লাহ না করুন, কোন দস্যু (শয়তান) যাতে এই ক্রয়-বিক্রয়ে (জিহাদে অংশগ্রহণ ও বেহেশত লাভ) বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে। নতুবা আফসোসের সম্মুখীন হতে হবে এবং আসমান ও যমীনের ফিরিশতাগণ ঈর্ষা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকে দেখতে থাকবেন।

মাররায যাহ্রান নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন

নবী (সা) কাদীদ নামক স্থান থেকে রওয়ানা হয়ে ইশার সময় মাররাযযাহ্রান নামক স্থানে পৌঁছেন। সেখানে তাঁবু স্থাপন করার পর প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বীয় তাঁবুর সামনে অগ্নি প্রজ্বলিত করার জন্য মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করেন। অগ্নি প্রজ্বলিত করা ছিল আরবের একটি প্রাচীন রীতি। তদনুযায়ী তিনি এ নির্দেশ প্রদান করেন। চুক্তিভঙ্গ

করার ফলে কুরায়শদের মধ্যে এই আশংকা ছিল যে, না জানি রাসূলুল্লাহ (সা) কখন তাদের উপর আক্রমণ করে বসেন। সুতরাং আবূ সুফিয়ান ইবন হারব, বুদায়ল ইবন ওয়ারাকা এবং হাকীম সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়। মাররায যাহরান (مَرَّ الظهران) নামক স্থানের নিকট পৌঁছলে মুসলিম বাহিনী তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এতে তারা ভয় পেয়ে যায়। আবূ সুফিয়ান বলল, এ আগুন কাদের প্রজ্বলিত ? বুদায়ল বলল, এ আগুন হলো খুযা'আ গোত্রের। আবূ সুফিয়ান বলল, এত বিশাল বাহিনী খুযা'আ গোত্রের কোথা থেকে আসবে, তারা তো খুবই নগণ্য। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রহরীগণ তাদের দেখামাত্র গ্রেফতার করলো। প্রহরীদেরকে তারা জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের মধ্যে ইনি কে? তারা বলল, ইনি হলেন আল্লাহ্র রাসূল, আমরা তাঁর সাহাবা, তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। এ সময় হযরত আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খচ্চরের উপর আরোহণ করে এদিকে আসেন। আবূ সুফিয়ানের কণ্ঠের আওয়ায শুনে তিনি তাকে বললেন, আফসোস! হে আবূ সুফিয়ান! এ সমস্ত হলো নবী করীম (সা) এর বাহিনী। আল্লাহ্র শপথ! যদি তিনি তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করেন, তাহলে তোমাকে হত্যা করবেন। সুতরাং তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে তাঁর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করা কুরায়শদের জন্য উত্তম হবে।

আবূ সুফিয়ান বলল, আমি আওয়ায শুনে খোঁজ করে হযরত আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আবুল ফযল! (হযরত আব্বাসের উপাধি) আমার পিতামাতা তোমার উপর উৎসর্গ হোক, এখন আমাদের মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? হযরত আব্বাস (রা) বললেন, আমার পিছনে খচ্চরের উপর আরোহণ কর। তোমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হব। এবং তোমার জন্য নিরাপত্তার আবেদন করব। হযরত আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ানকে সাথে নিয়ে মুসলিম বাহিনী পরিদর্শন করে চলেছেন, তারা হযরত উমর (রা)-এর নিকট দিয়ে গমনের সময় তিনি আবূ সুফিয়ানকে দেখেই তার পিছনে ছুটে এসে বলেন, এ হলো আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের দুশমন আবূ সুফিয়ান। আল্লাহর প্রশংসা, কোন অঙ্গীকার ব্যতীত আমাদের হস্তগত হয়েছে। হযরত উমর (রা) পায়ে হেঁটে চলছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) খচ্চরের উপর আরোহণ করে আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে খুব দ্রুত নবী হযরত (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এদিকে হযরত উমর (রা) পিছনে পিছনে তলোয়ার উত্তোলন করে নবী (সা)-এর নিকট হাযির হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি হলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দুশমন আবূ সুফিয়ান। আল-হামদুলিল্লাহ, কোন অঙ্গীকার ব্যতীত আজ হস্তগত হয়েছে। আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি তাকে হত্যা করব। হযরত আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে নিরাপত্তা দান করেছি। হযরত উমর (রা) তলোয়ার

নিয়ে দাঁড়িয়ে বার বার একই আরয করছিলেন এবং আবূ সুফিয়ানকে হত্যার জন্য নবী (সা)-এর ইশারার অপেক্ষা করছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, হে উমর! একটু থাম। যদি এ ব্যক্তি বনূ আদী গোত্রের হতো তাহলে তুমি তাকে হত্যার জন্য এভাবে জোর তাকিদ করতে না। যেহেতু তুমি অবগত আছ যে, এ ব্যক্তি হলো বনূ আবদ মান্নাফ গোত্রের, তাই তাকে হত্যার জন্য তুমি বারবার চেষ্টা করছ। হযরত উমর (রা) বললেন, হে আব্বাস! আল্লাহ্র শপথ! তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল। যদি আমার পিতা ইসলাম গ্রহণ করতো তাহলে আমি এত আনন্দিত হতাম না, যতটুকু তোমার ইসলাম গ্রহণের জন্য আনন্দিত হয়েছি। কেননা এটা আমি খুব ভালভাবে জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তোমার ইসলাম গ্রহণ খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল। তোমার ব্যাপারে আমার হলো এই ধারণা, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা মনে কর।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আব্বাস (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আবূ সুফিয়ানকে তোমার তাঁবুতে নিয়ে যাও, ভোরে আমার নিকট নিয়ে এস। আবূ সুফিয়ান সারা রাত হযরত আব্বাস (রা)-এর তাঁবুতে ছিলেন। হাকীম ইবন হিযাম এবং বুদায়ল ইবন ওয়ারাকা ঐ সময় নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাসূল (সা) তাঁদের সাথে মক্কার অবস্থা নিয়ে আলাপ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা উভয়ে মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীদেরকে নবী (সা) আগমনের সংবাদ প্রচার করেন।

আবূ সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

হযরত আব্বাস (রা) ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) আবূ সুফিয়ানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আফসোস হে আবূ সুফিয়ান! এখনো কি সময় আসেনি যে, তুমি এটা বিশ্বাস করবে যে, لا اله الا الله "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।"

আবূ সুফিয়ান বললেন! আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, আপনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল এবং আত্মীয়দের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ থাকত তাহলে আজ আমাদের কিছু উপকার হতো এবং আপনার বিপক্ষে তার কাছে সাহায্য কামনা করতাম।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আফসোস হে আবূ সুফিয়ান! তোমার কি এখনো সময় আসেনি যে, তুমি আমাকে আল্লাহ তা'আলার রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করবে? আবূ সুফিয়ান বললো, আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক! নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত

ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল এবং আত্মীয়দের প্রতি সবচেয়ে বেশি দরদী ও ক্ষমাশীল, এখনো আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে যাচ্ছেন যে, আমার এত মারাত্মক শত্রুতা সত্ত্বেও আমার উপর দয়া প্রদর্শন করছেন, আপনি প্রকৃতই নবী কিনা এ বিষয়ে এখনো আমার সন্দেহ রয়েছে।

অতঃপর হযরত আব্বাস (রা)-এর উপদেশে আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে। আবূ সুফিয়ান মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর হযরত আব্বাস (রা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সুফিয়ান হলো মক্কার সর্দার, গর্ব পসন্দ করে। সুতরাং আপনি তাঁর জন্য এমন কিছু করুন যা তাঁর জন্য সম্মান ও গৌরবের কারণ হবে। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, ঘোষণা করে দাও! যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে। আবূ সুফিয়ান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ঘরে কিভাবে এত অধিক সংখ্যক লোক সংকুলান হবে। নবী (সা) বললেন, যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, ঐ ব্যক্তিও নিরাপদ।

আবূ সুফিয়ান বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মসজিদও যথেষ্ট হবেন না। নবী (সা) বললেন, সে ব্যক্তি তার নিজ গৃহের দরযা বন্ধ করে থাকবে ঐ ব্যক্তিও নিরাপদ হবে। আবূ সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ এতে সংকুলানের ব্যবস্থা হবে। অতঃপর রাসূল (সা) যখন মাররায্ যাহ্‌রান থেকে রওয়ান হলেন, তখন হযরত আব্বাস (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে পাহাড়ের উপর দাঁড়াও, যাতে সে বিশাল মুসলিম বাহিনী প্রত্যক্ষ করতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন গোত্রের বাহিনী যখন আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে বীরদর্পে রাস্তা অতিক্রম করতে লাগল, তখন আবূ সুফিয়ান হতবাক হয়ে বললেন, তোমার ভাতিজার সাম্রাজ্য বিশাল হয়ে গিয়েছে। হযরত আব্বাস (রা) বললেন, এটা বাদশাহী নয়; বরং এটা হলো নবুওয়াত। অর্থাৎ হযরত দাঊদ (সা) ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর শান-শওকত বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাম্রাজ্য ছিল, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা ছিল নবুওয়াত। কেননা তা ছিল অলৌকিক। বাহ্যিক আসবাব ও ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল ছিল না। উড়োজাহাজ যন্ত্রপাতির শক্তি দ্বারা উড়ে থাকে, কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসন কোন যন্ত্রপাতি বা বাহ্যিক শক্তি ব্যতীত স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে উড়ে চলত। এটা ছিল তাঁর নবুওয়াতের দলীল। মু'জিযা হিসেবে তাঁকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল, যাতে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্রাটগণ তাদের যান্ত্রিক শক্তিকে এই গায়বী ও অদৃশ্য শক্তির বিপরীতে খুবই হীন ও ক্ষুদ্র মনে করে এবং আল্লাহ্‌র নবীর সামনে আত্মসমর্পণ করে। এমনিভাবে নবী (সা)-এর এই শান-শওকত ও মর্যাদাকে উপলব্ধি কর যে, বাহ্যিকভাবে বাদশাহী প্রতীয়মান হলেও মূলত এটাও নবুওয়াত ও পয়গাম্বরী।

যে গোত্র সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিল তাদের সম্পর্কে আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, এটা কোন গোত্র? সর্বপ্রথম হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ এক হাজার লোক নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করেন। সর্বশেষে নবী করীম (সা) শান-শওকত ও অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মুহাজির ও আনসারের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত দল নিয়ে বীরদর্পে অগ্রসর হন। মুহাজিরগণের পতাকা হযরত যুবায়র (রা)-এর হাতে এবং আনসারগণের পতাকা হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর হাতে ছিল। আর সা'দ ইবন উবাদা (রা) এদিক দিয়ে গমনের সময় আবেগ ও উত্তেজনায় বলেন,

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة

"আজ হলো যুদ্ধের দিবস, আজ কা'বায় হত্যা করা হালাল হবে।"

আবূ সুফিয়ান ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এই ব্যক্তি কে? হযরত আব্বাস (রা) বলেন, এটা হলো মুহাজির ও আনসারের বাহিনী, এ বাহিনীর মধ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) অবস্থান করছেন। সম্মুখ দিয়ে যখন রাসূল (সা) গমন করছিলেন, তখন আবূ সুফিয়ান আরয করেন, যে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি হযরত সা'দ ইবন উবাদাকে আপনার গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং সা'দ ইবন উবাদার উচ্চারিত বাক্যও উল্লেখ করেন। আবূ সুফিয়ান আরো উল্লেখ করেন যে, আমি আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছি, আপনি নেকী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণের ব্যাপারে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি বললেন,

يا ابا سفيان اليوم يوم المرحمه يعز الله فيه قريشا

"হে আবূ সুফিয়ান। আজ সহানুভূতির দিন যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়শদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন।"

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة

"সা'দ ভুল বলেছে, আজ খানায়ে কা'বার মর্যাদার দিন এবং আজ কা'বায় গিলাফ পরিধান করানো হবে।" এবং এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, (মুসলিম বাহিনীর) পতাকা সা'দ ইবন উবাদার হাত থেকে নিয়ে তাঁর পুত্র কায়সকে দেয়া হোক।[১]

ইবন আসাকির-এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, যখন নবী (সা) সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন, তখন কুরায়শ গোত্রের এক মহিলা এই কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

---

১. আবেগ ও উত্তেজনায় হযরত সা'দের মুখ থেকে এরূপ বাক্য উচ্চারিত হয়, যা ছিল অনুচিত। ফলে নবী (সা) তাঁর হাত থেকে পতাকা নিয়ে নিলেন কিন্তু তাঁর অন্তরের সান্ত্বনার জন্য তাঁর পুত্রের হাতে তা অর্পণ করেন। তবে মূলত তাঁর হাতেই রয়ে যায়। যে ধরনের ভুল ছিল, তেমনি ধরনের হুশিয়ারী প্রদান করেন। মূল থেকে নিয়ে শাখায় প্রদান করেন এবং শাখা মূলের প্রতিপক্ষ হয় না।

يَانبى الهدى اليك لجاحى قريش ولاتحسن الجاء حين

"হে হিদায়াত বা পথ প্রদর্শনকারী নবী! কুরায়শ গোত্রের লোকজন আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অথচ এটা আশ্রয় প্রদানের সময় নয়।"

ضاقت، عليهم سعة الارض وعاداهم اله السماء

"যে সময় প্রশস্ত জমি তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে গেলেন।"

ان سعدا يريد قاصمة الظهر باهل الحجون والبطحأ -

"নিশ্চয়ই সা'দ ইবন উবাদা আহলে হজ্জুন এবং আহ্‌লে বাতহার (মক্কার) বাসিন্দাগণদের কোমর ভেঙ্গে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে।"

অতঃপর আবূ সুফিয়ান নবী (সা)-এর দরবার থেকে বিদায় হয়ে দ্রুত মক্কায় ফিরে এসে উচ্চস্বরে এ ঘোষণা প্রদান করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) মুসলিম বাহিনী নিয়ে মক্কা আগমন করছেন। আমার মতে, তাঁর সাথে কারো মুকাবিলা করার ক্ষমতা নেই। ইসলাম গ্রহণ করো নিরাপদে থাকবে। অবশ্য যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদে থাকবে, অথবা যে ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদে থাকবে, অথবা যে ব্যক্তি নিজের ঘরে দরযা বন্ধ করে থাকবে অথবা অস্ত্র সমর্পণ করবে; তারা নিরাপদ থাকবে। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাঁর গোঁফ ধরে বলে, হে বনী কিনানা! এ বৃদ্ধ বেকুব হয়ে গিয়েছে। সে উপলব্ধি করছে না যে, সে কি বলছে। আরো অনেক গালি গালাজ করে। ফলে অনেক লোক জমা হয়ে যায়। আবূ সুফিয়ান বললেন, বর্তমানে এ সমস্ত কথায় কোন ফল হবে না, হে লোক সকল! তোমরা এ মহিলার ধোঁকায় কখনো পড়বে না।

কোন ব্যক্তিই আজ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মুকাবিলা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে এবং আমার ঘরে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ থাকবে। লোকজন বলল, রে দুর্ভাগা! আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! তোমার ঘরে কতজন লোকের সংকুলান হবে। আবূ সুফিয়ান বললেন, যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে।[১]

অতঃপর আবূ সুফিয়ান তাঁর স্ত্রী হিন্দাকে বললেন, মৃত্যুর মুখে পতিত না হয়ে ইসলাম গ্রহণ করাই তোমার জন্য কল্যাণকর। যাও, তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাক। আমি সত্য ও সঠিক বলছি। লোকজন এ ঘোষণা শুনেই কেউ মসজিদে হারামের দিকে ছুটলো আবার কেউ নিজ ঘরের দিকে।

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ. পৃ. ২৯০।

মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ

অতঃপর নবী (সা) কাদার (كداء) দিক থেকে মক্কা প্রবেশ করেন। মক্কা প্রবেশের সময় তিনি কা'বা ঘরের আদব ও মর্যাদার প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বিনয়ের সাথে মাথা নত করে প্রবেশ করেন, গর্ব ও অহংকারের সাথে নয়।

বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি উটের আরোহণ করে সূরা انا فتحنا لك فتحا তিলাওয়াত করছেন।

এ মহান বিজয়ের সময় আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সাথে সাথে বিনয় ও নম্রতার আভা তাঁর পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠে। উটের উপর আরোহণ অবস্থায় বিনয়ের কারণে পবিত্র গর্দান এমনভাবে ঝুলে ছিল যে, উটের হাওদার কাঠের সাথে পবিত্র দাড়ি স্পর্শ করছিল। (ইব্‌ন ইসহাক) এবং নবী (সা)-এর খাদেম উসামা ইবন যায়িদ (রা) তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। (বুখারী শরীফ)

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, যখন তিনি বিজয়ীর বেশে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন তখন সমস্ত লোকজন নবী (সা)-কে দেখছিল। কিন্তু বিনয়ের কারণে তিনি মাথা নত করেছিলেন। (উত্তম সনদে হাকীম)

মু'জামে তাবারানীতে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, আজ হলো ঐ দিন যার অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে করেছেন। অতঃপর তিলাওয়াত করেন ঃ اذا جاء نصر الله والفتح (যারকানী, ২ খ. পৃ. ৩২০)

নবী (সা)-এর দৃষ্টি এ বিষয়ের উপর নিবন্ধ ছিল যে, এমন একটি সময় ছিল যখন আমি নিরাশ ও অসহায়ভাবে এ শহর থেকে হিজরত করেছি এবং শত্রুদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে একাকী বের হয়েছি। আজ এমন এক সময় এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে বিজয়ী বেশে এই শহরে প্রবেশ করছি। وَذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ (এটা আল্লাহ পাকের দয়া ও করুণা, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি দান করেন) এজন্য বিনয়ের কারণে রাসূল (সা)-এর পবিত্র মাথা নত ছিল এবং উটের গদিতে মাথা রেখে শোকর আদায়ের সিজ্‌দা করছিলেন ও আনন্দের আতিশয্যে সুমিষ্ট সুরে انا فتحنا এবং اذا جاء نصر الله পাঠ করছিলেন। এটাও উচ্চারণ করছিলেন যে, নিশ্চয়ই এটা প্রকাশ্য বিজয় ও বিরাট মর্যাদাপূর্ণ সাহায্য। এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও পুরস্কার। ন্যায় ও সত্যকে রাজ্য দান করা হয়েছে এবং বাতিল পরাজয় বরণ করে মাথা নত করেছে। ইসলাম ও ঈমানের নূর প্রজ্বলিত হয়েছে এবং কুফরীর অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। সমস্ত দুনিয়া হারাম, কুফর ও শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হয়েছে।

নবী (সা) কাদা [১] নামক স্থান অতিক্রম করে উপর দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে কুদা [২] থেকে নিম্নদিক দিয়ে এবং যুবায়র (রা) কে মক্কার উপর অর্থাৎ কাদা নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দান করেন। সাথে সাথে এই তাকিদ প্রদান করেন যে, তোমরা নিজেরা কখনো হত্যাকাণ্ডের সূচনা করবে না। যারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে শুধু তাদের সাথে জিহাদ করবে। অতঃপর অত্যন্ত আদব বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে তিনি পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন।

মক্কায় প্রবেশের পর তিনি সর্বপ্রথম উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন এবং গোসল করার পর আট রাক'আত নামায আদায় করেন। এটা ছিল চাশতের নামাযের সময়। (বুখারী)

'ওলামায়ে কিরামের পরিভাষায় এ নামাযকে 'সালাতুল ফাত্‌হ' (صلوة الفتح) বলা হয়। মুসলিম সমাজপতিগণের এ পদ্ধতি ছিল যে, যখন তারা কোন শহর জয় করতেন, তখন বিজয়ের কৃতজ্ঞতা হিসেবে আট রাক'আত নামায আদায় করতেন। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) যখন মাদায়েন জয় করে ইরানের রাজধানীতে প্রবেশ করেন তখন এক সালাতে আট রাক'আত নামায আদায় করেন। (রওযুল উনুফ, ২ খ, পৃ ২৭৩)

---

১. كَدَاً (بفتح كاف والف ممدوده) মক্কার উঁচু স্থানকে বলা হয় এবং الف ضم كاف) كُدًا (مقصوره মক্কার নিম্নভূমিকে বলা হয়। كَدًا ঐ স্থানকে বলা হয় যে স্থানে দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) লোকজনকে হজ্জের জন্য আহ্বান করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

"এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে চড়ে, এরা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।" (সূরা হজ্জ ঃ ২৭) হযরত ইবরাহীম (সা)ঐ স্থানেই তাঁর বংশধরদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেন এবং আল্লাহ পাক ঐ দু'আ কবুল করেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কিছু লোককে তোমার পবিত্র ঘরের নিকট অনুর্বর এক স্থানে বসবাসের জন্য রেখেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তা এজন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলমূল দ্বারা তাদের রিযকের ব্যবস্থা কর যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭) প্রেক্ষিতে, নবী ঐ স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, যেখান থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন। (রওযুল উনুফ, ২ খ, পৃ. ২৭০)

২. হযরত খালিদকে (রা) নিম্নভাগ থেকে প্রবেশের জন্য এ জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, এদিকে থেকেই মুকাবিলা ও যুদ্ধের আশংকা ছিল। (যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩০৯)।

সম্ভবত এ কারণেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এক সালামে আট রাক'আতের অধিক নামায আদায় করা মাকরূহ। উম্মে হানী (রা) রাসূল (সা) এর নিকট আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার স্বামীর দু'জন আত্মীয় পলায়ন করে আমার ঘরে আগমন করলে আমি তাদেরকে আশ্রয় দান করেছি। কিন্তু আমার ভাই আলী তাদেরকে হত্যা করতে চায়। রাসূল (সা) বলেন, উম্মে হানী যাদেরকে আশ্রয় দান করেছে, আমরাও তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছি। আলীর উচিত তাদেরকে হত্যা না করা।[১]

নবী (সা) নামায সমাপ্ত করে শি'আবে আবূ তালিব নামক স্থানে গমন করেন। এখানেই রাসূল (সা) এর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। মক্কা প্রবেশের পূর্বেই সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবী (সা) কোথায় অবস্থান করবেন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। নবী করীম (সা) বলেন, সেখানে কুরায়শ এবং বনূ কিনানা, বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবকে অবরোধ করে। এছাড়া পরস্পর এর অঙ্গীকার করে যে, বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তলিব -এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়, শাদী-বিবাহ সহ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের নিকট সোপর্দ না করে। শি'আবে আবূ তালিব ঐ স্থানকেই বলা হয়।[২]

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল্লাহ (সা) আনসারগণকে ডেকে বললেন, কুরায়শগণ তোমাদের মুকাবিলায় কঠোর প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। যদি তারা মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়, তাহলে তাদেরকে ফসলের মত কেটে রেখে দিবে।

সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, ইকরামা ইবন আবূ জাহল এবং সুহায়ল ইবন আমর খানদামা নামক স্থানে মুকাবিলার জন্য কয়েকজন দুষ্কৃতকারীকে একত্র করে। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদের সাথে মুকাবিলা হলে মুসলমানদের মধ্যে খুনাইস ইবন খালিদ ইবন রাবীয়া এবং কুরয্ ইবন জাবির ফিহ্রী (রা) দু'জন শাহাদাত বরণ করেন। মুশরিকদের মধ্যে বার অথবা তেরজন নিহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়। এটা ইবন ইসহাক রিওয়ায়াত করেন।[৩]

মূসা ইবন উকবার মাগাযীতে বর্ণিত আছে, খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা) যখন মক্কার নিম্ন দিক থেকে প্রবেশ করেন, তখন বনূ বকর, বনূ হারিস ইবন আবদ মানাফ, হুযায়ল গোত্রের কিছু লোক এবং কিছু দুষ্কৃতকারী মুকাবিলার জন্য একত্র হয়েছিল। হযরত খালিদ (রা) পৌঁছা মাত্র তারা শোরগোল শুরু করে। খালিদ (রা) তাদের উপর আক্রমণ

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ. পৃ. ২৯৯-৩০০।

২. যারকানী, ২ খ. পৃ. ৭২, ৩২৪; ফাতহল বারী, ৮ খ, পৃ. ১৬।

৩. এই রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মক্কা বিজয়ের দিন মাত্র ১২/১৩ জন নিহত হয়। কিন্তু মূসা ইবন উকবা, ইবন সা'দ এবং ওয়াকিদীর বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ২৩ অথবা ২৪ জন নিহত হয়। এ বর্ণনাটিই অধিক নির্ভরযোগ্য। কম অধিকের পরিপন্থী নয়। সম্ভবত নিহতদের মোট সংখ্যা ২৪ হবে এবং খান্দামা নামক স্থানে ১২/১৩ জন নিহত হয়, অবশিষ্টরা অন্য স্থানে নিহত হয়।

করেন। তারা মুকাবিলা করতে না পেরে পরাজয় বরণ করে পলায়ন করে। বনূ বকর থেকে বিশজন এবং হুযায়ল গোত্রের তিন অথবা চারজন নিহত হয়। অবশিষ্টরা পলায়ন করে। কেউ বাড়ি গিয়ে আত্মগোপন করে, কেউ পাহাড়ে চড়ে। আবূ সুফিয়ান চিৎকার করে বললেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখবে সে নিরাপদ অথবা যে কোন আক্রমণে উদ্ধত না হবে সে নিরাপদ থাকবে। নবী (সা)-এর দৃষ্টি তলোয়ারের চমকানীর উপর নিবন্ধ হয়েছিল। ফলে তিনি হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, ঘটনা কি? আমি তোমাদেরকে তো হত্যাকাণ্ড থেকে নিষেধ করেছি। হযরত খালিদ (রা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হত্যাকাণ্ডের সূচনা করিনি। আমি সর্বদা আমার হাত নিয়ন্ত্রণে রেখেছি। আমার উপর যখন তলোয়ার চলতে থাকে, তখন আমি বাধ্য হয়ে তাদের মুকাবিলা করেছি। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যা নির্ধারণ করেছেন এতে কল্যাণ রয়েছে।[১]

এরপর শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং লোকজনকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। লোকজন শান্ত হয় এবং পূর্ণাঙ্গভাবে বিজয় অর্জিত হয়। অতঃপর তিনি (সা) মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন।

মসজিদে হারামে প্রবেশ

মক্কা বিজয়ের পর নবী (সা) মসজিদে হারামে প্রবেশ করে খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করেন। দালাইলে বায়হাকী এবং দালাইলে আবূ নুয়াঈম গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পবিত্র হেরেমে প্রবেশ করেন, তখন কা'বার চতুর্দিকে ৩৬০টি মূর্তি রক্ষিত ছিল। রাসূল (সা) এক একটি মূর্তির দিকে ছড়ি দিয়ে ইঙ্গিত করে পাঠ করছিলেন ঃ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (সত্য সমাগত এবং বাতিল দূরীভূত) সাথে সাথে মূর্তিগুলো মাথা নত করে পতিত হতে লাগলো।

ইমাম বায়হাকী (র)বলেন, ইবন উমরের হাদীসটি যদিও দুর্বল কিন্তু ইবন আব্বাসের হাদীস এ সম্পর্কে সমর্থন[২] প্রদান করেছে। হাফিয আসকালনী বলেন, ইবন হিব্বান আবদুল্লাহ ইবন উমরের হাদীসকে সহীহ বলেছেন।[৩]

হাফিয হায়সামী (র)বলেন, ইবন আব্বাসের হাদীসকে তাবারানী রিওয়ায়াত করেছেন। এর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য এবং এই হাদীস বায্যার সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন।[৪] ইবন ইসহাক এবং আবূ নুয়াঈম এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, ঐ মূর্তি গুলো সিসা দ্বারা আটকানো ছিল।[৫]

১. ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৯।
২. খাসাইসুল কুবরা, ১ খ, পৃ. ২৬৪।
৩. ফাতহুল বারী, ১৪ খ পৃ. ৮।
৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৫ খ, পৃ. ১৭৬।
৫. যারকানী, ২ খ. পৃ. ৩৩৪।

এ সম্পর্কে তামীম ইবন আসাদ খুযাঈ বলেন–[১]

وفى الاصنام معتبر وعلم ـ ⁸لمن يرجو الثواب او العقابا

নবী (সা) উটের উপর সাওয়ার হয়ে হেরেম শরীফে প্রবেশ করেন এবং এ অবস্থায় তাওয়াফ সম্পন্ন করে উসমান ইবন তালহা (রা)-কে ডেকে খানায়ে কা'বার চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহ খোলার ব্যবস্থা করেন। সেখানে তিনি অনেক ছবি দেখতে পেলেন এবং এগুলো মুছে ফেলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সমস্ত ছবি মুছে ফেলার পর তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা হয়। অতঃপর রাসূল (সা) বায়তুল্লাহর প্রবেশ করেন এবং নামায আদায় করেন।[২]

বায়তুল্লাহ্‌র চতুর্দিকে ফিরে ফিরে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে তা মুখরিত করে তুলেন। এ সময় হযরত বিলাল ও হযরত উসামা (রা) রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলেন। অতঃপর দরজা খুলে বাইরে এসে দেখেন, মসজিদে হারাম লোকজনে পরিপূর্ণ। সবাই এ বিষয়ে অপেক্ষমান যে, অপরাধী ও শত্রুদের ব্যাপারে কি নির্দেশ প্রদান করা হয়। এটা ছিল পবিত্র রমযান মাসের ২০ তারিখ। চাবি হাতে নবী (সা) কা'বা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় এ খুতবা পাঠ করেন।

কা'বা শরীফের দরজায় খুত্‌বা প্রদান

لا اله الا الله وحده لاشريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ـ الا كل ماثرة اودم اومايدعى فهوتحت قدمى هاتين الاسدانة البيت وسقاية الحاج الاوقتيل الخطاء شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة من الابل اربعون منها فى بطونها اولادها ـ يامعشر قريش ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء الناس من ادم وادم من تراب ـ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ ثم قال يامعشر قريش ماترون انى فاعل بكم قالوا خير اخ كريم وابن اخ كريم قال فانى اقول لكم كما قال يوسف لاخوته لاَتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ. পৃ. ৩০২।

২. যারকানী, ২ খ.

"আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, শত্রুদের সমস্ত দলবলকে একা পরাজয় করেছেন। সাবধান! অতীতের যে কোন ক্ষতিপূরণের দাবি-চাই সেটা জান বা মালের হোক এবং যে কোন প্রথা বা রীতি তা সমস্ত আমার পদতলে (সব কিছুই আজ বাতিল) কিন্তু বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজীগণকে যমযমের পানি পান করানো এটা পূর্বের মত অব্যাহত থাকবে। সাবধান! যদি কোন ব্যক্তিকে চাবুক বা লাঠি দ্বারা ভুলক্রমে হত্যা করা হয়। তাহলে দিয়াত বা রক্তপণ হিসেবে একশত উট প্রদান করতে হবে, এর মধ্যে চল্লিশটি গর্ভবতী উট হতে হবে। হে কুরায়শ গোত্র! আল্লাহ তা'আলা জাহেলিয়াতের অহংকার এবং বাপদাদার উপর গৌরব করা বাতিল করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম হতে সৃষ্ট এবং আদম মাটি থেকে। অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করেন– يايها الناس الاية "হে লোক সকল! আমরা তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পরস্পরের পরিচয়ের জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন শাখা ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান যে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।"

অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, হে কুরায়শ গোত্র! আমার ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা যে, আমি তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করব? তারা বললো, আমরা উত্তম ব্যবহারের আশা করি। কেননা আপনি দয়ালু[১] ভাই এবং দয়ালু ও সহানুভূতিশীল ভাই-এর পুত্র। নবী (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে ঐ কথা বলব, যা ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন, "তোমাদের উপর আজ কোন অভিযোগ ও প্রতিশোধ নেই। যাও তোমরা সবাই মুক্ত।" (যাদুল মা'আদ; সীরাতে ইবন হিশাম; যারকানী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ. পৃ. ৩০০-৩০১)।

আরবে বংশ ও অভিজাত্য নিয়ে গৌরব করার যে প্রবণতা চলে আসছিল, নবী (সা) এই খুতবার মাধ্যমে তা চিরতরে বিলুপ্ত করে দেন এবং ইসলামের সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। সাথে সাথে এটাও ঘোষণা করে দেন যে, সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হলো শুধু তাক্ওয়া। নবী করীম (সা) বিশ্ব জগতের জন্য শান্তির দূতও হিদায়াতকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিদায়াত প্রদান করা; শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হলো রাজ-বাদশাহ্দের কাজ।

---

১. সুহায়ল ইবন আমর এটা বলেছিলেন। রাসূল (সা) তার সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলী সম্পন্ন করেছিলেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, হে কুরায়শগণ! আমার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? সুহায়ল ইবন আমর তৎক্ষণাৎ বলেন ঃ نقول خيرا ونظن خيرا اخ كريم ابن اخ كريم وقد قدرت (ভাল বলছি,.ভাল ধারণা করছি, আপনি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল ভাই এবং সহানুভূতিশীল ভাই -এর পুত্র এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উপর সম্পূর্ণ সক্ষম। (আল-ইসাবা সুহায়ল ইবন আম্র প্রবন্ধ)।

বায়তুল্লাহর রক্ষণা-বেক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করান

নবী (সা) খুতবা সমাপ্ত করে মসজিদে উপবেশন করেন। এ সময় বায়তুল্লাহর চাবি নবী (সা)-এর হাতে ছিল, হযরত আলী[১] (রা) দাঁড়িয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ চাবি আমাদেরকে প্রদান করুন। যাতে হাজীদেরকে যমযমের পানি করানোর[২] সাথে সাথে বায়তুল্লাহর পাহারাদারী তথা নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের মর্যাদাও আমরা হাসিল করতে পারি। তখন আল্লাহ নাযিল করেন ঃ [১] اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পন করতে।" (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

নবী (সা) উসমান ইবন তালহাকে ডেকে তাঁর নিকট চাবি হস্তান্তর করে বলেন, চিরদিনের জন্য এ চাবি গ্রহণ কর অর্থাৎ সর্বযুগে তোমাদের বংশের নিকট এই চাবি আমানত থাকবে। আমি নিজে প্রদান করিনি বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যালিম ও জোরপূর্বক ছিনতাইকারী ব্যতীত তোমাদের কাছ থেকে কেউ তা নিতে পারবে না।[৩]

কা'বা শরীফের দরজায় আযান

যুহর নামাযের সময় হলো। নবী (সা) বিলাল (রা)-কে কা'বা ঘরের ছাদের ওপর চড়ে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। মক্কার কুরায়শগণ সত্য দীনের প্রকাশ্য বিজয়ের এই বিস্ময়কর দৃশ্য পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রত্যক্ষ করছিলো।

যে সমস্ত কুরায়শ সরদার কুফর ও শিরকের অপমান ও অমর্যাদা এবং দীনে হকের মর্যাদার এ দৃশ্য অবলোকন করতে পারেনি, তারা আত্মগোপন করেছে। আবূ সুফিয়ান, ইতাব ও খালিদ (উসায়দের পুত্র) হারিস ইবন হিশাম (পরে ইসলাম গ্রহণ করেন) এবং অন্যান্য কুরায়শ সরদারগণ কা'বা ঘরের উঠানে বসা ছিল। ইতাব ও খালিদ বলেন, আল্লাহ আমাদের পিতার সম্মান রক্ষা করেছেন। এ আওয়ায শোনার পূর্বেই তারা মৃত্যুবরণ করেছে। হারিস বলে, আল্লাহ্র শপথ! যদি এটা আমি নিশ্চিত হতাম যে, তিনি সত্য নবী, তাহলে আমি তাঁর আনুগত্য করতাম। আবূ সুফিয়ান বলল, আমি কিছু বলব না। আমি যা কিছু মুখে উচ্চারণ করব, তা পাথরও তাঁর নিকট পৌছিয়ে দেবে। নবী (সা) ওহীর মাধ্যমে তাদের এ কথাবার্তা অবগত হয়েছেন। যখন নবী (সা) এদিক দিয়ে গমন করেন, তখন তাদেরকে বলেন, তোমরা যা কিছু বলেছ তা আমাকে

---

১. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত হযরত আব্বাস (রা) এ ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু রাসূল (সা) তা মঞ্জুর করেননি।

২. অর্থাৎ হজ্জের সময় হাজীগণকে যমযমের পানি পান করানোর খেদমত হযরত আব্বাস এবং বনূ হাশিমের উপর ন্যাস্ত ছিল।

৩. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১৫; যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩৩৭-৩৪০

জানানো হয়েছে এবং তারা যা কিছু আলাপ করেছে ঐ সমস্ত বর্ণনা করেন। হারিস ও ইতাব বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল। কেননা, আমাদের মধ্যে কেউ তো আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করিনি। (মনে হয় আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূলকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন)। আবূ ইয়ালা হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি এবং ইবন আবূ শায়বা হযরত আবূ সালমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন।[১]

ইতাব ইবন উসায়দ (রা) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা) তাকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইতাব ইবন উসায়দ (রা) এর বয়স ছিল তখন ২১ বছর এবং দৈনিক এক দিরহাম মাহিনা নির্ধারণ করেন। এ ব্যাপারে উসায়দা (রা) বলেন ايها الناس। اجاع الله كبد من جاع على درهم "হে লোক সকল! আল্লাহ ঐ ব্যক্তির কলিজা ক্ষুধার্ত রাখবেন, যে এক দিরহামেও ক্ষুধার্ত থাকে।" (রাওযুল উনুফ, ২ খ. পৃ. ২৭৬)

ইতাব ইবন উসায়দ (রা) নবী করীম (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত মক্কার গভর্নর ছিলেন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) খলীফা হওয়ার পরও তা অব্যাহত থাকে। যে দিন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ইনতিকাল করেন ঐ দিন ইতাব ইবন উসায়দও ইনতিকাল করেন। (আল-ইসতি'আব লি ইবন আবদুল বার, ইতাব ইবন উসায়দ প্রবন্ধ।

হযরত বিলাল (রা) যখন কা'বার ছাদে চড়ে আযান দেয়া শুরু করে তখন আবূ মাহযূরা জুমাই এবং তাঁর সাথী কয়েকজন যুবক ঠাট্টা করে আযানের নকল করে উচ্চারণ করছিলে। আবূ মাহযূরা অত্যন্ত সুমিষ্ট স্বর ও উচ্চ আওয়াযের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আওয়ায রাসূল (সা) পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাকে হাযির করানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কার আওয়ায আমি শুনতে পেয়েছি? সবাই আবূ মাহযূরার দিকে ইঙ্গিত করলো। তখন তিনি সবাইকে ছেড়ে দিয়ে শুধু তাকে থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

আবূ মাহযূরা (রা) নবী (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে এ ধারণা পোষণ করছিলেন যে, হয়ত আমাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু তিনি আমাকে আযান দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ভাগ্যক্রমে আমি আযান দিলাম। আযানের পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে একটি থলি দান করেন যাতে কিছু দিরহাম ছিল এবং আমার মাথা ও কপালে পবিত্র হাত বুলিয়ে দেন, বুক, কলিজা, পেট ও নাভী পর্যন্ত পবিত্র হাত ফিরালেন, অতঃপর এ দু'আ করেন ঃ بارك الله فيك وبارك الله عليك

হযরত আবূ মাহযূরা (রা) বলেন, রাসূল (সা)-এর পবিত্র হাত বুলানোর সাথে সাথে আমার অন্তরের সমস্ত ঘৃণা ভালবাসায় পরিবর্তন হয়ে গেল এবং অন্তর নবী (সা)-এর মহব্বতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এবার আমি নিজেই আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে মক্কার কা'বাঘরের মু'আযযিন নিয়োগ করুন। রাসূল (সা) বললেন, আমি

১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩৪৬।

তোমাকে মক্কার মু'আযযিন[১] নিয়োগ করলাম। আমি মক্কায় আগমন করে মক্কার গভর্নর ইতাব ইব্ন উসায়দকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আযান দিতে থাকলাম। আজীবন তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং আযানের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৫৯ হিজরীতে মক্কায় ইনতিকাল করেন। (ইসতি'আব লি ইবন আবদুল বার প্রবন্ধ আবূ মাহযূরা রা)

সুহায়লী বর্ণনা করেন, আবূ মাহযূরা (রা) সে সময় মু'আযযিন হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন, ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। ইনতিকাল পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর বংশধরগণ বংশানুক্রমে মু'আযযিনের দায়িত্ব পালন করেন।

একজন কবি আবূ মাহযূরার আযান সম্পর্কে বলেন ঃ

اما ورب الكعبة المستوره * وما تلا محمد من سوره

"শপথ কা'বা ঘরের প্রতিপালকের যার উপর গিলাফ পরিধান করা হয়েছে এবং শপথ পবিত্র কুরআনের সূরার যা হযরত মুহাম্মদ (সা) তিলাওয়াত করেছেন।"

والنغمات من أبى محذوره * لافعلن فعلة مذكورة

"শপথ আবূ মাহযূরার আযানের সুর মাধুর্যের, আমি অবশ্যই অমুক কাজ করব।"[২]

নবী করীম (সা) তাওয়াফ সম্পন্ন করে সাফা পাহাড়ে গমন করেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ ও আল্লাহ পাকের প্রশংসায় নিমগ্ন থাকেন। কাছেই আনসারদের একটি সমাবেশ ছিল। এ সময় একজন আনসার নবী (সা) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার শহর ও মাতৃভূমির উপর আপনাকে বিজয় দান করেছেন। এমন যেন না হয় যে, মদীনায় গমন না করে আপনি মক্কায়ই থেকে গেলেন। অতঃপর তাঁরা পরস্পরে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, ইতোমধ্যে নবী (সা) এর উপর ওহী নাযিল হতে লাগলো। কিন্তু ওহী নাযিলের সময় রাসূল (সা)-এর পবিত্র চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করা সাহাবাগণের অভ্যাস ছিল না। ওহী নাযিল শেষ হওয়ার পর নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি এটা বলেছ? তাঁরা আরয করলেন, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, মনে রেখ এরূপ কখনো হবে না। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশে হিজরত করেছি। তোমাদের জীবন আমার জীবন, তোমাদের মৃত্যু আমার মৃত্যু। এটা শুনে জীবন উৎসর্গকারী আনসারদের চোখে অশ্রু প্রবাহিত হলো এবং আরয করলেন, হে আল্লাহর

১. কোন কোন বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আবূ মাহযূরা (রা) মক্কা বিজয়ের পর মু'আযযিন নিয়োজিত হন এবং অধিকাংশ রিওয়ায়তে দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুনায়ন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর রাসূল (সা) তাঁকে মু'আযযিন নিয়োগ করেন।

২. রওযুল উনুফ, ২ খ, পৃ. ২৭৭

রাসূল! আমাদের মধ্যে এই আশংকার সৃষ্টি হয় যে, আপনার নিকট আগত আলো যাতে আমাদের মধ্যে থেকে উঠিয়ে নেয়া না হয়। আমরা জীবন উৎসর্গকারী গোলাম, প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারী খাদেম যে কোন কুরবানীর জন্য প্রস্তুত রয়েছি। কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ব্যাপারে আমরা অত্যধিক কৃপণ (অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই।)

باسایه ترانمی پندم + عشق است وهزار بدگمانی

"আপনার পরশে ধন্য হবার সুযোগ্য কি আমরা আর পাবো (যেহেতু মক্কা বিজয় হলে গেছে) প্রেম ভালোবাসার ক্ষেত্রে বিরহের তেমন দুঃশ্চিন্তা হয়েই থাকে।"

নবী (সা) বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদেরকে অসহায় ও সত্য মনে করে। (মুসলিম, আহমাদ প্রমুখে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩৩৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ, পৃ. ৩০৬-৩০৭।

পুরুষ ও নারীদের বায়'আত গ্রহণ

নবী (সা) দু'আ সম্পন্ন করে সাফা পাহাড়ে উপবেশন করেন। লোকজন বায়'আত গ্রহণের জন্য সেখানে একত্র হয়। নবী (সা) ইসলাম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর বায়'আত গ্রহণ করেন। পুরুষদের নিকট থেকে শুধু ইসলাম ও সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর বায়'আত গ্রহণ করতে থাকেন। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, পুরুষদের থেকে ইসলাম এবং জিহাদের উপর বায়'আত গ্রহণ করেন। পুরুষদের থেকে বায়'আত গ্রহণের পর মহিলাদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করতে থাকেন। মহিলাদের থেকে ঐ বিষয়ে বায়'আত গ্রহণ করেন যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

يَآيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّاَيُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَايَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَايَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَايَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ١

"হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, তারা কোন অপবাদ রটাবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না তখন তাদের বায়'আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[১]

১. সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২।

নবী (সা) মহিলাদের থেকে মুখে মুখে বায়'আত গ্রহণ করতেন। তিনি স্বীয় পবিত্র হাত দ্বারা কখনো কোন মুহরিম নয় এমন মহিলার হাত স্পর্শ করেননি, কোন মহিলার সাথে মুসাফাহা করেন নি; বরং কাপড়ের এক কোণ রাসূল (সা)-এর হাতে থাকত এবং এক কোন মহিলাদের হাতে রেখে বায়'আত গ্রহণ করতেন। কখনো মহিলাদের বায়'আত গ্রহণের সময় পানির একটি পেয়ালা নিয়ে এতে স্বীয় পবিত্র হাত চুবিয়ে আবার বের করতেন। অতঃপর মহিলাদেরকে ঐ পেয়ালায় হাত রেখে ভিজিয়ে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করতেন। এভাবে বায়'আত মজবুত হতো।

অধিক জানতে হলে দেখুন তাফসীরে কুরতুবী সূরা মুমতাহিনা ১৮ খ. পৃ. ৭১ এবং কোন কোন মহিলা বায়'আত নিয়েছিলেন, তা জানতে হলে তারীখে ইবন আসীর, ২ খ, পৃ. ৬৬ দ্র.।

ইবন আসীর জাযরী 'তারীখে ইবন আসীর' এ বর্ণনা করেন, নবী (সা) যখন পুরুষদের বায়'আত গ্রহণ সম্পন্ন করে মহিলাদের বায়'আত গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। কুরায়শ গোত্রের যে সমস্ত মহিলা এ সময় বায়'আত গ্রহণের জন্য উপস্থিত হন তাঁদের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব অর্থাৎ হযরত আলী (রা) বোন,

২. উম্মে হাবীবা বিনত আ'স ইবন উমাইয়া আমর ইবন আবদ আমরীর স্ত্রী,

৩. আরওয়া বিনত আবিল আইস অর্থাৎ ইতাব ইবন উসায়দ এর ফুফু,

৪. আতিকা বিনত আবিল আইস অর্থাৎ আরওয়ার বোন,

৫. হিন্দা বিনত উতবাহ, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী এবং আমীর মু'আবিয়ার মা,

হিন্দা চেহারার উপর অবগুণ্ঠন দিয়ে বায়'আতের জন্য রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। যেহেতু হিন্দা হযরত হামযা (রা)-কে হত্যার পরিকল্পনাকারী এবং হত্যার পর বুক চিরে কলিজা চিবিয়েছিল, ফলে লজ্জা ও অনুতপ্ত হওয়ার কারণে মুখ লুকিয়ে বায়'আতের জন্য হাযির হন– যাতে তিনি তাকে চিনতে না পারেন। তাঁর বায়'আতের ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

হিন্দা ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের থেকে কি কি বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন?

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না।

হিন্দা ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের নিকট ঐ বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন, যা আপনি পুরুষদের থেকে গ্রহণ করনেনি। কিন্তু আমরা তা মেনে নিচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ চুরি করবে না।

হিন্দা ঃ আমি স্বামী আবূ সুফিয়ানের সম্পদ থেকে কিছু নিয়ে থাকি। জানি না এটা চুরি হয় কিনা। আবূ সুফিয়ান এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবূ সুফিয়ান বললেন,

অতীতে যা হয়েছে তা ক্ষমা করা হলো। রাসূল (সা) বললেন, প্রচলিত নিয়ম ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে স্বামীর সম্পদ থেকে তোমার ও সন্তানদের প্রয়োজনে সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে পার।

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ ব্যভিচার করবে না।

ভদ্র মহিলাগণ কি ব্যভিচার করতে পারে ?

নবী (সা) ঃ সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।

হিন্দা ঃ ربناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدرٍ كباراً فانت وهم اعلم

"আমরা শিশুকালে তাদেরকে লালন-পালন করেছি এবং আপনি তাদেরকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেছেন। সুতরাং আপনি এবং তারা অধিক জানবেন।" হযরত উমর (রা) এটা শুনে হেসে ফেলেন।

রাসূল (সা) ঃ কারো উপর অপবাদ লাগাবে না।

হিন্দা ঃ والله ان اليان البهتان قبيح ومانامرنا الابالرشد ومكارم أخلاق

"আল্লাহ্র শপথ! কারো উপর অপবাদ রটানো অত্যন্ত মন্দকাজ এবং আপনি তো হিদায়াত ও উন্নত চরিত্র ব্যতীত অন্য কিছুর নির্দেশ প্রদান করেন না।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ কোন নেককাজে নাফরমানী করবে না এবং কোন বিধি-বিধান অমান্য করবে না।[১]

হিন্দা ঃ এই মজলিসে আমরা আপনার নাফরমানীর ইচ্ছা ও খেয়াল নিয়ে আসিনি। রাসূল (সা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন, তাদের থেকে বায়'আত গ্রহণ কর। বায়'আতের পর নবী (সা) তাঁদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন।[২]

হিন্দা ইসলাম গ্রহণের পর আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার নিকট আপনার চেহারার চেয়ে অধিক ঘৃণিত আর কোন চেহারা ছিল না এবং আপনার চেয়ে আর কাউকে অধিক শত্রু মনে করতাম না। কিন্তু এখন থেকে আপনার চেহারা ব্যতীত আমার নিকট অধিক প্রিয় আর কেউ নেই। নবী (সা) ইরশাদ করেন, এখন মহব্বত আরো বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় খুত্বা

ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন খুযাঈ গোত্রের এক ব্যক্তি হুযাইলী গোত্রের এক মুশরিককে হত্যা করে। নবী (সা) এ ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর সাহাবাগণকে সাফা পাহাড়ে একত্র করে নিম্নলিখিত খুতবা প্রদান করেন ঃ

১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩১৬।

২. আল-কামিল লি ইব্ন আসীর, ২ খ, পৃ. ৯৬।

يـأيـها الـنـاس ان الـله حرم مكة يـوم خلق الـسموات والارض فـهى حرام الى يـوم الـقيامـة - فـلايـحل لامرئ يـؤمـن بـالـله والـيـوم الاخـر ان يسفك فيـها دمـا ولايـعضدفيـها شجـرة ولـم تحلل لاحد كان قبلـى ولاتحل لاحد يكون بعدى ولـم تحلل لى الا هذا الساعة غضبًا على اهلها الاثم قد رجعت كحرمتها بالامس - فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم ان رسـول الـلـه صلى الـلـه عليـه وسلم قاتل فيـها فقولـوا ان الـله قد أحلها لرسولـه ولـم يحللها لكم يامعشر خزاعة ارفعوا ايديكم عن القتل فلقد كثر القتل لقد قتلتم قتيلا لادينـه فمن بعد مقامى هذا فاهلـه بخير الـنظرين ان شاء فدم قاتله وان شاءوا فعقلـه ـ

"হে লোক সকল! যে দিন আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সেই দিন মক্কাকে হারাম ও সম্মানিত করেছেন। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম ও সম্মানিত থাকবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার জন্য এটা বৈধ নয় যে, মক্কা মুকাররমায় রক্তপাত ঘটাবে, এখানে কোন বৃক্ষ কর্তন করাও বৈধ নয়। আমার পূর্বে মক্কা কারো জন্য হালাল হয়নি, আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। আমার জন্যও শুধু একটি মুহূর্তের জন্য হালাল করা হয়েছে মক্কাবাসীদের নাফরমানী ও অবাধ্যতার কারণে। অতঃপর এর মর্যাদা পূর্বের মতই বহাল হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা আজ উপস্থিত রয়েছ, তারা অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দিবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এটা বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় হত্যাকাণ্ড করেছেন। তোমরা তাদেরকে এটা বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু তাঁর রাসূলের জন্য কিছু সময়ে মক্কাকে হালাল করেছিলেন কিন্তু তোমাদের জন্য হালাল করেননি। হে খুযা'আ গোত্রের লোকেরা! তোমরা হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাক। তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ আমি তার রক্তপণ পরিশোধ করব। যে ব্যক্তি এই দিনের পর কাউকে হত্যা করবে, তখন নিহত ব্যক্তির স্বজনদের দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের অধিকার থাকবে। হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীদেরকে একইভাবে হত্যা করবে অথবা নিহত ব্যক্তির রক্তপণ গ্রহণ করবে।"

অতঃপর রাসূল (সা) নিজের পক্ষ থেকে এক শ' উট ঐ ব্যক্তির রক্তপণ হিসেবে আদায় করেন যাকে খুযা'আ গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল।[১]

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ৪ খ, পৃ. ৫৮।

মুহাজিরগণের পরিত্যক্ত বাড়িঘর ফেরত প্রদানের বিষয়

মক্কার কাফিররা মদীনায় হিজরতকারী সমস্ত মুহাজিরগণের বাড়িঘর, ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র দখল করে নিয়েছিল। নবী (সা) খুতবা সম্পন্ন করে কা'বা শরীফের দরজায় দণ্ডায়মান হয়েছেন, এমনি সময় আবূ আহমাদ ইবন জাহাশ (রা) তাঁর ঐ বাড়ি ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে কিছু আরয করার জন্য দাঁড়ালেন, যা তাঁর হিজরতের পর আবূ সুফিয়ান চারশ দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করেছিল। রাসূল (সা) তাঁকে ডেকে আস্তে কিছু বলে দেন। শুনেই আবূ আহমাদ ইবন জাহাশ চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর যখন আবূ জাহাশকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে কি ইরশাদ করলেন ? আবূ আহমদ বলেন, নবী (সা) ইরশাদ করেন, যদি তুমি ধৈর্যধারণ কর, তাহলে তোমার জন্য উত্তম হবে এবং এর পরিবর্তে বেহেশতে তুমি একটি বাড়ি পেয়ে যাবে। আমি আরয করলাম, আমি ধৈর্যধারণ করব।

আবূ আহমাদ ব্যতীত অন্যান্য সাহাবাগণ তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়ি ফেরত প্রদানের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। নবী (সা) বললেন, তোমাদের যে সম্পদ আল্লাহর পথে চলে গিয়েছে (দখল করা হয়েছে) তা ফেরত নেয়া আমি প্রসন্দ করছি না। এটা শ্রবণ করে সাহাবায়ে কিরাম চুপ হয়ে গেলেন এবং যে বাড়িঘর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেছেন। অতঃপর তা ফেরত প্রদানের ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। যে বাড়িতে নবী (সা) জন্মগ্রহণ করেন এবং যে বাড়িতে হযরত খাদীজা (রা) -এর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয় রাসূল (সা) ঐ বাড়ির কথা উল্লেখ করেন নি।[১]

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর বিশেষ অপরাধীদের সম্পর্কে বিধান

মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। যারা তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে, যারা তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করেছে, যারা তাঁর সাথে সর্বদা সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে এবং যারা তাঁকে রক্তে রঞ্জিত করেছে, সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি যারা নবী (সা)-এর সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের ঔদ্ধত্য অভদ্রতা ও তাঁকে গালি-গালাজ করেছে, তাদের ব্যাপারে এই নির্দেশ জারী করা হয় যে, যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে, হত্যা করবে। এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশ রয়েছে ঃ

مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلاً سُنَّةَ اللّٰهِ فِىْ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً -

"এ সমস্ত অভিশপ্ত ব্যক্তিকে সেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। পূর্বে যারা (বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী) অতীত হয়ে গিয়েছে,

১. আস-সারেমুল মাসলূল, পৃ. ১৫৪।

তাদের জন্য এটাই ছিল আল্লাহ্‌র রীতি ও বিধান। তুমি কখনো আল্লাহ্‌র বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৬১-৬২।)

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পয়গাম্বরের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা করা সমস্ত উম্মাতের উপর ফরয। তাঁর অমর্যাদা করা হলো আল্লাহ্‌র দীনের অমর্যাদা করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ "নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।" (সূরা কাওসার ঃ ৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لاَ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ - اَلاَتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -

"যদি চুক্তির পর তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তাহলে কাফিরগণের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। তারা এরূপ লোক যাদের কোন প্রতিশ্রুতি রইল না; যেন তারা নিবৃত্ত হয়। তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে এবং রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরা তাওবা ঃ ১২-১৩।)

অর্থাৎ যারা নবী করীম (সা)-কে বিতাড়িত করার সংকল্প করেছে, তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে ঈমানদারগণের সামান্যতম দ্বিধা বা সংশয় থাকা উচিত নয়। তাদের বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যক্ষ করে ভয় না পেয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত এবং তাঁর রাসূলের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য জীবন ও ধন-সম্পদ যা কিছু প্রয়োজন তা উৎসর্গ করতে অনীহা না করবে। এ বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, গালি-গালাজ, ঠাট্টা, কটুকথা ইত্যাদির অপরাধ বিতাড়িত করার অপরাধের চেয়ে অধিক জঘন্য ও কঠোর। সরকার যে কোন কঠোর অপরাধ ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে কটুকথা গালি-গালাজকারীর ব্যাপারে এক মুহূর্তের জন্য সুযোগ দেয়া যায় না। এতে রাষ্ট্রের অবমাননা করা হয়।

এছাড়া নবী (সা)-এর অবমাননা সমস্ত উম্মাতের অবমাননা ও অপমান করারই নামান্তর। সুতরাং সমস্ত উম্মাতের উপর ফরয ও কর্তব্য হলো এই যে, যখনই নবী (সা)-এর শানে কোন অবমাননাসূচক কথা শুনবে, তখন সাথে সাথে তাকে হত্যা করবে অথবা স্বীয় জীবন উৎসর্গ করবে।

تشتم ايدينا ويحلم رأينا * ونشتم بالافعال لابالتكلم

"আমাদের হাত গালি দিচ্ছে, আমাদের বিবেক ধৈর্যধারণ করছে। আমরা কাজের দ্বারা গালি দিচ্ছি, মুখ দ্বারা নয়।"

কাযী ইয়াযের শিফা নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, খলীফা হারুনুর রশীদ যখন ইমাম মালিক-এর নিকট রাসূল (সা)-এর শানে অবমাননাকারীর বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন, مابقاء الامة بعد شتم نبيها "এই উম্মাতের জীবনের কি মূল্য আছে যাদের নবীকে গালি দেয়া হয়।"

শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবন তায়মিয়ার যুগে একজন খ্রিস্টান নবী (সা)-এর শানে অবমাননা ও অবজ্ঞাসূচক কথা বলে। তখন ইবন তায়মিয়া এ বিষয়ে ছ'শ পৃষ্ঠার এক বিরাট কিতাব রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম রাখেন– الصارم المسلول على شاتم الرسول। এই গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীস, সাহাবা ও তাবেঈদের ইজ্‌মা, খুলাফায়ে রাশেদীনের কার্যক্রম এবং যুক্তি ও দলীল দ্বারা রাসূল (সা)-কে গালি প্রদানকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব বলে প্রমাণ করেছেন।[১]

সারকথা ঃ নবী (সা) যে সমস্ত লোকের সম্পর্কে মক্কা বিজয়ের দিন এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করতে হবে। এরূপ ব্যক্তি ছিল মাত্র পনের-ষোলজন। এখানে তাদের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

প্রথম ঃ আবদুল্লাহ ইবন খাত্তাল, এ ব্যক্তি প্রথমত ইসলাম গ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে সাদাকা আদায় করার জন্য নিয়োগ করেন। একজন গোলাম ও একজন আনসার তার সাথে ছিল। এক মঞ্জিলে পৌঁছার ইব্‌ন খাত্তাল গোলামকে খাবার তৈরি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। গোলাম কোন কারণে ঘুমিয়ে পড়ে। জাগ্রত হওয়ার পর ইবন খাত্তাল দেখতে পায় যে, সে এখনো খাবার তৈরি করেনি। ক্রোধান্বিত হয়ে সে গোলামকে হত্যা করে। অতঃপর তার খেয়াল হয় যে নবী (সা) তার কিসাস হিসেবে আমাকে হত্যা করবেন, অবশেষে মুরতাদ হয়ে মক্কা গিয়ে মুশরিকদের সাথে মিশে যায়। যাওয়ার সময় সাদাকার উটও সাথে নিয়ে যায়। সে রাসূল (সা)-এর কুৎসা রটনা করে কবিতা আবৃত্তি করত এবং বাঁদীদেরকে এ সমস্ত কবিতা দ্বারা গান গাওয়ার নির্দেশ প্রদান করত। ফলে তার দ্বারা তিনটি অপরাধ সংঘটিত হয় ঃ (১) অন্যায়ভাবে রক্তপাত করা; (২) মুরতাদ হওয়া বা ধর্ম ত্যাগ করা এবং (৩) নবী (সা)এর দুর্নাম ও কুৎসা রটনা করে কবিতা আবৃত্তি করা। ইবন খাত্তাল মক্কা জয়ের দিন কা'বা ঘরের পর্দার মধ্যে নিজকে জড়িয়ে রাখে। নবী (সা)-এর খেদমতে আরয করা হয় যে, ইবন খাত্তাল খানায়ে কা'বার পর্দা আকড়িয়ে রয়েছে। রাসূল (সা) নির্দেশ করেন, তাকে সেখানেই হত্যা কর। সুতরাং আবূ বারযা আসলামী এবং সা'দ ইবন হুরায়স তাকে

১. কিতাবটি দায়িরাতুল মা'আরিফ, হাযদরাবাদ (দক্ষিণাত্য) থেকে মুদ্রিত হয়।

হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করেন। (আস-সারিমুল মাসলূল, পৃ. ৬৩৩; যারকানী, ২য় খ, পৃ. ৩১৪)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঃ কমরতানা[১] এবং কুরায়বা নাম্নী দু'মহিলা ইবন খাত্তালের দাসী ছিল। দিবারাত্র নবী (সা)-এর কুৎসা রটনা করত। মক্কার মুশরিকরা যখন কোন মজলিসে একত্র হত, তখন মদ্যপানের মহড়া চলত এবং এ দু'জন নবী (সা)-এর দুর্নাম করে কবিতা আবৃত্তি করত, গান-বাজনা করত। এদের একজনকে হত্যা করা হয়। অপরজন নিরাপত্তার জন্য আবেদন করলে তাকে নিরাপত্তা দান করা হয়। এরপর রাসূল (সা)-এর দরবারে আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

চতুর্থ ঃ সাররাহ, বনী আবদুল মুত্তালিবের মধ্যে কারো দাসী ছিল। সে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে গান করত। কেউ কেউ বলেন, তাকে হত্যা করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং হযরত উমর (রা) খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিল। সে ছিল ঐ মহিলা যে হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ (রা)-এর পত্র নিয়ে মক্কা রওয়ানা হয়েছিল।

পঞ্চম ঃ হুয়াইরিস ইবন নাকীদ ছিল একজন কবি এবং নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে সে কবিতা আবৃত্তি করত। তাই তাকে হত্যা করা বৈধ করা হয়। হযরত আলী (রা) তাকে হত্যা করেন।[৩]

ষষ্ঠ ঃ মুকাইস ইবন সাবাবা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। গাযওয়ায়ে যি'কাদে একজন আনসারী শত্রু মনে তার ভাই হিশামকে ভুলে হত্যা করে। নবী (সা) রক্তপণ আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। মুকাইস রক্তপণ গ্রহণের পর উক্ত আনসারীকে হত্যা করে এবং মুরতাদ হয়ে মক্কা গমন করে। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) তাকে হত্যা বৈধ করেন। মুকাইস বাজারে যাওয়ার পথে তাকে গ্রেফতার[১] করা হয় এবং গায়লাতা আবদুল্লাহ লায়সী তাকে হত্যা[৪] করেন।

সপ্তম ঃ আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবূ সারাহ প্রথমে ওহী লিখক (كاتب الوحى) ছিল। মুরতাদ হয়ে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়। হযরত উসমানের দুধভাই ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন সে জীবন রক্ষার জন্য লুকিয়ে থাকে। হযরত উসমান (রা) তাকে নিয়ে রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। নবী (সা) ঐ সময় লোকজনের বায়'আত গ্রহণ করছিলেন। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আবদুল্লাহ উপস্থিত হয়েছে, তার থেকেও বায়'আত গ্রহণ করুন। রাসূল (সা) কিছুক্ষণ চুপ

১. আস-সারিমল মাসলূল, পৃ ১২৬।
২. যারকানী, ২খ. পৃ. ৩১৫।
৩. ফাতহুল বারী, ৮ম, পৃ. ৯
৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ, পৃ. ২৯৮।

থাকলেন। অবশেষে হযরত উসমান (রা) যখন আবদেন-নিবেদন করলেন, তখন তিনি আবূ সারাহ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে তার জীবন রক্ষা পায়। পরে নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন বুদ্ধিমান ছিল না যে, যখন আমি আবদুল্লাহ্‌র বায়'আত গ্রহণ থেকে হাত থামিয়ে রেখেছি এসময় তাকে হত্যা করে ফেলতে? একজন আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সময় কেন আপনি একটু ইঙ্গিত করলেন না, রাসূল (সা) বললেন, নবীদের জন্য ইশারা প্রদান করা উচিত নয়।

আবদুল্লাহ ইবন আবূ সারাহ (রা) এবার অত্যন্ত ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তার সম্পর্কে অন্য কোন কথা উঠেনি। হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে মিসর ও অন্যান্য দেশে গভর্নর ও বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে ২৭ অথবা ২৮ হিজরীতে আফ্রিকা বিজয়ের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের সময় সমস্ত গোলযোগ থেকে আলাদা ও দূরে ছিলেন। হযরত আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়ার মধ্যে কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন নি। হযরত মু'আবিয়ার খিলাফতের শেষদিকে আসকালানে ইনতিকাল করেন। ইনতিকাল সম্পর্কে বিস্ময়কর ঘটনা হলো এই যে, একবার ভোরে উঠে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এই দু'আ করেন, اللهم اجعل اخر عملى الصبح। (হে আল্লাহ! আমার সর্বশেষ আমল ভোরে কর) ওযূ করলেন এবং নামায পড়ালেন। ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর বামদিকে সালাম ফিরাবেন, এমনি মূহূর্তে তাঁর রূহ নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গেল।[১]

انا لله وانا اليه راجعون

অষ্টম ঃ ইকরামা ইবন আবূ জাহল ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, মক্কা বিজয়ের দিন যাদেরকে হত্যা করা বৈধ করা হয়েছিল। ইকরামা আবূ জাহলের পুত্র ছিলো। পিতার মত সে ও নবী (সা) ঘোরতর শত্রু ছিলো। মক্কা বিজয়ের পর পলায়ন করে ইয়ামন গমন করে। ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারিস ইবন হিশাম ইসলাম গ্রহণ করে এবং নবী করীম (সা)-এর দরবারে এসে স্বামীর নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেন। শান্তির দূত মহানবী (সা) আবূ জাহলের পুত্র ইকরামার নিরাপত্তার আবেদন সাথে সাথেই গ্রহণ করেন।

ইকরামা পলায়ন করে ইয়ামনের সমুদ্রের কিনারায় পৌছে নৌকায় আরোহণ করে। প্রচণ্ড বায়ু নৌকাটি ঘিরে ফেলে। ইকরামা লাত ও ওয্যা দেবতাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকে। নৌকার লোকজন বলে, এ সময় লাত-ওয্যা দ্বারা কোন কাজ হবে না। এক আল্লাহকে স্মরণ কর। ইকরামা বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি দরিয়ার মধ্যে

---

১. আল-ইসাবা, ২ খ, পৃ. ৩১৬; যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩১৩

আল্লাহ ছাড়া কোন কাজ ও সাহায্য না হয়, তাহলে স্থলে ও আল্লাহ ব্যতীত কেউ কাজে আসবে না। তখনই সঠিক অন্তরে আল্লাহর সাথে এই অঙ্গীকার করলেন ঃ

أللهم لك عهد ان عافيتنى مما انافيه ان اتى محمدا حتى اضع يدى فى يده فلاجدنه عفوا غفورا كريما

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করছি যে, যদি তুমি আমাকে এই বিপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও, তাহলে আমি অবশ্যই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আমার হাত তাঁর হাতে রাখব। আমি নিশ্চয়ই তাঁকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান হিসেবে পাব।" (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

এদিকে ইকরামার স্ত্রী সেখানে গিয়ে পৌছেন এবং তাকে বলেন ঃ

يا ابن عم جئتك من عند ابر الناس واوصل الناس وخير الناس لاتهلك نفسك انى قد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"হে আমার চাচার পুত্র (চাচাত ভাই)! আমি সর্বাধিক নেককার, সর্বাধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তির নিকট থেকে আগমন করেছি। তুমি নিজকে ধ্বংস করো না। আমি তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করেছি।"

এটা শুনে ইকরামা উম্মে হাকীমের সাথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে। উম্মে হাকীম বলেন, এখনো তুমি কাফির আর আমি হলাম মুসলমান, ইকরামা বলল, কিরূপ বিরাট বস্তু তোমাকে বাঁধা প্রদান করছে? এটা বলেই মক্কা রওয়ানা হল। ইকরামা পৌঁছার পূর্বেই নবী (সা) সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

يأتيكم عكرمة مؤمنا فلاتسبوا اباه فان سب الميت يؤذى الحى

"ইকরামা মু'মিন হয়ে আগমন করছে। সুতরাং তার পিতাকে গালি দিও না। কেননা মৃত ব্যক্তিকে গালি দেওয়ায় জীবিত ব্যক্তি কষ্ট পেয়ে থাকে।"

ইকরামা নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার স্ত্রীও ঘোমটা দিয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকেন। ইকরামা আরয করে, আমার স্ত্রী এখানে হাযির রয়েছে। সে আমাকে বলেছে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন। রাসূল (সা) বললেন, সে সত্য বলেছে, তোমাকে নিরাপত্তা দান করা হয়েছে। ইকরামা বলল, আপনি কোন্ বিষয়ের দিকে আহ্বান করেন? নবী (সা) বললেন, তুমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, নামায আদায় কর, যাকাত দান কর। এছাড়া ইসলামের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেন। ইকরামা বলল ঃ

قد كنت الا الى خير وامر حسن جميل قد كنت فينا يارسول الله قبل ان تدعونا وانت اصدقنا حديثًا وابرنا ـ

"নিশ্চয়ই আপনি উত্তম, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য বিষয়ের দিকে আহ্বান করেছেন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই সত্যের দিকে দাওয়াতের পূর্বেও আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী ও নেককার ছিলেন।"

অতঃপর বলেন ঃ أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণের পর ইকরামা বলেন, আমি আল্লাহ এবং উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি এখন একজন মুসলমান, মুজাহিদ ও মুহাজির।[১]

অতঃপর তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার খেদমতে আমার আরয এই যে, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমার জন্য দু'আ করবেন। রাসূল (সা) ইকরামার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন। ইকরামা আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদানের জন্য আমি যা ব্যয় করেছি এখন আমি আল্লাহর পথে আহ্বানের উদ্দেশ্যে তার চেয়ে দ্বিগুণ ব্যয় করব। আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে আমি যে পরিমাণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড করেছি, এখন থেকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথে তার চেয়ে দ্বিগুণ যুদ্ধ-বিগ্রহ করব। যে সমস্ত স্থানে আমি লোকজনকে আল্লাহ্‌র পথে বাধাদান করেছি, ঐ সমস্ত স্থানে গিয়ে আমি লোকজনকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করব। সুতরাং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) যখন ধর্মত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন, তখন একটি বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন হযরত ইকরামা (রা)। মূলত জীবনের বাকী অংশ তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের সাথে জিহাদ ও সংগ্রাম করে অতিবাহিত করেছেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতকালে আজনাদাইনের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। দেহের মধ্যে তীর ও তলোয়ারের সত্তরটির চেয়ে অধিক ক্ষত বিদ্যমান ছিল।[২]

উম্মুল মু'মিনীর হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার এইকথা বলেন যে, আমি স্বপ্নে আবূ জাহলের জন্য বেহেশতে একটি বাসস্থান প্রত্যক্ষ করেছি। ইকরামা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন নবী (সা) উম্মে সালামা (রা)-কে বলেন, আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো এটাই। (ইসাবা)

---

১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩১৪।

২. আল-ইসতি'আব লি ইবনি আবদুল বার, ৩ খ, পৃ. ১৪৮।

ইকরামা মুসলমান হওয়ার পর অবস্থা হয় এই যে, যখনই তিনি তিলাওয়াতের জন্য বসতেন এবং কুরআন মজীদ খুলতেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন এবং বারবার বলতেন هٰذَا كَلَامُ رَبِّىْ –"এটা আমার প্রতিপালকের কালাম।"[১]

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন ইকরামার হাতে একজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। রাসূল (সা)-কে যখন এ সংবাদ অবহিত করা হয়, তখন তিনি মুচ্‌কি হেসে বললেন, হত্যাকারী এবং নিহত উভয়েই বেহেশতী।[২] ভবিষ্যতের জন্য এই ইঙ্গিত ছিল যে, ইকরামা বর্তমানে যদিও কাফির, কিন্তু অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করবে।

নবম ঃ হিবার ইবন আসওয়াদের অপরাধ ছিল এই যে, সে মুসলমানদেরকে অত্যন্ত কষ্ট দিত। নবী (সা)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা) (আবুল আস ইবন রাবী-এর স্ত্রী) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা যাচ্ছিলেন, তখন হিবার ইবন আসওয়াদ কয়েকজন লম্পট ও দুষ্কৃতিকারীকে নিয়ে পথিমধ্যে হযরত যমনাবের উপর বর্শা নিক্ষেপ করে। যার ফলে তিনি একটি পাথরের উপর পড়ে যান। তিনি গর্ভবতী ছিলেন, গর্ভপাত হয়ে গেল এবং তিনি এই রোগে ইনতিকাল করেন। انا لله وانا اليه راجعون

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) হিবারকে হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করেন। যখন নবী (সা) জি'রানা থেকে ফিরে আসেন, তখন হিবার রাসূল (সা)-এর খেদমতে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। সাহাবাগণ আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই ব্যক্তি হলো হিবার ইবন আওসয়াদ। নবী (সা) বললেন, আমি দেখেছি। উপস্থিত সাহাবাদের মধ্যে একজন হিবারকে আক্রমণ করার জন্য যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ইশারা দিয়ে বললেন, বস। হিবার ইবন আসওয়াদ দাঁড়িয়ে আরয করেন ঃ

السلام عليك يانبى الله أشهد ان لا اله الله وأشهد ان محمداً رسول الله وقد هربت منك فى البلاد واردت اللحاق بالاعاجم ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك وكنا يانبى الله اهل شرك فهدانا الله بك وانقذنا من الهلكة فاصفح عن جهلى وعما كان يبلغك عنى فانى مقر بسوء فعلى معترف بذنبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنك وقد احسن الله اليك اذهداك للاسلام والاسلام يجب ماقبله ـ

---

১. ইহইয়া উলূমুদ্দীন, ১ খ, পৃ, ২৫৩।

২. মাদারিজুন নবুওয়াত, ২ খ, পৃ. ৩৯৩।

হিবার রাসূল (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং অতীত দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা চান। রাসূল (সা) তাকে ক্ষমা করে দেন।

দশম ঃ ওয়াহ্শী ইবন হারব ছিল সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা)-এর হত্যাকারী। (এর বিস্তারিত বর্ণনা গাযওয়ায়ে ওহুদের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে)। মক্কা বিজয়ের পর সে পলায়ন করে অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) যখন (নবুওয়তের দাবিদার) মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন, ওয়াহ্শীও বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যে বর্শা দিয়ে হযরত হামযা (রা)-কে শহীদ করেন, ঐ বর্শাও তার সাথে ছিল। যে বর্শা দ্বারা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, একই বর্শা দ্বারা সে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করেন। (ইসতি'আব ইবন্ আবদুল বার)[১]

একাদশ ঃ কা'ব ইবন যুহায়র একজন বিখ্যাত কবি ছিল। নবী (সা)-এর কুৎসা রটনায় কবিতা আবৃত্তি করত। সে ঐ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল মক্কা বিজয়ের দিন যাদেরকে হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করা হয়। মক্কা বিজয়ের দিন সে পলায়ন করে। অতঃপর মদীনা গমন করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় কাব্য রচনা করে যা আরবী ভাষার কাব্য জগতে বানাত সু'আদ (بانت سعاد) নামে খ্যাত।[২] নবী (সা) তাঁর কবিতা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে স্বীয় চাদের উপহার দেন।

দ্বাদশ ঃ হারিস ইবন তলাতিল, নবী (সা)-এর কুৎসা রটনা করত। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আলী (রা) তাকে হত্যা করেন।[৩]

ত্রয়োদশ ঃ আবদুল্লাহ ইবন যিব'আরা (عبد الله بن زبعرى) অত্যন্ত উচ্চমানের কবি ছিল। নবী (সা)-এর নিন্দা ও কুৎসা বর্ণনা করে কবিতা আবৃত্তি করত। হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন ইবন যিব'আরাকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। সে পলায়ণ করে নজরান গমন করে। অবশেষে অনুতপ্ত হয়ে রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করে নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করেন।[৪]

يارسول المليك ان لسانى * راتق مَا فَتَقْتُ اِذَا اَنَا بُوْرٌ -

"হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার যবান ও মুখ ঐ অনিষ্টতার ক্ষতিপূরণ আদায় করবে যা আমি স্বীয় গোমরাহীর অবস্থায় সম্পন্ন করেছি।"

---

১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ২১৬।

২. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১০; আল ইসতি'আব, পৃ. ২৯৭।

৩. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১০।

৪. সীরাতে ইবন হিশাম; ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৪২৫।

امن اللحم والعظام بربی * ثم قلبی الشهيد انت النذير ۔

"আমার গোশত ও হাড় আমার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনয়ন করেছে। অতঃপর আমার অন্তর সাক্ষী প্রদান করছে যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার (পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা) ও ভয় প্রদর্শনকারী।" (সীরাতে ইবন হিশাম)

চতুর্দশ

হিরাত ইবন আবু ওয়াহ্হাব মাখযুমীও ঐ সমস্ত কবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা নবী (সা)-এর নিন্দা করে কবিতা আবৃত্তি করত। মক্কা বিজয়ের দিন পলায়ণ করে নজরান গমন করে এবং সেখানেই কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। (সীরাতে ইবন হিশাম) ইসাবা হিন্দ বিনত আবূ তালিব প্রবন্ধ যিনি উম্মে হানী উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিল। হিরাতা ইবন আবূ ওয়াহ্হাবের স্ত্রী ছিল।[১]

পঞ্চদশ

হিন্দা বিনতে উতবা, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী, সে ঐ হিন্দা, যে মহিলা ওহুদ যুদ্ধে হযরত হামযার (রা) কলিজা বের করে চিবিয়েছিল! হিন্দা ঐ সমস্ত মহিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল মক্কা বিজয়ের দিন যাদেরকে হত্যা নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। হিন্দা নবী (সা)-কে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছে। হিন্দা রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। ঘরে ফিরে সমস্ত মূর্তিকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে বলেন, তোমাদের কারণেই আমরা ধোকার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম।[২]

এ পনের ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী ছিল। তাদের অপরাধ ছিল অত্যন্ত জঘন্য এদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে রাসূল (সা)-এর খেদমতে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাকে নিরাপত্তা দান করা হয়েছে। যে বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে তাকে হত্যা করা হয়।

এবার কয়েকজন সম্মানিত কুরায়শ ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করা হবে যাঁরা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবূ কুহাফার ইসলাম গ্রহণ

আবূ কুহাফা (রা) ছিলেন হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর পিতা। মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) মসজিদে হারামে তশরীফ রাখেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে নবী (সা)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং সামনে বসিয়ে দিলেন, রাসূল (সা) বললেন ঃ هلا تركت الشيخ فی بيته حتی اكون أنا أتيه فيه

১. সীরাতে ইবন হিশাম; ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৪২৫

২. প্রাগুক্ত

"হে আবূ বকর। তুমি এই বৃদ্ধকে কেন ঘরে রেখে আসলে না, আমি নিজেই তাঁর নিকট গমন করতাম।"

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করেন ঃ

يارسول الله هو أحق ان يمشى اليك من ان تمشى انت

"হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমার পিতার নিকট গমন করার চেয়ে আমার পিতা নিজে পদব্রজে আপনার খেদমতে হাযির হওয়া অধিক উত্তম।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ কুহাফার বুকে পবিত্র হাত ফিরালেন এবং ইসলামের কিছু বাণী তালীম দান করেন। আবূ কুহাফা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। বয়স্ক হওয়ার কারণে সমস্ত চেহারা এবং মাথা সাদা ছিল। রাসূল (সা) তাঁকে খেযাব ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন কিন্তু কাল খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করেন।[১]

আল্লামা হালাবী (রা) সীরাতে হালাবিয়াতে উল্লেখ করেন যে, আবূ কুহাফার ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কো মুবাকবাদ জানালেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! শপথ ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আপনাকে হক প্রদান করে প্রেরণ করেছেন, যদি আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলে আমার চোখ অধিক ঠাণ্ডা হতো।[২]

সাফ্ওয়ান ইবন উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণ

সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা কুরায়শদের একজন অন্যতম নেতা ছিলেন। দানশীলতা মেহমানদারী ও অতিথি সেবায় তিনি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা উমাইয়া ইবন খালফ বদর যুদ্ধে নিহত হয়। মক্কা বিজয়ের দিন জিদ্দা পলায়ন করেন। তার চাচাত ভাই উমায়র ইবন ওয়াহ্হাব নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে সাফওয়ানের নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেন। তিনি তাকে নিরাপত্তা দান করেন এবং আলামত হিসেবে স্বীয় পাগড়ী অথবা চাদর দান করেন। উমায়র জিদ্দা গমন করে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। নবী করীম (সা)-এর দরবারে আগমন করে আরয করেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন বলে উমায়র বলছে। রাসূল (সা) বলেন, হাঁ। সাফওয়ান আরয করে, চিন্তা করার জন্য আমাকে দু'মাস সময় দিন। নবী (সা) বললেন, তোমাকে চার মাস সময় দেয়া হলো। ঐ সময় সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। হুনায়ন যুদ্ধে সাফওয়ান রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলেন। তার কাছ থেকে রাসূল (সা) লোহার বর্ম ও কিছু যুদ্ধের পোষাক ধার হিসেবে গ্রহণ করেন। হুনায়ন পৌছে সে বলে ঃ

---

১. রওযুল উনুফ, ৭ খ, পৃ. ২৭০

২. সীরাতে হালবীয়া, ২ খ, পৃ. ২১২

كان يربنى رجل من قريش احب الى من ان يربنى رجل من هوازن

"কুরায়শদের কোন ব্যক্তির উপদেশ আমার নিকট অধিক প্রিয় হাওয়াযিনের কোন ব্যক্তির উপদেশের চেয়ে।"

হুনায়ন থেকে ফিরে আসার পর নবী (সা) সাফওয়ানকে অসংখ্য বকরী দান করেন সাফওয়ান ঐ বকরী দেখে বলেন, আল্লাহর শপথ! নবী ব্যতীত এত বিপুল পরিমাণ দান আর কেউ করতে পারে না এবং সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইসতি'আব ও ইসাবা)

সুহায়ল ইবন আম্‌রের ইসলাম গ্রহণ

সুহায়ল ইবন আম্‌র মক্কার মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। কুরায়শদের মুখপাত্র ও বক্তা হিসেবে খ্যাত ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তাকে আগমন করতে দেখে নবী (সা) বলেন ঃ قد سهل من أمركم (এবার তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল)।

মক্কা বিজয়ের দিন সুহায়ল তার পুত্র আবদুল্লাহকে নবী করীম (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করে বলেন, তুমি সেখানে গিয়ে রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে আমার জন্য নিরাপত্তা গ্রহণ কর। তিনি তাকে নিরাপত্তা দান করেন এবং সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

من لقى سهيل بن عمرو فلايحد اليه النظر فلعمرى ان سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل يجهل الاسلام -

"যে ব্যক্তি সুহায়লের সাথে সাক্ষাত করবে, সে যেন তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না দেখে। আমার জীবনের শপথ! নিশ্চয়ই সুহায়ল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ভদ্র। সুহায়লের মত লোক ইসলাম থেকে জাহিল ও বেখবর থাকতে পারে না।"

সুহায়ল তাৎক্ষণিক ইসলাম গ্রহণ করে নি। হুনায়নের যুদ্ধে নবী (সা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং জি'রানা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১] এবং শপথ গ্রহণ করেন যে, মুশরিকদের সাথে মিলে যত যুদ্ধ করেছি, এখন মুসলমানদের সাথে মিলে তত পরিমাণ যুদ্ধ করব। মুশরিকদের জন্য যে পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছি, সে পরিমাণ সম্পদ মুসলমানদের জন্য ব্যয় করব।[২]

একদিন হযরত উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর দরজায় লোকজন অপেক্ষমান ছিল। সুহায়ল ইবন আমর, আবূ সুফিয়ান ইবন হারব এবং অন্যান্য কুরায়শ

১. সীরাতে হালবীয়া, ২ খ, পৃ. ২২৬।
২. ইসাবা, ২ খ, পৃ. ৯৪।

নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দারোয়ান সংবাদ পৌছানোর পর সুহায়ব, হযরত বিলাল ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ভিতরে ডেকে নেয়া হলো। এবং সুহায়ল, আবূ সুফিয়ান এবং কুরায়শ নেতাদেরকে ডাকা হলো না। আবূ সুফিয়ান বলল, আজকের এই দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি। গোলামদেরকে ডাকা হলো কিন্তু আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা হলো না। এ সময় সুহায়ল সে বুদ্ধিদীপ্ত জবাব প্রদান করেছেন, তা অন্তরে গেথে রাখার মত। সুহায়ল আবূ সুফিযান ও অন্যান্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ "হে আমার গোত্রের নেতৃবৃন্দ! আল্লাহ্‌র শপথ, তোমাদের চেহারায় অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের আলামত পরিদৃশ্য হচ্ছে। অথচ অন্যের উপর ক্রোধ প্রকাশের চেয়ে নিজেদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত। কেননা সত্য দীনের দাওয়াত তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছে, তোমাদেরকেও দেওয়া হয়েছে। তাঁরা শোনামাত্র তা গ্রহণ করেছেন আর তোমরা গ্রহণ না করে পিছনে রয়েছ। আল্লাহর শপথ! এ সমস্ত লোক যে মর্যাদা ও ফযীলত অর্জন করেছে, ঐ মর্যাদা থেকে তোমাদের বঞ্চিত থাকা আমার নিকট এই দরজার বঞ্চিত হওয়া থেকে অনেক বেশি কঠোর যার উপর তোমরা ঈর্ষা করছ। এ সমস্ত লোক তোমাদের থেকে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছ। এ মর্যাদা ও ফযীলত অর্জন করার জন্য এখন আর তোমাদের কোন পথ বা সুযোগ নেই। এই হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই, তৈরি হয়ে যাও, এটা কোন অবাক বিষয় নয় যে, হয়ত আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শাহাদাতের নি'আমত দ্বারা অভিষিক্ত করে দেবেন।"

সুহায়ল যখন তাঁর মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করেন, তখনই তাঁর গোত্র ও পরিবারের লোকজন আল্লাহর পথে রোমকদের মোকাবিলার জন্য জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, আমওয়াসের মহামারীতে (طاعون أمواس) তিনি ইনতিকাল করেন। মোটকথা, যে কোন অবস্থায় তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। (ইস্তি'আব লি ইবন আবদুল বার)

আবূ লাহাবের পুত্র উতবা ও মা'তাবের ইসলাম গ্রহণ

হযরত আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা বিজয়ের জন্য এখানে আগমন করেন, তখন আমাকে বললেন, তোমার দু'ভাতিজা এবং আবূ লাহাবের পুত্র উতবা ও মা'তাব কোথায়? তারা তো আমার সাথে সাক্ষাত করেনি। আমি আরয করলাম, কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা আত্মগোপন করেছে। তাদের সাথে এ দু'জন ও দূরে কোথাও পলায়ন করেছে। রাসূল (সা) বললেন, তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি নবী (সা) এর নির্দেশ অনুযায়ী সাওয়ার হয়ে উরনা নামক স্থানে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসি এবং রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হই। নবী (সা) তাদের

নিকট ইসলামের মূলনীতি পেশ করেন। তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী (সা)-এর বায়‘আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁদের উভয়ের হাত ধরে কা‘বা ঘরের সন্নিকটে মুলতাযম এ আগমন করেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দু‘আ করেন। এরপর সেখান থেকে ফিরে আসেন। এ সময় রাসূল (সা)-এর পবিত্র চেহারায় আনন্দের আভা পরিস্ফুটিত হচ্ছিল।

হযরত আব্বাস (রা) বলেন, আমি আরয করলাম। আল্লাহ আপনাকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখুন। আপনার পবিত্র চেহারা আজ আনন্দিত মনে হচ্ছে। রাসূল (সা)-এর (সা) বললেন, আমি আমার পরওয়াদিগারের নিকট এই আবেদন করেছি যে, আমার চাচার এই দু’পুত্র উতবা ও মা‘তাব আমাকে দান করুন। আল্লাহ তা‘আলা আমার দু‘আ কবূল করেছেন এবং আমার জন্য এদু’জনকে হেবা করে দিয়েছেন।[১]

হযরত মু‘আবিয়ার ইসলাম গ্রহণ

কেউ কেউ বলেন, মু‘আবিয়া (রা) মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু সঠিক কথা হলো এই যে, তিনি হুদায়বিয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু এটা গোপন রাখেন এবং মক্কা বিজয়ের পর তা প্রকাশ করেন।[২]

উম্মুল মু’মিনীন উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা) ছিলেন হযরত মু‘আবিয়া (রা)-এর বোন। মা এর ভাই মামা হয়ে থাকেন। ফলে হযরত মু‘আবিয়া (রা) হলেন সমস্ত মু’মিনের মামা। সুতরাং আহ্‌লি বায়ত ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি মহব্বত রাখা মু’মিনদের উপর কর্তব্য, রাসূল (সা)-এর শ্বশুর পক্ষের লোকদের প্রতি মহব্বত রাখাও তেমনি কর্তব্য।

আবূ সুফিয়ান ইবন হারব (রা) নবী (সা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবার পিতা এবং মু‘আবিয়া (রা) উম্মে হাবীবার ভাই, তাঁদের প্রতি মহব্বত রাখা অবশ্য কর্তব্য। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম। ইসলামের পূর্বে যা কিছু ঘটেছে, তা সবই ক্ষমা করা হয়েছে। ইসলাম পূর্বের ঘটনাবলী উল্লেখ কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

মন্দির ধ্বংস করার জন্য সারিয়া প্রেরণ

নবী (সা) মক্কা বিজয়ের পর প্রায় পনের দিন মক্কায় অবস্থান করেন। কা‘বা ঘরে যে সমস্ত মূর্তি ছিল, তা ধ্বংস করান এবং সবার উদ্দেশ্যে এই আহ্বান করেন ঃ

من كان مؤمن بالله واليوم الاخر فلايدع فى بيته صنما -

“যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলা ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন তার ঘরে কোন মূর্তি অবশিষ্ট না রাখে।”

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১ খ, পৃ. ২৬৪।

২. ইসাবা, ৩ খ, পৃ. ৪৩৩।

যখন মক্কা মুকাররমা মূর্তি থেকে পবিত্র হয়ে যায় এবং কা'বা ঘরের সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করা হয়, তখন মক্কার চতুর্দিকে মূর্তিসমূহ ধ্বংস করার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করা হয়।

উয্যা ও সুওয়া নামক মূর্তি ধ্বংস

৮ম হিজরীর ২৫ রমযান হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে ত্রিশজন অশ্বারোহীসহ উয্যা নামক মূর্তি ধ্বংস করার জন্য নাখ্লা নামক স্থানে প্রেরণ করেন। মক্কা থেকে ঐ স্থানের দূরত্ব এক রাতের পথ। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা)-কে সুওআ নামক মূর্তি ধ্বংস করার জন্য মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে প্রেরণ করেন। আমর ইবনুল আ'স (রা) সেখানে পৌঁছলে মন্দিরের রক্ষী তাঁকে বলল, তুমি কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশে এই মূর্তি ধ্বংস করার জন্য এসেছি। এ জবাব শুনে রক্ষী বলল, তুমি কখনো এটা করতে সক্ষম হবে না, সুওয়া খোদা তোমাকে প্রতিহত করবে। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) বললেন, আফসোস! তোমরা এখনো ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছ। আমাকে কিসে প্রতিহত করবে তা কি শুনতে ও দেখতে চাও? এ বলেই এমনি এক আঘাত করেন যার ফলে সুওয়া ধ্বংস হয়ে যায় এবং রক্ষীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি তো দেখতে পেয়েছ। রক্ষী এ দৃশ্য দেখে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করে এবং বলে اسلمت لله। (আমি আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি)।

মানাত নামক মূর্তি ধ্বংস

৮ম হিজরীর ২৬ রমযান হযরত সা'দ ইবন যায়দ আশহালী (রা)-কে বিশজন অশ্বারোহী সহ মানাত নামক মূর্তি ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ[১] করা হয়। মূলত পবিত্র রমযানের মাসব্যাপী এই মূর্তি ধ্বংস অর্থাৎ আল্লাহর দুনিয়া থেকে কুফর ও শিরকের অপবিত্রতাকে ধৌত করে পবিত্র করা হয়।

শাওয়াল মাসে ইসলামের প্রচার এবং দীনে হকের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য মুহাজির ও আনসারের ৩৫০ জনের একটি দল হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদের নেতৃত্বে বনূ জাযীমার নিকট প্রেরণ করেন। এ সমস্ত লোক ইয়ালামলামের কাছে একটি কূপের পার্শ্বে গামীসা নামক স্থানে বাস করত। খালিদ (রা) সেখানে গমন করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তারা ভয় পেয়ে সঠিকভাবে এটাও বলতে পারেনি যে, আমরা মুসলমান। তারা বলতে থাকে صَبَأْنَا صَبَأْنَا (আমরা আমাদের পূর্ববর্তী ধর্ম ত্যাগ করেছি)। হযরত খালিদ (রা) এটা যথেষ্ট মনে না করে কিছু লোককে হত্যা করেন এবং কিছু লোককে গ্রেফতার করেন। যখন নবী (সা)-এর খেদমতে পৌঁছে

১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩৪৭।

ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন তিনি হাত উঠিয়ে দু'বার এই কথা বলেন ঃ اللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد। (হে আল্লাহ্! খালিদ যে কাজ করেছে আমি তা থেকে মুক্ত)। (বুখারী ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৪৫)

অতঃপর রক্তপণ আদায়ের জন্য হযরত আলী (রা)-কে টাকা-পয়সাসহ বনূ জাযীমার নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আলী (রা) সেখানে গমন করে নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ আদায় করেন। জিজ্ঞাসা করে যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, কারো রক্তপণ বাকী নেই, তখন অবশিষ্ট টাকাও সতর্কতাবশত তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। ফিরে এসে যখন রাসূল (সা)-এর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং বলেন أصبت، أحسنتَ [১] (তুমি উত্তম কাজ করেছ)।

গাযওয়ায়ে হুনায়ন, আওতাস ও তায়েফ

(৮ম হিজরী, শনিবার, ৬ শাওয়াল)

মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম হলো হুনায়ন। সেখানে হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের লোকজন বাস করত। এ গোত্রের লোকজন অত্যন্ত দক্ষ যুদ্ধবাজ ও তীরন্দাজ ছিল। মক্কা বিজয়ের পর তাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, নবী (সা) পুনরায় তাদের উপর আক্রমণ করতে পারেন। সুতরাং পরামর্শ করে তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আমাদের উপর আক্রমণ করার পূর্বে আমরাই মুসলমানদের উপর আক্রমণ করব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের নেতা মালিক ইবন আউফ নসরী বিশ হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী নিয়ে মুসলমানের উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

বনী জুশমের নেতা দুরায়দ ইবন সুম্মা বয়স্ক হওয়ার কারণে যদিও চলাফিরা করতে সক্ষম ছিল না কিন্তু বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার কারণে উপদেশ ও পরামর্শের জন্য তাকেও সাথে নিয়ে যায়।

মালিক ইবন আউফ তার বাহিনীর সবাইকে তাদের পরিবারবর্গকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে, যাতে মরণপণ যুদ্ধ করতে পারে এবং কেউ তার পরিবারবর্গ ত্যাগ করে পলায়ন করতে না পারে। আওতাসের ময়দানে পৌঁছার পর দুরায়দ জিজ্ঞাসা করে এটা কোন জায়গা? লোকজন বললো, এ স্থানের নাম হলো আওতাস। দুরায়দ বললো, এটা যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান। এখানে মাটি অত্যন্ত শক্তও নয়, আবার অত্যন্ত নরমও নয় যাতে পা ধসে যাবে। অতঃপর বলে,

مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير

"এটা কিরূপ অবস্থা যে, আমি উটের, গাধার এবং বকরী ও শিশুদের চিৎকার শুনছি।"

---

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ৩।

লোকজন বললো, মালিক ইবন আউফ লোকজনকে তাদের পরিবারবর্গ ও ধন সম্পদসহ এখানে নিয়ে এসেছে, যাতে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করতে পারে।”

দুরায়দ বলল, সে বিরাট ভুল করেছে। পরাজিত দল কি কিছু ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, যুদ্ধে বর্শা ও তলোয়ার ব্যতীত কোন কিছুই কাজ হয় না। যদি তোমাদের পরাজয় হয় তাহলে পরিবারবর্গের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই পরিবার-পরিজন পিছনে রাখাই উত্তম হবে। যদি বিজয় হয়, তাহলে সবাই এসে মিলিত হবে। আর যদি পরাজয় হয় তাহলে শিশু ও মহিলাগণ শত্রুদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু মালিক ইবন আউফ যৌবনের উম্মাদনায় এদিকে দৃষ্টিপাত না করে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো আমার সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত হব না। বার্ধক্যজনিত কারণে তার জ্ঞান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্র যদি আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলে তা হলে ভাল, নতুবা আমি এখনই আত্মহত্যা করব। অতঃপর সবাই বললো, আমরা তোমার সাথে আছি।

নবী (সা) যখন তাদের ঐ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবন হাদরাদ আসলামীকে সংবাদ সংগ্রহ ও অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ সেখানে দু'একদিন অবস্থান করে, সার্বিক অবস্থা অবগত হয়ে নবী (সা)-কে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন রাসূল (সা)-ও মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু করেন। সাফওয়ান ইবন উমাইয়া থেকে এক শ' বর্শা ও অন্যান্য আসবাবপত্র ধার হিসেবে গ্রহণ করেন।

৮ম হিজরীর ৮ শাওয়াল শনিবার বার হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী মক্কা থেকে হুনায়নের দিকে রওয়ানা হলো। দশ হাজার জীবন উৎসর্গকারী যোদ্ধা মদীনা থেকে রাসূল (সা)-এর সাথী ছিলেন। বাকী অমুসলিম যোদ্ধাও এই বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। (সীরাতে ইবন হিশাম) বার হাজার নির্ভিক যোদ্ধার এই বাহিনী হুনায়নের দিকে এগিয়ে চললো। তখন এদের মধ্যে একজন বললো, لن نغلب اليوم من قلة (অদ্য আমরা সংখ্যা অল্প হওয়ার কারণে পরাজিত হব না)। এতে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা বিদ্যমান ছিল যা আল্লাহ তা'আলা অপসন্দ করেন। দুনিয়ায় যেহেতু স্বল্পতাও পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে। ফলে শত্রুপক্ষের আধিক্য প্রত্যক্ষ করে কোন কোন সাহাবার মুখে এ বাক্য উচ্চারিত হয় যে, অদ্য আমরা সংখ্যাল্পতার কারণে পরাজিত হব না। অর্থাৎ যদি আজ আমরা পরাজিত হই তা হলে এটা সংখ্যা অল্প হওয়ার কারণে হবে না বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হবে। কেননা বিজয় ও সাহায্য আল্লাহ পাকের হাতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে এ বাক্য পসন্দনীয় হয়নি। কেননা এ কথার মধ্যে বিভ্রান্তিমূলক ধারণা এই ছিল যে, বিজয়ের কারণ হলো সংখ্যাধিক্য বিশেষ করে যে সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করে তাওহীদের শিক্ষা

লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে কারো মুখ থেকে এরূপ কাল্পনিক কথা উচ্চারিত হওয়া তাঁদের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি। এটাও হতে পারে যে, মক্কা বিজয়ের দিন যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা)-এর সাথী হয়েছে এবং এখনো ইসলামের মহত্ব তাঁদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয়নি, এটা তাঁদের সাহচর্যের প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

সুনানে নাসাঈ শরীফ বর্ণিত আছে, একবার ফজর নামাযে নবী (সা) সূরা রূম তিলাওয়াত শুরু করেন। তিলাওয়াতের মধ্যে রাসূল (সা)-এর কিছু সন্দেহ ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। তিনি নামায শেষ করে ইরশাদ করেন ঃ

مابال أقوام يصلون معنا لايحسنون الطهور وانما يلبس علينا القران -

"লোকজনের কী হয়েছে যে, আমাদের সাথে নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ায় অথচ সঠিকভাবে অযূ সম্পন্ন করে না। সম্ভবত এ সমস্ত লোকই আমার তিলাওয়াতে সন্দেহ ও জটিলতার সৃষ্টি করেছে।"

এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবী (সা)-এর মনের অসন্তুষ্টি ও তিলাওয়াতের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণ ঐ সমস্ত লোকের (নামাযে) অংশ গ্রহণের কারণে হয়েছিল যারা অযূর আদব ও মুস্তাহাব যথাযথভাবে আদায় করেনি। নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে সবাই অযূ করেছিল কিন্তু কোন কোন নামাযীর অযূ উত্তমভাবে করা হয়নি। যার ফলে রাসূল (সা)-এর অন্তরে এর প্রভাব পড়ে। এর দ্বারা মুশরিক, কাফির, যিন্দীক ও বিদ্‘আতীদের সংসর্গের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কত অনিষ্টকর হতে পারে তা অনুমান করা যায়। আল্লামা তাইয়্যেবী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, সুন্নাত ও আদবের নূর ও বরকত অন্যজনের প্রতি অনুপ্রবেশ করে থাকে এবং এগুলো পরিত্যাগ করার কারণে অদৃশ্য দয়া ও অনুগ্রহের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কোন কোন সময় এর প্রতিক্রিয়া অন্যজনের প্রতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এই ব্যক্তির কারণে অন্য ব্যক্তিও কল্যাণ, বরকত এবং নূর ও তাজাল্লী থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। হযরত সাহাবায়ে কিরামের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সাহচর্য ও সান্নিধ্যের কারণ ও প্রভাবে অর্জিত হয়েছিল কিন্তু এই যুদ্ধের সময় নবদীক্ষিত লোকদের সান্নিধ্যের কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে এই বাক্য উচ্চারিত হয়।

اندکے پیش توگفتم غم دل ترسیدم * کم دل آزرده شوی ورنه سخن بیمارست

"আপনার সকাশে সামান্য ত্রুটির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ভীত অন্তকরণে জড়সড় হয়ে পড়েছি, বিষণ্ণ হৃদয়ে কালাতিপাত করছি, নতুবা আরো কিছু বলার ছিল।"

মোটকথা এই বাক্য আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন নি এবং বিজয়ের পরিবর্তে প্রথমবারেই পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا - وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ - ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ، ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى وَرَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ذَالِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ -

"আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে প্রফুল্ল করেছিল কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন বাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেছেন কাফিরদেরকে এবং এটা হলো কাফিরদের কর্মফল।" (সূরা তাওবা ঃ ২৫-২৬।)

মুসলিম বাহিনী সোমবার বিকালে হুনায়ন প্রান্তরে উপস্থিত হয়। হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্রের উভয় দল দু'দিকে ওঁৎপেতে বসেছিল। মালিক ইবন আউফ তাদেরকে পূর্ব থেকেই এ নির্দেশ দান করে যে, তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেল এবং মুসলিম বাহিনী যখন এদিক দিয়ে আগমন করবে, তখন বিশ হাজার তলোয়ার দিয়ে একত্রে আক্রমণ করবে। তদনুসারে ভোরের অন্ধকারে যখন মুসলিম বাহিনী এই গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করতে থাকে, তখন বিশ হাজার তলোয়ার নিয়ে কাফেররা হঠাৎ করে আক্রমণ করে যার ফলে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মাত্র দশ-বার জন জীবন উৎসর্গকারী নবী করীম (সা)-এর চতুর্দিকে ঘিরে থাকে। এ সময় রাসূল (সা)-এর সাথে হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আব্বাস, ফযল ইবন আব্বাস, উসামা ইবন যায়দ (রা)-সহ আরো কয়েকজন সাহাবা ছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) রাসূল (সা)-এর খচ্চরের লাগাম এবং আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস (রা) রিকাব ধরে রেখেছিলেন।

যারা মক্কা থেকে নবী (সা)-এর সাথে এসেছিল তারা হঠাৎ পরাজয়ের কারণে সমালোচনা শুরু করে। আবূ সুফিয়ান ইবন হারব (আমির মু'আবিয়ার পিতা) বলেন, এ পরাজয় সাগর থেকে মুক্তা আহরণ করতে পারবে না। কালাদা ইবন হাম্বল আনন্দে চীৎকার করে বলে, আজ যাদুর সমাপ্তি ঘটেছে।

সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা তখনো ইসলাম গ্রহণ করে নি, তিনি বলেন, চুপ! আল্লাহ তোমাদের মুখ বন্ধ করুন। হাওয়াযিন গোত্রের কোন ব্যক্তি আমার লালন-পালন করার চেয়ে আমার নিকট এটা সবচেয়ে পসন্দনীয় যে, কুরায়শ গোত্রের কোন ব্যক্তি আমার অভিভাবক ও মুরুব্বী হোক। শায়বা ইবন উসমান ইবন আবূ তালহা বলে, আজ আমি আমার পিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। তার পিতা ওহুদ যুদ্ধে নিহত হয়। যখন সে নবী (সা)-এর দিকে অগ্রসর হয় তখন হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং রাসূলের (সা) নিকট যেতে সক্ষম হয়নি। সে উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে রাসূল (সা) পর্যন্ত যেতে প্রতিহত করা হয়েছে। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

মোটকথা হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের বাহিনী ওঁৎপেতে থাকার স্থান থেকে রেব হয়ে যখন একত্রে হামলা করে এবং চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির মত মুসলমানদের উপর তীর বর্ষণ হতে থাকে তখন মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শুধু একান্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন লোক নবী (সা)-এর সাথে রয়ে গেলেন। রাসূল[১] (সা) তিনবার আহ্বান করে বললেন, হে লোক সকল! এদিকে আস। আমি হলাম আল্লাহ্‌র রাসূল এবং মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ।[২]

أنا النبى لاكذب * انا ابن عبد المطلب -

"আমি হলাম সত্য নবী। আল্লাহ্ আমাকে যে বিজয় ও সাহায্য এবং আমার পবিত্রতা[৩] ও সম্মান রক্ষা ও সাহায্যের অঙ্গীকার করেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। এতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। অধিকন্তু আমি হলাম আবদুল মুত্তালিবের পুত্র।"

হযরত আব্বাস (রা)-এর আওয়ায ছিল খুব উঁচু। মুহাজির ও আনসারগণকে ডাকার জন্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার দিয়ে বললেন ঃ يامعشر الانصار يا أصحاب السمرة (হে আনসারের দল, হে ঐ সমস্ত লোক যারা বাবলা গাছের নিছে বায়'আত গ্রহণ করেছ)

আওয়ায পৌছামাত্র মুহূর্তের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-এর চতুর্দিকে একত্র হলেন। নবী (সা) মুশরিকদের উপর হামলা করার নির্দেশ প্রদান করেন। যখন জীবনপণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠে তখন রাসূল (সা) এক মুষ্টি মাটি নিয়ে কাফির-মুশরিকদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ شاهت الوجوه (তাদের চেহারা নষ্ট হোক) সহীহ মুসলিম শরীফের অন্য

---

১. তারীখে ইবনুল আসীর।

২. বুখারী ও মুসলিম।

৩. এটা ইঙ্গিত হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ والله يعصمك من الناس

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী (সা) মাটি নিক্ষেপ করার সংগে সংগে বলেন ঃ

انهزموا ورب محمد। (শপথ মুহাম্মদের প্রতিপালকের, তারা পরাজিত হয়েছে)।

কাফির-মুশরিকদের এমন কোন লোক বাকী ছিল না যাদের চোখে এই মুষ্টি মাটির ধূলা পৌঁছেনি, মুহূর্তের মধ্যে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। অনেকে পলায়ন করলো। অনেককে গ্রেফতার করা হলো। এ ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ الاية (সূরা তাওবা ঃ ২৫-২৬)

এদিকে রাসূল (সা) এক মুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করেন অন্যদিকে মুসলিম বাহিনী আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে আক্রমণ করে। প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তিত হতে লাগলো। হাওয়াযিনদের বীর যোদ্ধাদের শক্তি-সামর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনী তাদেরকে গ্রেফতার শুরু করে। যুদ্ধে শত্রুদের সত্তরজন নিহত হয়, অনেক গ্রেফতার হয় এবং প্রচুর সম্পদ ও আসবাবপত্র মুসলমানদের হস্তগত হয়।[১]

হযরত জুবায়র ইবন মুত্ঈম (রা) বর্ণনা করেন, হাওয়াযিনদের পরাজয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে আমি আকাশ থেকে একটি কাল চাদর পতিত হতে দেখেছি। চাদরটি আমাদের ও শত্রুদের মধ্যবর্তী স্থানে পতিত হয়। ঐ চাদর থেকে হঠাৎ অসংখ্য পিপীলিকা বের হয়ে সম্পূর্ণ যুদ্ধের ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো ফিরিশতা হওয়া সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এগুলো অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুদল পরাজয় বরণ করে।[৩]

পরাজয়ের পর হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্রের নেতা ও সেনাপতি মালিক ইবন আউফ নসরী একটি দল নিয়ে পলায়ন করে তায়েফ গমন করে। দুরায়দ ইবন সাম্মা কিছু লোকসহ পলায়ন করে আওতাস নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কিছু লোক পলায়ন করে নাখলায় পৌছে। নবী (সা) আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর চাচা আবূ আমির আশ'আরীকে অল্প সংখ্যক সৈন্য সহ আওতাসের দিকে প্রেরণ করেন। মুকাবিলা হওয়ার পর দুরায়দ রাবী'আ ইবন রুফায় (রা)-এর হাতে নিহত হয়।

সালমা ইবন দুরায়দ হযরত আবূ আমির আশ'আরী (রা)-এর হাঁটুতে তীর নিক্ষেপ করে। যার ফলে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) অগ্রসর হয়ে মুসলিম বাহিনীর পতাকা হাতে নিয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করেন এবং চাচার হত্যাকারীকে হত্যা করেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন।[৩]

---

১. উয়ূনুল আসার, ২য় খ, পৃ. ১৯২।

২. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৩৪।

৩. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৩৪।

হযরত আবূ আমির আশ'আরী (রা) মৃত্যুর সময় হযরত আবূ মূসা আশ'আরীকে বলেন, হে ভাতিজা। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার সালাম বলবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বলবে। হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম এবং আমার চাচার সালাম পৌঁছালাম। নবী (সা) সাথে সাথেই পানি চেয়ে অযূ করলেন এবং হাত উঠিয়ে এই দু'আ করেন ঃ أللهم اغفر لا أبى عامر (হে আল্লাহ আবূ আমিরকে ক্ষমা করুন) অতঃপর এই দু'আ করেন–

أللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس

"হে আল্লাহ, কিয়ামতের দিন তাকে অনেকের চেয়ে বেশী মর্যাদা দান করুন।"

হযরত আবূ মূসা (রা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। রাসূল (সা) দু'আ করেন–

أللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريما

"হে আল্লাহ্! আবদুল্লাহ ইবন কায়স এর পাপ মার্জনা করুন এবং কিয়ামতের দিন তাকে (আবূ মূসাকে) মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে প্রবেশের সুযোগ দিন।" (বুখারী, পৃ. ৬১৯, গাযওয়ায়ে আওতাস)

তায়েফ অবরোধ

নবী (সা) হুনায়নের গণীমতের মাল ও কয়েদীদের জি'রানা নামক স্থানে জমা করার নির্দেশ দান করেন এবং স্বয়ং তায়েফ রওয়ানা করেন। তায়েফ গমনের পূর্বে তুফায়ল ইবন আমর দাওসীকে কয়েকজন মুসলিমসহ একটি মূর্তি (যার নাম ছিল যুল কাফফাইন) জ্বালিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। নবী (সা) তায়েফ পৌঁছার চারদিন পর হযরত তুফায়ল ইবন আমর একটি কামান ও মিনজানিখ নিয়ে সেখানে হাযির হন। (যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৮; উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২০০)।

পৌঁছার পূর্বেই হাওয়াযিনদের সেনাপতি মালিক ইবন আউফ নসরী তার বাহিনী নিয়ে তায়েফের দূর্গে প্রবেশ করে প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেয় এবং কয়েক বছরের খাদ্য-পানীয় ও আসবাবপত্র দূর্গের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখে। রাসূল (সা) তায়েফে পৌছে তাদের দূর্গ অবরোধ করে ফেলেন। কামান দিয়ে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করে। তারা দূর্গের প্রাচীরের উপর তীরন্দায বাহিনী প্রস্তুত রেখেছিল। তারা এমন কঠোরভাবে তীর নিক্ষেপ করে যার ফলে অনেক মুসলমান আহত হন এবং বারজন শাহাদাত বরণ করেন। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) তাদেরকে সামান সামনি যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু জবাবে তারা বলে যে, দূর্গ থেকে বের হওয়ার

আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। কয়েক বছরের খাদ্যদ্রব্য আমাদের নিকট মওজুদ রয়েছে। যখন এগুলো শেষ হয়ে যাবে, তখন আমরা তলোয়ার নিয়ে অবতীর্ণ হব। মুসলমানগণ দূর্গের পাশে বসে প্রাচীর ভেঙ্গে সুড়ঙ্গ করার চেষ্টা করেন। শত্রুগণ দূর্গের উপর থেকে তপ্ত লৌহদণ্ড বর্ষণ করতে থাকে। যার ফলে মুসলমানদের পিছু হটে আসতে হয়। এটা দেখে নবী (সা) বাগান ধ্বংসের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। দূর্গের অধিবাসীগণ রাসূল (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দেয়। নবী (সা) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলা ও আত্মীয়তার জন্য তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। অতঃপর দূর্গের প্রাচীরের নিকট থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয় যে, যে গোলাম দূর্গ থেকে বের হয়ে আমাদের নিকট আগমন করবে, সে আযাদ হয়ে যাবে। ফলে বার-তেরজন গোলাম দূর্গ থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়। এ সময় নবী (সা) স্বপ্নে দেখতে পান যে, এক পেয়ালা দুধ রাসূল (সা)-এর সামনে পেশ করা হয়। একটি মোরগ এসে ঐ দুধের মধ্যে ঠোঁট প্রবেশ করে দেয়ায় দুধ পড়ে যায়। রাসূল (সা) এ স্বপ্ন হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সম্ভবত এই দূর্গ এখনই জয় করা যাবে না, রাসূল (সা) নাওফেল ইবন মু'আবিয়া দায়লামীকে ডেকে এ সম্পর্কে তার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! শিয়াল আপনার নিয়ন্ত্রণে, যদি অবস্থান করেন তাহলে ধরে ফেলবেন, যদি ছেড়ে দেন তাহলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।[১]

ইবন মা'সাদের রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা) আগমন করে আরয করেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি তাদের উদ্দেশ্যে বদ দু'আ করুন। নবী (সা) বলেন, বদ দু'আ করার জন্য আল্লাহ আমাকে অনুমতি প্রদান করেন নি। হযরত উমর (রা) বললেন, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করার কি প্রয়োজন রয়েছে? নবী (সা) ঐস্থান ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং গমনের সময় এই দু'আ করেন –[২]

أللهم اهد ثقيفا وائت بهم

"হে আল্লাহ সাকীফ গোত্রকে হিদায়ত দান কর এবং তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে আমার নিকট পৌছিয়ে দাও।"

সুতরাং এই দূর্গ পরে এমনিতেই হস্তগত হয়ে যায়, সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করে। মালিক ইবন আউফ স্বয়ং নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

১. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ২৮।

২. আত-তাবাকাতিল কুবরা লি ইবন সা'দ, ২ খ, পৃ. ১১৫।

হুনায়নে যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন

নবী (সা) তায়েফ থেকে রওয়ানা হয়ে ৫ যিলকাদা জি'রানা পৌঁছেন। সেখানে গনীমতের মালসমূহ জমা করা হয়েছিল। গনীমতের মালের মধ্যে ৬ হাজার কয়েদী, ৩৪ হাজার উট, ৪০ হাজার বকরী এবং ৪ হাজার উকিয়া রৌপ্য ছিল। এখানে পৌঁছার পর নবী (সা) দশ দিনের অধিক হাওয়াযিন গোত্রের অপেক্ষা করেন। হয়ত তারা স্বীয় আপনজন, শিশু ও মহিলাদেরকে মুক্ত করে নেয়ার জন্য আগমন করবে। কিন্তু দশ দিন অপেক্ষা করার পরও যখন কেউ আগমন করেনি, তখন নবী (সা) গনীমতের মালামাল যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। (ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৩৮; উয়ূনুল আসার, ২ খণ্ড, পৃ. ১৯৩)

গনীমতের মাল বণ্টনের পর হাওয়াযিন গোত্রের নয়জনের একটি দল রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। অতঃপর তাঁরা তাঁদের ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন পেশ করেন। রাসূল (সা)-এর দুধ মা হযরত হালীমা সাদীয়া ছিলেন ঐ গোত্রের। এই গোত্রের খতীব বা বক্তা যুহায়র ইবন সরদ দাঁড়িয়ে আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ সমস্ত কয়েদী মধ্যে আপনার ফুফু, খালাও রয়েছেন। যারা আপনাকে কোলে নিয়ে খেলা করেছেন এরূপ লোক রয়েছেন। যদি কোন বাদশাহ্ অথবা আমীরের সাথে আমাদের এ ধরনের সম্পর্ক থাকত, তা হলে আমরা অনেক সহানুভূতি পেতাম, অথচ আপনার শান ও মর্যাদা তাদের চেয়ে অনেক উন্নত। আমাদের উপর যে মুসীবত আগমন করেছে, এ সম্পর্কে আপনার নিকট কিছুই গোপন নেই। আপনি আমাদের উপর ইহসান করুন। আল্লাহ্ আপনার উপর ইহসান করবেন। অতঃপর এই কবিতা আবৃত্তি করেন–

امن علينا رسول الله فى كرم * فانك المر نرجوه وندخر -

কবিতার শেষ পর্যন্ত পূর্ণ কবিতা ইনশা'আল্লাহ প্রতিনিধি অধ্যায় আসবে।

নবী (সা) বললেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা করেছি। এখন তো গনীমত বণ্টন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে দু'টোর মধ্যে একটি গ্রহণ করতে পার, কয়েদী অথবা মাল। তারা আরয করল, আমরা গোত্রের কয়েদীদের মুক্তি কামনা করছি। উট ও বকরীর ব্যাপারে কিছু বলব না।

নবী (সা) ইরশাদ করেন, আমার এবং বনী হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের গোত্রের অংশে যা কিছু বণ্টন করে দেয়া হয়েছে, এ সমস্ত তোমাদের। কিন্তু অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে যা কিছু বণ্টন করা হয়েছে এ সম্পর্কে তোমরা যোহর নামাযের পর দাঁড়িয়ে বলবে, আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করব। সুতরাং যোহর নামাযের পর

হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের কয়েদীদের মুক্তির জন্য মুসলমানদের নিকট আবেদন পেশ করেন। অতঃপর রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে প্রথমত আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন। এরপর বলেন, তোমাদের এই ভাই হাওয়াযিন ইসলাম গ্রহণ করে আগমন করেছে। আমি নিজের ও আমার গোত্রের অংশ তাদেরকে ফেরত দিয়েছি। অন্যান্য মুসলমানগণও তাদের কয়েদীদেরকে ফেরত দেয়াটাকে আমি যথার্থ মনে করছি। যে ব্যক্তি আগ্রহে সন্তুষ্টি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, এটা তাদের জন্য উত্তম হবে। অন্যথায় আমি তাদের বিনিময় প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছি। সবাই বললো, আমরা কল্যাণের জন্য এতে সম্মত ও সন্তুষ্ট আছি। এভাবে ৬ হাজার কয়েদী একবারে আযাদ ও মুক্ত করে দেয়া হয়।[১]

যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত কয়েদীদের মধ্যে নবী (সা) এর দুধ বোন হযরত সায়মাও ছিলেন। লোকজন তাকে যখন গ্রেফতার করে, তখন তিনি বলেন, আমি তোমাদের পয়গাম্বরের বোন, প্রমাণ হিসেবে এই বর্ণনা প্রদান করেন যে, শিশুকালে তুমি আমাকে দাঁত দিয়ে কামড় দিয়েছিলে যার চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। হুযুর (সা) তাকে চিনতে পেরে বললেন, মারহাবা এবং বসার জন্য চাদর বিছিয়ে দিলেন। আনন্দে তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে আসলো। নবী (সা) বললেন, যদি তুমি আমার নিকট থাকতে চাও তাহলে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তোমাকে রাখব। আর যদি তুমি তোমার গোত্রের মধ্যে ফিরে যেতে চাও, তাহলে তোমাকে এর জন্য সুযোগ দেয়া হলো। সায়মা বললেন, আমি আমার গোত্রের নিকট যেতে চাই। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) যাওয়ার সময় তাকে কিছু সংখ্যক উট, বকরী, তিনটি গোলাম ও একটি বাঁদী প্রদান করেন। (ইসাবা, ৪ খ. পৃ. ৩৪৪)

মক্কা বিজয়ের দিন কুরায়শদের যে সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁরা এখন পর্যন্ত বিশ্বাসের দিক দিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। অন্তরে ঈমান দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয়নি। যাদেরকে কুরআনের প্রচলিত ভাষায় مؤلفة القلوب বলা হয়েছে। গনীমতের মাল বণ্টনের সময় নবী (সা) তাদেরকে অধিক পরিমাণে মাল প্রদান করেন। কাউকে একশ', কাউকে দু'শ আর কাউকে তিনশ' উট দান করেন।

মোটকথা যা কিছু দেন কুরায়শ নেতাদেরকেই দেন কিন্তু আনসারদেরকে কিছুই দেননি। ফলে আনসার যুবকদের মধ্যে এই সমালোচনা হতে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুরায়শদেরকে মালামাল প্রদান করেছেন এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। অথচ আমাদের তলোয়ারসমূহ থেকে তাদের রক্ত ঝরছে। কেউ কেউ বলেন, বিপদ ও সংকটকালে আমাদেরকে আহ্বান করা হয় অথচ গনীমতের মাল অন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। নবী (সা)-কে যখন এ বিষয়ে অবহিত করা হয়, তখন তিনি আনসারগণকে

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ. পৃ. ২৬

একত্র করে ইরশাদ করেন, হে আনসারগণ! আমি এসব কী শ্রবণ করছি? আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কোন নেতৃত্ব স্থানীয় এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটা বলেনি। অবশ্য কোন কোন যুবক হয়ত এরূপ বলেছে।

নবী (সা) বলেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলার আমার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমরা দরিদ্র দুঃস্থ ছিলে, আল্লাহ্ পাক আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন। আনসারগণ আরয করলেন, আপনি যা বলছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য। নিঃসন্দেহে আমাদের উপর আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলের বিরাট ইহ্সান ও করুণা রয়েছে। নবী (সা) বলেন, তোমরা আমার বক্তব্যের এ জবাব প্রদান করতে পার যে, হে মুহাম্মদ (সা)! যখন আপনাকে লোকজন মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তখন আমরা আপনার সত্যতার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যখন আপনার কোন সাহায্যকারী ছিল না তখন আমরা আপনার সাহায্য করেছি। যখন আপনি উপায়হীন ও ঠিকানাবিহীন ছিলেন, তখন আমরা ঠিকানা দিয়েছি। যখন আপনি দরিদ্র ছিলেন, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদান করেছি। হে আনসারগণ! তোমাদের অন্তর কি এজন্য অসন্তুষ্ট হয়েছে, যে দুনিয়ার এমন কিছু সম্পদ ও আসবাবপত্র-যার হাকীকত দুনিয়ার দৃষ্টিতে মরীচিকার চেয়ে অধিক নয়, তা আমি কিছু লোকের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে দিয়েছি এবং তোমাদের ঈমান ও ইয়াকীনের উপর ভরসা করে তোমাদেরকে বাদ দিয়েছি। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী (সা) ইরশাদ করেন, কুরায়শদের উপর হত্যা ও গ্রেফতারীর বিপদ আপতিত হয়েছে। মুসলমানদের বিপরীতে তাদের জান ও মালের বিভিন্নমুখী ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ফলে তাদের এই ক্ষতিপূরণ এবং তাদের অন্তরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার আমি ইচ্ছা পোষণ করছি। এছাড়া বিভিন্ন যুদ্ধে তাদের ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছে। এভাবে তাদের নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ সমস্ত থেকে নিরাপদ রেখেছেন। সুতরাং তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্য গনীমতের মাল প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। তোমরা ঈমানদার ও বিশ্বাসী, ঈমান ও ইয়াকীনের তুলনাহীন এবং চিরস্থায়ী সম্পদের দ্বারা বিভূষিত। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকজন উট ও বকরী নিয়ে ঘরে ফিরবে এবং তোমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরবে? শপথ ঐ পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি হিজরত নির্ধারিত বিষয় না হত, তাহলে আমিও আনসারদের অন্তর্ভূক্ত হতাম। যদি মানুষ এক ঘাঁটির দিকে চলে এবং আনসার অন্য ঘাঁটির দিকে, তা হলে আমি আনসারদের ঘাঁটি গ্রহণ করব। হে আল্লাহ্! তুমি আনসার, তাদের সন্তান এবং সন্তানদের সন্তানের উপর রহম ও অনুগ্রহ কর।

একদিকে নবী (সা) বলে যাচ্ছেন অপরদিকে জীবন উৎসর্গীকৃত আনসারগণ ক্রন্দন করতে করতে তাঁদের দাঁড়ি ভিজে উঠে এবং তাঁরা বলে উঠেন, আমরা অন্তর দিয়ে এই বণ্টনের উপর সন্তুষ্ট আছি যে,আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বণ্টনে আমাদের অংশে এসেছেন। এর পর সভার সমাপ্তি হয়ে যায়। (তারীখে[১] ইবনুল আসীর, ২ খ. পৃ. ১৩১)

উমরায়ে জি'রানা

নবী (সা) ৮ যিলকা'দ রাতে জি'রানা থেকে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে ইতাব ইবন উসায়দকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং হযরত মু'আয ইবন জাবালকে দীনের তালীম প্রদানের জন্য মু'আল্লিম নিয়োগ করেন। দু'মাস ষোল দিন পর ২৭ যিলকা'দ সাহাবাগণকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন।[২]

মুত'আ বিয়ে হারাম হওয়া

নবী (সা) যখন আওতাস থেকে উমরা করার জন্য মক্কা আগমন করেন, তখন তিনি কা'বা ঘরে দাঁড়িয়ে কা'বার উভয় দরজা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ইরশাদ করেন, "কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ীভাবে মুত'আ হারাম করা হয়েছে।" যেহেতু এই ঘোষণা রাতে হয়েছিল এবং শ্রোতার সংখ্যা ছিল কম, ফলে সবাই এ সংবাদ অবগত হতে পারেনি, তাই কেউ কেউ বেখবর হওয়ার কারণে মুত'আ বিয়েতে জড়িয়ে পড়ে। এ জন্য নবী (সা) তবুক অভিযানকালে পুনরায় মুত'আ হারাম হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন। অতঃপর হযরত উমর (রা)-খিলাফতের সময় কোন কোন লোক অজ্ঞতার কারণে মুত'আ বিয়েতে জড়িয়ে পড়ে। এ সংবাদ অবগত হওয়ায় খলীফা মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, নবী করীম (সা) মুত'আ হারাম করেছেন। নবী (সা)-এর কোথাও কোথাও (অজ্ঞতার কারণে মুত'আ হয়েছে) কিন্তু তিনি এ জন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করেন নি। অবশেষে মুত'আ হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই আমার এই ঘোষণার পর যে মুত'আ করবে, আমি তার উপর যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করব। হযরত উমরের (রা) এই অকাট্য ঘোষণার পর মুত'আ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

বিভিন্ন ঘটনাবলী

১. এ বছর (৮ম হিজরী) ইতাব ইবন উসায়দ (রা) আরবের নিয়মানুযায়ী সমস্ত মুসলমানকে হজ্জ করিয়েছেন।

২. এ বছরই যিলহাজ্জ মাসে হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) জন্ম গ্রহণ করেন।

---

১. নবী (সা)-এর মূল বক্তব্যের অধিকাংশ ফাতহুল বারী, ৮ খ. পৃ. ৪০ এবং যারকানী, ৩ খ. পৃ. ৩৮ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারতীব অনুযায়ী তারীখে ইবনুল আসীরে উল্লেখ রয়েছে।

২ যারকানী, ৩ খ, পৃ. ৪১।

৩. এ বছরই নবী (সা) হযরত আমর ইবনুল আ'সকে (রা) সাদাকা আদায় করার জন্য আমিল হিসেবে আম্মান প্রেরণ করেন।

৪. এ বছর নবী (সা) কা'ব ইবন উমায়রকে সিরিয়ার অন্তর্গত 'যাতে ইত্তিলা' নামক এলাকায় ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। পনের ব্যক্তি তাঁদের সাথে ছিল। সেখানের লোকজন সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করে। মাত্র একজন প্রাণে রক্ষা পেয়ে মদীনা ফিরে আসেন। (তারীখে ইবনুল আসীর, পৃ. ১৩২)

প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী

আরবের গোত্রসমূহ মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। তারা এই ধারণা পোষণ করত যে, যদি হযরত মুহাম্মদ (সা) মক্কাবাসীর উপর বিজয় লাভ করেন, তাহলে তিনি হবেন সত্য পয়গাম্বর। সুতরাং মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا -

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।"

(সূরা নাসর ঃ ১-৩)

কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, চৌকশ ও দক্ষ তীরন্দাজ হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্রের লোকদের অন্তর আপাতত থামিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে সমস্ত আসবাবপত্র এমন কি নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, উট-বকরী, গবাদিপশু সহ সর্ব প্রকার মাল আল্লাহ্ তা'আলার বাহিনীর জন্য গনীমতের মাল হিসেবে এক স্থানে জমা হয় এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মযবূত দ্বীনের প্রকাশ্য বিজয়ের এক বিস্ময়কর দৃশ্য দুনিয়াকে প্রত্যক্ষ করাতে পারেন।

বদর যুদ্ধ থেকে আরবের যুদ্ধসমূহের সূচনা হয় যা তাদেরকে ভড়কে দিয়েছিল এবং হুনায়নের যুদ্ধ দ্বারা এর সমাপ্তি হয়েছে যার দ্বারা আরবদের শক্তি-সামর্থ্য ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে আরব উপদ্বীপে কারো এই ক্ষমতা থাকেনি যে, সত্যের মুকাবিলায় মাথা উঁচু করতে পারে। কিন্তু কোন কোন মুসলমানের মুখ থেকে যেহেতু এই বাক্য বের হয়েছে। لَنْ نَغْلِبَ الْيَوْمَ عَنْ قِلَّةٍ (আজ আমরা বাহিনীর স্বল্পতার জন্য পরাজিত হব না)। এটা আল্লাহ তা'আলার দরবারে পসন্দনীয় হয়নি। সুতরাং প্রথম আক্রমণে মুসলমানদের পরাজয় বরণ করতে হয়। যাতে এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে বিজয় ও সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। স্বল্পতা বা আধিক্যের উপর নির্ভর করে না। যাকে আল্লাহ সাহায্য করেন, তার উপর কেউ জয়ী হতে পারে

না। যার সাহায্য থেকে তিনি বিরত থাকেন, তার কোন সাহায্যকারী নেই এবং যাতে লোকজন এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ও দ্বীনের সাহায্যকারী। তোমাদের আধিক্যের উপর এটা নির্ভর করে না। তোমরা তো সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও পলায়ন করেছ। সুতরাং যখন তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছ যে, তোমাদের আধিক্য ও তোমাদের শক্তি দ্বারা কোন ফল হবে না, শুধু আল্লাহ পাকের শক্তিই তোমাদের জন্য কার্যকর ও ফলদায়ক হতে পারে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর এই সাহায্য প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْكَافِرِيْنَ ـ

"অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর সান্ত্বনা নাযিল করেন এবং অবতীর্ণ করেন এমন বাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদেরকে। এটা হলো কাফিরদের কর্মফল।" (সূরা তাওবা ঃ ২৬)

আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও নীতি হলো এই যে, বিজয় ও সাহায্য বিনয়ী ও অনুগতদেরকে দান করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ - وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ.

"আমার ইচ্ছা হলো যাদেরকে দেশে দুর্বল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করব, তাদেরকে নেতা বানাব, তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করব, তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করব এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেব যা তারা সেই দুর্বল দলের পক্ষ থেকে আশংকা করত।" (সূরা কাসাস ঃ ৫-৬)

বস্তুত বদর যুদ্ধে বিজয় এবং ওহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের এটাই ছিল রহস্য। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন ঃ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদরের দিন তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা তখন দুর্বল ও অস্ত্রশস্ত্রহীন অবস্থায় ছিলো।"

গাযওয়ায়ে ওহুদ বা ওহদ যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে গাযওয়ায়ে বদরের (বদর যুদ্ধের) পরিসমাপ্তি ছিল। যেমন ঘটনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গাযওয়ায়ে বদর ও গাযওয়ায়ে ওহুদ মিলে একটিই গাযওয়া ছিল। এই দু'টি আরব গোত্রের সাথে প্রথম গাযওয়া ছিল এবং গাযওয়ায়ে হুনায়ন সর্বশেষ গাযওয়া ছিল। ফলে প্রথম গাযওয়ায়ে

বদরে প্রথমত বিজয় এবং পরিসমাপ্তিতে (ওহুদে) পরাজয় হয়। পক্ষান্তরে গাযওয়ায়ে হুনায়নে প্রারম্ভে পরাজয় এবং পরে বিজয় হয় যাতে আরবের প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে বিজয় হয়। যেভাবে গাযওয়ায়ে বদরে মুসলিম বাহিনীর সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়, তেমনিভাবে গাযওয়ায়ে হুনায়নেও ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়েছিল।

মালে গনীমত থেকে অধিকাংশ নবী (সা) ঐ সমস্ত লোককে প্রদান করেছেন যাদের অন্তরে ঈমান এখনো দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয়নি। যাতে দান ও মহানুভবতা দ্বারা রাসূল (সা)-এর মহব্বত তাদের অন্তরে দৃঢ় হয়ে যায়। কেননা দাতার প্রতি মহব্বত হলো স্বাভাবিক, একজন কবি বলেছেন ঃ

وَاحسن وجه فى الورى وجه محسن * وَايْمَن كف فيهم كف منعم

"এবং যখন নবী (সা)-এর মহব্বত অন্তরের মধ্যে দৃঢ় হয়ে যাবে, তখন ঐ অন্তর থেকে দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার মহব্বত আপনা থেকেই দূরীভূত হয়ে যাবে।"

একই অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহব্বত এবং দুনিয়ার মহব্বত উভয় একত্র হয়ে যাওয়া। مَاجَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهِ (আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের সিনার মধ্যে দু'টি অন্তর তৈরি করেন নি)

আনসারদের অভিযোগ মালের প্রতি মহব্বতের কারণে ছিল না। যাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষী প্রদান করছেন যে, আমি তোমাদের ঈমান ও ইয়াকীনের উপর ভরসা করে তোমাদেরকে (মালে গনীমতের) অংশ দেইনি। তাদের এই পবিত্র অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকবে কিভাবে, বরং আনসারগণ এই বাহ্যিক দান ও বন্টনকে সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক এবং দলীল মনে করেছেন। ফলে মর্যাদাবোধের চাহিদার পেক্ষাপটে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এ অবস্থায় নবী (সা) আমাদের মত জীবন উৎসর্গকারীদের সম্মান বৃদ্ধি করার বিষয়টি কেন উপেক্ষা করলেন?

باسایه ترانمی پسندم * عشقست وهزاربد گمانی

"আপনার করুণার দৃষ্টি আমাদেরকে অপসন্দ করছে? প্রেমের ও ভালবাসার ক্ষেত্রে অসংখ্য ভ্রান্ত ধারণা হয়ে থাকে।"

অথচ এই উপেক্ষা ছিল ঐ দানের চেয়ে লাখো-কোটি গুণ উত্তম। উত্তম উপেক্ষা ছিল আনসারগণের ঈমান ও ইখ্‌লাসের সনদ এবং ঐ দান নতুন মুসলমানদের দোদুল্যমান হওয়ার দলীল। যাদের ঈমান ও ইয়াকীনের উপর প্রশান্তি ও বিশ্বাস ছিল শুধু তাঁদেরকেই গনীমত প্রদান করা হয়নি। (ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৩৯)

গভর্নর ও শাসক নিয়োগ

মক্কা বিজয়ের পর প্রায় সমস্ত আরব উপদ্বীপ ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং সর্বত্র ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন জরুরী হয়ে পড়ে। তাই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক শাসক নিযুক্ত করেন। বাযান ইবন সাসানকে ইয়ামনের শাসক নিযুক্ত করেন। বাযান কিস্রার পক্ষ থেকে ইয়ামনের শাসক ছিলেন। কিসরার নিহত হওয়ার পর বাযান ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে রাসূল (সা) বাযানকে পূর্বের ন্যায় ইয়ামনের শাসক হিসেবে নিয়োজিত রাখেন এবং যতদিন পর্যন্ত বাযান জীবিত ছিলো ততদিন পর্যন্ত তাকে একই পদে বহাল রাখেন। বাযানের ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র শাহর ইবন বাযানকে সান'আর শাসক নিযুক্ত করেন। শাহরের মৃত্যুর পর খালিদ ইবন সাঈদ ইবনুল আ'স উমূভী সান'আর শাসক নিযুক্ত হন। এছাড়া যিয়াদ ইবন লবীদ আনসারী মূতার, আবূ মূসা আশ'আরীকে যবীদ ও আদনের, মু'আয ইবন জাবালকে ইয়ামনের শহর জুনুদের, আবূ সুফিয়ান ইবন হারবকে নজরানের, তার পুত্র ইয়াযীদ ইবন আবূ সুফিয়ানকে ইয়াতামামীর, ইতাব ইবন উসায়দকে মক্কার শাসক এবং হযরত আলী (র)-কে ইয়ামনের কাযী (বিচারক) নিযুক্ত করেন।[১]

হিজরী ৯

৯ হিজরীর প্রারম্ভে নবী (সা) বেশ কিছু সংখ্যক কর্মচারীকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যাকাত ও সাদাকা আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন।

আদায়কারীর নাম	যে গোত্রের নিকট প্রেরণ করা হয়
উয়ায়না ইবন হাসান ফাযারী (রা)	বনী তামীম
বুরায়দা ইবনুল হাসীব (রা)	আসলাম ও আক্কার
ইবাদ ইবন বিশর আশহালী (রা)	সালীম ও মুযায়না
রাফি' ইবন মাকীস (রা)	জুহায়না
আম্র ইবনুল আ'স (রা)	বনী ফাযারাহ
দিহাক ইবন সুফিয়ান কিলাবী (রা)	বনী কিলাব
বিসর ইবন সুফিয়ান কা'বী (রা)	বনী কা'ব
ইবনুল লুতাবীয়া আযদী (রা)	বনী যুবইয়ান[২]
আলা' ইবনুল হাযরামী (রা)	বাহরাইন
হযরত আলী মুরতাযা (রা)	নাজরান

১. যাদুল মা'আদ, ১ খ. পৃ. ৩১

২. তাবাকাত ইবন সা'দ, খ, পৃ. ১১৫।

আদী ইবন হাতিম (রা)	তায় ও বনী আসাদ
মালিক ইবন নুওয়ায়রাহ (রা)	বনী হানযালা[১]

সারীয়া উয়াইনা ইবন হাসান ফাযারীকে বনী তামীম গোত্রের নিকট প্রেরণ

মুহাররম ৯ হিজরী। নবী (সা) বিশর ইবন সুফিয়ান আদাবীকে সাদাকা আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন। লোকজন যাকাত প্রদানের জন্য তৈরি হয়ে যায় কিন্তু বনী তামীম এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং বলে, আল্লাহর শপথ! এখান থেকে একটি উটও যাকাত হিসেবে প্রেরণ করা হবে না এবং তলোয়ার উত্তোলন করে তারা লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে যায়। বশর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ফিরে আসেন। নবী (সা) উয়াইনা ইবন হাসান ফাযারীকে পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর এক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে বনূ তামীমের আবাসস্থল সাকীয়া নামক স্থানে প্রেরণ করেন। এ স্থানটি ছিল জুহফা থেকে সতের মাইল দূরে অবস্থিত। রাতে পৌঁছেই তাদের উপর আক্রমণ চালান এবং এগারজন পুরুষ, একুশজন নারী ও ত্রিশজন শিশু গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে আসেন। বনী তামীম বাধ্য হয়ে দশজনের একটি দল নবী (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে আতার ইবন হাজিব, যিবর কান, কায়স ইবন আসিম ও আকরা' ইবন হাবিস অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। মদীনা পৌছার পর তারা নবী (সা)-এর পবিত্র হুজরার পিছনে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলে, হে মুহাম্মদ (সা) বাইরে এসো, আমরা তোমার সাথে আত্মগৌরব ও কাব্যের মাধ্যমে মুকাবিলা করব। আমাদের প্রশংসা সৌন্দর্যময় এবং তিরস্কার ও অপবাদ হলো কলংকময়। নবী (সা) বললেন, এই শান ও মর্যাদা তো আল্লাহর। আমি কবিও নই এবং আমাকে অহংকার করার নির্দেশও দেয়া হয়নি। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُ لاَيَعْقِلُوْنَ وَ لَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًالَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"নিশ্চয়ই যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচু স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। যদি তারা আপনার তাদের কাছে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করত, তাহলে এটা তাদের জন্যই কল্যাণকর হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৪-৫)

সমীক্ষা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) উলূমুল কুরআন শিক্ষা লাভের জন্য প্রখ্যাত কিরা'আত বিশারদ হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর বাড়ি গমন করতেন কিন্তু আদব রক্ষার্থে কখনো দরজায় খটখট করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বাইরে না আসতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অপেক্ষায় বসে থাকতেন। একবার হযরত উবাই ইবন

১. যাদুল মা'আদ, ২ খ, পৃ. ২০১।

কা'ব (রা) বললেন, তুমি দরজার মধ্যে খটখট করবে। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) বললেন ঃ

العالم فى قومه كَالنَّبِىْ فِى اُمَّةٍ وَ قَدْ قَالَ اللّٰه تعالى فى حق نبيِّه عَلَيْهِ الصَّلٰوة وَالسَّلَامُ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ -

একজন আলিম তার কাওমের মধ্যে এরূপ যেমন নবী তার উম্মাতের মধ্যে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর শানে ইরশাদ করেন, নবী করীম (সা) তাদের নিকট বাইরে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত তাহলে এটা তাদের জন্য উত্তম হত। আবূ উবায়দ বলেন, আমি কোন আলিমের দরজা কখনো খটখট করিনি, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজে তার সময় মত বাইরে না এসেছেন। আল্লামা আলূসী (র) বলেন, যখন থেকে আমি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, তখন থেকে উস্তাদবৃন্দ ও মাশায়েখ দলের সাথে আমার এই ব্যবহার অব্যাহত ছিল।[১]

অতঃপর নবী (সা) বাইরে আগমন করেন এবং যোহরের নামায আদায় করেন। জামা'আত থেকে অবসর হয়ে মসজিদের চত্ত্বরে উপবেশন করেন। প্রতিনিধি দল আরয করলো, আমরা গৌরব ও প্রশংসা প্রকাশের জন্য এসেছি। আপনি আমাদের কবি ও বক্তাদের কিছু বলার অনুমতি দিন। রাসূল (সা) বললেন, অনুমতি দেয়া হলো।

আতারিদ ইবন হাজিব তামীমির খুতবা

বনী তামীম গোত্রের বাগ্মী আতারিদ ইবন হাজিব নিম্নে বর্ণিত খুতবা প্রদান করেন ঃ

ألحمد للّه الذى له عَلَيْنَا الْفَضْلِ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلْنَا ملوكًا وَهَب لنا أموالا عظاما نفعل فيها لمعروف وجعلنا أعز أهل المشرق واكثر عددا وعدة فمن مثلنا فى الناس ـ السنا برؤس الناس وأفضلهم فمن فاخرنا فليعبدد مثل ماعددنا وانا لوشئنا لاكثرنا الكلام ولكنا نستحى من الاكثار وانا نعرف بذالك أقول هذا لان تاتوا بمثل قولنا وامر أفضل من أمرنا ـ

"সমস্ত প্রশংসা ঐ পবিত্র সত্তার জন্য যিনি আমাদেরকে ফযীলত দান করেছেন, বাদশাহ বানিয়েছেন, ধন-সম্পদ দান করেছেন, যা আমরা উত্তম কাজে ব্যয় করে থাকি, প্রাচ্যের লোকদের মধ্যে আমাদেরকে সর্বাধিক সম্মানিত, সবচেয়ে অধিক সংখ্যক এবং সবচেয়ে শক্তিশালী বানিয়েছেন। সুতরাং মানুষের মধ্যে আমাদের মত কে আছে? আমাদের নেতৃবৃন্দ কি তাদের চেয়ে উত্তম নয়? সুতরাং যারা আমাদের সাথে গৌরব

---

১. রূহুল মা'আনী, ২৬ খ. পৃ. ১৩১

প্রকাশে প্রতিযোগিতা করতে ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের উচিত হবে আমাদের মত গৌরবের বিষয় উপস্থাপন করা। যদি আমার ইচ্ছা করতাম তাহলে আমাদের গৌরব ও প্রশংসার উপর দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করতে সক্ষম ছিলাম। কিন্তু এতে আমাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে। আমি এটা এজন্যই উল্লেখ করছি যে, যদি কেউ এর মত বা এর চেয়ে উত্তম কিছু উপস্থাপন করতে পারে তবে করুক।"

আতারিদ ভাষণ সমাপ্ত করে বসে পড়ে। নবী (সা) সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস আনসারীকে জবাব দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত সাবিত ইবন কায়স (রা) সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে এ ভাষণ পেশ করেন ঃ

সাবিত ইবন কায়স (রা)-এর খুতবা

ألحمد لله الذى السموات والارض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيئ قط الامن فضله ثم كان من قدرته ان جعلنا ملوكا واصطفى خير خلقه رسولا أكرمة نسبا وأصدقه حديثا وافضله حسبا وأنزل عليه كتابا وأئتمنه على خلقه فكانَ خيرة اللّهِ فى العالمين ثم دعا الناس الى الايمان به فامن برسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قومه وذوى رحمه أكرم الناس احسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا ثم كنا أول الخلق اجابة واستجابة الله حين دعا رسول الله فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله فمن امن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه فى للّه ابداً وكان قتله علينا يسيرا أقول قولى هذا واستغفر الله و للمُؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم -

"সমস্ত প্রশংসা ঐ পবিত্র সত্তার জন্য, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় বিধান এতে জারী করেছেন। বিশ্বজগতের সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর ফসল ও করুণার দ্বারা সব কিছু হচ্ছে। অতঃপর তাঁর কুদরত ও ক্ষমতা আমাদেরকে বাদশাহ্ বানিয়েছে এবং উত্তম সৃষ্টিকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বংশ মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ, কথাবার্তায়ও সবচেয়ে সত্যবাদী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টির জন্য আমীন বানিয়েছেন। বিশ্বজগতের মধ্যে তিনি আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। অতঃপর তিনি মানুষকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য আহবান করেন, ফলে রাসূলুল্লাহ

(সা)-গোত্রের মুহাজিরগণ, তাঁর আত্মীয় স্বজন ঈমান আনয়ন করেন। তাঁরা বংশ মর্যাদায় সবচেয়ে মর্যাদাবান এবং কাজকর্ম ও আমলের দিক দিয়েও সর্বোত্তম। অতঃপর আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র পথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছি। মুহাজিরদের পর আমরা আনসারগণ হলাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাওয়াত কবূল করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী। আমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারী এবং রাসূলুল্লাহ্‌র ওযীর। আমরা লোকজনের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত জিহাদ করে থাকি যতক্ষণ না তারা ঈমান আনয়ন করে। যারা ঈমান আনয়ন করে, তারা তাদের জীবন ও মাল-দৌলত নিরাপদ করে নেয় এবং যারা কুফরী করে, তাদের সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহাদ করা ও তাদেরকে হত্যা করা আমাদের জন্য সহজ। এটা আমার বক্তব্য। আমি আমার জন্য এবং সমস্ত মু'মিন নর-নারীর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করছি। আল্লাহ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।"

এরপর যবরকান ইবন বদর তাদের গৌরবময় কীর্তি সম্পর্কে প্রশংসাসূচক এক কবিতা আবৃত্তি করে। নবী (সা) হাসসান ইবন সাবিত (রা)-কে এর জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) এর জবাবে তাৎক্ষণিকভাবে এক কবিতা আবৃত্তি করেন। আকার ইবন হাবিস বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনার খতীব আমাদের খতীব থেকে এবং আপনার কবি আমাদের কবি থেকে বড় ও মর্যাদাবান এবং সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। নবী (সা) তাদেরকে উপহার প্রদান করেন এবং তাদের সব কয়েদীকে ফেরত দান করেন।[১]

বনী মুসতালিকের নিকট ওয়ালীদ ইবন উকবা ইবন আবূ মুয়াইতকে প্রেরণ

নবী (সা) ওয়ালীদ ইবন উকবাকে সাদাকা আদায় করার জন্য বনী মুসতালিকের নিকট প্রেরণ করেন। তারা এ সংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সৈন্যদের মত শান-শওকতের সাথে ওয়ালীদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য গমন করে। আইয়্যামে জাহিলিয়াত থেকে ওয়ালীদের গোত্র ও বনী মুসতালিকের মধ্যে শত্রুতা চলে আসছিল। দূর থেকে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ওয়ালীদ এই ধারণা করে যে, পূর্ব শত্রুতার কারণে এ সমস্ত লোক মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসছে। ফলে ওয়ালীদ রাস্তা থেকে ফিরে যায় এবং নবী (সা)-এর দরবারে এসে বর্ণনা করে যে, তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। তারা যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছে। নবী (সা) এ সংবাদ শুনে অবাক হয়ে গেলেন। রাসূল (সা) বিষয়টি নিয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন। এ সংবাদ বনী মুসতালিকের নিকট পৌছে। তারা সাথে সাথে একটি প্রতিনিধি রাসূল (সা) দরবারে প্রেরণ করেন। তারা নবী করীমের (সা) দরবারে এসে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

---

১. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ৪২-৪৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجِهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ ـ

" হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৬)

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ আয়াতে "فسق" শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া, তা যত ক্ষুদ্র হোক না কেন। আয়াতে প্রচলিত বা শরঈ অর্থ গ্রহণ করা হয়নি। গুনাহ্ কবীরার ইচ্ছা পোষণ করা এবং এতে জড়িয়ে পড়াকে শরী'আতের দৃষ্টিকোণে "فسق" বলা হয়। ওয়ালীদ ইবন উকবা (রা) নবী (সা)-এর নিকট যা কিছু বর্ণনা করেছে, তার মূল ছিল ভুল বুঝা বা ভুল মনে করা। তাই আয়াতে ফিস্ক (فسق) দ্বারা আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঘটনা যেহেতু বাস্তবতার পরিপন্থি ছিল ফলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ফাসিক বলা হয়েছে। এ অর্থে কোন সাহাবীকে ফাসিক বলাতে শরী'আতের দৃষ্টিতে ফাসিক হওয়া জরুরী নয়। (যারকানী, ৩ খ, পৃ. ৪৬)।

হাদীসে বর্ণিত আছে, ঈমানের ৭৭টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর সবচেয়ে নিম্নতম হলো রাস্তা থেকে কাঁটা বা কোন কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। এর মধ্যবর্তী হলো অন্যান্য শাখা এবং প্রত্যেক শাখার উপর ঈমান শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এমনিভাবে কুরআন ও হাদীসে فسق এবং معصيت ও ظلم শব্দের প্রয়োগ কুফর থেকে সগীরা গুনাহ পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেভাবে ঈমানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, তেমনি কুফর ও নাফরমানীরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। হযরত আদম (আ)-এর ভুলের উপরও معصيت এর প্রয়োগ হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ وعصى ادم ربه فغوى (আদম তার প্রতিপালকের নাফরমানী করলো) কুফরের উপরও معصيت প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا (যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, তার শাস্তি হবে দোযখের আগুন, সে অনন্তকালের জন্য সেখানে থাকবে)। প্রকাশ থাকে যে, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। শব্দ একটি হলেও অর্থ ভিন্ন রয়েছে।

এমনিভাবে বর্ণিত আয়াতে যে فاسق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এটা অভিধানিক অর্থে প্রয়োগ করতে হবে, শরঈ অর্থে প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা সাহাবায়ে কিরাম (রা)

হলেন সবচেয়ে ন্যায়বান ও নির্ভরযোগ্য। আল্লাহপাক বলেছেন ঃ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ (আল্লাহ পাক তাঁদের উপর সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহ উপর সন্তুষ্ট)। যদি শরী'আতের দৃষ্টিতে তাঁরা ফাসিক হতেন (معاذ الله) তাহলে আল্লাহ তাদের উপর রাযী ও সন্তুষ্ট হতেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসিক কাওমের উপর রাযী ও সন্তুষ্ট নন।"

সারীয়া আবদুল্লাহ ইবন আওসাজা (রা)

৯ হিজরীর সফর মাসে নবী (সা) আবদুল্লাহ ইবন আওসাজাকে (র) বনী আম্‌র ইবন হারিসাকে ইসলামে দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে এবং প্রেরিত পত্র ডোলের তলে বেধে রাখে। আবদুল্লাহ ইবন আওসাজা (রা) ফিরে এসে যখন এ ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন রাসূল (সা) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের জ্ঞান ও বিবেক কি শেষ হয়ে গিয়েছে? তখন থেকে অদ্যাবধি ঐ গোত্রের লোকজন আহম্মক, অজ্ঞ ও জাহিল রয়েছে।

সারীয়া কুতবা ইবন আমির (রা)

৯ হিজরীর সফর মাসে রাসূল (সা) বিশজনের একটি দল কুতবা (রা) ইবন আমিরের নেতৃত্বে খাশ'আম গোত্রের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। কুতবা (রা) ইবন আমির সেখানে গমন করে তাদের মুকাবিলা করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেন। অতঃপর গনীমতের মাল কিছু উট, বকরী এবং কয়েদী নিয়ে ফিরে আসেন। এতে এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর প্রত্যেকেই চারটি করে উট পেয়েছিল। একটি উট দশটি বকরীর বিনিময় হিসেবে ধরা হয়েছিল।[১]

দাহহাক ইবন সুফিয়ান (রা)-এর সারিয়া

রবিউল আউয়াল মাসে নবী (সা) বনী কিলাবকে ইসলামের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে দাহহাক ইবন সুফিয়ান কিলাবী (রা)-কে প্রেরণ করেন। তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তাঁকে এবং ইসলামকে গালাগাল দেয়। উপরন্তু তাঁদের উপর আক্রমণে উদ্ধত হয়। অবশেষে তাদের সাথে যুদ্ধ হয়। তারা পরাজিত হয়। দিহাক (রা) বিজয়ী বেশে প্রফুল্ল চিত্তে গনীমত সহ মদীনা শরীফে ফিরে আসেন।[২]

সারীয়া আলক়ামা ইবন মুজায্‌যায মুদলাজীকে হাবসার দিকে প্রেরণ

নবী (সা)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌছে যে, কিছু হাবশী লোক জেদ্দা আগমন করেছে, তখন তিনি আলকামা ইবন মুজাযয্যায মুদলাজীকে তিনশ' আরোহীর সাথে

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২ খ, পৃ.১১৭।

২. প্রাগুক্ত।

তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য প্রেরণ করেন। তারা সংবাদ পেয়ে পলায়ন করে দ্বীপের মধ্যে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী যখন সেখান থেকে ফিরে আসেন তখন সৈন্যবাহিনীর কিছু লোক জলদী করে এবং সবার আগে বাড়ি পৌঁছার ইচ্ছা করে। আলকামা অগ্নি প্রজ্বলিত করে তাদের নির্দেশ প্রদান করেন যে, এই অগ্নির উপর লাফ দিয়ে যাও। কিছু লোক প্রস্তুত হয়ে যায়। আলকামা বলেন, থামো! আমি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করেছি। এই সমস্ত লোক মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, কেউ যদি তোমাদেরকে নাফরমানীর নির্দেশ প্রদান করে, তাহলে তার নির্দেশ পালন করবে না। সহীহ বুখারী, মুসনাদে আহমদ এবং সুনানে ইবন মাজার রিওয়ায়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই সারীয়ার আমীর ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা সাহ্মী এবং অগ্নিতে ঝাঁপ বা লম্প দেয়ার নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন। এই পার্থক্যের কারণে ইমাম বুখারী (র) এই সারীয়ার বর্ণনায় অধ্যায়ের নাম রেখেছেন ঃ

باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزز المدلجى ويقال انها سرية الانصارى -

(ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৪৬; যারকানী, ৩ খ, পৃ. ৪৯)।

সারীয়া আলী ইবন আবূ তালিবকে মূর্তি পূজারী তায় গোত্রের নিকট প্রেরণ হাতিম তাঈ এর পুত্র ও কন্যার ইসলাম গ্রহণ

৯ হিজরীর রবিউস সানী মাসে নবী (সা) হযরত আলীকে (রা)-কে ১৫০/২০০ শ' লোকের এক বাহিনী নিয়ে তায় গোত্রের ফুলস[১] মন্দির ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সেখানে পৌঁছার পর তারা তায় গোত্রের উপর আক্রমণ করে। কিছু লোক গ্রেফতার হয় এবং কিছু গবাদিপশু হস্তগত হয়। মন্দির ধ্বংস করে এবং দু'টি তলোয়ার মন্দির থেকে পাওয়া যায়। হারিস ইবন শিমার এগুলো সেখানে রেখেছিল। কয়েদীদের মধ্যে বিখ্যাত দানশীল হাতিম তাঈ-এর কন্যা সাফ্ফানা (سفّانه) ছিল এবং তার পুত্র আদী ইবন হাতিম মুসলিম বাহিনীর সংবাদ পেয়েই সিরিয়ায় পলায়ন করে। সেখানে একই ধর্মের অনুসারী অসংখ্য খ্রিস্টান বাস করত। কয়েদীদের গ্রেফতার করে মদীনায় নেয়ার পর মসজিদের নিকট তাদেরকে জমা করা হয়। নবী (সা) এদিক দিয়ে গমন করার সময় হাতিম-এর কন্যা দাঁড়িয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যিনি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, তিনি পলায়ন করেছেন। আপনি আমাদের উপর ইহসান (মহানুভবতা প্ররিদর্শন) করুন, আল্লাহ আপনার উপর ইহসান করবেন। নবী (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ ব্যক্তি কে? সাফ্ফানা বললো, আমার ভাই আদী ইবন হাতীম। নবী (সা) বললেন, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ এবং রাসূল থেকে

১. فُلْسٌ (ف এর উপর পেশ এবং ل সাকিন)

পলায়ন করেছে? আমি তোমার উপর ইহসান করব কিন্তু তুমি যাওয়ার ব্যাপারে জলদি করবে না। আমার অভিপ্রায় হলো, তোমার গোত্রের এমন কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যদি পাওয়া যায়, তাহলে তার সাথে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। বস্তুত দু'তিন দিন পর তায় গোত্রের কিছু লোক সিরিয়া গমনেচ্ছু পাওয়া যায়, নবী (সা) দয়া ও সহানুভূতির কারণে সাওয়ারী এবং কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে তাকে বিদায় করেন। সাফফানা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত বাক্যের দ্বারা নবী (সা)-এর শুকরিয়া আদায় করেন ঃ

شكرتك يدا فتقرت بعد غنى ولاملكتك يد استغنت بعد فقروا اصاب الله بمعروفك مواضعه ولاجعل لك الى لئيم حاجة ولاسلب نعمة عن كريم الاوجعلك سببا لردها عليه ـ

সাফ্‌ফানা নবী (সা) থেকে বিদায় নিয়ে সিরিয়ায় পৌঁছে তার ভাই-এর সাথে মিলিত হন এবং তাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। আদী তার বোনকে জিজ্ঞাসা করে, এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি? সাফ্‌ফানা জবাবে বলেন ঃ

ارى والله ان تلحق به سريعًا فان يك نبيا فللسابق اليه فضيلة وان يك ملكافلن تزال فى عز وانت انت ـ

"আল্লাহর শপথ! আমি এটা যথাযথ মনে করি যে, তুমি খুব দ্রুত নবী (সা)-এর সাথে মিলিত হও। যদি তিনি নবী হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর নিকট দ্রুত গমন করা ফযীলতের কারণ। যদি তিনি বাদশাহ হন, তাহলে সর্ব সময়ের জন্য মর্যাদার বিষয় হবে। আর তুমি তো তুমিই।"

আদী এটা শুনে বলেন ঃ والله ان هذا هو الراى "আল্লাহ শপথ! উত্তম মতামত তো এটাই।"

অতঃপর নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। (যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৫০; আল-আসাবা)

কা'ব ইবন যুহায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

কা'ব ইবন যুহায়র নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করে কবিতা আবৃত্তি করত। মক্কা বিজয়ের দিন কা'ব ইবন যুহায়র এবং তার ভাই বুজায়র ইবন যুহায়র প্রাণ নিয়ে মক্কা থেকে পলায়ন করে আবরাকুল গারাফ নামক স্থানে গিয়ে থামে। বুযায়র কা'বকে বলে, তুমি এখানে অবস্থান কর। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁর কথাবার্তা শ্রবণ করব, তাঁর দ্বীন সম্পর্কে অবগত হব। যদি তাঁর সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি, তাহলে তাঁর অনুসরণ করব, অন্যথায় তা পরিত্যাগ করব। কা'ব সেখানেই অবস্থান করে। বুজায়র রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁর কথাবার্তা শ্রবণ করা মাত্রই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

১. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ৫৩

নবী (সা) যখন তায়েফ থেকে মদীনা আগমন করেন, তখন বুজায়র তাঁর ভাই কা'ব ইবন যুহায়রকে একটি পত্র লিখে বলেন যে, নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করে যে ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তি করেছে, মক্কা বিজয়ের দিন তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং যে পলায়ন করেছে এত সে প্রাণে বেঁচে গেছে। যদি তোমার জীবন তোমার নিকট প্রিয় হয় তা হলে দ্রুত রাসূল (সা) খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর নিকট ফিরে আসে, তিনি তাকে হত্যা করেন না। যদি তুমি এটা না কর তাহলে কোথাও দূরদেশে চলে যাও, যেখানে গিয়ে তুমি প্রাণে রক্ষা পেতে পার।

কা'ব ইবন যুহায়রের এটা পছন্দ হল না যে, কোন পরামর্শ ব্যতীত তার ভাই বুজায়র ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং নিম্নলিখিত কবিতা লিখে তার ভাই-এর নিকট প্রেরণ করে ঃ

الا ابلغا عنى بجيراً رسالة * فهل لك فيما قلت ويحل هل لكا

"হে বন্ধু! বুজায়রকে আমার এই সংবাদ পৌছিয়ে দাও, আমি যা বলছি এ ব্যাপারে তোমার কি মতামত। আফসোস তুমি এটা করলে।"

فبين لنا ان كنت لست بفاعل * على اى شيئ غير ذالك دلكا ـ

"তুমি এটা বল, যদি তুমি তোমার বাপ-দাদার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে না পার, তাহলে এটা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা তুমি গ্রহণ করেছ।"

عَلٰى خُلُقٍ لَمْ تُلْفِ اُمًّا وَلاَ اَبًا * عَلَيْهِ وَتُلْفِىْ عَلَيْهِ اَخًا لَكَا

"তুমি এরূপ পথ গ্রহণ করেছ, না এর উপর মাকে পেয়েছ, না বাপকে এবং না তোমার ভাইকে এর উপর পাবে।"

فَانْ اَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَلَسْتُ بِاسِفٍ * وَلاَ قَائِلٍ اِمَّا عَثَرْتَ لعًا لَكَا

"অতঃপর যদি তুমি আমার কথার উপর আমল না কর তাহলে আমার কোন চিন্তা নেই। আর আমি তোমার বিচ্যুতির সময় তোমাকে (لعالك) (কারো পদস্খলনের সময় বলা হয়, যার অর্থ সাবধান, সর্তক হও।) বলবও না।"

سَقَاكَ بِهَا الْمَامُوْنَ كَاسًا رَوِيَّةً * فَانْهَلَكَ الْمَامُوْنُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

"মামূন অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যেহেতু কুরায়শ তাঁকে আমীন ও মামূন মনে করত। তোমাকে তিনি নির্মল পানীয় পান করিয়েছেন।"

বুজায়র এ ঘটনা রাসূল (সা)-এর নিকট গোপন করা পসন্দ করলেন না। ফলে এই কবিতাসমূহ নবী (সা)-এর খেদমতে পেশ করেন। রাসূল (সা) বললেন, কা'ব সত্য

বলেছে। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপদ ও নির্দেশিত[১] এবং على خلق لم تلف اما ولا ابا শুনে তিনি বলেন, এটাও সত্য, সে বলেছে, মা-বাপকে ঐ দীনের উপর দেখেছে।

বুজায়র এর জবাবে নিম্নলিখিত কবিতা লিখে কা'বের নিকট প্রেরণ করেন-

مَنْ مُبلِغٌ كَعبًا فَهَلْ لَكَ فِى الَّتِى * تَلُوْمَ عَلَيْهَا بَاطِلاً وَهِىَ اَحْزَمُ

"এমন কেউ আছে কি যে, কা'ব-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিয়ে দেবে, তোমার কি এই দ্বীন ও মিল্লাত গ্রহণে আগ্রহ বা উৎসাহ রয়েছে? তুমি আমাকে নাহক তিরস্কার করছ, অথচ এটাই অত্যন্ত সঠিক।"

اِلَى اللّٰهِ لاَ العُزّى وَلا اللاتِ وَحده * فَتَنْجُوْا اِذَا كَانَ النَّجَاءُ وَتَسْلَمُ

"লাত ও ওযযা দেবতার দিকে নয়, বরং এক আল্লাহ তা'আলার দিকে এসো। তাহলে যে সময় তাওহীদবাদীগণ আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাবে, তখন তুমিও মুক্তি পাবে এবং আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে।"

لَدَى يَوْمَ لاَيَنْجُوْ وَلَيْسَ بِمُفْلِتٍ * مِنَ النَّاسِ اِلاَّ طَاهِرُ الْقَلْبِ مُسْلِمٌ

"ঐ দিন কোন ব্যক্তি আযাব থেকে মুক্তি পাবে না, শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার অন্তর কুফর ও শিরকের নাপাক থেকে মুক্ত ও অনুগত।"

فَدِيْنُ زُهْيَرٍ وَهُوَ لاَشَئْ دِيْنُهُ * وَدِيْنٌ اِلٰى سُلْمٰى عَلَىَّ مُحَرَّمُ

"যুহায়র-এর দ্বীন নিঃসন্দেহে মূল্যহীন। আমার পিতা যুহায়র এবং দাদা আবূ সালমার দীন আমার উপর হারাম। কেননা আমি হক অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছি।"

বুজায়র-এর এই পত্র কা'বের উপর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে নবী (সা)-এর প্রশংসাসূচক কবিতা লিখে মদীনা রওয়ানা হন। মদীনা পৌঁছে ফজর নামাযের পর নবী (সা)-এরখেদমতে হাযির হয়ে অপরিচিত ব্যক্তি হিসেবে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কা'ব ইবন যুহায়র তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে আপনার খেদমতে হাযির হয়, তাহলে আপনি কি তাকে নিরাপত্তা দান করবেন? রাসূল (সা) হ্যাঁ। কা'ব আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ পাপী ব্যক্তিটি হলাম আমি। হে রাসূল! পবিত্র হাত প্রসারিত করুন। আমি বায়'আত গ্রহণ করব। এ সময় একজন আনসারী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে হত্যা করার অনুমতি দান করুন। নবী (সা) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, সে তাওবাকারী হিসেবে আগমন করেছে। অতঃপর কা'ব ইবন যুহায়র রাসূল (সা)-এর শানে নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

১. কোন কোন মুদ্রণে سقاك بها المأمون এর পরিবর্তে سقاك بها المامور রয়েছে।

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول * ميم اثرها لم يفد مكبول

"সু'আদ চলে গিয়েছে ফলে তার বিরহ ব্যথায় আমার অন্তর আজ বিদীর্ণ। আমি প্রেমের বন্দী, শৃংখলাবদ্ধ, আমার মুক্তিপণ দেয়া হয়নি।"

কা'ব ইবন যুহায়র যখন এই কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

ان الرسول لسيف يستضاء به * مهند من سيوف الله مسلول[১]

১. হাকীম এর বর্ণনায় রয়েছে যে কা'ব من سيوف الهند পাঠ করেন। নবী করীম (সা) বলেন, তুমি এভাবে من سيوف الله سلول

"নিশ্চয়ই রাসূল হলেন আলোকরশ্মি। তাঁর থেকে আলো গ্রহণ করা হয়। তিনি আল্লাহর তরবারিসমূহ হতে একখানা কোষমুক্ত ধারালো তরবারি।"

তখন নবী (সা) এ সময় যে ইয়ামানী চাদর পরিহিত ছিলেন কা'ব ইবন যুহায়রকে দান করেন। পরবর্তীতে হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত কা'ব ইবন যুহায়রের বংশধরদের থেকে বিশ হাজার দিরহাম মূল্য দিয়ে ঐ চাদর ক্রয় করেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই চাদর মুসলিম খলিফাগণের নিকট রক্ষিত ছিল। পবিত্র ঈদের দিন বরকতের জন্য তাঁরা এটা পরিধান করতেন। তাতারীদের বাগদাদ আক্রমনের সময় তা হারিয়ে যায় (শারহে মাওয়াহিব)।

গাযওয়ায়ে তাবূক (৯ হিজরী রজব মাসের বৃহস্পতিবার)

মু'জামে তাবারানী গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত আরব কাফিরদের পক্ষ থেকে রোম দেশের সম্রাট হিরাকলের নিকট এই পত্র লিখে প্রেরণ করা হয় যে, মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন এবং লোকজন দূর্ভিক্ষে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। আরব তথা মুসলমানদের উপর হামলা করার এটাই উপযুক্ত সময়। হিরাকল সাথে সাথেই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। চল্লিশ হাজার যুদ্ধবাজ রোমক সৈন্যের এক বাহিনী মুসলমানদের সাথে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।[১]

সিরিয়ার বণিকগণ যায়তুনের তৈল বিক্রয়ের জন্য মদীনায় যাতায়াত করে থাকে, তাদের মাধ্যমে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, হিরাকল এক বিরাট বাহিনী নিয়ে নবী (সা)-এর মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছে, তাদের অগ্রগামী দল বালকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। হিরাকল সমস্ত সেনা বাহিনীর সারা বছরের বেতনভাতা বন্টন করে দিয়েছে।

এ সংবাদ পেয়ে রাসূল (সা) সাথে সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন, যাতে শত্রুদের সীমানা (তাবুক) পৌঁছে তাদের মুকাবিলা করা যায়। সফরের দূরত্ব, গ্রীষ্মকাল, দূর্ভিক্ষ, অর্থ ও আসবাবপত্রের অভাব মিলিয়ে এরূপ সংকটপূর্ণ সময়ে

১. মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬ খ, পৃ. ১৯১।

জিহাদের নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, যে সমস্ত মুনাফিক নিজদেরকে মুসলমান বলে দাবি করত তারা ভয় পেয়ে যায়। কেননা এবার তাদের মুখোশ খুলে পড়বে। তারা নিজেদের জীবন রক্ষার চেষ্টা করে এবং অন্যদেরকেও এরূপ গরমে জিহাদের গমন না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। (لاتنفروا فى الحر) (এমন গ্রীষ্মে বেরিওনা)।

এক উপহাসকারী বলে, লোকজন এটা অবগত আছে যে, আমি সুন্দরী নারী দর্শনে ব্যাকুল হয়ে পড়ি। আমার আশংকা হয় যে, পরীর মত সুন্দরী রোমের নারীদেরকে প্রত্যক্ষ করে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ি।

সত্যিকার মু'মিনগণ আনুগত্য প্রকাশ করে জীবন ও ধন-সম্পদ নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন। সর্বপ্রথম হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) সমস্ত সম্পদ নবী (সা)-এর খেদমতে পেশ করেন। এর পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। নবী ((স) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পরিবারবর্গের জন্য কি রেখে এসেছে, হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।

হযরত উমর ফারূক (রা) সমস্ত মালের অর্ধাংশ হাযির করেন, হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) দু'শ উকিয়া রৌপ্য এবং হযরত আসিম ইবন আদী (রা) সত্তর ওসক খেজুর রাসূল (সা)-এর খেদমতে পেশ করেন।[১]

হযরত উসমান গনী (রা) আসবাবপত্রসহ তিনশ' উট এক হাজার দীনার পেশ করেন। নবী (সা) এতে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বার বার তাকে প্রত্যক্ষ করে বলেন, এই নেককাজের পর উসমানকে কোন আমল অনিষ্ট করতে পারবে না। হে আল্লাহ! আমি উসমানের উপর সন্তুষ্ট, তুমিও উসমানের উপর সন্তুষ্ট থাক।[২]

অধিকাংশ সাহাবা (রা) স্বীয় সাধ্য অনুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগিতা করেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাওয়ারী ও আসবাবপত্র পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কয়েকজন সাহাবা রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খুবই দরিদ্র। যদি আমাদের জন্য সাওয়ারীর ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আমরা এই পূণ্যকাজ থেকে বঞ্চিত থাকব না। নবী (সা) বললেন, আমার নিকট কোন সাওয়ারী নেই। ফলে তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যা, তঁদের শানে কুরআন মাজীদের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُمَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلاَّيَجِدُوْا مَايُنْفِقُوْنَ ـ

"ঐ সমস্ত লোকের জন্যও বাধ্যবাধকতা বা অপরাধ নেই যারা এসেছে আপনার নিকট যাতে আপনি বাহন দান করেন (কিন্তু) আপনি বলেন, আমার নিকট এমন কোন জন্তু নেই যার উপর তোমাদেরকে আরোহণ করাব। তখন তারা ফিরে গিয়েছে এ

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ৬৪

২. প্রাগুক্ত

অবস্থায় যে, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বের হচ্ছিল। এই দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে।" (সূরা তাওবা ঃ ৯২)

হযরত আবদুল্লাহ মুগাফ্ফাল ও আবূ লায়লা, আবদুর রহমান ইবন কা'ব (রা) যখন নবী (সা)-এর নিকট থেকে অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে, এমন সময় পথে ইয়ামীন ইবন আমর নযরীর সাক্ষাৎ হলে তিনি ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট বাহন নেই এবং আমাদেরও আসবাবপত্র ক্রয় করার ক্ষমতা নেই। এখন অনুতাপের বিষয় হলো আমরা এই গাযওয়ায় অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। এ ঘটনা শুনে ইয়ামীনের অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তৎক্ষণাৎ তিনি একটি উট ক্রয় করেন এবং তাদের আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করেন।[১]

সাহাবায়ে কিরাম রওয়ানার জন্য প্রস্তুত হলে নবী (সা) মুহাম্মদ ইবন মুসলিমকে স্বীয় প্রতিনিধি এবং মদীনার প্রশাসক বা গভর্নর নিয়োগ এবং হযরত আলীকে পরিবারবর্গের হিফাযত ও দেখাশুনার জন্য মদীনায় থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আলী (রা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে শিশু মহিলাদের নিকট রেখে যাচ্ছেন? তখন নবী (সা) বললেন, তুমি কি এর উপর সন্তুষ্ট নও যে, আমার সাথে তোমার ঐ সম্পর্ক হোক যা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে হযরত হারূন (সা)-এর ছিল? কিন্তু আমার পর কোন নবী হবে না। (বুখারী)

হাদীস أنت منى بمنزلة هارون من موسى -এর ব্যাখ্যা

এ হাদীস দ্বারা শী'আ সম্প্রদায় হযরত আলীর (রা) খিলাফত সম্পর্কে দলীল পেশ করে বলেন, রাসূল (সা)-এর পর খিলাফতের হকদার ও অধিকারী হলেন হযরত আলী (রা)। আহ্লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলেন, নবী (সা)-এর সফরে গমনের সময় হযরত আলী (রা)-কে স্বীয় পরিবারবর্গের হিফাযতের দায়িত্বে রেখে যাওয়ার দ্বারা হযরত আলীর আমানতদারী, সততা ও বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। কেননা স্বীয় পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ ও হিফাযতের দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত করা হয় যার আমানতদারী, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, স্নেহ মহব্বতের উপর আস্থা ও বিশ্বাস থাকে, বংশধর ও সন্তান-সন্ততিকে এ কাজে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু 'ইনতিকালের পর তুমিই আমার খলীফা নিযুক্ত হবে', হাদীসে এ বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

এছাড়া হযরত আলী (রা)-কে এ স্থলাভিষিক্ত করা শুধু পরিবারবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা গাযওয়ায় গমনের সময় রাসূল (সা) মুহাম্মদ ইবন মাসলামাকে মদীনার শাসনকর্তা, সাবা ইবন আরফা (রা)-কে মদীনার কোতওয়াল এবং আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা)-কে মসজিদে নব্বীর ইমাম নিযুক্ত করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী খিলাফত উদ্দেশ্য ছিল না, বরং পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যদি ধরে

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

নেয়া হয়, তবুও তা গাযওয়া থেকে ফিরে আসার সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন কোন বাদশাহ্ সফরে গমনের সময় কাউকে রাজধানীর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে থাকেন এবং এই প্রতিনিধিত্ব ফিরে আসার সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। ফিরে আসার পর নিজে থেকেই তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই কিছু সময়ের প্রতিনিধিত্ব এই বিষয়ের দলীল নয় যে, বাদশাহর ইনতিকালের পর এই ব্যক্তিই বাদশাহর খলীফা হবে। অবশ্য এই দায়িত্ব প্রদানের দ্বারা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমরা এ কথা বলছি না যে, হযরত আলী (রা)-এর মধ্যে খিলাফতের যোগ্যতা ছিল না, বরং সমস্ত আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হযরত আলীর (রা) যোগ্যতা ও দক্ষতার কথা একান্ত আন্তরিকভাবে স্বীকার করেন। তবে এর দ্বারা অন্যান্য খলীফাদের যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়না। অন্য হাদীস দ্বারা তাঁদের পরিপূর্ণ যোগ্যতার বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

সুতরাং বাদশাহ যদি রাজধানী থেকে বাইরে গমনের সময় কাউকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান, তবে তা এ বিষয়ের দলীল নয় যে, বাদশাহ্র ইনতিকালের পরও ঐ ব্যক্তিই বাদশাহ হবে। কাজেই বাড়িঘর ও পরিবারবর্গের হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে যে দায়িত্ব সম্পর্কিত, তা মহান খিলাফতের দলীল হিসেবে গ্রহণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নবী (সা)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন গাযওয়ায় গমন করতেন, তখন মদীনায় কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন ঐ প্রতিনিধিত্ব নিজে নিজেই শেষ হয়ে যেত। কোন ব্যক্তিই এ ধারণা পোষণ করত না যে, কিছু সময়ের জন্য কোন সাহাবার প্রতিনিধিত্বকে মহান খিলাফতের ধারাবাহিকতার দলীল হিসেবে মনে করা হবে।

এবার বাকী রইল এ বিষয় যে, নবী (সা) এ হাদীসে হযরত আলী (রা)-কে হযরত হারূন (আ)-এর সাথে সাদৃশ প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে আমরা আরয করব যে, এই সাদৃশ্য দ্বারা নিশ্চয়ই এক প্রকার ফযীলত প্রমাণিত হবে কিন্তু সাদৃশ দ্বারা সমস্ত বিষয়ে সমতা জরুরী নয়। এ হাদীসে যদিও হযরত আলী (রা)-কে হযরত হারূন (আ) সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে, পক্ষান্তরে বদরযুদ্ধে গ্রেফতারকৃত কয়েদীদের সম্পর্কে যখন রাসূল (সা) সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন, তখন তিনি হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সাদৃশ প্রদান করেছেন। হযরত উমর (রা)-কে হযরত নূহ (আ) ও হযরত মূসা সাথে সাদৃশ প্রদান করেছেন। কাউকে হযরত নূহ (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাদৃশ প্রদান করা انت منى بمنزلة هارون من موسى বলা থেকে অনেক উত্তম।

মোটকথা নবী (সা) ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন, এ বাহিনীতে ছিল দশ হাজার ঘোড়া।[১] (যারকানী, শারহে মাওয়াহিব)

১. উয়ূনুল আসার , ২ খ. পৃ. ২১৬।

সামূদ জাতির আবাসভূমি অতিক্রম, সেখানকার পানির বিষয় নির্দেশ এবং এর রহস্য

পথিমধ্যে ঐ দৃষ্টান্তমূলক ও বিপদজনক স্থান পড়ে যেখানে সামূদ গোত্রের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল। যখন নবী (সা) ঐ স্থান অতিক্রম করছিলেন, তখন পবিত্র চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে নেন, উটকে গতিশীল করেন এবং সাহাবাগণকে এই নির্দেশ প্রদান করেন যেন, কোন ব্যক্তি এ যালিমদের বাড়ি ঘরে প্রবেশ না করে, এখানের পানি পান না করে। অযূ না করে এবং মাথা নত করে ক্রন্দন করতে করতে রাস্তা অতিক্রম করে। যারা ভুলে অথবা অজ্ঞতার কারণে পানি নিয়েছে অথবা ঐ পানি দ্বারা আটা গুলিয়েছে, তাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন পানি ফেলে দেয় এবং ঐ আটা উটকে খাইয়ে দেয়। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল আম্বিয়া; ফাতহুল বারী, ৬ খ, পৃ. ২৬৮; শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ৭৩)

মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নব্বী, যা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদতে আবাদ থাকে, সেখানে গমন করা, অবস্থান করা নৈকট্য লাভ এবং কল্যাণ ও বরকতের কারণ এবং রহমত নাযিলের উপায়। পক্ষান্তরে যে স্থানে দীর্ঘকাল আল্লাহপাকের নাফরমানীর কেন্দ্র ছিল এবং আল্লাহ তা'আলার গযব ও শাস্তি নাযিল হয়েছিল, সেখানে ইচ্ছাকৃত প্রবেশ করা অত্যন্ত বিপদজনক ছিল। যেভাবে আল্লাহ তা'আলার হেরেমে প্রবেশকারীর জন্য নির্দেশ রয়েছে ঃ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا (যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে।)

এমনিভাবে আযাবের স্থানে প্রবেশ করলে আযাব নাযিল হওয়ার আশংকা থাকে। পবিত্র কা'বার তাওয়াফ কেউ করুক বা না করুক, তা কল্যাণ, বরকত ও নূরের তাজাল্লীর উৎস এবং তা দর্শনের মাধ্যমে অন্তরের কালিমা ও পঙ্কিলতা দূরীভূত হয়ে যায়। এ অঞ্চলের আবহাওয়াই অন্তরের রোগের শিফা। সুতরাং এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অন্তরের চিকিৎসকের দৃষ্টিতে আযাবের স্থানের আবহাওয়া বিষাক্ত এবং সেখানের বিষাক্ত কীট আত্মার জন্য অনিষ্টকর হতে পারে। ফলে তিনি ঐ স্থানের পানি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যে কূপ থেকে হযরত সালিহ (আ)-এর উট পানি পান করেছিল, সেখান থেকে পানি নেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কেননা ঐ কূপ নাফরমানী এবং আল্লাহর গযব থেকে পবিত্র ছিল। যমযমের পানি যেহেতু পবিত্র এবং যাহিরী ও বাতেনী রোগের মহৌষধ, ফলে এ পানি পান করার জন্য তাগিদ করেছেন যে, যে পরিমাণ সম্ভব পান কর। যে বদ-নসীব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীর মধ্যে ডুবে রয়েছে, যার ফলে তাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছে, তারা প্রকৃতপক্ষে চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তাদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্টতর। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ (তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর)

এ জন্য নবী (সা) সামূদ গোত্রের পানি দ্বারা যে আটা গোলান হয়েছে, তা উটগুলোকে খাওয়ানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এরূপ পানি জন্তুর মেযাজের উপযুক্ত, মানুষের জন্য নয়। অধিকন্তু নবী (সা) যখন এই আযাবের এলাকা অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি এই আশংকা করেছেন যে, আল্লাহ না করুন, এ অঞ্চলের বিষাক্ত আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া সাহাবাদের উপর পতিত না হয়। এর থেকে হিফাযতের জন্যই তিনি প্রতিষেধক হিসেবে পরামর্শ প্রদান করেন যে, মাথা নত করে ক্রন্দন করে অর্থাৎ স্বীয় পাপের কথা স্মরণ করে ভয় ও বিনয়ের সাথে ঐ স্থান অতিক্রম করবে। ইনজেকশন নেয়ার পর যদি কেউ প্লেগ বা মহামারীর এলাকা অতিক্রম করে, তাহলে তার রোগের কোন আশংকা থাকে না। হে বন্ধুগণ! আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন, তাওবা এবং বিনয় পাপের এরূপ প্রতিষেধক ইনজেকশন, সবচেয়ে বিষাক্ত পদার্থও এরপর অবশিষ্ট থাকে না।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا انت أستغفرك وأتوب اليك قال تعالى وَلَاتَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

"হে আল্লাহ! তোমার জন্য পবিত্রতা এবং তোমার জন্যই প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, তুমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা যুলূম করেছে তাদের প্রতি তোমরা ঝুঁকে পড়বে না। তাহলে অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।" (সূরা হূদ ঃ ১১৩)

وَسَكَنْتُمْ فِىْ مَسَاكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَكُمْ -

"এবং তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে, যারা নিজেদের প্রতি যুলম করেছে।" (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৪৫)

যালিমদের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং তাদের বাড়িতে অবস্থান করাও ক্রোধ বা অসন্তোষের কারণ।

হিজর (حجر) নামক স্থানে পৌঁছে নবী (সা) এ নির্দেশ প্রদান করেন, যেন কেউ একাকী বের না হয়। ঘটনাক্রমে দু'ব্যক্তি একাকী বের হয়ে পড়ে। একজনের দমবন্ধ হয়ে যায় যা রাসূল (সা)-এর দম করে দেয়ায় সুস্থ হয়ে যায়। অপর ব্যক্তিকে বায়ু তায় পাহাড়ে নিক্ষেপ করে। তিনি দীর্ঘ দিন পর মদীনায় পৌঁছেন।

এটা হলো বায়হাকী ও ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াত। সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাবূকে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সম্ভবত ঘটনা দু'টি ছিল। অথবা ইবন ইসহাক ও বায়হাকীর রিওয়ায়াতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

সামনে অগ্রসর হয়ে এক মনযিলে থামেন, সেখানে পানি ছিল না। খুবই পেরেশান ছিলেন। আল্লাহপাক নবী (সা)-এর দু'আর বরকতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যার ফলে সবাই

পানি পান করে তৃপ্ত হয়। সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার পর রাসূল (সা)-এর উট হারিয়ে যায়। এক লোক বলে, তিনি আসমানের খবর বর্ণনা করেন কিন্তু নিজের উটের খবর নেই যে, এটা কোথায়? নবী (সা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার কোন বিষয়ের ইল্‌ম নেই, তবে আল্লাহ আমাকে যা কিছু অবহিত করেন। এখন আল্লাহ্‌পাকের ইলহামের মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি যে, আমার উট অমুক ময়দানে রয়েছে এবং এর মিহার (নাসারন্দ্রের রশি) এক বৃক্ষের সাথে আটকে গিয়েছে, যার ফলে এটা সেখানে আটকিয়ে আছে। ফলে সাহাবাগণ সেখানে গমন করে ঐ উট নিয়ে আসেন। (বায়হাকী ও আবূ নুয়াইম)

তাবুক পৌছার একদিন পূর্বে রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, আগামীকাল চাশতের সময় তোমরা তাবূকের কূপের নিকট পৌছবে। কেউ যেন ঐ কূপ থেকে পানি সংগ্রহ না করে। যখন ঐ কূপের নিকট পৌছে, তখন সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি নির্গত হচ্ছিল। একটি পাত্রে কিছু পানি জমা করা হলো। নবী (সা) ঐ পানি দ্বারা স্বীয় হাত-মুখ ধৌত করে ঐ পানি কূপের মধ্যে ঢেলে দেন। ফলে ঐ কূপ পানিতে কানায় কানায় ভর্তি হয়ে ফোয়ারা জারী হয়ে যায়, যার ফলে সমস্ত সৈন্য তৃপ্তি সহকারে পানি পান করে। নবী (সা) মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মু'আয! যদি তুমি জীবিত থাক, তাহলে এ এলাকা বাগানের দ্বারা সবুজ ও সতেজ দেখতে পাবে। (মুসলিম)

ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, অদ্যাবধি ঐ ফোয়ারা জারী আছে এবং দূর থেকে এর আওয়ায শুনা যায়। (খাসাইসে কুবরা, ১ খ, পৃ. ২৭৩)

তাবূক পৌছার পর রাসূল (সা) সেখানে বিশদিন অবস্থান করেন। কিন্তু কেউ মুকাবিলার জন্য আসেনি। কিন্তু নবী (সা)-এর আগমন ব্যর্থ হয়নি। শত্রুরা ভীত হয়ে পড়ে এবং আশেপাশের গোত্রের লোকেরা হাযির হয়ে আত্মসমর্পণ করে। জিরবা, আযয়খ এবং আমলার শাসকগণ রাসূল (সা) -এর খিদমতে হাযির হয়ে সন্ধি করে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। রাসূল (সা) সন্ধিপত্র লিখিয়ে তাদের নিকট হস্তান্তর করেন।

ঐ স্থান থেকেই নবী (সা) হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে চারশ' বিশজন আরোহীর সাথে হিরাকল কর্তৃক নিয়োজিত দাওমাতুল জান্দালের শাসক একীদরের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদকে রওয়ানা করার সময় রাসূল (সা) এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, শিকার করার অবস্থায় তোমরা তাকে পাবে তাকে হত্যা করবে না, বরং গ্রেফতার করে আমার নিকট নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, যদি সে বিদ্রোহ করে, তাহলে তাকে হত্যা করবে। হযরত খালিদ (রা) চাঁদনী রাতে সেখানে পৌছেন। গ্রীষ্মকাল ছিল। একীদর এবং তার স্ত্রী দূর্গের ছাদে বসে গান শুনছিল। হঠাৎ একটি নীল গাভী দূর্গের ফটকে এসে ধাক্কা দেয়। একীদর সাথে সাথেই তার ভাই ও কয়েক বন্ধুকে নিয়ে শিকারে বের হয় এবং ঘোড়ায় আরাহণ করে এর পিছনে দৌড়াতে

থাকে। কিছু দূর যাওয়ার পর খালিদ ইবন ওয়ালীদ তাদের সামনে এসে পৌঁছেন। একীদরের ভাই হাসান মুকাবিলা করে নিহত হয় এবং একীদর খালিদ ইবন ওয়ালীদের হাতে গ্রেফতার হয়।

হযরত খালিদ (রা) বলেন, আমি তোমাকে হত্যা থেকে রক্ষা করতে পারি যদি তুমি আমার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হতে সম্মত হও। একীদর এতে সম্মত হয়। হযরত খালিদ (রা) তাকে নিয়ে রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। একীদর দু'হাজার উট, আট'শ ঘোড়া, চার'শ লৌহ বর্ম এবং চার'শ বল্লম প্রদান করে সন্ধি করে।[১]

মসজিদে দিরার বা ক্ষতিকর মসজিদ

বিশ দিন অবস্থানের পর নবী (সা) তাবূক থেকে মদীনার পথে যাত্রা করেন। মদীনা থেকে এক ঘন্টার পথ দূরে যী'আওয়ান (ذى اوان) নামক স্থানে পৌঁছার পর রাসূল (সা) মালিক ইবন দুখশুম এবং মা'আন ইবন আদীকে দেরার মসজিদ ধ্বংস করা ও জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। মুনাফিরা-রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে এখানে বসে পরামর্শ করার জন্য এই মসজিদ নির্মাণ করেছিল। যখন রাসূল (সা) তাবূক যাচ্ছিলেন তখন মুনাফিকরা এসে আরয করে যে, আমরা রুগ্ন ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি মসজিদ তৈরি করেছি। আপনি সেখানে গমন করে একবার নামায পড়িয়ে দিলে তা মাকবূল ও বরকতময় হয়ে যাবে। নবী (সা) বললেন, এখন আমি তাবূক যাচ্ছি ফেরার পথে দেখা যাবে। ফেরার সময় রাসূল (সা) ঐ দু'ব্যক্তিকে মসজিদে দেরার জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ - وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ -لاَتَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ - فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ -

"যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে মুসলমানদের অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে, কুফরী করা এবং মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং ঐ লোকের জন্য ঘাঁটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা শুধু কল্যাণই কামনা করছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী প্রদান করছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আপনি কখনো সেখানে (মসজিদে দিরারে) দাঁড়াবেন

১. উয়ূনুল আসার, ২ খ. পৃ. ২২।

না। তবে যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাক্ওয়ার উপর রাখা হয়েছে, ঐ মসজিদ (মসজিদে কুবা) আপনার দাঁড়াবার উপযুক্ত স্থান। সেখানে রয়েছে, এমন লোক যারা পবিত্রতা ভালবাসে এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।"

(সূরা তাওবা ঃ ১০৭ -৮)

ইবন হিশামের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী (সা) সুওয়াইলাম নামক ইয়াহূদীর বাড়িও জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কেননা এ বাড়িতে বসেই মুনাফিকরা নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে পরামর্শ করত। হযরত তালহা (রা) কয়েক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে গিয়ে ঐ বাড়ী জ্বালিয়ে দেন।

যখন রাসূল (সা) মদীনার নিকট পৌঁছেন, তখন নবুওয়াত ও রিসালাতের সূর্য মহানবী (সা)-কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য মদীনাবাসী বের হয়ে আসেন। এমন কি উৎসাহের আতিশয্যে পর্দানশীন মহিলাগণও ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। শিশু কিশোরীরা এই কবিতা আবৃত্তি করে।

طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع
وجب الشكرَ عَلَيْنا * مادعاء الله داع
ايُّهَا المبعوث فينا * جئت بالامر المطاع

"পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের উপর উদিত হয়েছে সানিয়াতিল বিদা থেকে, শুকরিয়া আদায় করা আমাদের উপর ওয়াজিব যে আহবানকারী আল্লাহর দিকে আহবান করে। হে মহান ব্যক্তি (নবী সা) আপনি আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েছেন, এবং এমন বস্তু নিয়ে এসেছেন যা অনুসরণ করার যোগ্য।"

যখন মদীনার বাড়িঘর দৃষ্টিগোচর হয় তখন তিনি বলেন, هذه طابة (এই হলো পবিত্র মদীনা) এবং ওহুদ পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তিনি বলেন, هذا جبل يحبنا ونحبه "এ পাহাড় আমাদেরকে মহব্বত করে এবং আমরা এটাকে মহব্বত করি।"

শা'বান মাসের শেষ অথবা রমযান মাসের প্রথমে মদীনায় প্রবেশ করে। তিনি মসজিদে নব্বীতে গমন করে সেখানে কয়েক রাক'আত নামায আদায় করেন। নামায সম্পন্ন করার পর লোকজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য কিছুক্ষণ মসজিদে অবস্থান করেন। অতঃপর বিশ্রামের জন্য ঘরে প্রবেশ করেন। (শারহে মাওয়াহিব)

এটা ছিল সর্বশেষ গাযওয়া, যাতে নবী (সা) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১]

অভিযান থেকে পশ্চাদগামীদের[২] বর্ণনা

নবী (সা) যখন তাবূক রওয়ানা হন তখন খালিস মু'মিনগণও নবী (সা)-এর সাথে গমন করেছিলেন। মুনাফিকদের একটি দল অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু

১. ইবন হিশাম, শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ৮০।

২. গাযওয়ায়ে তাবূক গমন থেকে যারা বিরত ছিলেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট মু'মিনও নিফাকের কারণে নয়, বরং কোন ওযর এবং কেউ গরম ও লু হাওয়ার কষ্ট থেকে ভীত হয়ে গাযওয়ায় অংশগ্রহণ থেকে পিছনে থেকে যান।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর উট ছিল দুর্বল। ফলে তিনি এই চিন্তা করেন যে, দু'চার দিনে এই উট পানাহার করে চলার যোগ্য হবে, তখন আমি রাসূল (সা)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হব। কিন্তু যখন এই উট থেকে নিরাশ হলেন, তখন স্বীয় আসবাবপত্র পিঠে বহন করে রওয়ানা হয়ে একাকী তাবূক পৌঁছেন। নবী (সা) তাঁকে দেখে বলেন, আল্লাহ আবূ যরের উপর রহম করুন। একা এসেছে, একাই মৃত্যুবরণ করবে, একাই পুনরুত্থিত হবে। মূলত এরূপই ঘটেছে। রাবযাহ্ নামক স্থানে তিনি একাকী অবস্থায় ইনতিকাল করেন। দাফন-কাফনের কেউ ছিল না। ঘটনাক্রমে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) কূফা থেকে ফিরে আসছিলেন, তিনি দাফন কাফনের ব্যবস্থা করেন।[১]

'মু'জামে তাবারানী' গ্রন্থে আবূ খায়সামা থেকে বর্ণিত, নবী (সা) মদীনা রওয়ানা হওয়া সত্ত্বেও আমি মদীনায় থেকে গেলাম। প্রচণ্ড গরম ছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে আমার পরিবারবর্গ ছাউনিতে ঠাণ্ডা পানিসহ সুস্বাদু খাদ্যের ব্যবস্থা করল। এ দৃশ্য দেখে সহসা আমার অন্তরে দুঃখবোধের সৃষ্টি হলো যে, এটা সম্পূর্ণ অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) লু হাওয়া এবং গরমের মধ্যে অবস্থান করছেন, আর আমি ছায়ায় উপবেশন করছি, আরাম করছি। তৎক্ষণাৎ উঠে কিছু খেজুর নিয়ে উটে আরোহণ করেন এবং দ্রুতগতিতে রওয়ানা হয়ে যখন মুসলিম বাহিনীর সামনে পৌঁছেন। তখন নবী (সা) দূর থেকে তাঁকে দেখে বলেন, আবূ খায়সামা আসছে। আমি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।[২]

যারা যুদ্ধে যোগদান করেনি তাদের মধ্যে নেককার মু'মিন হিসেবে হযরত কা'ব ইবন মালিক, হযরত মুররা ইবন রাবী' এবং হিলাল ইবন উমাইয়্যাও ছিলেন।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) গাযওয়ায়ে তাবূকের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম। ধারণা ছিল এই যে, দু'-এক দিন পর আসবাবপত্র প্রস্তুত হয়ে যাবে। তখন রাসূল (সা)-এর সাথে মিলিত হব। ইতিমধ্যে বিলম্ব হয়ে গেল এবং কাফেলা অনেক দূর চলে যায়। মদীনায় অক্ষম ব্যক্তিগণ ও মুনাফিক ব্যতীত কেউ বাকী রইল না। যখন আমি এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতাম তখন আমার অত্যন্ত দুঃখ ও অনুতাপ হত। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক থেকে ফিরে আসেন, তখন মুনাফিকরা মিথ্যা ওযর বর্ণনা করে। রাসূল (সা) বাহ্যিকভাবে তাদের ওযর কবূল করেন এবং অন্তরের বিষয় আল্লাহর উপর সোপর্দ করেন।

১. শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ৭১।

২. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৮৮।

মাগাযী ইবন আয়েযে বর্ণিত, হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন, আমি এই প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি কখনো এরূপ করব না যে, গাযওয়া থেকে বিরত থাকব এবং মিথ্যা কথাও বলব। সুতরাং আমি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সালাম করলাম। তিনি অন্যদিকে ফিরে থাকলেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আমার থেকে ফিরে আছেন? আল্লাহর শপথ! আমি মুনাফিক নই, না আমার মধ্যে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে এবং না আমি দ্বীন থেকে ফিরে গিয়েছি। নবী (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে যুদ্ধ থেকে কেন বিরত রয়েছ? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি যদি কোন দুনিয়াদার ব্যক্তির সামনে বসতাম, তাহলে কথাবার্তা বানিয়ে মিথ্যা বলে তার ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতাম। কিন্তু আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল যদি আজ মিথ্যা বলে আপনাকে সন্তুষ্ট করি তা হলে হয়ত আল্লাহপাক কাল আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে দিবেন। আর যদি আপনার নিকট সত্য বলি যার ফলে আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারেন কিন্তু আল্লাহর ফযলে আমার আশা এই যে, তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। মূলত আমার কোন ওযর নেই, আমি অপরাধী। নবী (সা) বললেন, এই ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। এখন তুমি যাও, আল্লাহ হয়ত তোমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল করবেন। এমনিভাবে মুররা ইবন রাবী এবং হিলাল ইবন উমাইয়্যা (রা) নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে অপরাধ স্বীকার করলেন। রাসূল (সা) নির্দেশ প্রদান করেন যে, কেউ যেন এ তিন ব্যক্তির সাথে পঞ্চাশ দিন কথাবার্তা না বলে। সুতরাং সবাই আমাদের সাথে সালাম ও কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে অনাত্মীয় মনে হতে লাগল। হযরত কা'ব (রা) বলেন, আমার দু'সাথী শারীরীক দুর্বলতার কারণে ঘরে অবস্থান করতে থাকে। দিবারাত্র কাঁদাকাটির মধ্যে অতিবাহিত করে। আমি জওয়ান ছিলাম বিধায় নামাযের জামা'আতে হাযির হতাম। মোটকথা এমনি পেরেশানীর মধ্যে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হলো। আল্লাহর যমীন আমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল। সবেচেয়ে বেশি চিন্তা হলো এই জন্য যে, যদি এ অবস্থায় মৃত্যু হয়ে যায় তা হলে রাসূল (সা) এবং মুসলমানগণ আমার জানাযা পড়বে না। পঞ্চাশ দিন পর হঠাৎ সালা পাহাড় থেকে এই বহু আকাঙ্ক্ষিত এই সুসংবাদ শোনা গেল ঃ ياكعب بن مالك أبشر (হে কা'ব ইবন মালিক, তোমাকে সুসংবাদ)

এ সুসংবাদ শুনেই আমি আমি সিজ্‌দাবনত হয়ে পড়ি এবং উপলব্ধি করলাম যে, বিপদ দূর হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেন যে, এ সমস্ত লোকের তাওবা কবূল হয়েছে। চতুর্দিক থেকে লোকজন আমাকে এবং আমার দু'জন সাথীকে সুসংবাদ ও মুবারকবাদ জানানোর জন্য আগমন করে। ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতে বর্ণিত, তারা বলছেন لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّٰه عَلَيْكَ (আল্লাহপাক তোমার তাওবা কবূল করার কারণে

তোমাকে মুবারকবাদ)। যে ব্যক্তি আমার নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করেছে আমি সাথে সাথে আমার দু'টি কাপড় তাকে পরিধান করিয়ে দিয়েছি। অতঃপর আমি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি মসজিদে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করেন এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। হযরত কা'ব (রা) বলেন, উপস্থিত ব্যক্তিদের অন্য কেউ উঠে আসেনি। আল্লাহর শপথ! তালহার এই ইহ্সান ও করুণা আমি কখনো ভুলব না। নবী (সা)-এর চেহারা মুবারক থেকে চাঁদের মত আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আমি তাঁকে (সা) সালাম পেশ করলাম। তিনি বলেন,

أبشر بخير يوم مرعليك منذ ولدتك امك

"তোমাকে মুবারকবাদ ঐ দিনের জন্য যা সমস্ত দিনের থেকে উত্তম, ঐ দিন থেকে যেদিন তোমার মা তোমাকে প্রসব করে।"

হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) যে দিন ইসলাম গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই ঐ দিন সমস্ত দিন থেকে উত্তম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দিন ঐ দিন থেকেও অধিক উত্তম। কেননা এই দিন আল্লাহর দরবারে তাঁর তাওবা কবূল হয়। যার ফলে তার ঈমান ও ইখলাসের ব্যাপারে চিরদিনের জন্য মোহর অঙ্কিত হয়ে যায়। তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ - اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ - وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ - وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ - ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا - اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

"আল্লাহ ক্ষমাশীল নবীর প্রতি, মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি, যারা কঠিন মূহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিলেন, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময় এবং অপর তিনজন, যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল। এমনকি পৃথিবী সুপ্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল আর তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হল যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি-যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ,আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সূরা তাওবা ১১৭-১১৯)

আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ তাওবা কবূল হওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ দান করার ইচ্ছা পোষণ করছি। নবী (সা) বললেন, কিছু রেখে দাও। হযরত কা'ব (রা) বলেন, খায়বারে আমি যা অংশ পেয়েছিলাম, তা আমি রেখে দিয়েছ এবং বাকী সমস্ত দান করে দিয়েছি। তিনি আরো আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে শুধু সত্য বলার কারণে নাজাত দিয়েছেন। সুতরাং তাওবার ফায়দা হিসেবে আমি আমরণ সত্য কথা ব্যতীত অন্য কিছু বলব না। (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮ খ. পৃ. ৮৬)

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) কে হজ্জের আমীর নির্বাচন

৯ম হিজরীর যিলকা'দ মাসে নবী (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে হজ্জের আমীর নির্বাচন করে মক্কা মুকাররমা প্রেরণ করেন। মদীনা থেকে তিন'শ লোক এবং কুরবানীর জন্য বিশটি উট তাঁর সাথে প্রদান করেন, যাতে তিনি শরী'আতের বিধান অনুযায়ী লোকজনের হজ্জ আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং চুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে সূরা তাওবার যে চল্লিশ আয়াত নাযিল হয়েছে, তা ঘোষণা করবেন। আয়াতসমূহে এ বিষয়ে বর্ণনা ছিল যে, এ বছরের পর মুশরিকরা মসজিদে হারামে যেতে পারবে না এবং উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না, যার সাথে নবী (সা) কোন চুক্তি করেছেন তা ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ণ করা হবে। যাদের সাথে কোন চুক্তি করা হয়নি, তাদেরকে 'ইয়াওমুন নাহর' বা কুরবানীর দিন থেকে চার মাসের সুযোগ দেয়া হলো।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) রওয়ানা হওয়ার পর নবী (সা)-এর এটা খেয়াল হলো যে, চুক্তি এবং চুক্তি ভঙ্গ সম্পর্কে এরূপ ব্যক্তির দ্বারা ঘোষণা হওয়া উচিত যিনি চুক্তিকারীর গোত্র এবং আহ্‌লি বায়তের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আরবগণ এরূপ বিষয়ে গোত্র ও আত্মীয়দের কথা গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং রাসূল (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডেকে স্বীয় 'আদবা' (عضباء) নামক উটে সাওয়ার করে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পিছনে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন যে, হজ্জের সময় তুমি সূরা বারা'আতের আয়াতসমূহ লোকজনকে শুনাবে। কোন কোন রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বারা'আতের আয়াত হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) রওয়ানা হওয়ার পর নাযিল হয়, এজন্য পরে হযরত আলীকে (রা) পয়গাম শোনানোর জন্য প্রেরণ করা হয়। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) উটের আওয়ায শুনেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, স্বয়ং হুযুর (সা) আগমন করেছেন। থেমে গেলেন এবং আলী (রা)-কে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন أمير أو مامور অর্থাৎ আমীর হয়ে এসেছেন অথবা অধীন হয়ে? হযরত আলী (রা) বললেন, আমি শুধু সূরা বারা'আতের কিছু আয়াত শোনানোর নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে এসেছি। বস্তুত হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) লোকজনকে হজ্জ করালেন এবং হজ্জের খুতবাও তিনিই পেশ করেন। হযরত আলী (রা)-কে সূরা বারা'আতের

আয়াতসমূহ এবং এর বিষয়বস্তু 'ইয়াওমুন নাহরে' (কুরবানীর দিন) জামারায়ে আকাবার নিকট দাঁড়িয়ে লোকজনকে শোনালেন। হযরত আবূ বকর (রা) কিছু লোককে হযরত আলী (রা) সহযোগিতার জন্য নিযুক্ত করেন, যাতে তারা বারবার ঘোষণা দিতে পারে।

তদনুসারে কুরবানীর দিন এই ঘোষণা দেয়া হয় যে, বেহেশতে কোন কাফির প্রবেশ করতে পারবে না, আগামী বছর থেকে কোন মুশরিক হজ্জ আদায় করতে পারবে না, এবং কেউ উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যার কোন চুক্তি রয়েছে, তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ণ করতে হবে। যার সাথে কোন চুক্তি নেই অথবা অনির্ধারিত সময়ের জন্য চুক্তি রয়েছে, তার জন্য চার মাসের নিরাপত্তা রয়েছে। যদি এ সময়ে ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে এ সময়ের পর যেখানে পাওয়া যাবে, তাকে হত্যা করা হবে।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা)-কে যুল-হুলায়ফা পৌঁছে হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) সাথে মিলিত হয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এ আয়াত সমূহের ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) এ ধারণা হলো যে, সম্ভবত আমার সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে। ফলে তিনি সাথে সাথেই মদীনা আগমন করে রাসূল (সা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পর্কে কি কোন আয়াত নাযিল হয়েছে? নবী (সা) বললেন, না, তুমি তো আমার হেরা গুহার সাথী, সাওর গুহার সাথী এবং হাউযে কাওসারেও তুমি আমার সাথী হবে। কিন্তু সূরা বারা'আতের ঘোষণা আমি অথবা আমার গোত্রের কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। যার কারণে বারা'আতের আয়াত ঘোষণা ও শোনানোর জন্য আমি আলীকে প্রেরণ করেছি।[১]

বিভিন্ন ঘটনাবলী (৯ম হিজরী)

১.এ বছর যিল-কা'দ মাসে মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহর ইবন উবায় ইবন সুলূল মৃত্যুবরণ করে। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَلَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَاتَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ ـ

"এবং আপনি এ সমস্ত মুনাফিকের মধ্যে কারো জানাযার নামায পড়বেন না এবং তাদের কবরে দাঁড়াবেন না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।" (শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ৯৫)

মাসয়ালা ঃ কাফিরদের জানাযায় অংশগ্রহণ এবং তাদের কবরে গিয়ে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ নাজায়েয। ঐ জানাযা হিন্দুর হোক অথবা খ্রিস্টানের, উভয়ই কুফরীর মধ্যে

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৬৫

রয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে মুশরিক এবং মূর্তি পূজারী কাফির আহলি কিতাবের চেয়েও মারাত্মক কাফির। (সূরা তাওবা ঃ ৮৪)

২. এ বছর হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশী ইনতিকাল করেন। ওহীর মাধ্যমে ঐ দিনই রাসূল (সা)-কে তাঁর ওফাতের খবর অবহিত করা হয়। নবী (সা) সাহাবাগণকে একত্র করে তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।

৩. এ বছরই সুদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। এক বছর পর নবী (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে এ বিষয়ে সাধারণ ঘোষণা প্রদান করেন।

৪. এ বছরই স্ত্রীদের সাথে লি'আন (لعان) সংক্রান্ত বিধান নাযিল হয়। এ সম্পর্কে সূরা নূরে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৫. যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তবে শুধু ইসলামী শাসনের অধীনে থাকতে সম্মত হয়েছে তাদের জিযিয়া প্রদান সম্পর্কে এ বছরই কুরআনের আয়াত নাযিল হয়।

وَقَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَيُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلاَيَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُو الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ ـ

" তোমরা যুদ্ধ কর আহ্লি কিতাবের ঐ লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম হিসেবে মানে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে।" (সূরা তাওবা ঃ ২৯)

جزيه শব্দটি جزاء থেকে আগত অর্থাৎ এই প্রতিফল বা শাস্তি হলো কুফরীর। অসম্মান ও ঘৃণা হিসেবে আযাদ, জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক থেকে তা আদায় করা হয়। জিযিয়া আদায়ের উদ্দেশ্য হলো যাতে এর দ্বারা কাফিরদের শক্তি-সামর্থ্য দুর্বল এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং শাসকদের সামনে তাদের মাথা নত হয়ে যায়। শরী'আতের পরিভাষায় এদেরকে 'যিম্মী' বলা হয়। ذمى – ذمة থেকে এসেছে অর্থাৎ যাদের জীবন, ধন সম্পদ ও সম্মান মর্যাদা এ সব কিছুর যিম্মাদার হলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআন ও হাদীসে কাফিরদের থেকে জিযিয়া গ্রহণের যে বিধান দেয়া হয়েছে, তা প্রাণ রক্ষার বদলে নয় অর্থাৎ জিযিয়ার কারণ এটা নয় যে, যিম্মী স্বয়ং নিজকে হিফাযত করতে পারবে না এবং আমরা শত্রুদের থেকে তাদেরকে হিফাযত করছি। কেননা যিম্মীদের নারী, শিশু, বৃদ্ধ , পঙ্গু ও সন্ন্যাসীদেরকেও হিফাযত করা হয় কিন্তু তাদের উপর জিযিয়া নেই, বরং জিযিয়া ঐ লোকদের থেকে আদায় করা হয় যারা জিহাদে হত্যার উপযুক্ত হয়েছিল। এ জন্য ফকীহ্গণ বলেছেন, জিযিয়া হলো হত্যার বদলা, যা শুধু স্বাধীন, সুমস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের থেকে গ্রহণ

করা হয়। যাদের সাথে এই ভিত্তির উপর চুক্তি হয় যে, উভয় পক্ষের স্বাধীনতাকে সংরক্ষণে করা হবে। শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের লোককে মু'আহিদ (معاهد) অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ বলা হয়।

দশম হিজরী বিভিন্ন প্রতিনিধির আগমন (عام الوفود)

আরবে সবচেয়ে বৃহৎ ছিল কুরায়শ গোত্র। এই গোত্রের নেতৃত্ব সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল। জ্ঞানবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, দানশীলতা এবং বীরত্বে তাঁরা খ্যাত ছিল। বায়তুল্লাহ এবং হেরেমের রক্ষক ছিল। কিন্তু ইসলামের বিরোধিতা ও শক্রতা পোষণে কঠোর ছিল। আরবের গোত্রসমূহের দৃষ্টি কুরায়শদের উপর এ জন্য নিবদ্ধ ছিল যে, তাদের হাতে রাসূল (সা) এর কী পরিণতি হয়।

কুরায়শদের যুবকগণ শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ ধারা অব্যাহত থাকে কিন্তু বৃদ্ধরা বাকী ছিল। যখন বিজয় হয় এবং বৃদ্ধগণও ইসলাম গ্রহণ করে না তখন আরবগণ এটা উপলব্ধি করে যে, দ্বীন ইসলাম হলো দ্বীনে ইলাহী বা আল্লাহর দ্বীন। এই দ্বীন অবশ্যই সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। কোন শক্তিই এর বিরোধিতা করে সফল হতে পারবে না। এ জন্যই মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই চতুর্দিক থেকে দূতগণ আগমন করতে থাকে এবং প্রত্যেক গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি রাসূল (সা)-এর দরবারে হাযির হতে থাকে। ইসলামের হাকীকত উপলব্ধি করে নিজেও ইসলাম গ্রহণ এবং স্বীয় গোত্রের সবাইকে ইসলাম গ্রহণ করানোর অঙ্গীকার করে ফিরে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ـ

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি লোকজনকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।" (সূরা নাসর ঃ ১-৩)

৮ হিজরীর শেষ ভাগ থেকে ১০ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হয়। কিন্তু ১০ হিজরীতে এই প্রতিনিধি দলের আগমন অধিক হারে অব্যাহত থাকে। এ জন্য এই দু'টি সালকে عام الوفود বলা হয়। ইবন সা'দ, দিমইয়াতী, মুগলাতাঈ এবং ইরাকী প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ষাট থেকে কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন। আল্লামা কাস্‌তাল্লানী মাওয়াহিবে পঁয়ত্রিশটি প্রতিনিধির কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

---

১. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ২।

১. হাওয়াযিন প্রতিনিধি দল

মক্কা বিজয়ের পর হাওয়াযিন প্রতিনিধি দল সর্বপ্রথম নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হুনায়নের যুদ্ধের বর্ণনা অতিক্রান্ত হয়েছে। যখন রাসূল (সা) জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় হাওয়াযিন গোত্রের চৌদ্দ ব্যক্তির একটি দল তাদের মাল ও কয়েদীদেরকে মুক্ত করার জন্য রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। এই দলে হুযুর (সা)-এর রিযাঈ (رضاعى) চাচা ছিলেন। হযরত হালিমা সা'দীয়া ছিলেন এই গোত্রের। যুহায়র ইবন সূরাদ সাদী ও জাশমী এ প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন। তারা দাঁড়িয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ সমস্ত কয়েদীদের মধ্যে আপনার খালা ও রিযাঈ ফুফু এবং লালন পালনকারী রয়েছে। যারা কোন কোন সময় আপনাকে বুকে (শিশুকালে) নিয়েছেন। যদি আমরা হারিস গাস্সানী এবং নু'মান ইবন মুনযিরকে দুধ পান করাতাম, তা হলে এ ধরনের বিপদে তার নিকট মুক্তির আশা করতাম। আপনি তো সবচেয়ে উত্তম দায়িত্ব গ্রহণকারী। অতঃপর এ কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

أُمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ كَرَمٍ * فَاِنَّكَ الْمَرْءُ نرجوه وننتظر

" হে আল্লাহর রাসূল, স্বীয় করুণা ও দয়া দ্বারা আমাদের প্রতি ইহসান (সদ্ব্যবহার) করুন। নিশ্চয়ই আপনি এরূপ ব্যক্তি যার থেকে আমরা মেহেরবানী ও সহানুভূতির আশা এবং অপেক্ষায় রয়েছি।"

أُمْنُنْ عَلٰى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَرٌ * مُمَزَّنٌ شَمْلُهَا فِىْ دَهْرِهَا غَيْرُ ـ

"ঐ গোত্রের প্রতি ইহ্সান করুন যাদের প্রয়োজনকে ভাগ্য থামিয়ে দিয়েছে। যুগের পরিবর্তনে তাদের শৃংখলা বিনষ্ট হয়েছে।"

يَاخَيْرَ طِفْلٍ وَمَوْلُوْدٍ وَمُنْتَخَبٍ * فِىْ الْعَالَمِيْنَ اِذَا مَا حَصَّلَ الْبَشَرُ

" এবং সারা বিশ্বের জন্য আপনি উত্তম ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত। হে সর্বোত্তম জাতক, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সন্তান"

اِنْ لَمْ تُدَارِكُهُمْ نَعْمَاءُ تَنْشُرُهَا * يَا اَرْجَعَ النَّاسِ حِلْمًا حِيْنَ تُخْتَبَرُ

"যদি আপনার নিয়ামত ও ইহ্সান তথা সাহায্য তারা না পায় তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। হে ঐ সত্তা যার ধৈর্য সর্বাধিক এবং পরীক্ষার সময় তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, আমাদের উপর ইহসান করুন।"

أُمْنُنْ عَلٰى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتُ تَرْضَعُهَا * اِذْفُوْكَ تَمْلَؤُهُ مِنْ مَحْضِهَا الدَّرُّ ـ

"ঐ সমস্ত মহিলার প্রতি ইহ্সান করুন যাদের দুধ আপনি পান করেছেন এবং তাদের খালিস ও প্রবাহিত দুধ দ্বারা আপনি স্বীয় মুখ ভর্তি করেছেন।"

لَاتَجْعَلَنَّا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ * وَاسْتَبِقْ مِنَّا فَاِنَّا مَعْشَرُ زُهُرُ

"আমাদেরকে ঐ সমস্ত লোকের মত করবেন না যাদের পদস্খলন হয়েছে এবং আপনার দান ও দয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ দিন। কেননা আমরা ভদ্র পরিবারের লোক হওয়ায় কারো দয়া ও করুণার কথা ভুলে যাইনি।"

اِنَّا لَنَشْكُرُ لِلنَّعْمَاءِ اِذْ كُفِرَتْ * وَعِنْدَنَا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ مَدَّخَرُ

"নিশ্চয়ই আমরা নিয়ামত ও ইহ্সানের অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকি যখন মানুষ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আজকের দিনের পর আমাদের নিকট অনেক সঞ্চিত ধন থাকবে।"

فَالْبِسِ الْعَفْوَ مِنْ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهُ * مِنْ اُمَّهَاتِكَ اِنَّ الْعَفْوَمُشْتَهَرَ

"সুতরাং আপনি যাদের দুধ পান করেছেন ঐ মায়েদেরকে ক্ষমা করুন। কেননা আপনার ক্ষমা তো খুবই প্রসিদ্ধ।"

يَاخَيْرَ مَنْ مَرِحَتْ كُمْتُ الجِيَادِ بِهِ * عِنْدَ الْهِيَاجِ اِذَا مَا اسْتُوْقِدَ الشَّرَرُ

"আপনি এরূপ উত্তম ব্যক্তি যার আরোহণে কুমিত ঘোড়া (কাল মিশ্রিত লাল রং এর ঘোড়া) আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে, ঐ সময়, যখন যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে।"

اِنَّا نُؤَمِّلُ عَفْوًا مِنْكَ تُلْبِسُهُ * هٰذِى الْبَرِيَّةَ اِذْ تَعْفُوا وَتَنْتَصِرُ

"আমরা আপনার নিকট এরূপ ক্ষমার আশা করছি যে, ক্ষমা ও সাহায্যের গুণাবলী আপনার মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে।"

فَاغْفِرْ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا اَنْتَ رَاهِبُهُ * يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذْ يُهْدِى لَكَ الظَّفَرُ

"সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আল্লাহ আপনাকে কিয়ামতের বিপদাশংকা থেকে হিফাযত করবেন এবং আপনাকে সফলতা দান করবেন।"

কোন কোন রিওয়ায়াতে কিছু আরো অতিরিক্ত কবিতা রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, (আর রওযুল উনুফ, ২ খ, পৃ. ৩০৬, উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ১৯৬, যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৩)।

নবী (সা)-এর জবাব

নবী (সা) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করেছি। তোমরা আগমন না করায় আমি মাল আসবাব এবং কয়েদীদেরকে বন্টন করে দিয়েছি। এখন দু'টির মধ্যে একটি গ্রহণ করতে পার। মাল ও আসবাব নিয়ে যাও অথবা পরিবারবর্গকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পার। প্রতিনিধি দল বললো, পরিবার-পরিজন আমাদের নিকট অধিক প্রিয়। রাসূল (সা) বললেন, আমার এবং গোত্র বনূ আবদুল মুত্তালিবের অংশ আমি তোমাদেরকে প্রদান করলাম। বাকী অন্যান্য মুসলমান যে অংশ পেয়েছে, তা পাওয়ার

জন্য আমি তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করব। সুতরাং তিনি সুপারিশ করেন। সবাই আনন্দচিত্তে সমস্ত কয়েদী আযাদ করে দেন। দু'চারজন কিছুটা অনীহা প্রকাশ করেন। নবী (সা) তাদের বদলা প্রদান করে দেন। এভাবে প্রতিনিধি দল তাদের ছয়হাজার শিশু-কিশোর এবং নারীকে মুক্ত করে নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত ঘটনা গাযওয়ায়ে হুনায়নে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. সাকীফ প্রতিনিধি দল

৯ হিজরীর রমযান মাসে সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূল (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে নবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। এটা ঐ সাকীফ গোত্র যাদের দ্বারা রাসূল (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম তাফে অবরোধের সময় অত্যন্ত কষ্টভোগ করেন এবং তায়েফের দূর্গ বিজয় না করে ভগ্ন হৃদয়ে মদীনা ফিরে আসেন। নবী (সা) যখন অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে আসেন, তখন কোন একজন আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)-আপনি তাদের জন্য বদ্‌দু'আ করুন, তাদের তীর আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। নবী (সা) বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا وَأْتِ بِهِمْ مُسْلِمِيْنَ

"হে আল্লাহ সাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দান কর এবং মুসলমান হিসেবে আমার নিকট প্রেরণ কর।" (তিরমিযী)।

নবী (সা)-এর দু'আ কবূল হয় এবং উরওয়া ইবন মাসঊদ সাকাফীর শাহাদাতের আট মাস পর এবং রাসূল (সা)-এর তাবূক থেকে ফিরে আসার পর মদীনা শরীফে হাযির হয়ে সাকীফ প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করে নবী (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। আব্‌দ ইয়ালীল-এর নেতৃত্বে ছয় ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল মদীনা রওয়ানা হয়। হয়ত তারা বিদ্রোহী ছিল অথবা জোশ ও জযবা ও ইসলামের আকর্ষণেই নবী করীম (সা)-কে দরবারে স্বইচ্ছায় হাযির হয়। ফলে তাদের আগমনে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন। হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) সর্বপ্রথম তাঁদেরকে দেখতে পান এবং সাথে সাথে রাসূল (সা)-কে অবহিত করার জন্য দ্রুত গমন করেন। পথিমধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সাক্ষাত হয়, সংবাদ অবহিত হয়ে হযরত আবূ বকর (রা) হযরত মুগীরা ইবন শু'বাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলেন, আমাকে অনুমতি দাও, আমি নবী (সা)-কে এ সুসংবাদ অবহিত করি। হযরত মুগীরা (রা) অনুমতি প্রদান করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূল (সা)-এর দরবারে গিয়ে এই প্রতিনিধি দলের আগমনের সুসংবাদ অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের অবস্থানের জন্য মসজিদে নব্বীতে এক বিশেষ তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়ে দেন, (যাতে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করতে পারে এবং নামায ও মুসল্লীদেরকে দেখতে পারে)। তাদের সেবা

যত্নের দায়িত্ব খালিদ ইবন সাঈদ ইবনুল আ'স-এর উপর অর্পণ করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত খালিদ ইবন সাঈদ ঐ খাদ্য থেকে না খেতেন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিনিধি দলের লোকজন ঐ খাদ্য আহার করত না এবং নবী (সা)-এর নিকট প্রতিনিধি দলের যা কিছু বলার থাকত, তারা এটা খালিদ ইবন সাঈদের মাধ্যমে বলত। প্রতিনিধি দল খালিদের মাধ্যমে আশ্চর্যজনক শর্তাবলী পেশ করে।

১. তাদের জন্য নামায মওকুফ করে দিতে হবে।

২. লাত (যা তাদের বড় দেবতা)-কে তিন বছর পর্যন্ত ধ্বংস করা যাবে না। শিশু ও নারীরা এর উপর অত্যন্ত আসক্ত।

৩. আমাদের দেবতা স্বয়ং আমাদের হাতে ভাঙ্গা যাবে না।

নবী (সা) প্রথম দু'টি শর্ত সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ لاخير فى دين لاصلوة فيه (ঐ দ্বীনে কোন কল্যাণ নেই যাতে নামায নেই)। তৃতীয় শর্ত সম্পর্কে বলেন, এটা গ্রহণ করা যেতে পারে, অতঃপর সবাই ইসলাম গ্রহণ করে এবং দেশে ফিরে যায়। ঐ প্রতিনিধি দলের মধ্যে উসমান ইবন আবুল আ'স সর্ব কনিষ্ঠ ছিল। তাকে আমীর ও হাকিম নিযুক্ত করা হয়। ইল্‌ম দ্বীন, কুরআন ও ইসলামী মাসায়েল শিক্ষার তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। ফলে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ইঙ্গিতে তাকে আমীর নিযুক্ত করা হয়। তার সাথে আবূ সুফিয়ান ইবন হারব এবং মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-কে লাত নামক দেবতা ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। আবূ সুফিয়ান কোন কারণে পিছনে থেকে যান। হযরত মুগীরা (রা) সেখানে গিয়ে দেবতার উপর প্রচণ্ড আঘাত করেন। সাকীফ গোত্রের নারীগণ খোলা মাথা ও খোলা পায়ে এ দৃশ্য দেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে। মুগীরা (রা) দেবতা ভেঙ্গে ফেলেন এবং মন্দিরে যে মাল-আসবাব ও অলংকার ছিল, সমস্ত নিয়ে আসেন। প্রথমত ঐ সম্পদ থেকে উরওয়া ইবন মাসঊদ সাকাফীর পুত্র আবূ ফালীহ এবং উরওয়ার ভাতিজা কারিব ইবন আসওয়াদ-এর ঋণ পরিশোধ করেন। অবশিষ্ট মালামাল রাসূল (সা) খেদমতে হাযির করেন। নবী (সা) তখনই ঐ মাল মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন যে, তিনি তাঁর সাহায্য করেছেন, স্বীয় নবীকে মর্যাদা দান করেছেন। উরওয়া ইবন মাসঊদের শাহাদাতের পর তায়েফের বাসিন্দাগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন সাকীফ প্রতিনিধি দলের উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আবূ ফালীহ ইবন উরওয়া এবং কারিব ইবন আসওয়াদ নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! লাত দেবতার মন্দির থেকে প্রাপ্ত মাল হতে আমাদের পিতা উরওয়া ও আসওয়াদের ঋণ পরিশোধ করে দিন। উরওয়া ও আসওয়াদ ছিল সহোদর ভাই। উরওয়া ইসলাম গ্রহণের পর শাহাদাত বরণ করেন। আবূ ফলীহ হলেন উরওয়ার পুত্র এবং আসওয়াদ কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কারিব

হলো আসওয়াদের পুত্র। তারা উভয়ে তাদের পিতার ঋণ আদায়ের আবেদন করেন। নবী (সা) বললেন, আসওয়াদ মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, কারিব ইবন আসওয়াদ বলেন, নিঃসন্দেহে সে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু ঋণ আদায়ের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। নবী (সা) আবূ সুফিয়ানকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, লাত দেবতার মন্দির থেকে প্রাপ্ত মালামাল থেকে আবূ ফালীহ এবং কারিব ইবন আসওয়াদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা কর।[১]

৩. বনূ আমির ইবন সা'সা গোত্রের প্রতিনিধি দল

তাবূক থেকে ফিরে আসার পর বনূ আমির ইবন সা'সার প্রতিনিধি দল নবী (সা) এর খেদমতে হাযির হয়। এই দলে আমির ইবন তুফায়ল এবং ইরবাদ ইবন কায়সও ছিল। কথাবার্তার সময় তারা রাসূল (সা)-কে এভাবে সম্বোধন করে اَنْتَ سَيِّدُنَا (আপনি আমাদের সরদার বা নেতা)। নবী (সা) বললেন, তোমরা নিজের কথা বলো। শয়তান যেন তোমাদের সাথে ঠাট্টা করতে না পারে। সরদার হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। প্রকাশ্যে তারা সুমিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে কিন্তু গোপনে আমির ইরবাদকে এই পরামর্শ দান করে যে, যখন আমি মুহাম্মদকে কথার মধ্যে নিমগ্ন করে ফেলব, তখন তুমি খুব দ্রুত তলোয়ার দ্বারা তাঁর কাজ শেষ করবে (অর্থাৎ হত্যা করবে)।

আমীর রাসূল (সা)-এর সাথে কথা আরম্ভ করে বলে, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আমাকে আপনার বিশেষ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন। নবী (সা) বললেন, কখনো নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এক আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন না করবে। আমীর বললো, যদি আমি মুসলমান হয়ে যাই তা হলে আপনি আমাকে কি প্রদান করবেন? নবী (সা) বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য মুসলমানদের মতই তোমার অধিকার ও বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে। আমীর বললো, আপনার পর হুকুমত ও খিলাফত আমাকে দান করবেন। রাসূল (সা) বললেন, কখনো নয়। আমীর বললো, আচ্ছা মরুভূমি এলাকা আপনি শাসন করুন এবং শহর ও আবাদি এলাকার শাসনভার আমাকে প্রদান করুন, নতুবা আমি গাতফান গোত্রের লোকজন নিয়ে আপনার উপর আক্রমণ করব এবং মদীনা আরোহী ও পদাতিক দিয়ে ভর্তি করে দিব।

নবী (সা) বললেন, আল্লাহ তোমাকে এ ক্ষমতা দিবেন না কথা শেষ হওয়ার পর যখন উভয়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন নবী (সা) দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আমীর ইবন তুফায়লের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর এবং তার কাওমকে হিদায়াত দান কর। বাইরে আমীর ইরবাদকে বললো, আফসোস! আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তুমি কোন শব্দই করলে না! ইরবাদ বললো, আমি যখনই তলোয়ার কোষমুক্ত করেছি তখনই কিছু একটা দৃষ্টিগোচর হতো। একবার লোহার প্রাচীর, আর একবার এক উট দৃষ্টিগোচর হয় যা আমার মাথা গিলে ফেলার উপক্রম করে।

১. যারকানী, ৪ খ., পৃ. ৫-৬

এই প্রতিনিধে দল যখন রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে ফিরে যায়, তখন আমীর ইবন তুফায়ল পথে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। আরবে যেহেতু বিছানার উপর মৃত্যু হওয়া অসম্মানজনক মনে করা হয়, ফলে আমীর বললো, আমাকে ঘোড়ার উপর বসিয়ে দাও। ঘোড়ার উপর আরোহণ করে হাতে বর্শা নিয়ে বললো, হে মৃত্যুর ফেরেশতা! আমার নিকট এসো। এটা বলতে বলতে সে ঘোড়ার উপর থেকে ছিটকিয়ে পড়ে। ঐ স্থানেই তাকে দাফন করা হয়। প্রতিনিধিদল যখন বনূ আমীরের এলাকায় পৌঁছে, তখন লোকজন ইরবাদের নিকট অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করে। ইরবাদ জবাবে বলে, নবী (সা)-এর দ্বীন খুবই খারাপ। আল্লাহর শপথ! যদি ঐ ব্যক্তি (নবীজীর দিকে ইঙ্গিত করে) এ মুহূর্তে আমার সামনে থাকত, তাহলে আমি তাঁকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতাম। দু'দিন পর সে উটে আরোহণ করে বের হয়। হঠাৎ আকাশ থেকে তার উপর বিদ্যুৎ পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। আমীর ও ইরবাদ এমনই দুর্ভাগ্য যে, ইসলাম গ্রহণ না করে ফিরে আসে। কিন্তু প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ি ফিরে আসে।[১]

৪. আবদুল কায়স প্রতিনিধি দল

আবদুল কায়স প্রতিনিধি দল বাহরাইনের বাসিন্দা ছিল। এ গোত্র ছিল অত্যন্ত বিশাল। এ গোত্রের প্রতিনিধি দল দু'বার নবী (সা)-এর খেদমতে আগমন করেছিল। প্রথমত, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ৫ম হিজরী অথবা এর পূর্বে আগমন করেছিল। এ সময় প্রতিনিধি দলে তের বা চৌদ্দ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূল (সা) তাদের উদ্দেশ্য বলেন, مرحبا بالقوم غير خزايا ولاندامى (মুবারকবাদ এই কাওমকে যারা অপদস্থ হবে না, লজ্জিতও হবে না। অর্থাৎ স্বইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, যুদ্ধ করে মুসলমান হয়নি, যার ফলে তাদের অপদস্থ ও লজ্জিত হতে হত)।

প্রতিনিধি দল আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও আপনাদের মধ্যে মুযির গোত্রের কাফির সম্প্রদায় প্রতিবন্ধক রয়েছে। শুধু হারাম মাস (৪টি)-সমূহে আমরা আপনার খেদমতে হাযির হতে পারি, যে মাসে আরবগণ লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড হারাম মনে করে। কাজেই আপনি আমাদেরকে কিছু পূর্ণাঙ্গ ও সংক্ষিপ্ত আমল শিক্ষা দিন, যা আমল করে আমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব এবং শহরবাসীকেও আমরা দাওয়াত প্রদান করতে পারব। নবী (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং সাক্ষী প্রদান কর যে, আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, নামায আদায় কর, যাকাত দান কর, গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য রেখে দাও। এছাড়া চারটি বস্তু ব্যবহার করা নিষেধ করেছেন। এগুলো হলো-দুব্বা

১. যাদুল মা'আদ। ৩ খ. পৃ. ২৯।

(লাউয়ের শুষ্ক খোল), নাকীর (কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র), হানতাম (তৈল মালিশ করা সবুজ রঙের কলসী) এবং মুযাফ্ফাত (মেটে তৈল মালিশ করা মাটির পাত্র)। (সহীহ বুখারী)

মুসনাদে আহমাদ এবং আবু দাউদের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, যখন এই প্রতিনিধি দল মদীনায় পৌছে, তখন নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্খায় এ সমস্ত লোক সাওয়ারী থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং নবী (সা)-এর খেদমতে দ্রুত হাযির হয়ে পবিত্র হাতে চুমু দেয়। এই দলে আশাজ্জ আবদুল কায়সও ছিলেন, তাঁর নাম ছিল মুনযির। তিনি ছিলেন সবচেয়ে কম বয়স্ক । তিনি সেখানে পৌছার পর প্রথমত, সমস্ত উট বাঁধলেন এবং সমস্ত সামান এক স্থানে জমা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর থলে থেকে দু'টি পরিষ্কার সাদা কাপড় বের করে তা পরিধান করে রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে প্রথমত তাঁর সাথে মুসাফাহা করেন এবং নবী (সা)-এর পবিত্র হাতে চুমা দেন। নবী করীম (সা) বললেন, তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল পসন্দ করেন। একটি ধৈর্যশীলতা অপরটি ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য। আশাজ্জ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দু'টি গুণ কি আমার মধ্যে কৃত্রিম? অথবা প্রকৃতিগত রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এই গুণ ও স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন। আশাজ্জ বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাকে এমন দু'টি গুণ দান করেছেন, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) পসন্দ করেন।

এটা ছিল প্রথমবারের ঘটনা। ৮ম অথবা ৯ম হিজরীতে আবদুল কায়স প্রতিনিধি দল চল্লিশ ব্যক্তির সমন্বয়ে দ্বিতীয়বার নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়েছিল। সহীহ ইবন হিব্বানের রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। তিনি তখন বলেছিলেন ঃ مالى ارى الوانكم تغيرت। কি হয়েছে যে, আমি তোমাদের রং পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ সমস্ত লোক প্রথমবারও আগমন করেছিল।[১]

৫. বনূ হানীফার প্রতিনিধি দল (৯ হিজরী)

৯ হিজরীতে বনূ হানীফার এক প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। এই দলে অত্যন্ত চতুর ও ফিতনাবাজ মুসায়লামা কায্যাব ছিল। কিন্তু অহংকারের কারণে সে নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়নি। স্বয়ং রাসূল (সা) সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাসকে সাথে নিয়ে তার নিকট গমন করেন। মুসায়লামা বলে, যদি আপনি আমাকে খিলাফত দান করেন এবং আপনার পর আমাকে আপনার প্রতিনিধি মনোনীত করেন, তাহলে আমি বায়'আতের জন্য প্রস্তুত আছি। রাসূল (সা)-এর পবিত্র হাতে তখন খেজুরের এক ছড়ি ছিল। তিনি বলেন, যদি তুমি এই ছড়িটিও চাও তবুও তোমাকে তা দেব না। আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তুমি এর

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৬৭; যারকানী, ৪ খ, পৃ. ১৩

থেকে সামান্য পরিমাণ অতিক্রম করতে পারবে না। খুব সম্ভব তুমিই ঐ ব্যক্তি যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে এবং এই সাবিত ইবন কায়স তোমার জবাব দেবে। এটা বলে তিনি (সা) ফিরে আসেন।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী (সা)-কে স্বপ্নে কি দেখানো হয়েছে? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (সা) ইরশাদ করেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পাই যে, আমার হাতে স্বর্ণের দু'টি চিরুনী রাখা হয়েছে। যার ফলে আমি একটু ভয় পেয়ে যাই। স্বপ্নেই আমাকে বলা হয় যে, এতে ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দেয়ার সাথে সাথেই তা উড়ে গেল। এর ব্যাখ্যা হলো এই যে দু'জন মিথ্যাবাদী প্রকাশ হবে। এ দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী হলো মুসায়লামা[১] আর অপরজন হলো আসওয়াদ আনসী।[২] আসওয়াদ আনসী হুযুরের জীবিত কালেই নিহত হয় এবং মুসায়লামা কায্যাব হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর খিলাফতকালে নিহত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ৩

---

১. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবার থেকে ফিরে যাওয়ার পর মুসায়লামা নবুওয়াতের দাবি করে এবং লোকজনের নিকট মিথ্যা বলে যে, নবী (সা) আমাকে তাঁর অংশীদার করে নিয়েছেন।

২. আসওয়াদ আনসী যখন নবুওয়াতের দাবি করে তখন নবী (সা) ফিরোয দায়লামী (রা)-কে কয়েকজন অশ্বারোহী সহ তাকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন এবং মৃত্যু রোগের সময় তার হত্যার সংবাদ পৌছে। আবদুর রহমান সুমালী এ বিষয়ে নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

لعمری وماعمری علی بهلين * لقد جرعت عنس لقتل الاسود

"আমার জীবনের শপথ এবং আমার শপথ সাধারণ শপথ নয়। আনস গোত্র আসাওয়াদ আনসীর হত্যায় ভীত হয়ে পড়েছে।"

وقال رسول الله سيروا لقتله * على خير موعود واسعد اسعد

"রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গমন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং উত্তম ওয়াদা ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।"

فسرنا اليه فی فوارس بهمة * علی حين امر من وصاة محمد ۔

"অতঃপর আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশ ও ওসীয়্যত অনুযায়ী তাকে (আসওয়াদ আনসী (রা)-কে হত্যার জন্য রওয়ানা হয়ে যাই।"

হযরত উরওয়া (রা) বলেন, নবী (সা)-এর ওফাতের একদিন ও এক রাত পূর্বে আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করা হয়। ঐ সময়ই রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে এ সংবাদ অবহিত করা হয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বিষয়টি অবহিত করেন। এরপর হযরত আবূ বকর (রা) যখন খলীফা মনোনীত হন তখন দূত এ সংবাদ নিয়ে আসে। কেউ কেউ বলেন, নবী (সা)-এর দাফনের দিন দূত এ সংবাদ নিয়ে আগমন করে। (ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৭৩)

৩. ফাতহুল বারী, ৮ খ. পৃ. ৭০; যারকানী, ৪খ, পৃ. ১৯।

অতঃপর ১০ম হিজরীতে মুসায়লামা কাযযাব নবী (সা)-এর নিকট নিম্নলিখিত পত্র লিখে প্রেরণ করে ঃ

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله أما بعد فانى قد أشركت معك فى الامر وان لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا لاينصفون والسلام ـ

" আল্লাহর রাসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আমাকে আপনার কাজের সাথে শরীক করা হয়েছে। অর্ধেক যমীন আমার জন্য, আর অর্ধেক যমীন কুরায়শদের জন্য। কিন্তু কুরায়শগণ ইনসাফ করে না, ওয়াসসালাম।

নবী (সা) উক্ত পত্রের জবাবে লিখেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب اما بعد فالسلام على من اتبع الهدى فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ـ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুসায়লামা কাযযাবের নিকট যারা হিদায়তের অনুসরণ করে, তাদের উপর সালাম। নিশ্চয়ই যমীন আল্লাহর, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে দান করেন। উত্তম পরিণতি তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে।"

এ ঘটনা বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর সংঘটিত হয়।[১]

৬. তায় প্রতিনিধি দল

তায় গোত্রের পনের ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল ১০ম হিজরীতে রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাদের নেতা ছিল যায়দুল খায়ল (زيد الخيل)। নবী (সা) তাদের নিকট ইসলাম পেশ করেন। সবাই আনন্দ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে এবং যায়দুল খায়ল-এর নাম যায়দুল খায়র রাখেন। সে এটা বলে যে, আরবের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির আমি প্রশংসা শুনেছি একমাত্র আপনাকে ব্যতীত আর সবাইকে এর চেয়েও কম পেয়েছি।[২]

৭. কিনদাহ্ প্রতিনিধি দল

কিনদাহ্ ইয়ামনের একটি গোত্রের নাম। ১০ম হিজরীতে আশিজন অশ্বারোহীর একটি প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাদের নেতা ছিল

১. ইবন আসীর, ২ খ, পৃ. ১৪৫
২. উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৩৬

আশ'আস[১] ইবন কায়স। যখন তারা রাসূল (সা) দরবারে হাযির হয় তখন তারা সানজাফ রেশমের জুব্বা পরিহিত ছিল। নবী (সা) বললেন, তোমরা কি মুসলমান নও? তারা আরয করলো, নিঃসন্দেহে আমরা মুসলমান। রাসূল (সা) বলেন, তাহলে তোমাদের গর্দানে এই রেশমের বস্ত্র কেন? তৎক্ষণাৎ তারা ঐ সমস্ত পোশাক ছিঁড়ে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়।

মাসয়ালা ঃ সানজাফ (রেশম) যদি অল্প পরিমাণ হয়, যেমন চার অঙ্গুলী পরিমাণ ব্যবহার জায়িয আছে। স্বয়ং নবী করীম (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ফারূকে আযম (রা) থেকে এটা পরিধান করার দলীল রয়েছে। খুব সম্ভব ঘটনার সময় সানজাফ রেশমের পরিমাণ পরিমাণের চেয়ে অধিক ছিল।, ফলে এটা ব্যবহারে নিষেধ করেন।[২]

৮. আশ'আরীঈন প্রতিনিধি দল

আশ'আরীঈন ইয়ামানের একটি মর্যাদাবান ও বিরাট গোত্র। তারা তাদের প্রপিতামহসহ উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের দিকে নিজদেরকে সম্বন্ধ করে থাকে। আশ'আর (اشعر)-কে এ জন্য আশ'আর বলা হয় যে, যখন তারা ভূমিষ্ট হয়, তখন তাদের দেহে অনেক লোম হয়ে থাকে এবং আশ'আর সিফাতের সিগাহ, شعر এর অর্থ অসংখ্য লোম। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ছিলেন এই গোত্রের। এ সমস্ত লোক অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই পংক্তিপাঠ করতে করতে রওয়ানা হয় ঃ

غدا نلقى الاحبه * محمد او جف به

"আগামীকাল আমরা বন্ধুর সাথে মিলিত হব অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) তার দলের সাথে।"

এ দিকে নবী (সা) এ সংবাদ প্রদান করেন যে, একটি দল আগমন করেছে যাদের অন্তর অত্যন্ত নরম। ইতোমধ্যে আশ'আরীঈন দল রাসূল (সা)-এর খেদমতে এসে পৌঁছে। তিনি সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ইয়ামনের বাসিন্দাগণ আগমন করেছে যাদের অন্তর অত্যন্ত নরম ও কোমল (অর্থাৎ কঠোরতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র), দ্রুত সত্যকে গ্রহণ করে। এমন কঠোর নয় যে, কোন উপদেশ ও হিকমতের তাদের উপর প্রতিক্রিয়া না হয়। তাদের অন্তর কোমল হওয়ার ফল হলো এই যে, তাদের অন্তর ঈমান ও ইরফানের খনি এবং ইল্‌ম ও হিকমতের উৎস হয়ে দাঁড়ালো। নবী করীম (সা) সত্য বলেছেন, কোমল অন্তর সমস্ত কল্যাণের উৎস এবং অন্তরের কঠোরতা সমস্ত অনিষ্টতার মূল।

---

১. আশ'আস ইবন কায়স রাসূল (সা)-এর ওফাতের পর মুরতাদ হয়ে যায় কিন্তু হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) হাতে তাওবা করে ফিরে আসে এবং কাদেসীয়া, মাদায়ন, জলুলা এবং নাহাওন্দের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ৪০ অথবা ৪২ হিজরীতে কূফায় ইনতিকাল করেন। (উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৪২)

২. যাদুল মা'আদ ৩ খ, পৃ. ৩৪।

যেহেতু ইয়ামনের বাসিন্দাগণ অধিকাংশ বকরী চরাত, তাই রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, শান্তি ও বিনয় বকরীওয়ালাদের মধ্যে এবং গৌরব ও অহংকার উট পালনকারীদের মধ্যে বিরাজমান। অতঃপর পূর্বদিকে ইশারা করেন।

প্রতিনিধি দল আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দীনের জ্ঞান হাসিল করাও বিশ্ব জগতের সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। নবী (সা) বলেন, সর্ব প্রথম আল্লাহ ব্যতীত কেউ ছিল না এবং তাঁর আরশ পানির উপর ছিল অর্থাৎ পৃথিবীর[১] সৃষ্টির সূচনা পানি ও আরশ থেকে হয়েছে। প্রথম পানি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশ, অতঃপর আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত কিছু লোওহ্ মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

টিকা ঃ ইবন আসাকির বলেন, তাওহীদ ও দ্বীনের মূলনীতি, দুনিয়া সৃষ্টি সম্পর্কে কথা বলা দর্শন ও যুক্তি নিয়ে গবেষণা করা আশ্'আরী গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে অব্যাহত চলে আসছে। এটি ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর [তিনি হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বংশধর ছিলেন] যুগে খুব বেশি প্রসারিত হয়েছিল। ইলম কালামে আহ্লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে তাঁকে নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়।[২]

৯. ইয্দ গোত্রের প্রনিনিধি দল

ইয্দ গোত্রের পনের ব্যক্তি সূরাদ ইবন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে নবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সা) সুরাদ ইবন আবদুল্লাহকে আমীর নিযুক্ত করেন এবং আশেপাশের এলাকার মুশরিকদের সাথে জিহাদের নির্দেশ প্রদান করেন। সূরাদ মুসলমানদের একটি দল নিয়ে জরশ শহর অবরোধ করেন। এভাবে যখন এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও শহর বিজয় হয়নি, তখন সূরাদ অবরোধ পরিত্যাগ করে ফিরে আসেন। জরশের বাসিন্দারা তাদের ফিরে আসাকে পরাজয় মনে করে পশ্চাদ্বাবণ করে। যখন তারা জাবালে শকরের নিকট পৌঁছে, তখন মুসলমানগণ ঘুরে তাদের উপর আক্রমণ করে, ফলে জরশবাসী পরাজয় বরণ করে।

জরশবাসী ইতিপূর্বে প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দু'ব্যক্তিকে মদীনা প্রেরণ করেছিল। নবী (সা) তাদেরকে ঐ দিনই জাবালে শকরের ঘটনা অবহিত করেন, যে দিন তারা পরাজয় বরণ করে। যখন তারা ফিরে আসে, তখন তারা তাদের গোত্রের লোকদের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপর জরশ গোত্রের একটি দল রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।[৩]

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য বুখারী ও ফাতহুল বারী باب بدء الخلق এবং হাফিয ইবন আসীরের 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দেখা যেতে পারে।

২. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৭৫

৩. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৩৩।

১০. বনূ হারিস প্রতিনিধি দল

বনী হারিস ছিল নজরানের একটি মর্যাদাবান গোত্র। ১০ম হিজরীর রবিউস সানী অথবা জুমাদাল উলা মাসে নবী (সা) খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে এ নির্দেশ প্রদান করে তাদের নিকট প্রেরণ করেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করবে। এরপরও যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে যুদ্ধ করবে। তারা সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত খালিদ (রা) বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে মুবাল্লিগ প্রেরণ করেন। সর্বত্র কোন যুদ্ধ ব্যতীতই লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত খালিদ (রা) এ সুসংবাদ লিখে রাসূল (সা)-এর খেদমতে প্রেরণ করেন। নবী (সা) ঐ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনা আসার জন্য খালিদ (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত খালিদ (রা) তাদের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে রাসূল খেদমতে উপস্থিত হন। এই দলে ছিল কায়স ইবন হুসায়ন, ইয়াযীদ ইবন মাহজাল এবং শাদ্দাদ ইবন আবদুল্লাহ। যখন এ সমস্ত লোক রাসূল খেদমতে উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন ঃ من هؤلاء القوم الذين كانهم رجال الهند

"(এ সমস্ত লোক কোন গোত্রের, সম্ভবত তারা হিন্দুস্থানের)।"

তারা আরয করলো, আমরা হলাম বনূ হারিস। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। যেহেতু তারা বীর বাহাদুর ছিল এবং যে কোন মুকাবিলায় তারা জয়ী হতো। তাই রাসূল (সা) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কিভাবে মানুষের উপর জয় লাভ কর। তারা আরয করলো, আমরা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকি, পরস্পর মতানৈক্য করি না, পরস্পরে হিংসা করি না, কারো উপর অগ্রগামী হয়ে যুলম করি না, বিপদ ও দরিদ্রতার সময় ধৈর্যধারণ করি। নবী (সা) বললেন, তোমরা সত্য বলেছ এবং কায়স ইবন হুসায়নকে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। তাদের চলে যাওয়ার পর আমর ইবন হাযমকে তা'লীম প্রদান করে সাদাকা আদায়ের জন্য এ গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। এবং সাদাকা ও যাকাতের আহকাম লিখে তাঁকে প্রদান করেন।

এ প্রতিনিধি দল শাওয়াল অথবা যিলকা'দ মাসে তাদের গোত্রের নিকট ফিরে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার চার মাসের মধ্যে নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন।[১]

১১. হামদান প্রতিনিধি দল

হামদান হলো ইয়ামনের এক বিরাট গোত্র। নবী (সা) প্রথমত, খালিদ (রা) -কে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য তাদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে ছ'মাস অবস্থান করেন কিন্তু কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। অতঃপর রাসূল (সা) হযরত আলী (রা)-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ পর্যায়ের পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন এবং খালিদ

১. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৩২।

(রা)-কে ফিরে আসার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আলী (রা) সেখানে গমন করে সবাইকে একত্রিত এবং নবী (সা)-এর পত্র পাঠ করে শুনালেন, ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। এক দিনেই সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আলী (রা) পত্রের মাধ্যমে রাসূল (সা)-কে এ ঘটনা অবহিত করেন। এ সংবাদ শুনে তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সিজ্‌দা আদায় করেন এবং আনন্দে কয়েকবার বলেন ঃ السلام على همدان। (হামদান গোত্রের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) সহীহ্ সনদে হযরত বারা'আ ইবন আযিব (রা) থেকে বায়হাকী এ রিওয়ায়াত করেন।

এটা ছিল ৮ হিজরীর ঘটনা, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফ থেকে ফিরে আসেন। এর এক বছর পর যখন রাসূল (সা) তাবূক থেকে ফিরে আসনে, ঐ সময় হামদানের একটি প্রতিনিধি দল মদীনা পৌঁছে। তাদের পরিধানে ছিল ইয়ামনের নকশী করা চাদর আদনের পাগড়ী এবং মোহরকৃত উটে আরোহণ করে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়। এরূপ সহীহ ও বাক্যালংকারের সাথে রাসূল সাথে আলাপ করেন, যার ফলে তারা যে আবেদন করে, নবী (সা) তা মঞ্জুর করেন এবং একটি পত্র লিখিয়ে দেন। এরপর প্রতিনিধি দলের সদস্য মালিক ইবন নমতকে সেখানের আমীর নিযুক্ত করেন। এটা হলো ইবন হিশামের রিওয়ায়াত। এর সনদ দুর্বল। হাসান ইবন ইয়াকূব হামদানী উল্লেখ করেন যে, ঐ প্রতিনিধি দলে একশ বিশজন ছিল।[১]

১২. মুযায়না প্রতিনিধি দল

৫ হিজরীতে মুযায়না গোত্রের চার'শ লোক নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। যাওয়ার সময় রাসূল (সা)-এর নিকট এই আবেদন করে যে, আমাদের কাছে কোন খাদ্য দ্রব্য নেই, আমাদেরকে কিছু খাদ্য দান করুন। নবী করীম (সা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন, তাদেরকে কিছু খাদ্য দ্রব্য ও পথ খরচ দিয়ে দাও উমর (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট এত অধিক পরিমাণ খেজুর নেই যা তাদেরকে চাহিদা অনুযায়ী দেয়া যাবে। রাসূল (সা) বললেন, যাও, তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে দাও। হযরত উমর (রা) তাদেরকে স্বীয় ঘরে নিয়ে যান। সবাই তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খেজুর নিয়ে যায় এবং এর মধ্যে একটি খেজুরও কম হয়নি। (আহমাদ, তাবারানী ও বায়হাকী)।

কাসীর ইবন আবদুল্লাহ আল-মুযানী স্বীয় পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে রিওয়ায়াত করেন, সর্বপ্রথম মুযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূল (সা)-এর খেদমতে আগমন করেন। এ দলে চার'শ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাফিয ইরাকী বলেন ঃ

اوّل وفدٍ وذل والمدينة * سنة خمس وفدوامزينة -

---

১. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৩৭০।

"সর্বপ্রথম মুযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দল মদীনা আগমন করে। এ দল ৫ম হিজরীতে মদীনায় আসে।"

১৩. দাওস প্রতিনিধি দল

৭ হিজরীতে দাওস গোত্রের সত্তর/আশিজন লোক খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে আগমন করে। বিস্তারিত তুফায়ল ইবন আম্‌র দাওসীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। (যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৩৭)

১৪. নজরানের নাসারাদের প্রতিনিধি দল

নজরান ইয়ামনের একটি বিরাট শহর। মক্কা মুকাররমা থেকে সাত মনযিল দূরে অবস্থিত। ৭৩টি ছোট শহর ও গ্রাম নিয়ে এ শহর গঠিত। সর্ব প্রথম নজরান ইবন যায়দ ইবন ইয়াশজাব ইবন ইয়ারাব ইবন কাহ্‌তান এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। তার নামেই এ শহরের নাম নজরান হিসেবে আখ্যায়িত হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা বুরূজে যে قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ উল্লেখ রয়েছে, ঐ এলাকা নজরানের কোন শহর বা গ্রামে অবস্থিত।[১]

নবম[২] হিজরীতে ৬০ ব্যক্তির সমন্বয়ে নজরানের খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল (সা) খেদমতে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিল ১৪ জন। প্রতিনিধি দলের আমীর ও নেতা ছিলেন আবদুল মাসীহ[৩] আকিব। সাইয়্যেদ[৪] আয়হাম ছিলেন পরামর্শদাতার মন্ত্রীর ন্যায় এবং দলের ব্যবস্থাপনাকারী। আবু হারিসা ইবন আলকামা ছিলেন তাদের পাদ্রী, যাকে হাব্‌র ও আসকাফ বলা হতো। আবূ হারিসা মূলত আরবের বকর ইবন ওয়ায়েল গোত্রের ছিল। কিন্তু সে খ্রিস্টান হয়ে যায়। রোমের বাদশাহ তার ইলম ও ফযীলত এবং ধর্মীয় যোগ্যতা ও দৃঢ়তার কারণে তাকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত এবং তাকে বিরাট জায়গীর দান করেন। সাথে সাথে গীর্জার নেতা নিযুক্ত করেন। এ প্রতিনিধি দল অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে মদীনা পৌছে। নবী করীম (সা) তাদেরকে মসজিদে নব্বীতে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন। আসর নামাযের সময় হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর যখন তাদের নামাযের সময় হয় তখন তারা নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সাহাবাগণ বাধা প্রদান করেন কিন্তু রাসূল (সা) বললেন, তাদেরকে নামায পড়তে দাও। অতঃপর তারা পূর্বদিকে মুখ করে নামায আদায় করে। এখানে অবস্থানের সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাদের সাথে বেশ কিছু আলোচনা হয় (ফাতহুল বারী, কিস্‌সায়ে আহলি নজরান ,৮ খ, পৃ.৭৩; শারহে মাওয়াহিব, ৪, পৃ. ৪১)।

১. শারহে মাওয়াহিব, ৪ খ, পৃ. ৪১।

২. এ বর্ণনা ইবন সা'দের, ৭ খ, পৃ.৭৪।

৩. আবদুল মাসীহ হলো নাম, উপাধি হলো আকিব। আয়হাম হলো নাম, অন্যান্যগুলো হলো উপাধি।

সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ)-এর ঈশ্বরত্ব ও পুত্র হওয়ার ব্যাপারে বিতর্ক ও কথাবার্তা শুরু হয়।

নজরানের খ্রিস্টান ঃ যদি হযরত মাসীহ (আ) ইবনুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর পুত্র না হন তা হলে তাঁর পিতা কে?

নবী (সা) ঃ তোমাদের এটা ভালভাবে জানা আছে যে, পুত্র পিতার সাদৃশ হয়ে থাকে।

নজরানের খ্রিস্টান ঃ কেন হবে না, নিশ্চয়ই এরূপই হয়ে থাকে।

ফল হলো এই যে, যদি হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর পুত্র হন তাহলে আল্লাহর সদৃশ হতে হবে। অথচ সবাই এটা অবগত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন উপমাবিহীন।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

"(তাঁর কোন উপমা নেই এবং তাঁর কোন সমকক্ষও নেই)"।

নবী (সা) ঃ তোমরা কি অবগত নও যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ حى لايموت অর্থাৎ তিনি জীবিত, কখনো তাঁর উপর মৃত্যু আসবে না। وان عيسى يأتى عليه الفناء অর্থাৎ হযরত ঈসার (আ) উপর মৃত্যু এবং লয় ও বিলুপ্তি আসবে।

নজরানের খ্রিস্টান ঃ নিঃসন্দেহে এটা সঠিক।

সতর্কবাণী ঃ নবী (সা) এর এ জবাবের দ্বারা (ان عيسى يأتى عليه الفناء) স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ঈসা (আ) এখনো জীবিত ইন্তিকাল হয়নি। ভবিষ্যতে তিনি ইনতিকাল করবেন, অন্যথায় খ্রিস্টানদের আকীদা অনুযায়ী অভিযোগ হিসেবে এ জবাব দেয়া যেত যে, তোমাদের ধারণা ও আকীদা অনুযায়ী নিহত ও শূলীতে চড়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবেন? যেহেতু হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্র মুখ থেকে এমন কোন বাক্য বা অক্ষর বের হতে পারে না যা সত্য ও বাস্তবতা বিরোধী, সুতরাং জবাবে তিনি এটাই বলেছেন যা সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব। আর তা হলো, হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ভবিষ্যত মৃত্যু আসবে। এখনো তাঁর উপর মৃত্যু আগমন করেনি, বরং তিনি জীবিত।

নবী (সা) ঃ তোমরা নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, আমাদের প্রতিপালক প্রতিটি বস্তু প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় রাখেন, তিনিই সমস্ত বিশ্ব জগতের হিফাযতকারী ও তত্ত্বাবধানকারী। সবার রিযিকদাতা, এগুলো মধ্যে হযরত ঈসা (আ) কি কোন বস্তুর মালিক?

নজরানের খ্রিস্টান ঃ- না।

নবী (সা) ঃ তোমরা ভালভাবেই অবগত রয়েছ যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী মায়ের গর্ভে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের এটাও জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা পানাহার করেন না এবং না তাঁর মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয়।

নজরানের খ্রিস্টান ঃ নিশ্চয়ই।

নবী (সা) ঃ তোমাদের ভালভাবেই জানা আছে যে, হযরত মরিয়াম (আ) অন্যান্য নারীদের মত হযরত ঈসা (আ)-কে জন্য গর্ভে ধারণ করেন এবং মরিয়ম সিদ্দীকা তাঁকে এমনিভাবে ভূমিষ্ট করেন, যেভাবে অন্যান্য নারী সন্তান প্রসব করে। অতঃপর অন্যান্য শিশুদের মত তাকে খাদ্য দেয়া হয়েছে, তিনি পানাহার করতেন, মলমূত্র ত্যাগ করতেন।

নজরানের খ্রিস্টান ঃ নিঃসন্দেহে তিনি এরূপেই ছিলেন।

নবী (সা) ঃ তা হলে এর পরও তিনি কিভাবে আল্লাহ হবেন? অর্থাৎ যার জন্ম ও আকৃতি মায়ের গর্ভে হয়েছে, জন্মের পর তাঁর খাদ্যের এবং মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয়েছে তিনি আল্লাহ হবেন কিভাবে?

নজরানের খ্রিস্টান সত্য বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সত্য অনুসরণ করতে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেনঃ

الٓمٓ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ - نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ - اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ - وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ انْتِقَامٍ - اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ - هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ - لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ বা মা'বূদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক-বাহক। তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে, যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের। নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল, এ কিতাবের পূর্বে মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং নাযিল করেছেন ফুরকান (পার্থক্য বা মীমাংসাকারী) নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। তিনি সেই আল্লাহ যিনি তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী মায়ের গর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১-৬)

এ সমস্ত বিতর্ক তাফসীরে দূররে মনসূর, ২ খ, পৃ. ৩, ইবন জারীর ও ইবন আবি হাতিমের সূত্রে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

নবী (সা) নজরানের খ্রিস্টানদের নিকট ইসলাম পেশ করেন। তারা বলে, আমরা তো প্রথম থেকেই মুসলমান। রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের ইসলাম কিভাবে সঠিক

হতে পারে, যেখানে তোমরা আল্লাহর পুত্র থাকার কথা ঘোষণা ও দাবি করছ, ক্রুশের পূজা করছ এবং শূকর ভক্ষণ করছ। খ্রিস্টানগণ বললো, আপনি তো হযরত মাসীহকে আল্লাহর বান্দা বলেন। আপনি কি মাসীহ্ এর মত কাউকে দেখেছেন অথবা এরূপ ঘটনা শুনেছেন?

এতে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ - ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ - فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ - ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ.

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তিনি তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেন। অতঃপর তাঁকে বলেন, হয়ে যাও, সাথে সাথে হয়ে গেলেন। তোমার পালনকর্তার কথাই হলো যথার্থ ও সত্য। সুতরাং তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই বিষয় সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তা হলে বল, এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের স্ত্রীদের এবং তোমাদের স্ত্রীদের, আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬০-৬১)

মুবাহালা

উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর নবী (সা) মুবাহালার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইমাম হাসান, ইমাম হুসায়ন, হযরত ফাতিমা (রা) এবং হযরত আলী (রা)-কে সাথে নিয়ে বাইরে আগমন করেন। খ্রিস্টানগণ রাসূল (সা)-এর পবিত্র ও নূরানী চেহারা প্রত্যক্ষ করে ভীত হয়ে পড়ে এবং নবী (সা)-এর নিকট কিছু সময়ের জন্য আবেদন করে বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শ করে আপনার নিকট উপস্থিত হব। আলাদা হয়ে তারা পরামর্শের জন্য বসে। সাইয়্যেদ আয়হাম আকিব আবদুল মাসীহর নিকট বলে, আল্লাহর শপথ! তোমরা খুব ভালভাবেই অবগত আছ যে, ইনি হলেন আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল। তোমরা যদি তাঁর সাথে মুবাহালায় অংশগ্রহণ কর তাহলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! আমি এমন আকৃতি প্রত্যক্ষ করছি যে, তিনি যদি এ পাহাড় স্থানচ্যুত হওয়ার জন্য দু'আ করেন, তাহলে পাহাড়ও স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! তোমরা তাঁর নবুওয়াত ও পয়গাম্বরীকে ভালভাবেই জেনেছ। হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে তিনি বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। আল্লাহর শপথ! যে কোন জাতি

কোন নবীর সাথে মুবাহালা করেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং তোমরা মুবাহালা করে নিজকে ধ্বংস করো না। যদি তোমরা স্বীয় ধর্মে স্থির থাকতে ইচ্ছা কর, তাহলে সন্ধি করে ফিরে যাও। অবশেষে তারা মুবাহালা থেকে পশ্চাদাপসরণ করে এবং বাৎসরিক জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। নবী করীম (সা) বললেন, শপথ ঐ পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন-নজরানবাসীর মাথার উপর শাস্তি এসে গিয়েছিল। যদি তারা মুবাহালায় অংশগ্রহণ করত, তাহলে তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করা হতো এবং সমস্ত ময়দান ও উপত্যাকা আগুন হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হতো, এতে সমস্ত নজরানবাসী ধ্বংস হয়ে যেত। ফলে বৃক্ষের উপর কোন পাখিও অবশিষ্ট থাকত না।[১]

দ্বিতীয় দিন মহানবী (সা) নিম্নে বর্ণিত শর্তসহ একটি চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করালেন ঃ

১. নজরানবাসীকে প্রতি বছর দু' হাজার হিল্লাহ্ আদায় করতে হবে। এক হাজার রজব মাসে এবং এক হাজার সফর মাসে। প্রত্যেক হিল্লাহর মূল্য হবে এক উকিয়া অর্থাৎ চল্লিশ দিরহাম।

২. নজরানবাসীর উপর নবী করীম (সা)-এর প্রেরিত দূতের এক মাস পর্যন্ত মেহমানদারী বাধ্যতামূলক।

৩. ইয়ামনে যদি কোন ফিতনা সৃষ্টি হয় তাহলে নজরানবাসীকে ত্রিশটি লৌহ বর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া এবং ত্রিশটি উট ফেরত দেয়া সাপেক্ষে প্রদান করতে হবে। যদি কোন বস্তু হারিয়ে যায়, তাহলে এর দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হবে।

৪. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের জীবন ও সম্পদের হিফাযতের যিম্মাদার। তাদের ধন-সম্পদ, তাদের সম্পত্তি, তাদের অধিকার, তাদের ধর্ম ও উপাসনালয়, তাদের বংশ ও অনুসারীদের কোন ক্ষতি করা হবে না। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের কোন রক্তপণ তাদের থেকে আদায় করা হবে না। তাদের ভূখণ্ডে কোন সৈন্য প্রবেশ করবে না।

৫. যদি কেউ তাদের নিকট অধিকার আদায়ের দাবি করে, তাহলে অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের (ظالم ومظلوم) মধ্যে ইনসাফ করা হবে।

৬. যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করবে তার কোন যিম্মা আমার উপর থাকবে না।

৭. যদি কোন ব্যক্তি যুলম ও সীমাতিক্রম করে, তাহলে তার পরিবর্তে অপর ব্যক্তি ধৃত হবে না।

এটা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা ও দায়িত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ শর্তাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আবু সুফিয়ান ইবন হারব, আয়লান ইবন আম্র, মালিক ইবন আউফ, আকরা ইবন হাবিস এবং মুগীরা ইবন শু'বা (রা) এ চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন।[২]

১. শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ৪৩।

২. যাদুল মা'আদের ৩ খ,পৃ. ৪০ এবং হিদায়াতুল হাওয়ারী ফী রাদ্দিল ইয়াহূদ ওয়ান নাসারা, পৃ. ৪৪ এ ঘটনা এভাবে উল্লেখ রয়েছে। মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ ঘটনা নজরান থেকে আসার সময় ঘটেছে এবং ইসাবা, ৩য় খ, পৃ. ২৯২ কুরয ইবন আলকামা নাজরানীর মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের রিওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণিত আছে।

নজরানের খ্রিস্টানগণ এই চুক্তিনামা নিয়ে দেশে গমন করে। গমনের পূর্বে নবী (সা)-এর নিকট এ আবেদন পেশ করে যে, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন যাতে সে সন্ধির মাল আমাদের থেকে নিয়ে আসতে পারে। রাসূল (সা) বললেন, একজন সঠিক আমানতদার ব্যক্তিকে তোমাদের সাথে প্রেরণ করব। এটা বলেই তিনি আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে তাদের সাথে গমনের নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, তিনি হলেন এই উম্মাতের আমীন বা আমানতদার।[১]

এ সমস্ত লোক নবী (সা)-এর ফরমান নিয়ে নজরান ফিরে যায়। নজরান এক মনযিল দূরে থাকতেই সেখানের পাদ্রী ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ তাদেরকে স্বাগত জানান। প্রতিনিধি দল রাসূলের প্রেরিত পত্রটি পাদ্রীদের নিকট অর্পণ করে। পাদ্রীগণ তা পাঠ করতে মগ্ন হয়ে পড়ে। এ সময় আবূ হারিসার খচ্চর, যার উপর সে সওয়ার ছিল, হোঁচট খায়। তার চাচাত ভাই কুরয ইবন আলকামার মুখ থেকে বের হয় تعس الابعد (ঐ কমবখত ধ্বংস হোক) অর্থাৎ নবী (সা) (নাউযুবিল্লাহ)। আবূ হারিসা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তুমিই কমবখত। আল্লাহর শপথ! তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তিনিই ঐ নবী তাওরাত ও ইঞ্জিলে যাঁর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কুরয বললো, তাহলে কেন ঈমান গ্রহণ করনি? আবূ হারিসা বললো, ঐ বাদশাহগণ আমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা সমস্তই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কুরয বললো, আল্লাহর শপথ! আমি তো স্বীয় উটের রশি মদীনায় গমন করেই খুলব এবং অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নিম্নের কবিতা পাঠ করতে করতে মদীনা রওয়ানা হয় ঃ

اليك تعدو قلقا وضينها * معترض كافى بطنها جينتها
مخالفا دين النصارى دينها -

অবশেষে নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। অতঃপর কোন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

কয়েকদিন পর সাইয়্যেদ আয়হাম এবং আবদুল মাসীহ আকীব ও মদীনা গমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) উভয়কে হযরত আবূ আইউব আনসারীর বাড়িতে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন।[২]

একটি জরুরী জ্ঞাতব্য

নজরানবাসীদের মধ্যে দু'টি দল ছিল। একটি উম্মিইন (اميين) অপরটি হলো আনসারীদের। প্রথম দলটি ইসলাম গ্রহণ করে। যেমন বনী হারিস প্রতিনিধি দল। দ্বিতীয় দলটির সাথে জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি হয়। নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে নজরানের প্রথম দলটি থেকে সাদাকা আদায় এবং দ্বিতীয় দলটি থেকে জিযিয়া

১. শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, প: ৪৩
২. প্রাগুক্ত।

আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন। এটা নয় যে, একই দল থেকে জিযিয়া ও সাদাকা উভয়ই আদায় করবে। তাহলে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, একই দল থেকে সাদাকা ও জিযিয়া উভয় কিভাবে আদায় করা হবে।[১]

১৫. ফারওয়া ইবন আম্‌র জাযামী দূতের বর্ণনা

রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে ফারওয়া ইবন আম্‌র জাযামী মা'আন ও সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি পত্র তার নিকট প্রেরণ করেন তখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন দূতকে কিছু নির্দেশ দিয়ে রাসূল (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। রোমীয়গণ ফারওয়া ইবন আমরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শোনার পর তাঁকে ফাঁসি দিয়ে দেয়। যখন তাঁকে ফাসিতে ঝুলাতে থাকে, তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

بلغ سراه المسلمين بانني * سلم لربي اعظمي ومقامي

"মুসলমানদের নেতার [নবী (সা)]-নিকট এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে, আমি হলাম মুসলমান আমার হাড় ও আমার দাঁড়ানোর স্থান সমস্ত আল্লাহর অনুগত।"[২]

১৬. যিমাম ইবন সা'লাবার আগমন

৯ম হিজরীতে বনূ সা'আদের পক্ষ থেকে দিমাম ইবন সা'লাবা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। মসজিদের দরযার নিকট উট বেঁধে রেখে নিজে মসজিদে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করেন, মুহাম্মদ (সা) কে? নবী (সা) তখন মসজিদে ঠেশ দিয়ে উপবেশন করেছিলেন। সাহাবাগণ বললেন, এই মহান ও পবিত্র যিনি ঠেস দিয়ে বসে আছেন। যিমাম ইবন সা'লাবা বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। নবী (সা) বললেন, আমি শুনতে পেয়েছি। সে বললো, আমি আপনাকে কিছু কঠোর প্রশ্ন করবো, আপনি মনে কোন কষ্ট নেবেন না। নবী (সা) বললেন, তুমি যা কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও, বলো। তিনি বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে সমস্ত মানুষের নিকট পয়গাম্বর হিসেবে প্রেরণ করেছেন? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। অত:পর তিনি পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তা'আলা কি দিবারাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সারা বছর এক মাস রোযা এবং মালদার থেকে যাকাত ও সাদাকা আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টনের নির্দেশ প্রদান করেছেন? তিনি (সা) বললেন, হ্যাঁ! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। এবার ঐ ব্যক্তি বললেন, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন আমি এ সমস্ত কিছুর ওপর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আমি হলাম আমার কাওমের দূত, আমার নাম যিমাম ইবন সা'লাবা। এটা হলো সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াত।

---

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খ, পৃ. ৪৪।

২. প্রাগুক্ত।

সহীহ্ মুসলিমের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, শপথ ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আপনাকে হক ও সত্য প্রদান করে প্রেরণ করেছেন, আমি এতে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করব না। নবী (সা) বললেন, যদি এ ব্যক্তি সত্য বলের থাকে, তাহলে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

মাসয়ালা ঃ এই হাদীস দ্বারা এ মাসয়ালা জানা যায় যে, কোন আলিম বা সম্মানিত ব্যক্তির জন্য মজলিসে ঠেস দিয়ে বসা জায়েয।[১]

যিমাম ইবন সা'লাবা রাসূল (সা) নিকট থেকে বিদায় হয়ে স্বীয় কাওমের নিকট হাযির হলেন এবং সবাইকে একত্র করে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্বপ্রথম তিনি বলেন, লাত এবং ওয্‌যা অত্যন্ত খারাপ।

লোকজন বললো, হে যিমাম, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করো না, তাহলে তুমি পাগল এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে যেতে পার। যিমাম বললো, শত শত আফসোস! আল্লাহর শপথ, লাত এবং ওয্‌যা তোমাদের না কোন উপকার করতে পারবে এবং না কোন অনিষ্ট করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর একখানা কিতাব নাযিল করেছেন। যিনি তোমাদেরকে এ সমস্ত অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে মুক্ত করেছেন। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) হলেন আল্লাহর রাসূল। আমি নবী করীম (সা) থেকে এ সমস্ত আহকাম শিখে এসেছি। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই সমস্ত নারী পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত উমর (রা) এবং হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা কোন কাওমের কাসেদকে যিমাম ইবন সা'লাবার চেয়ে উত্তম পাইনি। (ইবন ইসহাক)[২]

১৭. তারেক ইবন আবদুল্লাহ মাহারিবী ও বনূ মাহারিব প্রতিনিধি দল

তারেক ইবন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আমি যিল-মাজায বাজারে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তিকে এটা বলতে দেখলাম ঃ أيها الناس قولوا لا اله الا الله تفلح

"হে লোক সকল! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাহ্ বলো, সফলতা অর্জন করবে।"

অপর এক ব্যক্তি তার পিছনে পিছনে পাথর নিক্ষেপ করছে এবং বলছে ঃ

يايها الناس انه كذاب فلاتصدقوه

"হে লোক সকল! এই ব্যক্তি মিথ্যা বলছে, তাকে বিশ্বাস করো না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? লোকজন বললো, এ ব্যক্তি হলো বনূ হাশিম গোত্রের যিনি এটা বলেন যে, "আমি আল্লাহর রাসূল এবং এই পাথর নিক্ষেপকারী হলো তাঁর চাচা আবূ লাহাব।

---

১. ফাতহুল বারী, ১ খ, পৃ. ১৩৯।

২. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৪।

তারেক ইবন আবদুল্লাহ বলেন, মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং নবী (সা) মদীনায় হিজরত করেন, তখন আমি মদীনার খেজুর ক্রয় করার জন্য যাবদাহ্ থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনার নিকট একটি বাগানে অবস্থানের ইচ্ছা করছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি দু'টি পুরাতন চাদর পরিধান করে সম্মুখ দিয়ে আগমন করে আমাকে সালাম প্রদান করে এবং জিজ্ঞাসা করে কোথা থেকে আগমন করছ? আমি বললাম, যাবদাহ্ থেকে। ঐ ব্যক্তি বললো, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা?

আমি বললাম, মদীনায়। সে বললো, কি উদ্দেশ্যে? আমি বললাম, খেজুর ক্রয় করার জন্য। আমাদের নিকট একটি লাল রঙের উট ছিল। ঐ ব্যক্তি বললো, এত পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে উটটি কি আমার নিকট বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। ঐ ব্যক্তি এই মূল্যে সম্মত হলো এবং মূল্য হ্রাসের জন্য কিছুই বললো না এবং উট নিয়ে চলে গেল। আমরা পরস্পর বলতে লাগলাম, মূল্য না নিয়ে এমন ব্যক্তিকে আমরা উট সোপর্দ করলাম, যার পরিচয় আমরা জানি না। এদের মধ্যে হাওদায় আরোহণকারী এক মহিলা বললো, আল্লাহর শপথ! আমি ঐ ব্যক্তির চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত প্রত্যক্ষ করেছি। এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর হতে পারে না ভয় পেও না। আমি মূল্য আদায়ের যিম্মাদার হলাম।

আলাপকালে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি হলাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূত। তিনি এ খেজুর প্রেরণ করেছেন, এগুলো খাও এবং বাকীগুলো মেপে নাও। আমি প্রয়োজন অনুযায়ী খাওয়ার পর মেপে দেখলাম, ঐ খেজুর পরিপূর্ণ রয়েছে।

পরের দিন আমি মদীনা প্রবেশ করলাম। এ সময় রাসূল (সা) মিম্বরের উপর খুতবা প্রদান করছিলেন (সম্ভবত এটা জুমু'আর দিন ছিল)। খুতবায় তিনি এ বক্তব্য পেশ করছিলেন ঃ

تصدقوا فان اليد العليا خير من اليد السفلى امك واباك واختك واخاك وادناك ادناك ـ

"সাদাকা দান কর। নিশ্চয়ই উপরের হাত (দানকারীর হাত) নিচের হাতের চেয়ে (গ্রহণকারীর হাত) উত্তম। মাতা পিতা, বোন ভাই এবং নিকট-আত্মীয়ের প্রতিদান করার ব্যাপারে খেয়াল রাখবে।"[১] (বায়হাকী ও হাকেম প্রমূখ)

১৮. তুজীব প্রতিনিধি দল

ইয়ামনের কান্দাহ্ গোত্রের একটি শাখা হলো তুজীব গোত্র। এই গোত্রের তের ব্যক্তি সাদ্কার মালামাল নিয়ে নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। রাসূল (সা) বললেন, এই মালামাল ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং ঐ এলাকার দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। তারা আরয করলো, আমরা শুধু ঐ মালামাল নিয়ে এসেছি যা ঐ

১. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৪৬

এলাকার দরিদ্রদের মধ্যে বন্টনের পর অবশিষ্ট রয়েছে। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। তুজীবের মত অন্য কোন প্রতিনিধি দল আগমন করেনি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে ! হিদায়াত আল্লাহর হাতে। যার জন্য আল্লাহ্ কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার অন্তর ঈমানের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর নিকট বিভিন্ন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এগুলো তাদেরকে লিখিত আকারে প্রদান করেন। এবং উত্তমভাবে তাদের মেহমানদারী করার জন্য হযরত বিলালকে নির্দেশ প্রদান করেন। কয়েকদিন অবস্থানের পর তারা ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূল (সা) বললেন, এত জলদী করার কারণ কি? তারা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল, অন্তরের এটা ইচ্ছা যে, আপনার সাহচর্য ও প্রেরণা এবং বরকত যতটুকু হাসিল করেছি, তা স্বীয় কাওমের মধ্যে প্রচার করি। নবী (সা) তাদেরকে কিছু হাদিয়া দিয়ে বিদায় দেন। রওয়ানা হওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ বাকি রয়েছে? তারা বললো, একজন যুবক বাকী রয়েছে যাকে আমরা আমাদের মাল-আসবাবের সংরক্ষণের জন্য রেখে এসেছি। রাসূল (সা) বললেন, তাকেও ডেকে নিয়ে এসো। যুবক হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আমার গোত্রের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন, আমার একটি প্রয়োজন ও চাহিদা রয়েছে। নবী (সা) বললেন, সেটা কি? যুবকটি বললো, আমি এ জন্য ঘর থেকে বের হয়েছি যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমার জন্য এই দু'আ করবেন, যেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন, আমার উপর রহম করেন এবং আমার অন্তরকে সম্পদশালী তথা অমুখাপেক্ষী করে দেন। রাসূল (সা) দু'আ করলেন ঃ اللهم اغفرله وارحمه واجعل غناه فى قلبه "হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার উপর রহম কর এবং তার অন্তরকে সম্পদশালী ও অভাবমুক্ত করে দাও।"

অতঃপর এই যুবককে কিছু হাদিয়া প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

১০ম হিজরীতে ঐ গোত্রের লোকজন যখন হজ্জের জন্য আগমন করে এবং রাসূল (সা) এর সাথে সাক্ষাত করে, তখন তিনি ঐ যুবকের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। লোকজন আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল। তাঁর যুহদ ও কিনায়াতের (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও অল্পে তুষ্টি) অবস্থা খুবই বিস্ময়কর। আমরা তাঁর মত যাহেদ এবং কানে' (زاهد وقانع) আর দেখিনি। এত মালদৌলত তাঁর সামনে বিতরণ করা হয় কিন্তু তিনি তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পর যখন ইয়ামানবাসী ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায়, তখন এ যুবক লোকজনের মধ্যে ওয়ায ও নসীহত করেন, যার ফলে সবাই ইসলামের উপর অটল থাকে এবং আল-হামদুলিল্লাহ, কোন ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করেনি। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) যাতায়াতকারীদের নিকট তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। এমনকি তাঁর সম্পর্কে উল্লেখিত ঘটনা অবহিত হওয়ার পর

সিয়াদ ইবন ওয়ালীদকে ঐ যুবকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য পত্রের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করেন।[১]

১৯. হুযায়ম প্রতিনিধি দল

হুযায়ম গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন মসজিদে নব্বীতে উপস্থিত হয়, তখন নবী (সা) জানাযার নামায আদায় করছিলেন। এই লোকজন আলাদা বসে রইল, নবী (সা) তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা কি মুসলমান নও? তারা আরয করলো, আমরা মুসলমান। তিনি বললেন, তাহলে তোমার ভাই-এর জানাযায় কেন অংশগ্রহণ করনি তারা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ ধারণা পোষণ করেছিলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জন্য জানাযা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে না। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা মুসলমান, যেখানেই অবস্থান কর। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাদের এলাকায় ফিরে যান। সর্বকনিষ্ঠ এক যুবককে তারা তাদের আসবাবপত্র হিফাযতের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। নবী (সা) তাঁকে ডাকলেন, সে সামনে আগমন করে নবী করীম (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। তাঁরা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই ছেলেটি আমাদের মধ্যে কনিষ্ঠ এবং আমাদের খাদিম। নবী (সা) বললেন, اصغر القوم خادمهم بارك الله عليك (কাওমের সর্ব কনিষ্ঠ খাদিম হয়ে থাকে, আল্লাহ তোমার উপর বরকত নাযিল করুন)।

বস্তুত নবী (সা)-এর দু'আর বরকতে ঐ যুবকই সবচেয়ে উত্তম এবং পবিত্র কুরআনের আলিম হয়েছিলেন। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকেই ঐ গোত্রের আমীর ও ইমাম নিযুক্ত করেন। নবী (সা)-এর অনুমতিক্রমে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত বিলাল (রা) তাঁদেরকে উপঢৌকন প্রদান করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

২০. বনী ফাযারার প্রতিনিধি দল

গাযওয়ায়ে তাবূক থেকে ফিরে আসার পর বনী ফাযারার চৌদ্দ ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি তাদের শহরের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করেন, লোকজন আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! দুর্ভিক্ষের কারণে জনগণ চরম সমস্যা ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। নবী (সা) আল্লাহ পাকের দরবারে রহমতের জন্য দু'আ করেন।[৩]

১. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৪; উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৪৬।

২. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৪৭।

৩. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৫৪।

২১. বনী আসাদ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন (৯ম হিজরী)

বনী আসাদ গোত্রের দশ ব্যক্তি নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এ সময় তিনি মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তারা প্রথমে রাসূলকে সালাম করে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। আপনার আহবান ব্যতীত আমরা আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لاَّ تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ

"তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে এটা মনে করে। আপনি বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না; বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৭)

منت من که خدمت سلطان همی کنی * منت شناس ازدکه بنیرصت بداشتت

"বাদশাহ্‌র দরবারে সেবা করছ বলে খোঁটা দিতে যাবে না; বরং বাদশাহ্ যে তোমাকে সেবা করার সুযোগ দান করেছেন তাঁর সেই অনুগ্রহ স্মরণ রেখো।"

অতঃপর জ্যোতিষ্ক বিদ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। নবী (সা) ঐ বিদ্যা চর্চা করা নিষেধ করেন।[১]

২২. বাহ্‌রায়া প্রতিনিধি দল

ইয়ামানের বাহ্‌রায়া গোত্রের তের ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তারা হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। হযরত মিকদাদ (রা) তাদের আগমনের পূর্বেই একটি বিরাট পেয়ালার মধ্যে হায়স (حيس) তৈরি করেছিলেন। মেহমান আগমনের পর তা তাদের সামনে পেশ করেন। সবাই খুব তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও কিছু অবশিষ্ট রয়ে যায়। হযরত মিকদাদ (রা) স্বীয় বাঁদী সিদরার মাধ্যমে এই পেয়ালা নবী (সা)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। তিনি এবং নবী গৃহের সবাই আহার করার পর পেয়ালা ফিরিয়ে দেন। মেহমান যতদিন অবস্থান করেন ততদিন তারা ঐ পেয়ালা থেকে তৃপ্ত সহকারে আহার করতে থাকে। একদিন মেহমানগণ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, হে মিকদাদ! আমরা শুনেছি, মদীনাবাসীদের পানাহার অত্যন্ত সাধারণ, অথচ তুমি আমাদেরকে প্রত্যহ এত

১. উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৫।

পরিমাণ মজাদার ও উত্তম খানা পরিবেশ করছ যা আমরা আমাদের ঘরে প্রত্যহ তৈরি করতে সক্ষম নই। মিকদাদ (রা) বলেন, এ সমস্তই হলো নবী (সা)-এর পবিত্র হাতের বরকত এবং তাঁদেরকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। এতে ঐ লোকদের ঈমান আরো দৃঢ় হয় এবং কিছু দিন অবস্থান করে মাসায়েল ও আহকাম শিক্ষা লাভ করে বাড়ি গমন করে। রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূল (সা) তাদেরকে পথ খরচ ও উপঢৌকন প্রদান করেন।[১]

২৩. উয্রাহ প্রতিনিধি দল

৯ম হিজরীতে ইয়ামনের উয্রাহ গোত্রের ১২ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি তাদেরকে আহ্লান ও মারহাবা বলেন, তারা আরয করলো, আপনি কোন বিষয়ের দিকে আহবান করেন ? রাসূল (সা) বললেন, এক আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্র রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তারা ইসলামের ফরয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। নবী (সা) তাদেরকে ইসলামের ফরয বিধান সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন প্রতিনিধি দলের লোকজন বললো, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, আমরা তা কবূল করেছি। আমরা আন্তরিকভাবে অনুসারী ও সহযোগী সাহায্যকারী। হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করছি সেখানে হিরাকল রাজত্ব করেন। আপনার উপর কি এ ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হয়েছে?

রাসূল (সা) বললেন, অচিরেই সিরিয়া বিজয় হবে এবং হিরাকল সেখান থেকে পলায়ন করবে। জ্যোতিষ বা যাদুকরের নিকট ভবিষ্যতের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং তাদের যবেহকৃত খাদ্য গ্রহণ থেকে নিষেধ করেন এবং বলেন, তোমাদের উপর শুধু কুরবানী ওয়াজিব। কয়েকদিন অবস্থানের পর ফিরে যাওয়ার সময় রাসূল (সা) তাদেরকে কিছু হাদিয়া দিয়ে বিদায় করেন।[২]

২৪. বাল্লী প্রতিনিধি দল

৯ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বাল্লী প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সা) বলেন ঃ

ألحمد لله الذى هداكم للاسلام فكل من مات على غير الاسلام فهو فى النار

১. যাদুল মা'আদ, ৩ খ. পৃ. ৪৮-৪৯।

২. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৪৮-৪৯।

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র জন্য, যিনি তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের হিদায়ত দান করেছেন, যে ব্যক্তি অনৈসলামিক ও অমুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে হবে দোযখবাসী।"

প্রতিনিধি দলের নেতা আবূ দাবীব আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অন্তরে মেহমানদারী করার খুব স্পৃহা রয়েছে, এতে কি কোন সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ ধনী দরিদ্র যার উপরই ইহ্সান কর, তা হবে সাদাকার অন্তর্ভুক্ত। এর পর তিনি বললেন, হে রাসূল মেহমানদারীর সীমা কতদিন? রাসূল (সা) বললেন ঃ তিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা কর্তব্য। অতঃপর মেহমানদারী হবে সাদাকার অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর মেযবানের মনে কষ্ট দিয়ে অতিরিক্ত অবস্থান করা মেহমানের জন্য জায়েয নয়। তিন দিন অবস্থানের পর প্রতিনিধি দল ফিরে যায়। যাওয়ার সময় নবী করীম (সা) তাদেরকে কিছু হাদিয়া প্রদান করেন।[১]

২৫. বনী মুররা প্রতিনিধি দল

গাযওয়ায়ে তাবূকের পর ৯ম হিজরীতে বনী মুররার তের ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এ দলের নেতা ছিলেন হারিস ইবন আউফ। তারা আরয করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনারই বংশধর। আমরা আপনার পূর্ব পুরুষ লুওয়াই ইবন গালিব-এর আওলাদ। এটা শুনে রাসূল (সা) মৃদু হাসলেন এবং তাদের শহরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! দূর্ভিক্ষের কারণে শহরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নবী (সা) তখনই বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। যখন তারা বাড়ি ফিরে আসে তখন এটা প্রতীয়মান হলো যে, যেদিন রাসূল (সা) দু'আ করেন। ঐ দিনেই বৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত দেশ ফলে-ফুলে শস্য-শ্যামল হয়ে উঠেছে। দেশে রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূল (সা) তাদের প্রত্যেককে দশ উকিয়া রৌপ্য এবং হারিস ইবন আউফকে বার উকিয়া রৌপ্য প্রদান করেন।[২]

২৬. খাওলান প্রতিনিধি দল

১০ হিজরীর শা'বান মাসে ইয়ামন থেকে দশ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তারা আরয করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করেছি। আমাদের উপর আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের বিরাট ইহ্সান রয়েছে। অনেক দূরের পথ অতিক্রম করে সাক্ষাতের আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। নবী (সা) বললেন, তোমাদের এ সফর বিফল হবে না। প্রতিটি পদক্ষেপে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতের জন্য মদীনা আগমন করে, সে কিয়ামতের দিন আমার আশ্রয়ে এবং

১. উয়ুনল আসার, ২ খ. পৃ. ২৫১-১৫২

২. উয়ুনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৫১-২৫২

নিরাপদে থাকবে। অতঃপর খাওলান গোত্রের মূর্তি যার নাম ছিল আম্মে আনস, সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তারা আরয করলো, আল-হামদু লিল্লাহ, আপনার হিদায়ত ও তালীমের কারণে ঐ মূর্তিপূজা দূরীভূত হয়েছে। মাত্র কয়েকজন প্রাচীন নর-নারী এখানো আম্মে আনসের পূজা করে। এবার ফিরে যাবার পর ঐ মূর্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলব ইনশা'আল্লাহ।

নবী (সা) তাদেরকে ইসলামের ফরয ও কর্তব্যসমূহ শিক্ষা দিলেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

ক. অবশ্যই অঙ্গীকার পূরণ করবে।

খ. আমানত আদায় করবে।

গ. প্রতিবেশীর প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

ঘ. কারো উপর যুলম করবে না।

ফিরে যাওয়ার সময় দলের প্রত্যেককে বার উকিয়া রৌপ্য প্রদান করেন। দেশে ফিরে প্রথমেই তারা 'আম্মে আনস' নামক মূর্তি ধ্বংস করে।[১]

২৭. মুহারিব প্রতিনিধির দল

মুহারিব গোত্রের লোকগুলো ছিল অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের। মক্কায় হজ্জের সময় যখন নবী করীম (সা) লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করতেন, তখন এ সমস্ত লোক নবী (সা) এর সাথে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করত। ১০ম হিজরীতে এ গোত্রের দশজনের একটি প্রতিনিধি দল তাদের গোত্রের পক্ষ থেকে খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাথীদের মধ্যে আপনার বিরুদ্ধে আমার চেয়ে অধিক কঠোর ও রুক্ষ ব্যবহার এবং ইসলাম থেকে দূরে কেউ ছিল না। আমার সাথীরা মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, তিনি আমাকে জীবিত রেখে আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য দান করেছেন। নবী (সা) বলেন, অন্তর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন, আপনার সাথে আমি অন্যায় করেছি, আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। রাসূল (সা) বলেন, কুফরীর অবস্থায় যা কিছু করা হয় ইসলাম গ্রহণের ফলে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়। অতঃপর রাসূল (সা)-এর অনুমতি নিয়ে তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে।[২]

২৮. সুদা'আ প্রতিনিধি দল

৮ম হিজরীতে জি'রানা থেকে ফিরে আসার পর নবী (সা) মুহাজির ইবন আবূ উমাইয়্যাকে সান'আ, যিয়াদ ইবন লাবীদকে হাদ্রামাউত এবং কায়স ইবন সা'আদ ইবন

১. যাদুল মা'আদ, ৩১ খ, পৃ. ৫০; উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৫৩।

২. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৫০।

উবাদা খাযরাজীকে চারশ' আরোহীর সাথে কানাতের দিকে প্রেরণ করেন। কায়স ইবন সা'আদকে ইয়ামনের সুদা' আ এলাকার গমন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। যিয়াদ ইবন হারিস সুদাঈ এ সংবাদ পেলে তিনি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার বাহিনী ফিরিয়ে নিন। আমি আমার কাওমের ইসলাম গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। নবী (সা) কায়স ইবন সা'আদকে ফিরে আসার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। যিয়াদ ইবন হারিস সুদাঈ পনের ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। সবাই ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূল (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। নবী করীম (সা) যিয়াদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে যিয়াদ! তোমার কাওম তোমার খুবই অনুগত। যিয়াদ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা হলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ইহসান। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলামের প্রতি হিদায়ত দান করেছেন। বায়'আত গ্রহণ করে এ সমস্ত লোকই দেশে গমন করে। সমস্ত গোত্রের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। বিদায় হজ্জে এক'শ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে।[১]

২৯. গাস্সান প্রতিনিধি দল

১০ হিজরীর রমযান মাসে গাস্সান গোত্রের তিন ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আরয করেন, আমাদের কাওম আমাদের অনুসরণ করে কিনা, আমাদের জানা নেই। তাঁদের ফিরে যাওয়ার সময় রাসূল (সা) তাদেরকে কিছু অর্থ ও উপহার প্রদান করেন। যেহেতু তাদের কাওম ইসলাম গ্রহণ করেনি, ফলে তাঁরা নিজেদের ইসলাম গোপন রাখেন। এমনি অবস্থায় তাঁদের দু'ব্যক্তি ইনতিকাল করেন। তৃতীয় ব্যক্তি ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত আবূ উবায়দার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে স্বীয় ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত করেন। হযরত আবূ উবায়দা (রা) তাঁকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন।

৩০. সালমান প্রতিনিধি দল

১০ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সালমান গোত্রের সাত ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজ এলাকার অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কথা বলেন। নবী (সা) পবিত্র হাত উঠিয়ে দু'আ করেন, অতঃপর তাদেরকে কিছু অর্থ ও উপহার দিয়ে বিদায় করেন। বাড়ি গিয়ে তারা এটা উপলব্ধি করে যে, যে দিন এবং সে সময় নবী (সা) দু'আ করেছেন, ঐ দিনেই তাদের এলাকায় বৃষ্টিপাত হয়েছে।[৩]

---

১. উয়ুনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৫৪।

২. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৬১।

৩. প্রাগুক্ত,

৩১. বনী আবস্ প্রতিনিধি দল

বনী আবস্ এর তিন ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমরা এটা অবগত হয়েছি যে, হিজরত ব্যতীত ইসলাম গ্রহণযোগ্য হয় না। আমাদের নিকট কিছু মাল ও গবাদিপশু রয়েছে এবং এগুলোর উপর আমরা জীবিকা নির্বাহ করি। যদি হিজরত ব্যতীত ইসলাম গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে এরূপ মাল দ্বারা কি কল্যাণ ও বরকত হবে ? আমরা সমস্ত বিক্রি করে আপনার দরবারে হাযির হয়ে যাব। রাসূল (সা) তাদেরকে বলেন ঃ

اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم الله من أعمالكم شيئًا

"আল্লাহকে ভয় কর যেখানেই থাক না কেন। আল্লাহ তোমাদের আমলের সাওয়াবে কোন হ্রাস করবেন না।"[১]

৩২. গামিদ প্রতিনিধি দল

১০ম হিজরীতে ইয়ামনের গামিদ গোত্রের দশ ব্যক্তির এক প্রতিনিধি মদীনা আগমন করে বাকী নামক স্থানে অবতরণ করে এবং আসবাবপত্রের নিকট একটি কিশোরকে রেখে তারা নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আসবাবপত্রের নিকট কোন ব্যক্তিকে রেখে এসেছ? তারা আরয করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! একটি কিশোরকে। তিনি বললেন ঃ একটি থলে চুরি হয়ে গিয়েছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, ঐ থলে ছিল আমার। তিনি বললেন, ভয় করো না, তা পাওয়া গেছে। এ লোকজন যখন তাদের আসবাবপত্রের নিকট উপস্থিত হয়, তখন দেখতে পায় যে, কিশোরটি ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগ্রত হওয়ার পর দেখতে পায় যে, থলেটি নেই। তখন এর খোঁজে বের হয়। দূরে একটি লোককে উপবিষ্ট দেখে তার নিকট গমন করলে সে পলায়ন করে। সেখানে পৌঁছে মাটির মধ্যে গর্ত দেখতে পায়। সেখানে থলেটি পাওয়া যায়। আমরা বললাম, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র সত্য নবী ।

নবী (সা) উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাদেরকে তুমি কুরআন শিক্ষা দাও। রওয়ানা হওয়ার সময় তাদেরকে শরী'আতের বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ আকারে প্রদান করেন এবং প্রথামত তাদেরকে উপঢৌকনও প্রদান করেন।[২]

৩৩. আয্দ প্রতিনিধি দল

আযদ গোত্রের সাত ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাদের স্বভাব-চালচলন ও ব্যক্তিত্ব নবী (সা)-এর পসন্দ হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে ? প্রতিনিধি দলের লোকজন আরয করলেন, আমরা হলাম মু'মিন। রাসূল (সা) মৃদু হেসে বললেন, প্রত্যেক কথার মধ্যেই একটি হাকীকত

---

১. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৫৩।

২. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৫৩; যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৬৩।

থাকে। তোমাদের ঈমানের হাকীকত কি? তাঁরা আরয করলেন ঐ পনের খাসলত বা বিষয়, যার মধ্যে পাঁচটির উপর ঈমান ও ইতিকাদ রাখার জন্য আপনার দূতগণ নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তাঁরা আমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া পাঁচটি এরূপ বিষয় রয়েছে, যেগুলো আমরা জাহেলিয়াতের যুগেও পালন করে আসছি। নবী (সা) বললেন, ঐ বিষয়গুলো কি, যার উপর ঈমান আনার জন্য আমার মুবাল্লিগগণ তোমাদেরকে নির্দেশ করেছেন। তাঁরা আরয করেন, এগুলো হলো ঃ (১) আল্লাহ্ তা'আলার উপর; (২) তাঁর ফিরিশতাগণের; (৩) তাঁর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের; (৪) তাঁর পয়গাম্বরগণের; (৫) মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার উপর অর্থাৎ কিয়ামত ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, ঐ পাঁচটি কি, যেগুলোর উপর আমল করার জন্য আমার দূতগণ তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন? তাঁরা আরয করলো, এগুলো হলো ঃ (১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বল; (২) নামায আদায় কর; (৩) যাকাত প্রদান কর; (৪) রমযানের রোযা রাখ; (৫) সক্ষম হলে বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় কর।

নবী (সা) বলেন, ঐ পাঁচটি বিষয় বা খাসলত কি, যা তোমরা জাহেলিয়াতের যুগে পালন করেছ? তাঁরা আরয করলো ঃ

الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضابم القضاء والصدق فى مواطن اللقاء وترك الشماتة بالاعداء فقال صلى الله عليه وسلم حكما وعلما كادوا من قههم دان يكونوا أنبياء ثم قال وانا ازيدكم خمسًا فتتم لكم عشرون خصلة ان كنتم كما تقولون فلاتجمعوا مالاتاكلون ولاتنبوا مالاتسكنون ولاتنافسوا فى شئٍ انتم عنه غدا زائلون - واتقوا الله الذى اليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون -

"আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা; (২) বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা (৩) ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা; (৪) মুকাবিলার সময় অটল থাকা; (৫) শত্রুর বিপদে উৎফুল্ল না হওয়া।

নবী (সা) ইরশাদ করেন, বিরাট হাকীম ও আলিম (হলে তোমরা) ফিকহ্ ও জ্ঞানের কারণে নবুওয়াতের মর্যাদার অতি নিকটবর্তী।[১] অতঃপর নবী করীম (সা)

১. নবী (সা)-এর এ কথার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসের হাফেয নবুওয়াতের মর্যাদার এত নিকটবর্তী নন যতটুকু ফকীহ্ নবুওয়াতের মর্যাদার নিকটবর্তী হয়ে থাকেন। হাদীসের হাফেযের উদাহরণ ঐ আশিকের মত যে মাহবুবের কথা হুবহু মুখস্থ করে নিয়েছে। আর ফকীহর উদাহরণ ঐ বুদ্ধিমান বোধশক্তিসম্পন্ন জীবন উৎসর্গকারী মাহবূবের মত, যিনি তাঁর মাহবূবের ইঙ্গিতে তার গোপন রহস্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে থাকেন।

বলেন, আমি তোমাদেরকে আরো পাঁচটি খাসলতের কথা বলব, যাতে শ খাসলত পূর্ণ হয়ে যায়। (১) যে বস্তু খাওয়া হয়না তা জমা রেখ না; (২) যেখানে থাকবে না তা নির্মাণ করো না; (৩) যে বস্তু আগামীকাল ছেড়ে যাবে তা নিয়ে পরস্পর হিংসা করো না; (৪) ঐ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর যাঁর দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁর সামনে হাযির হতে হবে (৫) ঐ বস্তু কামনা কর; যাতে তোমরা অনন্তকাল থাকবে অর্থাৎ আখিরাত।"

এ সমস্ত লোক নবী (সা)-এর উপদেশ নিয়ে দেশে ফিরে যায় এবং তা স্মরণ রেখে আমল করতে থাকে।[১]

৩৪. বনী মুনতাফিক প্রতিনিধি দল

বনী মুনতাফিক প্রতিনিধি দল ফজর নামাযের পর নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়। ঘটনাক্রমে ঐ দিন নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করে তাঁদের সামনে এক দীর্ঘ খুতবা পেশ করেন। এতে হাশর-নশর ও বেহেশত-দোযখের অবস্থা বর্ণনা করেন। খুতবা শেষ হওয়ার পর তারা রাসূল (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং দেশে গমন করেন। বিস্তারিত খুতবা দু'পৃষ্ঠার মত। হাফেয ইবন কাইয়্যেম যাদুল মা'আদে তা উল্লেখ করেছেন।

৩৫. নাখা' প্রতিনিধি দল (মাহে মুহাররম ১১ হিজরী)

নাখা' ইয়ামনের একটি গোত্র। ১১ হিজরীর মুহাররম মাসের মধ্য দশকে এ গোত্রের দু'শ ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে যুরারাহ্ ইবন আম্র নামক এক ব্যক্তিও ছিলেন, এ সফরে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেন এবং রাসূল নিকট তা বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। যুরারাহ্ ইবন আমর তাঁর স্বপ্ন বর্ণনা করে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পাই যে, যমীন থেকে একটি অগ্নি বের হয়ে আমার এবং আমার পুত্রের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ঐ অগ্নি আহ্বান করছে ঃ

لظى لظى بصيروا عمى اطعمونى اكلكم اهلكم ومالكم

"আমি হলাম আগুন, আমি হলাম আগুন। কোন চক্ষুষ্মান ও কোন অন্ধ আমাকে আহার করতে দাও। আমি তোমাদেরকে, তোমাদের পরিবারবর্গকে এবং সম্পদকে খেয়ে ফেলবো।"

নবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ একটি ফিত্না সৃষ্টি হবে, যার ফলে লোকজন তাদের ইমাম ও খলীফাকে হত্যা করবে। বদকার লোক নিজেদেরকে নেককার মনে করবে। মু'মিনদেরকে হত্যা করা পানি পান করা থেকে অধিক স্বাদের হবে। যদি তোমার পুত্র তোমার আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তুমি এ ফিতনার সম্মুখীন হবে। আর যদি তুমি

১. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৫৪

প্রথমে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তোমার পুত্র ঐ ফিতনার সম্মুখীন হবে। হযরত যুরারাহ্ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি দু'আ করুন যেন, আমি ঐ ফিতনায় পতিত না হই। নবী (সা) দু'আ করলেন হযরত যুরারাহ্ (রা)-এর ইনতিকালের পর হযরত উসমান গণী (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়। হযরত যুরারাহ্র পুত্র বিদ্রোহীদের দলভুক্ত ছিল। (والله اعلم) (যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৫৯; যারকানী ৪ খ, পৃ. ৬৭)।

ইয়ামনে ইসলামের তালীম (১০ম হিজরী)

৯ অথবা ১০ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী ও হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামনের লোকদের দীন ইসলামের তালীম প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। তবে দু'জনকে এক যায়গায় প্রেরণ করেন নি। আবূ মূসাকে (রা)-কে ইয়ামনের পূর্ব প্রান্তে এবং মু'আয (রা)-কে পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ আদন ও জানুদ-এর বিভিন্ন এলাকায় তালীম ও তাবলীগের কাজ করার নির্দেশ দান করেন।

নাজরানে সারীয়ায়ে খালিদ ইবন ওয়ালীদ প্রেরণ

১০ হিজরীর রবিউস সানী অথবা জুমাদাল উলা মাসে নবী (সা) খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে একটি সারীয়ার নেতা নির্ধারণ করে নজরান এবং এর আশেপাশের এলাকায় প্রেরণ করেন এবং এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, যুদ্ধের পূর্বে তিনবার ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা দাওয়াত কবূল করে, তাহলে তোমরা তাদের ইসলামকে গ্রহণ করবে। আর যদি ইসলামের কবুল করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। কিন্তু খালিদ (রা) যখন নজরান পৌঁছেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন, তখন তারা কোন প্রশ্ন ছাড়াই শোনামাত্র ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত খালিদ (রা) সেখানে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামের তা'লীম দিতে থাকেন এবং এক পত্রের মাধ্যমে নবী (সা)-কে এ সংবাদ অবহিত করেন। নবী করীম তাঁর পত্রের জবাবে নজরানের বনী হারিস ইবন কা'ব গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনায় আগমনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এ পত্রের মর্মানুযায়ী খালিদ (রা) বনী হারিসের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলেন। নবী (সা) তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সেখানে অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। ১০ হিজরীর যিলকা'দ মাসে যখন তারা মদীনা থেকে নজরান গমন করেন, তখন নবী (সা) কায়স ইবন হাসানকে তাদের নেতা নিয়োগ করেন এবং প্রতিনিধি দল ফিরে যাওয়ার পর আমর ইবন হাযমকে ফরয ও সুন্নাতের এবং ইসলামের বিধি-বিধান তালীম প্রদান ও সাদাকা আদায়ের আমিল নিয়োগ করে প্রেরণ করেন। সাথে একটি ফরমান বা প্রজ্ঞাপন লিখে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। লিপিটি হলো এই ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان من الله ورسوله يايها الذين امنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد النبى رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن أمره بتقوى الله فى أمره كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون - وأمره أن ياخذ بالحق كما أمره الله وان يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه وينهى الناس فلا يمس القران انسان الاوهو طاهر - ويخبر الناس بالذى لهم والذى عليهم ويلين للناس فى الحق ويشتد عليهم فى الظلم فان الله كره الظلم ونهى عنه فقال الا لعنة الله على الظالمين - ويبشر الناس بالجنة وبعملها وينذر الناس النار وعملها ويستائف الناس حتى يفقهوا فى الدين ـ ويعلم الناس معالم الحج وسنة وفريضة وما أمر الله به والحج الاكبر والحج الاصغر هو العمرة وينهى الناس ان يصلى احد فى ثوب صغير الا ان يكون ثوبًا تبنى طرفيه على عاتقيه وينهى الناس ان يجتبى احد فى ثوب واحد بفضى بفرجه الى السماء وينهى ان يعقص احد شعر راسه فى فقاه وينهى اذا كان بين الناس هيج عن الدُّعا الى القبائل والعشائر ويكن دعواهم الى الله عز وجل وحده لاشريك له فمن لم يدع الى الله ودعا الى القبائل والعشائر فليقطفوا بالسيف حتى تكون دعواهم الى الله وحده لاشريك له ويأمر الناس باسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم الى المرافق وأرجلهم الى الكعبين ويمسحون برؤسهم كما أمرهم الله وأمر بالصلواة لوقتها واتمام الركوع والسجود والخشوع ويغلس بالصبح ويهجر بابها جهرة حين تميل الشمس وصلاة العصر والشمس فى الارض مدبرة والمغرب حين يقبل الليل لايؤخر حتى تبدو لنجوم فى السماء والعشاء اول الليل وامر بالسعى الى الجمعة اذا نودى لها والغسل عند الرواح اليها وامره ان يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين فى الصدقه من العقار عشر ماسقت العين وسقت السماء على ماسقى الغرب نصف العشر وفى كل من الابل شاتان وفى عشرين اربع شياه وفى كل ثلاثين من البقر تبيع جزع أو جذعة وفى كل أربيعن من

الغنم سائمة وحدها شاة فانها فريضة الله التى افترض على المؤمنين فى الصدقة فمن زاد خيرا فهو خيرًا له وانه من اسلم من يهودى او نصرانى اسلامًا خالصا من نفسه ودان بدين الاسلام فانه من المؤمنين له مثل مالهم وعليه مثل ماعليهم ومن كان على نصرانية او يهودية فانه لايرد عنها وعلى كل حالم ذكر او انثى حرا وعبد دينار وافرٍ او عوضه ثيابًا فمن ادى ذلك فان له ذمة الله وذمة رسوله ومن منع ذالك فانه عدوٌ لله ورسوله وللمؤمنين جميعا صلواة الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ـ

"বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম এটা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ফরমান। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ কর। এ অঙ্গীকারনামা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে আম্‌র ইবন হাযমকে প্রদান করা হয়, যখন তাঁকে ইয়ামনের প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করে সেখানে প্রেরণ করা হয়। সমস্ত কাজে তাক্‌ওয়া অবলম্বনের জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী ও নেককারদের সাথে রয়েছেন। তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন হক ও সত্যকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং লোকজনকে কল্যাণের নির্দেশ এবং কল্যাণের সুসংবাদ দিবে। লোকজনকে কুরআনের তা'লীম এবং এর অর্থ উপলব্ধি করার পদ্ধতি বলে দিবে। কুরআন পবিত্রতা ব্যতীত স্পর্শ না করার নির্দেশ প্রদান করবে এবং লোকজনকে এর উপকারিতা ও অনিষ্টতা সম্পর্কে অবহিত করবে। হক ও সঠিক পথে চলার ব্যাপারে লোকজনের সাথে কোমল ব্যবহার করবে এবং যুল্‌ম করার সময় যালিমের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যুলম হারাম করেছেন এবং এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।

লোকজনকে বেহেশতের সুসংবাদ এবং বেহেশতের আমল সম্পর্কে অবহিত করবে। দোযখের ভয় প্রদর্শন করবে এবং দোযখের আমল সম্পর্কে অবহিত করবে। লোকজনের সাথে তোমার আন্তরিকতা সৃষ্টি করবে যাতে তারা তোমার থেকে দ্বীন শিখতে পারে। লোকজনকে ফরয, সুন্নাত, হজ্জ ও উমরার তা'লীম দিবে এবং নামায সম্পর্কে তাদেরকে এটা অবহিত করবে যে, কোন ব্যক্তি যেন ক্ষুদ্র কাপড় পরিধান করে তা পিঠের উপর রেখে নামায না পড়ে, তবে কাপড় এতটুকু প্রশস্ত হতে হবে, যাতে এর দ্বারা উভয় কাঁধ ঢেকে যায়। লোকজনকে এভাবে কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করবে, যার ফলে আকাশের নিচে তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যায়। লোকজনকে তাদের গর্দানের পাশে চুল না বাঁধার জন্য নিষেধ করবে। যখন পরস্পর যুদ্ধ হবে তখন গোত্র ও

গোত্রের লোকজন ও দেশের নামের উপর সাহায্য বা সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে আহবান জানাবে না; বরং এক আল্লাহ ও তাঁর বিধানের প্রতি লোকজনকে আহবান করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবান না করে গোত্র, কাওম ও দেশের দিকে আহবান করে, তাহলে তরবারি দ্বারা তার গর্দান কেটে দিবে, যাতে তার আহবান এক আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনের দিকে হয়ে যায়। অর্থাৎ গোত্র, কাওম ও দেশের প্রতি আহবান থেকে বিরত হয়ে যায়।

লোকজনকে পরিপূর্ণভাবে অযূ করা, নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা, নামাযে পরিপূর্ণভাবে রুকূ'ও সিজ্‌দা করা, বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করার নির্দেশ প্রদান করবে। এ ছাড়া ফজর নামায কিছুটা অন্ধকার থাকতে এবং যোহর নামায সূর্য একটু ঢলে যাওয়ার পর আদায় করা, আসর নামায ঐ সময় পড়া যখন সূর্য পৃথিবীতে তাপ ছড়াতে থাকে এবং অস্ত যেতে থাকে, সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে এবং রাত শুরু হলেই মাগরিব নামায আদায়, এরূপ বিলম্ব করা যাবে না, যার ফলে নক্ষত্রসমূহ উদিত হয়ে যায়। রাতের প্রথম এক -তৃতীয়াংশে ইশার নামায আদায় করার নির্দেশ দিবে।

জুমু'আর নামাযের জন্য যখন আযান দেয়া হবে তখন দৌড়ে জুমু'আর নামাযের জন্য মসজিদে গমন করা এবং জুমু'আর নামাযের পূর্বে গোসল করার জন্য নির্দেশ দিবে। এ ছাড়া গনীমতের মাল থেকে আল্লাহর হক এক-পঞ্চমাংশ বের করে রাখবে। মুসলমানদের জমি থেকে উৎপাদিত শস্য থেকে সাদাকা আদায় করা, যে জমি ঝর্ণার পানি অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা চাষাবাদ করা হয়, ঐ জমির উৎপাদিত শস্যের এক-দশমাংশ ওয়াজিব হিসেবে দান করা, যে জমির চাষাবাদ কুয়ার পানি দ্বারা করা হয়, ঐ জমির উৎপাদিত শস্যের বিশ ভাগের এক অংশ ওয়াজিব হিসেবে আদায় করার নির্দেশ প্রদান করবে।

(এছাড়া যাকাতের আরো বিধান হলো এই যে,) দশটি উটের জন্য দু'টি বকরী, বিশটি উটের জন্য চারটি বকরী, ত্রিশটি গাভীর জন্য একটি গাভী, চল্লিশটি বকরীর জন্য একটি বকরী যাকাত হিসেবে আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ পাক এটা ঈমানদারগণের উপর ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ফরযের চেয়ে অতিরিক্ত দান করবে এটা তার জন্য উত্তম হবে।

যে ইয়াহূদী অথবা খ্রিস্টান খাঁটি অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করবে, সে ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদের অধিকার ও বিধান মুসলমানদের মত হবে। যে তার ইয়াহূদী অথবা খ্রিস্টান ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বা অটল থাকবে এবং ইসলামী হুকুমতের প্রজা হিসেবে বাস করতে সম্মত হবে, পুরুষ অথবা নারী, আযাদ অথবা দাস প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্কের উপর জিযিয়া প্রদান করা অথবা এর পরিবর্তে কাপড় দান করা তার উপর জরুরী হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি জিযিয়া আদায় করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

দায়িত্বে থাকবে। অর্থাৎ তার জীবন ও সম্পদ, সম্মান ও মর্যাদা নিরাপদ ও হিফাযতে থাকবে। যে ব্যক্তি তা প্রদান করতে অস্বীকার করবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং সমস্ত মু'মিনের শত্রু। আল্লাহ পাকের সালাত, সালাম, রহমত ও বরকত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর বর্ষিত হোক।"[১]

ইয়ামানে হযরত আলী (রা)-এর সারীয়া প্রেরণ

বিদায় হজ্জের পূর্বে ১০ম হিজরীর রমযান মাসে নবী (সা) হযরত আলী (রা)-কে তিন'শ লোকের নেতা নিয়োগ করে ইয়ামান প্রেরণ করেন এবং পবিত্র হাতে হযরত আলীর মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেন। এর তিনটি অংশ ছিল। পাগড়ীর একটি অংশ এক হাত পরিমাণ সামনে ঝুলিয়ে দেন এবং এক বিঘত পরিমাণ পিছনে ছেড়ে দেন। নির্দেশ করেন, সোজা চলে যাও, অন্য কোনদিকে দৃষ্টিপাত করবে না। সেখানে পৌঁছে প্রথমে যুদ্ধ করবে না বরং তাদেরকে প্রথম ইসলামের দাওয়াত প্রদান করবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের সাথে মুকাবিলা করবে না। আল্লাহর শপথ, যদি তোমার হাতে এক ব্যক্তি হিদায়তপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এটা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে এর চেয়ে উত্তম।

হযরত আলী তিন'শ আরোহীকে সাথে নিয়ে কানাত নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু স্থাপন করেন। সেখান থেকে সাহাবাদের এক-একটি দল বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনীর একটি দল সর্বপ্রথম মায্জাজ এলাকায় প্রবেশ করে এবং অনেক শিশু, নারী এবং উট ও বকরী ধরে নিয়ে আসে। এ সমস্ত গনীমতের মাল এক স্থানে জমা করা হয়। অতঃপর অন্য একটি দলের সাথে মুকাবিলা হয়। হযরত আলী (রা) তাদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং মুসলমানদের উপর তীর এবং পাথর নিক্ষেপ করে। তখন হযরত আলী (রা) তাদের উপর হামলা করেন। ফলে তাদের বিশ ব্যক্তি নিহত হয় এবং অন্যান্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কিছু বিরতির পর হযরত আলী (রা) পুনরায় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং দ্বিতীয়বার তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। এবার তারা নিজেদের এবং কাওমের পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর অঙ্গীকার করেন যে, আল্লাহর হক সাদাকা আমরা আদায় করব।

এরপর হযরত আলী (রা) গনীমতের মাল একত্র করেন এবং এক-পঞ্চমাংশ বের করে বাকী পাঁচ ভাগের চার অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করেন। এ সময় তিনি অন্য একজনকে বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে দ্রুত অন্য সাথীদের পূর্বেই মক্কা গমন করেন। কেননা হযরত আলী (রা) এ সংবাদ অবহিত হয়েছিলেন যে, নবী (সা)

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ৪ খ, পৃ. ২৪১।

মদীনা থেকে হজ্জের জন্য রওয়ানা হয়েছেন। ফলে হযরত আলী (রা) ইয়ামন থেকে সোজা মক্কা পৌঁছেন এবং বিদায় হজ্জে নবী (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।[১]

বিদায় হজ্জ

আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে মক্কা মুকাররমা বিজয় হয়। লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। কুফর ও শিরকের মূলোৎপাটন করা হয়। বিভিন্ন গোত্রসমূহ দূর-দূরান্ত থেকে এসে কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে এবং তাওহীদ ও রিসালাতকে খাঁটি অন্তরে স্বীকার করেছে, নবুওয়াতের ফরয (দায়িত্ব) আদায় হয়েছে। বর্ণনা ও আমলের মাধ্যমে ইসলামী আহকামের তা'লীম পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। ৯ম হিজরীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে প্রেরণ করে কা'বা ঘরকে জাহেলিয়াতের রীতিনীতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র করা হয়।

এবার নবী (সা)-এর স্বয়ং হজ্জের ফরয বাস্তবে সম্পন্ন করার সময় এসেছে, যাতে উম্মাতগণ সর্বকালের জন্য উপলব্ধি করতে পারে যে, কিরূপ মর্যাদার সাথে হজ্জ আদায় করতে হয় এবং হজ্জ আদায়ের জন্য হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর কি পদ্ধতি ছিল। হজ্জের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাওহীদের তা'লীম ছিল এবং শিরকের কথা ও জাহেলিয়াতের রীতিনীতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। এ জন্য রাসূল (সা) তালবীয়ার মধ্যে لاشريك শব্দটি বিশেষভাবে বলতেন, যাতে শিরকের কোন প্রকার চিহ্ন বাকী না থাকে। রাসূল (সা) এভাবে তালবীয়া বলতেন ঃ

لبيك أللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك -

হিজরতের পূর্বে নবী (সা) কয়েকবার হজ্জ আদায় করেন। জামি 'তিরমিযীতে হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) হিজরতের পূর্বে দু'বার হজ্জ আদায় করেন। ইবনু আলী নিহায়া নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হিজরতের পূর্বে রাসূল (সা) প্রতি বছর হজ্জ আদায় করতেন। ইবন জাওযী বলেন, এটা সঠিকভাবে জানা যায়নি যে, তিনি কতবার হজ্জ আদায় করেছেন। তবে এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, হিজরতের পর তিনি মাত্র একবার হজ্জ আদায় করেছেন।

৯ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। এ বছর নবী (সা) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে মক্কা মুকাররমায় প্রেরণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানগণ হজ্জ আদায় করেন। ১০ম হিজরীর যিলকা'দ মাসে নবী করীম (সা) স্বয়ং হজ্জে গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং চতুর্দিকে এ ঘোষণা দেয়া হয় যে, এ বছর রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জে গমন করবেন। অতঃপর ১০ম হিজরীর ২৫ যিলকা'দ মাসের শনিবার দিন যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নবী (সা) মদীনা

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ১০৩

থেকে রওয়ানা হলেন। মুহাজির, আনসার এবং আত্মনিবেদিত সাহাবায়ে কিরামসহ অনেক দল রাসূল (সা)-এর সঙ্গী হলেন। নবুওয়াতের উজ্জ্বল প্রদীপ মহানবী (সা)-এর সাথে নব্বই হাজার অথবা এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার অথবা এর চেয়েও অধিক সাহাবা (রা) সফরসঙ্গী ছিলেন। যিলহজ্জ মাসের ৪ তারিখ রবিবার নবী (সা) মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন। (শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ১০৫)।

নয়জন উম্মুল মু'মিনীন এবং সাইয়্যেদাতুন্ নিসা হযরত ফাতিমাতুয যাহ্রা (রা) সাথে ছিলেন। এ ছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষ খাদেমগণ সঙ্গী ছিলেন। ইতিপূর্বে রমযান মাসে হযরত আলী (রা)-কে সাদাকা আদায়ের জন্য ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তিনি ও সেখান থেকে মক্কায় এসে নবী করীম (সা) সাথে মিলিত হন। অতঃপর রাসূল (সা) হজ্জের রুকনসমূহ আদায় করেন এবং আরাফাতের ময়দানে এক দীর্ঘ খুত্বা পেশ করেন। প্রথমত তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন। অতঃপর ইরশাদ করেন, হে মানব মণ্ডলী! আমি যা বলছি তা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর, আমি হয়ত আগামী বছর এখানে তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারব না। হে লোক সকল! তোমাদের জীবন-সন্মান, ধন-সম্পদ আজ থেকে পরস্পরের জন্য হারাম করা হলো। যেমন-আজকের এই পবিত্র দিন, এ মাস এবং এ শহর সবার জন্য (হত্যাকাণ্ড ও অপরাধ থেকে) হারাম ঘোষণা করা হলো। অন্ধকার যুগের সমস্ত রীতিনীতি আমার পদতলে পদদলিত। অন্ধকার যুগের সমস্ত খুন অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল করা হলো। আমি সর্বপ্রথম (আমার নিজ গোত্রের) রাবী'আ ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের খুন যা হুযায়ল গোত্রের উপর ছিল, এর প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল করলাম। অন্ধকার যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো। তোমাদের শুধু ঋণের মূল অংশ প্রদান করতে হবে। সর্বপ্রথম আমি (আমার চাচা) আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ বাতিল করলাম।

অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের কথা বর্ণনা করেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের নিকট এমন সুদৃঢ় বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ কর তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত (হাদীস)। কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, বলো, তোমরা কি জবাব দেবে? সাহাবাগণ আরয করলেন, আমরা সাক্ষী দেব যে, আপনি আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতের কল্যাণ করেছেন। নবী (সা) তিনবার শাহাদাত অঙ্গুলী আকাশের দিকে উত্তোলন করে বলেন ঃ اللهم اشهد (হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক)।

নবী (সা) খুতবা সমাপ্ত করলেন। হযরত বিলাল (রা) যোহর নামাযের আযান দেন। যোহর ও আসর একই সময় আদায় করা হয়। অতঃপর রাসূল (সা) আল্লাহ

তা'আলা হামদ্ যিকর, শোকর, ইসতিগফার ও দু'আয় নিমগ্ন হলেন। ঐ মুহূর্তে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلَامَ دِيْنًا-

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" সূরা মায়িদা ঃ ৩ (ফাতহুল বারী ও শারহে মাওয়াহিব)

১০ যিলহজ্জ মিনায় পৌঁছে নবী (সা) (৬৩ বছর বয়সে) তাঁর পবিত্র হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করেন এবং হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে ৩৭টি কুরবানী করেন। নবী (সা) মিনাতেও আরাফাতের অনুরূপ খুতবা প্রদান করেন। অবশেষে বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে যিলহজ্জ মাসের শেষদিকে মদীনায় গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মিনায় পবিত্র মাথা মুণ্ডন করার পর পবিত্র কেশ সাহাবাগণের মধ্যে বন্টন করে দেন, যাতে সাহাবায়ে কিরাম বরকত হিসেবে তাঁদের নিকট তা সংরক্ষণ করেন। যেহেতু এই হজ্জের পর দ্বিতীয়বার রাসূল (সা)-এর হজ্জ আদায়ের সুযোগ আসেনি এবং মিনা ও আরাফাতের খুতবায় এদিকে ইঙ্গিতও করেছেন এ কারণে এই হজ্জকে 'বিদায়ী হজ্জ' (حجة الوداع) বলা হয়। কেননা নবী (সা) এই হজ্জের মাধ্যমে স্বীয় উম্মাত থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই হজ্জকে হুজ্জাতুল ইসলামও বলা হয়। কেননা হজ্জ ফরয হওয়ার পর ইসলামে এটাই ছিল প্রথম হজ্জ।

বিদায় হজ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য যাদুল মা'আদ ও শারহে মাওয়াহিব (৭খ. পৃ. ১৩) দেখা যেতে পারে।

গাদীরে[১] খুমের খুতবা

নবী (সা) যখন হজ্জ থেকে আগমন করেন তখন পথে হযরত বুরায়দা আসলামী হযরত আলী (রা) সম্পর্কে কিছু অভিযোগ করেন। রাসূল (সা) গদীরেখুমে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থানে নাম) এক খুতবা পেশ করেন এবং ইরশাদ করেন, আমিও একজন মানুষ, অচিরেই আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন দূত বা বাহক আমাকে ডাকার জন্য আগমন করবেন। আমি ঐ দাওয়াত কবূল করব। ইশারা ছিল এই দিকে যে, ইনতিকালের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। অতঃপর আহ্লে বায়ত বা নবী পরিবারের প্রতি মহব্বতের তাগীদ করেন। হযরত আলী সম্পর্কে ইরশাদ করেন من كنت مولاه فعلى مولاه (আমি যার দোস্ত আলীও তার দোস্ত)।

১. দ্রষ্টব্য, শারহে মাওয়াহিব, ৭খ. পৃ. ১৩

খুতবার পর হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-কে মুবারকবাদ জানান। হযরত বুরায়দার অন্তরও পরিষ্কার হয়ে যায়। যে বিষন্নতা ছিল তা দূর হয়ে যায়। এই খুতবার দ্বারা এটা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, হযরত আলী (রা) তাঁর প্রিয় ও ঘনিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর সাথে এবং আমার পরিবারবর্গের সাথে মহব্বত রাখা ঈমানের দাবি। তাঁর সাথে শক্রতা পোষণ করা, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি ঈমানের দাবির পরিপন্থি।

হাদীসের উদ্দেশ্য শুধু হযরত আলী (রা)-এর মহব্বতের গুরুত্ব বর্ণনা করা। ইমামত ও খিলাফতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, মহব্বত ও খিলাফতের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মহব্বত ও খিলাফতের জন্য এটি জরুরী নয় যে, যার সাথে মহব্বত থাকবে, তিনি কোন বিরতি ছাড়াই খলীফা হবেন। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও বন্ধুদের সাথে মহব্বত থাকে, এর ফলে কি সবাই খলীফা হয়ে যাবে? হযরত আব্বাস, হযরত ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রা) সবাই নবী (সা)-এর প্রিয় হওয়া ব্যতীত কলিজার টুকরাও ছিলেন। যদি মহব্বত খিলাফতের দলীল হয়, তাহলে ইমাম হাসান (রা) প্রথম খলীফা হওয়া উচিত। যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটা বলা হয় যে, খিলাফত ঘনিষ্ট আত্মীয় হওয়ার উপর নির্ভর করে, তাহলে সর্বাগ্রে হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রা) ক্রমান্বয়ে ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন এবং চতুর্থ স্তরে হবেন হযরত আলী (রা)। শী'আ সম্প্রদায়ের মাযহাব অনুযায়ীও হযরত আলী (রা) চতুর্থ খলীফা হওয়ার অধিকারী। যদি আহ্লি সুন্নাত তাঁকে চতুর্থ খলীফা নির্বাচন করে, তাহলে অভিযোগ করা হবে কেন? এছাড়া গাদীরে খুমে যখন নবী (সা) খুতবা প্রদান করেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং নবীর পরিবারবর্গও উপস্থিত ছিলেন। কেউ খুতবার এই অর্থ মনে করেনি যে, রাসূল (সা)-এর পর কোন বিরতি ছাড়াই হযরত আলী (রা) খলীফা হবেন। অতঃপর দু'মাস পর নবী (সা) ইনতিকাল করেন এবং সাকীফায়ে বনী সায়েদায় খিলাফতের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে ঐ সমস্ত সাহাবাও উপস্থিত ছিলেন যাঁরা গাদীরে খুমের খুতবার সময় উপস্থিত ছিলেন। কেউ এই হাদীসকে হযরত আলীর ইমামত বা খিলাফতের দলীল হিসেবে পেশ করে নি। হযরত আলী, হযরত আব্বাস, বনী হাশিমের কেউ কোন সময় হযরত আলীর খিলাফতের অধিকারের জন্য এই হাদীস পেশ করে নি।

বস্তুত গাদীরে খুমের খুতবায় নবী (সা) হযরত আলী, আহলি বায়ত এবং বংশধরগণের প্রতি মহব্বতের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তাঁদের প্রতি শক্রতা করতে নিষেধ করেছেন। আল-হামদু লিল্লাহ, সমস্ত আহ্লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নবী পরিবারের প্রতি একান্ত আন্তরিকভাবে মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন করা স্বীয় দ্বীন ও ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করে। কিন্তু শী'আদের মত এত অবুঝ ও অতি উৎসাহী নয়

যে, মহব্বতকে ইমামতের দলীল হিসেবে গ্রহণ করবে। নবী পরিবারের প্রত্যেকের জন্যই মহব্বত জরুরী কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাসূল (সা)-এর সমস্ত নিকট আত্মীয়কে ইমাম ও খলীফা মনোনীত করতে হবে।

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন

নবী (সা) বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করে যিলহজ্জ মাসের শেষে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন। কয়েকদিন পর ১০ম হিজরী শেষ হয়ে ১১ হিজরী শুরু হয়।

জিব্‌রাঈল আমীনের আগমন

বিদায় হজ্জ থেকে আগমনের কিছুদিন পর হযরত জিব্‌রাঈলী আমীন সাদা পোষাক পরিধান করে একজন অপরিচিত ব্যক্তির আকৃতিতে নবী করীমের (সা) দরবারে আগমন করেন, এবং অত্যন্ত আদবের সাথে দু'হাটু ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপবেশন করেন। অতঃপর ঈমান, ইসলাম, ইহ্‌সান, কিয়ামত এবং কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। রাসূল (সা) জবাব প্রদান করেন। যখন তিনি উঠে চলে গেলেন, তখন সাহাবাগণকে বলেন, দেখ ইনি কে? সাহাবাগণ দেখার জন্য বের হয়ে কাউকে দেখতে পাননি। নবী (সা) তখন বলেন, ইনি ছিলেন জিব্‌রাঈল আমীন। ইনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন। আমি সর্বদা তাঁকে চিনলেও আজ প্রথম তাঁকে চিনতে পারিনি।

সমীক্ষা ঃ নবী করীম (সা) জিব্‌রাঈল আমীনকে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা এবং উফূকে মুবীনে (افق مبين) মূল আকৃতির সাথে প্রত্যক্ষ করেছেন। আল্লাহপাক বলেছেন ঃ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنُ [এবং তিনি তাঁকে অর্থাৎ রাসূল (সা) জিব্‌রাঈল আমীনকে উফূকে মুবীনে দেখেছেন] وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى (এবং নিশ্চয়ই তাকে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার রাসূল (সা) তাঁকে সিরাতুল মুনতাহায় দেখেছেন এছাড়া তিনি অসংখ্যবার নবী (সা)-এর দরবারে আগমন করেছেন। জিবরাঈল আমীন যে পোশাক ও যে আকৃতি নিয়েই রাসূল (সা)-এর দরবারে আগমন করতেন তখন তিনি তাঁকে চিনতে পারতেন।

بهر رنگ کے خواهی جامه می پوش * من انداز قدرت رامی شناسم تو خواهی جامه خواهی قباپوش * بهر رنگے ترامن می شناسم

"(হে জিব্রাঈল!) আপনি যে রঙের পোষাকই ইচ্ছে হয় পরিধান করুন অর্থাৎ যে আকৃতিই ধারণ করুন আপনার পরিচয় আমার জানা আছে। আপনি যে কোন পোশাক পরিধান করেন না কেন আমি সবরূপেই আপনাকে চিনি।"

কিন্তু এবার একজন বেদুঈনের আকৃতিতে মাসয়ালা জানার উদ্দেশ্যে প্রশ্নকারী হিসেবে আগমন করেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন পয়গাম নিয়ে আগমন করেননি। ফলে প্রথমত তিনি জিব্‌রাঈল আমীনকে চিনতে পারেন নি। জিব্‌রাঈল আমীন মজলিস থেকে উঠার পর রাসূল (সা) জিব্‌রাঈল আমীনকে চিনতে পারেন।

جبریل ازدست اوشر خرقه دار * درلباس وجبه شدزان اشکار

"জিব্‌রাঈল (আ) নিজের মত করে জুব্বা পরিহিত (বেদুইনরূপ) উপস্থিত। এ পোষাকে আবৃত হয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন।"

সর্বশেষ প্রেরিত সারীয়া উসামা ইবন যায়িদ (রা) (১১ হিজরী)

২৬ সফর ১১ হিজরী সোমবার নবী (সা) রোমকদের মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে 'উবনা' নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ প্রদান করেন। এটা হলো ঐ স্থান যেখানে গাযওয়ায়ে মূতা সংঘটিত হয় এবং যে যুদ্ধে হযরত উসামা (রা)-এর পিতা হযরত যায়দ ইবন হারিসা, হযরত জা'ফর তায়্যার এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা (রা) প্রমুখ শাহাদাত বরণ করেন।

এটা ছিল সর্বশেষ সারীয়া এবং নবী (সা) কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ বাহিনী। হযরত উসামা ইবন যায়িদকে রাসূল (সা) এ বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন। এ বাহিনীতে প্রথম দিকের মুহাজিরগণ এবং উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামকে গমনের নির্দেশ প্রদান করেন।

বুধবার থেকে নবী করীম (সা)-এর রোগের কষ্ট বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বৃহস্পতিবার অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং পবিত্র হাতে পতাকা তৈরি করে উসামাকে দিয়ে ইরশাদ করেন ঃ

اغز باسم الله وفى سبيل الله فقاتل من كفر بالله -

"আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে জিহাদ কর এবং আল্লাহর সাথে যে কুফরী করে তার সাথে মুকাবিলা ও যুদ্ধ কর।"

হযরত উসামা (রা) পতাকা নিয়ে বাইরে আগমন করেন এবং বুরায়দা আসলামীর নিকট অর্পণ করেন। বাহিনীকে 'জুরুফ' নামক স্থানে সমবেত করেন। সমস্ত উঁচু মর্যাদা-সম্পন্ন মুহাজির ও আনসারগণ দ্রুত সেখানে একত্র হন। হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা) রাসূল (সা)-এর সেবা করার জন্য মদীনায় ফিরে আসেন। হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) হযরত উসামা (রা) থেকে অনুমতি নিয়ে নবী (সা)-কে দেখার জন্য আসতেন। বৃহস্পতিবার যখন রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং রাসূল (সা) ইশার নামাযের জন্য মসজিদে গমন করতে সক্ষম হলেন না, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে নামায পড়ানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং নিজের জায়গায়

তাঁকে ইমাম নিয়োগ করেন। মদীনা থেকে এক ক্রোশ দূরে জুরুফ নামক স্থানে সৈন্যবাহিনীকে সমবেত করা হয়েছিল। সোমবার সকালে যখন নবী (সা)-এর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় এবং তিনি কিছু সুস্থবোধ করেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম এটা মনে করেন যে, রাসূল (সা) সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। এ সময় হযরত উসামা (রা) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করেন। এমনি মুহূর্তে হযরত উসামার আম্মা উম্মে আয়মান লোক মারফত এটা অবহিত করেন যে, রাসূল (সা) অন্তিমকাল ও মৃত্যু কষ্টে রয়েছেন। সুতরাং কোন বিলম্ব করবে না। পরক্ষণেই এ সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন। انا لله وانا اليه راجعون

সমগ্র মদীনায় আকস্মিক ভীতি ছড়িয়ে পড়লো। সবাই দ্রুত মদীনায় ফিরে আসেন। বুবায়দা (রা) পতাকা নিয়ে এসে পবিত্র হুজরার দরজায় স্থাপন করলেন। নবী (সা)-এর ওফাতের পর হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) খলীফা মনোনীত হওয়ার পর বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রথম কাজ হিসেবে তিনি হযরত উসামার বাহিনী প্রেরণ করেন এবং 'জুরুফ' নামক স্থান পর্যন্ত স্বয়ং বিদায় দেবার জন্য গমন করেন। এভাবে উসামা বাহিনী রওয়ানা হয় এবং চল্লিশ দিন পর বিজয় লাভ করে ফিরে আসেন। যারা মুকাবিলার জন্য এগিয়ে এসেছে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। স্বীয় পিতা যায়িদ ইবন হারিসা (রা)-এর হত্যাকারীকে হত্যা করেন এবং তাদের বাড়ি-ঘর ও বাগান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) মদীনার বাইরে গিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। যখন মদীনায় প্রবেশ করেন তখন মসজিদে নব্বীতে দু'রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর স্বীয় ঘরে গমন করেন।[১]

আখিরাতের সফরের প্রস্তুতি

বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর রাসূল (সা) আখিরাতের সফরের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং তাসবীহ, তাহমীদ, তাওবা ও ইসতিগফারে নিমগ্ন হন।

সর্বপ্রথম যার দ্বারা নবী করীম (সা)-এর ইনতিকাল নিকটবর্তী হওয়া প্রকাশ পায় তা হলো আল্লাহপাকের নাযিলকৃত আয়াত ঃ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ - اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا -

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তো তাওবা কবূলকারী।" (সূরা নাস্‌র)

---

১. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২ খ, পৃ. ১৩৭।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকার অনুযায়ী যখন বিজয় ও সাহায্য এসে গিয়েছে, কুফর ও শিরকের মূলোৎপাটন করা হয়েছে, তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করা হয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের স্পষ্ট বিজয় অর্জিত হয়। দলে দলে লোক সত্য দ্বীনে প্রবেশ করছে। দুনিয়ায় আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে যায় এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়, তখন নবী (সা)-কে (সা) দুনিয়ায় প্রেরণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পূর্ণ হয়ে যায়, রাসূল যা কাজ ও দায়িত্ব ছিল তা সম্পন্ন হয়। এবার আমার (আল্লাহর) নিকট আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় করেছেন, এখন ঘরের মালিকের হজ্জের (যিয়ারত) প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-কে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তা সম্পন্ন হয়েছে। যিনি আপনাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, এখন তাঁর নিকট গমন করুন। এ ধ্বংসশীল পৃথিবী আপনার থাকার স্থান নয়। আপনার মত পবিত্র সত্তার জন্য মালায়ে আ'লা এবং রফিকে আ'লার সাথে মিলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং নবী (সা) উঠা-বসা ও আসা-যাওয়ার সময় পাঠ করেন ঃ

سبحنك أللهم ربنا وبحمدك أللهم اغفرلى وتب على انك أنت التواب الرحيم ـ

আবার কখনো পাঠ করতেন ঃ

سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب اليه

কখনো পাঠ করতেন ঃ

سبحانك أللهم وبحمدك استغفرك وأتوب اليك

(দুররে মনসূর, ৬ খ. পৃ. ৪০৮)।

নবী (সা) একবার হযরত ফাতিমা (রা)-কে বলেন, জিবরাঈল আমীন প্রতি রমযানে আমার সাথে কুরআন করীম শুধু একবার খতম করতেন কিন্তু এই রমযানে দু'বার খতম করেছেন। আমার মনে হয়, আমার রওয়ানা হওয়ার সময় অর্থাৎ ইনতিকালের সময় নিকটবর্তী রয়েছে।

প্রতি বছর পবিত্র মাহে রমযানে তিনি দশ দিন ইতিকাফ করতেন, কিন্তু এ বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন।

বিদায় হজ্জে যখন এ আয়াত ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الاية নাযিল হয়, তখনই নবী (সা) আল্লাহ পাকের ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

منتهائے کمال نقصان است * گل برپردلوقت سیرابی

"চূড়ান্ত পরিপূর্ণতাই অশনি-সংকেত বহন করে; যেমন কিনা ফুল পূর্ণরূপে ফুটেই ঝরে যায়।"

এ জন্য বিদায় হজ্জের খুতবায় এ ঘোষণা প্রদান করেন যে, সম্ভবত আমি এরপর তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারব না, হয়ত তোমাদের সাথে হজ্জ করতে পারব না।. অত:পর গাদীরে খুমের বক্তৃতায় বলেছেন, আমিও একজন মানুষ। মানুষের জন্য দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ (আপনার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করা হয়নি)। সম্ভবত অচিরেই আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দূত আগমন করবে। এ কারণে বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর একদিন নবী (সা) জান্নাতুল বাকীতে গমন করেন এবং আট বছর পর ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের উপর জানাযার নামায আদায় করেন, তাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করেন। যেমন কেউ কারো থেকে বিদায় নেয়ারকালে করে থাকে।

জান্নাতুল বাকী থেকে আগমনের পর মসজিদে নব্বীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে খুতবায় বলেন ঃ আমি তোমাদের পূর্বে চলে যাচ্ছি যাতে আমি তোমাদের জন্য হাউসে কাওসার ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। হাউসে কাওসারের নিকট তোমাদের সাথে মিলিত হবার অঙ্গীকার রইল, আমি এখান থেকে হাউযে কাওসার প্রত্যক্ষ করছি। নিশ্চয়ই আমাকে যমীনের ভাণ্ডারের চাবি দেয়া হয়েছে। আমার পর তোমাদের উপর এই আশংকা নেই যে, তোমরা সবাই শিরকে মগ্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ পূর্বের মত সবাই মুশরিক হয়ে যাবে। তবে ভয় ও আশংকা এই যে, তোমরা দুনিয়ার লোভ-লালসা ও পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে মগ্ন হয়ে যাবে এবং পরস্পর যুদ্ধ করবেও ধ্বংস হয়ে যাবে।[১]

রোগের সূচনা

সফর মাসের শেষ দশ দিনের কোন এক রাতে নবী (সা) উঠেন এবং গোলাম আবূ মুইহাবাকে জাগ্রত করে বললেন, জান্নাতুল বাকীর লোকদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে আমাকে দু'আ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে দু'আ করে ফিরে আসলেন, হঠাৎ শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাথা ব্যথা ও জ্বর শুরু হয়ে গেল।

এটা বুধবার দিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর ঘরে রাসূল (সা)-এর অবস্থানের নির্ধারিত দিন ছিল। এ অবস্থায়ও নবী (সা) পর্যায়ক্রমে উম্মুল মু'মিনীনগণের ঘরে গমন করতেন। যখন রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, তখন উম্মুল মু'মিনীনদের অনুমতিক্রমে হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে গমন করেন এবং সোমবার দিন হযরত আয়েশা (রা)-এর হুজরায় ইনতিকাল করেন। তের অথবা চৌদ্দ দিন রাসূল (সা) অসুস্থ ছিলেন। শেষ সপ্তাহ সেবাযত্ন হযরত আয়েশা (রা) করেছিলেন।[২]

---

১. যারকানী, ৮ খ, পৃ. ২৫১, ২৫০, ২৫৫।

২. প্রাগুক্ত।

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল আমীন যখন সূরা নাসর অর্থাৎ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ الاية নিয়ে নাযিল হলেন, তখন নবী করীম (সা) বললেন, এ সূরায় আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। জিবরাঈল আমীন বললেন, وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى (আখিরাত আপনার জন্য এ দুনিয়ার থেকে উত্তম)। (তাবারানী হাদীসে জাবির (রা) থেকে)[১]

অসুস্থতার মধ্যে নবী (সা) আসওয়াদ আনসী, মুসায়লামা কায্যাব এবং তুলায়হার নবুওয়াতের দাবি এবং কিছু লোকের মুরতাদ হওয়ার সংবাদ অবগত হলেন। তিনি মুরতাদদের সাথে জিহাদের ওসীয়্যত ও তাকীদ করেন এবং আসওয়াদ আনসীর বিদ্রোহ দমন করার জন্য আনসারগণের একটি দল প্রেরণ করেন। নবী (সা)-এর ইনতিকালের একদিন পূর্বে আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করা হয়।[২]

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) মৃত্যু রোগের সময়টা এটা বলতেন যে, এই কষ্ট ঐ বিষের প্রতিক্রিয়া, যা আমি খায়বারে খেয়েছিলাম। বুখারী শরীফের অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি অসুস্থ হতেন তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তিলাওয়াত করে নিজের উপর ফুঁ দিতেন।

অতঃপর স্বীয় হাত মুবারক সমস্ত দেহের উপর ফিরাতেন। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (সা)-এর অসুস্থতার শেষের দিকে معوذات পাঠ করে তাঁর উপর ফুঁ দিতাম কিন্তু বরকতের জন্য নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হাত তাঁর দেহ মুবারকে ফিরাতাম।

সাইয়্যেদাতুন নিসা হযরত ফাতিমার (রা) ক্রন্দন ও হাসি

ইনতিকালের পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় নবী করীম (সা) হযরত ফাতিমাকে ডাকলেন এবং কানে কানে কিছু কথা বললেন। এতে হযরত ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তিনি পুনরায় হযরত ফাতিমার কানে কানে কিছু কথা বললেন। এবার হযরত ফাতিমা (রা) হেসে ফেললেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর আমি হযরত ফাতিমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, প্রথমত রাসূল (সা) আমাকে বলেন যে, জিবরাঈল প্রত্যেক রমযান মাসে একবার সম্পূর্ণ কুরআন শুনাতেন। এ বছর দু'বার শুনিয়েছেন। এতে আমার ধারণা হয় যে, এই রোগেই আমার ইনতিকাল হবে। এটা শুনে আমি কেঁদে ফেলি। অতঃপর তিনি ইরশাদ

১. প্রাগুক্ত

২. ইবন আসীর, ২ খ, পৃ. ১৫৩

করেন যে, আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। এটা শুনে আমি হেসে ফেলি। বস্তুত রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের ছ'মাস পর হযরত ফাতিমা (রা) ইনতিকাল করেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) দ্বিতীয়বার বলেছেন, তুমি বেহেশতের সমস্ত নারী নেত্রী হবে।[১]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, নবী (সা) যখন জান্নাতুল বাকী থেকে আগমন করেন, তখন আমার মাথায় ব্যথা ছিল। এ অবস্থায় আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো- وا رأساه (হায় আমার মাথা অর্থাৎ এ কষ্টের কারণে আমার মৃত্যু হতে পারে) রাসূল (সা) বললেন ঃ بل أنا أقول ورأساه (বরং আমি বলছি, হায় আমার মাথা)। অর্থাৎ আমার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। সম্ভবত এই ব্যথা আমার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ। অতঃপর তিনি বলেন, হে আয়েশা! যদি তুমি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর তাহলে এতে আমার কি ক্ষতি হবে। আমি কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করব এবং তোমার জানাযা পড়াব, তোমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করব। হযরত আয়েশা (রা) (অভিমানের সুরে) বললেন, সম্ভবত আপনি আমার মৃত্যু কামনা করছেন। যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তাহলে আপনি ঐ দিনই আমার ঘরে অন্য একজন স্ত্রীর সাথে আরাম করবেন। অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর আপনি আমাকে ভুলে যাবেন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের নিয়ে মগ্ন হয়ে যাবেন। নবী (সা) এটা শুনে মৃদু হাসলেন। কেননা এ হলো সরলা মু'মিনা নারী। তাঁর খবর নেই যে, আমিই এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি এবং সে আমার পর জীবিত থাকবে।[২]

কাগজ আনতে বলার ঘটনা

ইনতিকালের চার দিন পূর্বে বৃহস্পতিবার যখন রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, তখন যাঁরা নবী করীম (সা)-এর হুজরায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরকে বলেন, কাগজ কলম নিয়ে এসো, যাতে আমি তোমাদের জন্য একটি ওসীয়তনামা লিখে দিতে পারি। ফলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। অনেকেই মতানৈক্য শুরু করেন। হযরত উমর (রা) বলেন, নবী (সা) এখন অসুস্থ, প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। এমনি অবস্থায় আরো কষ্ট দেয়া সমীচীন হবে না। আল্লাহর কিতাব সামনে রয়েছে যা আমাদেরকে গুমরাহী থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট। কেউ কেউ হযরত উমরের সমর্থন করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, দোয়াত-কলম এনে লিপিবদ্ধ করা উচিত এবং বলেন اهجر استفهموه। নবী (সা) রোগের প্রচণ্ডতার কারণে বেহুশ অবস্থায় معاذ الله কোন প্রলাপ বা অর্থহীন কথা বলেছেন? স্বয়ং রাসূল (সা) কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নাও। অর্থাৎ নবী (সা) হলেন

---

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১০৩।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২২৪।

আল্লাহর নবী ও রাসূল। তাঁর মুখ ও অন্তর ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও নিরাপদ। معاذ الله। অন্যান্যদের মত এরূপ নয় যে, অসুস্থতার কারণে প্রলাপ বা বেহুদা কথা বলবেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) একবার স্বীয় পবিত্র মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, শপথ ঐ পবিত্র সত্তার যাঁর নিয়ন্ত্রণ ও অধীনে আমার জীবন, এ মুখ থেকে কোন অবস্থায় সত্য ও ন্যায় ব্যতীত অন্য কোন কথা উচ্চারিত হয়নি।

اَهَجَرَ اِسْتَفْهِمُوْهُ এটা হযরত উমরের বাক্য নয়, বরং এটা তাদের কথা, যাদের মতামত হযরত উমরের মতের বিরোধী ছিল। হযরত উমরের মত ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যাতে লিখার জন্য কষ্ট দেয়া না হয়। কোন কোন লোকের মত ছিল এই যে, দোয়াত-কলম হাযির করে লিপিবদ্ধ করিয়ে নেয়া উচিত। তারা হযরত উমরের জবাবে বলেন, اهجر استفهموه। এর অর্থ হলো এই যে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ প্রদান করেছেন, তখন কেন লিখিয়ে নেয়া হবে না? কেননা নবী (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে কখনো কোন প্রলাপ ও অর্থহীন কথা বের হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ জন্য ঐ সমস্ত লোক اهجر। শব্দটি استفهام انكارى, বা না প্রশ্নবোধক অভিযোগ বলেছেন। স্বয়ং এর বক্তা ছিলেন না। যে রিওয়ায়াত এ বাক্য প্রশ্নবোধক ব্যতীত বর্ণিত হয়েছে এটাও প্রশ্নবোধক (استفهام)-এর উপর আরোপিত এবং সেখানে প্রশ্নবোধকের হরফ উহ্য রয়েছে।

মজলিসে মতানৈক্য শুরু হয়ে যখন হট্টগোল বৃদ্ধি পায়, তখন নবী (সা) বলেন, তোমরা আমার এখান থেকে উঠে যাও, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যেদিকে আহবান করছ, তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি এটা অধিক উত্তম। রোগের এত কষ্ট সত্ত্বেও নবী (সা) লোকজনকে পবিত্র যবানে তিনটি বিষয়ে ওসীয়্যত করেন ঃ

১. আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বের করে দাও অর্থাৎ আরব উপদ্বীপে কোন মুশরিক থাকতে পারবে না।

২. প্রতিনিধি দল বিদায়ের সময় কিছু হাদিয়া তোহফা প্রদান কর, যেভাবে আমি তাদেরকে প্রদান করে থাকি।

৩. তৃতীয় বিষয় সম্পর্কে নবী (সা) চুপ থাকেন অথবা বর্ণনাকারী ভুলে গিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

কেউ কেউ বলেন, তৃতীয় ওসীয়্যত ছিল কুরআনের উপর আমল করা অথবা উসামা বাহিনী প্রেরণ করা অথবা আমার কবরকে মূর্তি-পূজা ও সিজ্‌দার স্থান নির্বাচন না করা অথবা নামাযের পাবন্দী করা এবং গোলামদের প্রতি খেয়াল রাখা।[১]

---

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১০৩।

উপসংহার ঃ জানা নেই যে, নবী (সা) যে সমস্ত বিষয়ে মৌখিকভাবে ওসীয়্যত করেন এগুলোই লিখিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে কাগজ কলম চেয়েছিলেন। অথবা অন্য বিষয় হতে পারে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থতার সময় বলেছেন যে, আমার ইচ্ছা ছিল, আবূ বকর এবং তাঁর পুত্রকে (আবদুর রহমান) কারো মাধ্যমে ডেকে এনে তাদেরকে কিছু ওসীয়্যত করব, তাদেরকে আমার উত্তরাধিকার নিযুক্ত করব। যাতে কেউ কোন কিছু বলতে না পারে এবং আশা পোষণকারী কোন আশা করতে না পারে। কিন্তু আমি আমার এ ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছি এবং বলেছি এ ওসীয়্যতের প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার এটা অভিপ্রায় নয় যে, আবূ বকর ব্যতীত অন্য কেউ খলীফা হোক এবং মু'মিনগণও আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কাউকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করবে না। অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে ঃ معاذ الله ان يختلف الناس على أبى بكر (আল্লাহ রক্ষা করুন যে, লোকজন আবূ বকরের খিলাফতের ব্যাপারে মতানৈক্য করবে)।

এ সমস্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে,নবী (সা)-এর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল আবূ বকর (রা) তাঁর পর খলীফা মনোনীত হোক কিন্তু তিনি বিষয়টি তাক্দীর ও সাহাবাগণের ইজ্মার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাক্দীর বা আল্লাহর অভিপ্রায় অনুযায়ী আবূ বকরই খলীফা হবেন। মুসলমানদের ঐকমত্য অনুযায়ী তাঁর খিলাফত সম্পাদিত হবে এবং সমস্ত মুসলমান তাঁর খিলাফতের উপর ঐকমত্য পোষণ করবে। ইমাম বুখারীর কথার দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, এ হাদীস দ্বারা হযরত সিদ্দীক আকবরের খিলাফত সম্পর্কে লিখিয়ে দেয়ার বিষয় ছিল। কেননা ইমাম বুখারী এ হাদীসে কিতাবুল আহ্কামের তরজমায় লিখেছেন, باب الاستخلاف এ হাদীস দ্বারা খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (যারকানী, পৃ. ২৫৭; কাস্তাল্লানী, ১ খ, পৃ. ২৬০; ফাতহুল বারী, ১৩ খ, পৃ. ১৭৭)

যে মজলিসে কাগজ আনতে বলার ঘটনা সংঘটিত হয় এবং লোকগণের মতানৈক্য ও শোরগোলের কারণে নবী (সা) এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমার নিকট থেকে উঠে যাও, আল্লাহর নবীর সামনে মতানৈক্য এবং হৈ চৈ করা সমীচীন নয়। লোকজন তখন উঠে চলে যায়।

লোকজন চলে যাওয়ার পর নবী (সা) একটু আরাম করেন। যোহর নামাযের সময় যখন দৈহিক ও মানসিকভাবে একটু সুস্থবোধ করেন এবং রোগের প্রচণ্ডতা কিছুটা হ্রাস পায়, তখন তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে, সাত মশক পানি আমার মাথায় ঢাল। হয়ত কিছু আরাম হতে পারে এবং আমি লোকজনকে ওসীয়্যত করতে পারব। সুতরাং

নির্দেশ অনুযায়ী সাত মশক[১] পানি ঢালা হয়। এভাবে গোসলের দ্বারা তিনি একটু আরাম বোধ করেন। অতঃপর হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা)-এর সাহায্যে মসজিদে গমন করেন এবং যুহর নামাযে ইমামতি করেন। নামাযের পর তিনি খুতবা পেশ করেন এবং এটা ছিল রাসূল (সা)-এর সর্বশেষ খুতবা[২] সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, এ খুতবা তিনি ইনতিকালের চারদিন পূর্বে পেশ করেছিলেন। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) বলেন, এ হিসাবে এ খুতবা বৃহস্পতিবার দিন পেশ করেছিলেন।[৩]

নবী (সা) এর সর্বশেষ খুতবা

নবী (সা) নামায সমাপ্ত করে মিম্বরের উপর উপবেশন করেন। আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসার পর সর্বপ্রথম ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারীদের কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন। অতঃপর মুহাজিরগণকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, তোমরা অধিক হবে এবং আনসার কম হবে। তোমরা লক্ষ্য কর আনসারগণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা নেককার তাদের সাথে ইহ্সান (সদাচার) কর এবং যারা ভুল করেছে, তাদেরকে তোমরা ক্ষমা কর।

অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এক নেক বান্দাকে অধিকার দিয়েছেন যে, সে হয়ত দুনিয়ার নিয়ামত গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহ্র

---

১. দারেমীর রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, এই সাত মশক পানি মদীনার বিভিন্ন কূপ থেকে ভর্তি করা হয়েছিল। আল-ইত্তিহাফ শারহিল ইহ্য়া, ২ খ, পৃ. ২৮৮।

وقد خطب عليه الصلواة والسلام فى يوم الخميس قبل ان يقبض عن السلام بخميس ايام خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من سائر الصحابة مع ماكان قد نص عليه ان يؤم الصحابة أجمعين كما سيئاتى بينانه حضورهم كلهم ولعل خطبة هذه كانت عوضا عما اراد ان يكتب فى الكتاب وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام بين يدى هذه الخطبة كريمة فصوا عليه من سبع قرب لم تحلل او كيتهن وهذا من باب الاستباء بالسبع كما وردت بها الاحايث فى غير هذا الموج والمقصود انه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم خرج فصلى بالناس ثم خطبهم كما تقدم في حديث عائشة كذا فى البداية والنهاية صفحــ ٢٢٨ ج٥

২. হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, মসজিদের দিকে যতগুলো দরজা রয়েছে এগুলো বন্ধ করে দেয়া হোক, একমাত্র আলীর দরজা খোলা রাখা হোক। (আহমাদ ও নাসাঈ) এটা ঐ সময়ের নির্দেশ ছিল যখন মসজিদে নব্বীর নির্মাণ কাজ চলছিল অর্থাৎ হিজরতের প্রারম্ভে। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা)-এর দরজা ব্যতীত সমস্ত দরযা বন্ধ হওয়ার নির্দেশ ছিল মৃত্যু রোগের সময়ের ঘটনা। এটাই ছিল সর্বশেষ নির্দেশ। সর্বশেষ নির্দেশ প্রথম নির্দেশের রহিতকারী হয়ে থাকে।

৩. আল-বিদায়া ওয়াল নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২২৯; ফাতহুল বারী, ৭ খ, পৃ. ১০; ইত্তিহাফ শারহে ইহইয়াউল উলূমুদ্দীন, ১০ খ, পৃ. ২৮৭।

নি'আমত অর্থাৎ আখিরাতের নি'আমত গ্রহণ করবে। কিন্তু ঐ বান্দা আল্লাহর নি'আমত অর্থাৎ আখিরাত গ্রহণ করেছে।

হযরত আবূ বকর (রা) যেহেতু অধিক জ্ঞানী ও আলিম ছিলেন। ফলে তিনি এটা উপলব্ধি করেন যে, ঐ বান্দার দ্বারা রাসূল (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। এটা শুনেই তিনি কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক। নবী (সা) বলেন, হে আবূ বকর! একটু থাম এবং ধৈর্যধারণ কর। অতঃপর মসজিদের দিকে লোকজনের জন্য যতটি দরজা উন্মুক্ত ছিল, এগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এ সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়ে [১]শুধু আবূ বকরের দরজা খোলা রাখা হোক। জান-মাল, মহব্বত ও বন্ধুত্বের দৃষ্টিতে আমার উপর সবচেয়ে বেশি ইহসানকারী (উপকারী) ব্যক্তি হলেন আবূ বকর। যে ব্যক্তি আমার উপর ইহসান করেছেন আমি তাঁর প্রতিদান দিয়েছি। একমাত্র আবূ বকরের, ইহসানের প্রতিদান দেইনি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতিদান প্রদান করবেন। যদি আমি স্বীয় প্রভু ব্যতীত অন্য কাউকে প্রিয় বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বকরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তার সাথে আমার রয়েছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব। এতেও তিনি সবচেয়ে উত্তম। এই ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।[১]

বস্তুত এই খুতবায় নবী (সা) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) এর ফযীলত ও মর্যাদার বর্ণনা করেন, যাতে অন্য কেউ তাঁর সমপর্যায়ের ছিল না। সাথে সাথে জনগণের সামনে তাঁর ফযীলত ও মর্যাদা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় এবং রাসূল (সা)-এর খিলাফত সম্পর্কে কেউ মতানৈক্য না করে। এ বিষয়ে তাকিদের জন্য উত্তম ইবাদত নামাযের ইমামতের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেন। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণের সময় এটাই বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল যাঁকে আমাদের দ্বীনের (নামাযের) জন্য পসন্দ করেছেন, আমাদের দুনিয়ার (খিলাফত ও ইমারত) জন্য আমরা তাঁকে কেন নির্বাচন ও পসন্দ করব না।[২]

অতঃপর ঐ খুতবার মধ্যে এই ঘোষণা প্রদান করেন যে, উসামা বাহিনীকে দ্রুত প্রেরণ কর এবং তিনি আরো বলেন, আমি জানি যে, কিছু লোক (ইবন সা'দ বলেন, এরা ছিল মুনাফিক) উসামার নেতৃত্বের বিরোধিতাকারী রয়েছে। এই বলে যে, প্রধান ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও যুবককে কেন এ পদ দেয়া হয়েছে। সাবধান! এ সমস্ত লোক, এর পূর্বেও উসামার পিতার (যায়দের) নেতত্বের বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ্ শপথ! উসামার পিতাও অধিনায়ক বা নেতা হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তার পর তার পুত্রও অধিনায়ক হওয়ার যোগ্য এবং আমার প্রিয়ভাজন ব্যক্তির মধ্যে সেও একজন।

---

১. যারকানী, ৮ খ, পৃ. ২৫৪।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২২৯।

তিনি আরো বলেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের উপর লা'নত হোক, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে সিজ্‌দার স্থান বানিয়েছে। এর দ্বারা স্বীয় উম্মাতকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদের মত আমার কবরকে সিজ্‌দার স্থান নির্ধারণ করনা।

নবী করীম (সা) আরো ঘোষণা করেন, হে লোক সকল! আমি এ খবর অবগত হয়েছি যে, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুতে ভীত হয়ে পড়েছ। আমার পূর্বে কোন নবী কি তাঁদের উম্মতের মধ্যে চিরকালের জন্য জীবিত ছিলেন। যার কারণে আমিও তোমাদের মধ্যে চিরদিন থাকব? যেমন আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ، وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

"আপনার পূর্বে আমি কোন মানুষকে চিরঞ্জীব করিনি। মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন, নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল ইহলোক ত্যাগ করেছেন।"

তোমরা জেনে রাখ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অচিরেই মিলিত হতে যাচ্ছি, তোমরাও আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মিলিত হবে। আমি সমস্ত মুসলমানকে ওসীয়্যত করছি যে, পূর্ববর্তী মুহাজিরগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে এবং পূর্ববর্তী মুহাজিরগণকে ওসীয়্যত করছি যে, তারা যেন তাক্ওয়া ও নেক আমলের উপর অটল থাকে। কেননা আল্লাহপাক এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

"মহাকালের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্য্যের উপদেশ দান করে।" (সূরা আসর ঃ ১-৩)

হে মুসলমান! আমি তোমাদেরকে আনসারগণের সম্পর্কে ওসীয়্যত করছি যে, তাঁদের সাথে উত্তম ও সদ্ব্যবহার কর। আনসারগণ ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাঁদের বাড়ী ঘর, জমি, বাগান ও ফলের মধ্যে তোমাদেরকে অংশীদার বানিয়েছে। দারিদ্রতা ও ক্ষুধা তৃষ্ণা সত্ত্বেও তোমাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। যেমন-আল্লাহপাক বলেছেন ঃ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

তিনি আরো ইরশাদ করেন তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের আগে যাচ্ছি এবং তোমরাও এসে আমার সাথে মিলিত হবে। হাউযে কাউসারে নিকট মিলিত হবার ওয়াদা রইল। অত:পর মিম্বর থেকে অবতরণ করে পবিত্র হুজরায় গমন করেন।[১]

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ. পৃ. ২২৯।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ জামা'আতে নামায আদায় এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ (সা)-যতক্ষণ দৈহিক শক্তি বিদ্যমান ছিল ততক্ষণ মসজিদে গমন করে নামায পড়াতেন। সর্বশেষ তিনি বুধবারে মাগরিবের নামায পড়িয়েছিলেন। এর চারদিন পর সোমবার তিনি ইন্‌তিকাল করেন। সহীহ বুখারী শরীফে উম্মে ফযল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) আমাদেরকে মাগরিবের নামায পড়ালেন। নামাযে তিনি সূরা ওয়াল মুরসালাত তিলাওয়াত করেন। এরপর তিনি ইনতিকাল পর্যন্ত আর কোন নামায পড়ান নি। যখন ইশার সময় হয়, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, লোকজন কি নামায পড়েছে? আরয করা হয়, হে আল্লাহর রাসূল! লোকজন আপনার অপেক্ষা করছে। রাসূল কয়েকবার উঠার চেষ্টা করেন কিন্তু রোগের তীব্রতার কারণে বার বার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি ইরশাদ করেন, আমার পক্ষ থেকে আবূ বকরকে নামাযে ইমামতির দায়িত্ব পালনের জন্য বলে দাও। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ বকর অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। যখন তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন তখন (তাঁর উপর এরূপ ভাবের সৃষ্টি হবে যে,) তিনি নামায পড়াতে সক্ষম হবেন না এবং ক্রন্দনের কারণে লোকদেরকে স্বীয় কিরা'আত শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি হযরত উমরকে নামায পড়ানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করুন। হযরত আয়েশা (রা) প্রকাশ্যে এটা বলেছেন কিন্তু অন্তরে এ ধারণাও ছিল যে, যে ব্যক্তি জায়গায় দাঁড়াবে, মানুষ তাকে অশুভ মনে করবে। ফলে রাসূল (সা) রাগত স্বরে বললেন, তুমি ইউসুফের ভাইদের মত, মুখে এক কথা বলছ, অন্তরে অন্য খেয়াল পোষণ করছ। আবূ বকরকে নির্দেশ প্রদান কর, তিনিই নামায পড়াবেন।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা)-এর নির্দেশ প্রদানের পর হযরত আয়েশা (রা) তিনবার বিরোধিতা করেন, কিন্তু রাসূল (সা) প্রত্যেকবার একই নির্দেশ প্রদান করেন যে, আবূ বকরকে বল, তিনিই যেন নামায পড়ান। সুতরাং হযরত আবূ বকর (রা) ইমাম হয়ে নামায পড়ালেন।

ইমাম গাযালী (র) 'ইহ্ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার কথার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করেছেন। এতে হযরত আয়েশা (রা) তাঁর অন্তরের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছেন, কেন তিনি স্বীয় মর্যাদাসম্পন্ন পিতার ইমামতকে অপসন্দ করেছেন।

قالت عائشة رضى اللّه عنها ماقلت ذالك ولاصرفته عن أبى بكر الارغبة عن المخاطرة والهلكة الا ماسلم الله وخشيتُ ايضًا ان لايكون الناس رجلا صلى فى مقام النبى صلى الله عليه وسلم وهو حى الا أن يشاء الله يحسدونه ويبغون عليه ويتشاءمون به فاذا

الامر امر الله والقضاء قضاءه وعصمه الله من كل ماتخوفت عليه من امر الدنيا والدين -

"হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমি আমার পিতার ইমামতের ব্যাপারে বিরোধিতা করেছি, যাতে আমার পিতা বস্তু জগত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও দূরে অবস্থান করেন। কেননা সম্মান ও মর্যাদা বিপদ থেকে মুক্ত নয়। এতে ধ্বংস হওয়ার আশংকা রয়েছে। তবে আল্লাহ পাক যাকে সঠিক ও নিরাপদ রাখেন তিনিই দুনিয়ার ফিতনা থেকে রক্ষা পেতে পারেন। এছাড়া এটাও আশংকা ছিল যে, যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর জীবদ্দশায় তাঁর স্থানে দাঁড়াবে, মানুষ তাঁকে অশুভ মনে করতে পারে। অবশ্য যখন আল্লাহর নির্দেশ হয়েছে এবং ভাগ্যেও এটা নির্ধারিত হয়েছে যে, আমার পিতা রাসূলুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হবেন, তাঁর জায়গায় ইমামতি করবেন। সুতরাং আমি এই দু'আ করছি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার পিতাকে দ্বীন ও দুনিয়ার সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে হিফাযত করুন।

সুবহানাল্লাহ ! এটা হলো সিদ্দীকা বিন্‌তে সিদ্দীক-এর উপলব্ধি ও দুরদর্শিতা। তিনি এ ইমামত ও প্রতিনিধিত্বকে ভবিষ্যতের খিলাফত ও ইমারতের সূচনা মনে করেছেন এবং আন্তরিকভাবে এ চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর পিতা ইমাম ও আমীর নির্বাচিত না হোক। এই ক্ষুদ্র নেতৃত্ব ও বৃহত্তর নেতৃত্বকে তাঁর পিতার পরিবর্তে অন্য কারো উপর অর্পণ করা হোক, যাতে তাঁর পিতা দ্বীন ও দুনিয়ার ফিতনা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যান। এটা হলো কন্যার বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-এর বৈশিষ্ট্য বায়'আতের সময় প্রদত্ত খুতবা থেকে অনুধাবণ করা যায়।

তিনি খুতবায় বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো অন্তরে এই ইমামত ও খিলাফতের আশা পোষণ করিনি এবং কখনো প্রার্থনা করিনি। মুসলমানদের মধ্যে ফিতনার ভয়ে আমি এটা গ্রহণ করেছি।

সিদ্দীক ও সিদ্দীকাহ্‌র এটাই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁদের অন্তর ধন-সম্পদ ও উচ্চ পদের লোভ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। তবে এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহর নবী ও তাঁর রাসূল, যাঁকে ইমাম নির্বাচিত করার জন্য অনমননীয় ছিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণের ইমাম হবেন এবং তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন মন ইমারত এবং খিলাফতের লোভ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হবে। কোন প্রকার ফিতনা তাঁকে স্পর্শ করার সুযোগ পাবে না।

এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহ পাকের যে অনুগ্রহ ও আসমানী সাহায্য নবীর সাথে ছিল এবং নবী যাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তাঁর সাথে ঐ অনুগ্রহ ও সাহায্য বিদ্যমান থাকবে। কেননা আল্লাহর রাসূল (সা) কখনো আল্লাহর নির্দেশ ও ইঙ্গিত ব্যতীত স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারেন না। যেমন কোন বাদশাহ তাঁর জীবিতকালে

কাউকে তাঁর সিংহাসন অর্পণ করা তাঁকে (বাদশাহ্র) যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করার নামান্তর। এমনিভাবে 'ইমামুল মুত্তাকীন' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং কাউকে স্বীয় মুসাল্লার উপর ইমামতের জন্য দাঁড় করানোর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ ব্যক্তি হলেন আল্লাহর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি।

শনিবার অথবা রোববার রাসূল (সা)-এর শরীর কিছুটা সুস্থবোধ হওয়ায় তিনি হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা)-এর সহযোগিতায় মসজিদে আগমন করেন। হযরত আবূ বকর (রা) এ সময় যোহরের নামাযে ইমামতি করছিলেন। তিনি আবূ বকরের বামদিকে উপবেশন করলেন এবং বাকী নামায ইমাম হিসেবে রাসূল (সা) পড়ালেন। হযরত আবূ বকর (রা) (সা)-এর পেছনে নামায পড়তে থাকেন এবং মুসল্লীগণ হযরত আবূ বকরের তাকবীরের অনুসরণে নামায আদায় করেন। (বুখারী)

এটা ছিল যোহরের নামায এবং রাসূল (সা)-এর সর্বশেষ ইমামত। এরপর মসজিদে উপস্থিতি নবী (সা)-এর জন্য সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। উম্মে ফযলের রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা)-এর সর্বশেষ নামায ছিল মাগরিবের নামায। এর দ্বারা স্বতন্ত্র ইমামতের অস্বীকৃতি বুঝানো হয়েছে যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে নামাযের মধ্যে ইমামত ও তিলাওয়াত করেছেন তা ছিল মাগরিবের নামায। সপ্তাহের প্রথম দিন হযরত উসামা এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম যাঁদেরকে জিহাদের গমনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন তাঁরা নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন। তাঁরা সাক্ষাতের পর রওয়ানা হয়ে মদীনা থেকে এক ক্রোশ দূরে 'জুরুফ' নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। নির্দেশ পালন করার জন্য সাহাবাগণ রওয়ানা হয়ে গেলেও নবী (সা)-কে অসুস্থতার কারণে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কারো আগ্রহ হচ্ছিল না। রবিবারে নবীজী (সা)-এর রোগের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। এ সংবাদ পেয়ে হযরত উসামা (রা) নবী (সা) দেখার জন্য মদীনায় ফিরে আসেন। এ সময় রাসূল (সা) রোগের তীব্রতার কারণে কথা বলতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। হযরত উসামা (রা) ঝুঁকে পবিত্র কপালে চুমো খেলেন, নবী (সা) উভয় হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করেন অতঃপর উসামার উপর রাখেন। হযরত উসামা (রা) বলেন, আমি ধারণা করছি যে, রাসূল (সা) আমার জন্য দু'আ করছেন। অতঃপর হযরত উসামা (রা) জুরুফ নামক স্থানে যেখানে তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে গমন করেন।[১]

ইবন সা'দ তাবাকাতে এবং যারকানী শারহে মাওয়াহিবে উল্লেখ করেন যে, ঐ দিন অর্থাৎ রোববার লুদূদ (لدود) -এর ঘটনা সংঘটিত হয়।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে রোগের তীব্রতার কারণে আমরা পবিত্র মুখে ঔষধ দিলে রাসূল (সা) ইঙ্গিতে নিষেধ করেন। কিন্তু আমরা

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২ খ, পৃ. ১৩৬।

মনে করি যে, এটা রোগের কারণে হতে পারে। কারণ রোগী সাধারণত ঔষধ অপসন্দ করে থাকে। পরে যখন রাসূল (সা)-এর জ্ঞান ফিরে আসে, তখন তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? সুতরাং তোমাদের শাস্তি হলো এই যে, হযরত আব্বাস (রা) ব্যতীত তোমাদের সবার মুখে ঔষধ ঢেলে দেয়া হবে। কেননা। তিনি একাজে অংশগ্রহণ করেন নি।[১]

নবী (সা)-এর ইনতিকাল দিবস

সোমবার দিন নবী (সা) এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে অনন্তকাল তথা পরলোক গমণ করেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু তথা আল্লাহপাকের সাথে মিলিত হন। সোমবার দিন ফজরের সময় রাসূল (সা) হুজরার পর্দা উঠিয়ে প্রত্যক্ষ করেন যে, লোকজন কাতারবন্দী হয়ে ফজর নামায আদায় করছেন। সাহাবাগণকে এ অবস্থায় দেখে নবী (সা) মৃদু হাসলেন। নূরের আলোকে পবিত্র চেহারা শ্বেত-শুভ্রস্ফটিকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এদিকে আনন্দে সাহাবাগণের অবস্থা হলো এই যে, নামায যেন ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) এ অবস্থায় পিছনে চলে আসার ইচ্ছা করেন কিন্তু নবী (সা) তাঁকে নামায সম্পন্ন করার ইঙ্গিত করেন। দুর্বলতার কারণে নবী (সা) বেশিক্ষণ দাঁড়াতে সক্ষম ছিলেন না। হুজরার পর্দা নামিয়ে তিনি ভিতরে গমন করেন। (বুখারী)

নবী (সা)-এর পর্দা উঠিয়ে নামাযীদেরকে প্রত্যক্ষ করা এটা ছিল পবিত্র চেহারার নূরের দ্যুতির সর্বশেষ বিকাশ এবং সাহাবায়ে কিরামের জন্য ছিল নবুওয়াতের অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনের সর্বশেষ সুযোগ। রাসূল প্রেমিকগণ তখন এ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেনঃ

وكنت ارى كالموت من بين ساعة * فكيف ببين كان موعده الحشر

"আমি তো এক ঘন্টার বিচ্ছেদকে মৃত্যু মনে করেছি। সুতরাং এই বিচ্ছেদ সম্পর্কে কি জিজ্ঞাসা কর যাঁর সাথে হাশরে সাক্ষাতের অঙ্গীকার রয়েছে।"

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ফজর নামায সম্পন্ন করে সরাসরি পবিত্র হুজরায় গমন করেন এবং নবী (সা)-কে দেখার পর হযরত আয়েশা সিদ্দীক (রা)-কে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এখন সুস্থ প্রত্যক্ষ করছি। যে কষ্ট ও ব্যাকুলতা পূর্বে বিদ্যমান ছিল, তা এখন হ্রাস পাচ্ছে। যেহেতু এ দিনটি হযরত সিদ্দীকে আকবরের দু'জন স্ত্রীর মধ্যে যিনি মদীনা থেকে এক ক্রোশ দূরে বাস করতেন, তাঁর পালা ছিল, ফলে রাসূল (সা)-এর অনুমতি নিয়ে তিনি সেখানে গমন করেন।[২]

ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতে বর্ণিত, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) আরয করেন ঃ

يانبى الله انى اراك قد اصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب واليوم يوم بنت خارجة افاتيها قال نعم۔

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১১২।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৪।

" হে আল্লাহর নবী! আমি প্রত্যক্ষ করছি, আপনি আল্লাহর নি'আমত ও ফযলে ভাল ও সুস্থ অবস্থায় সকালবেলা অতিক্রম করেছেন। আজ আমার স্ত্রী হাবীবাহ্ বিনত খারিজার পালা, যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে সেখান থেকে ঘুরে আসি। রাসূল (সা) বলেন, হ্যাঁ , চলে যাও।"

অন্যান্য লোকজনও যখন অবগত হলেন যে, নবী (সা) সুস্থবোধ করছেন, তখন তারা নিজ নিজ বাড়িতে গমন করেন।[১]

হযরত আলী (রা) পবিত্র হুজরা থেকে বাইরে আগমন করেন। লোকজন তাঁকে নবীজীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত আলী (রা) বলেন, আল-হামদু লিল্লাহ। তিনি সুস্থ রয়েছেন। লোকজন শান্ত হয়ে চলে যায়। হযরত আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-এর হাত ধরে বললেন, হে আলী, আল্লাহর শপথ! তিন দিন পর তুমি লাঠির গোলাম হবে, অর্থাৎ অন্য কেউ হাকিম বা শাসক হবে এবং তুমি তার অনুগত হবে। নির্দেশ পালন করবে। আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি, রাসূলুল্লাহ (সা) এ রোগেই ইনতিকাল করবেন। সুতরাং উত্তম হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করি, আপনার পর কে খলীফা হবেন যদি আমাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়, তাহলে জানতে পারব। নতুবা তিনি এ ব্যাপারে আমাদের সম্পর্কে ওসীয়্যত করবেন। হযরত আলী (রা) বলেন, সম্ভবত রাসূল (সা) আমাদের ব্যাপারে অস্বীকার করবেন। অতঃপর আমরা চিরকালের জন্য এ পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। আল্লাহর শপথ, আমি এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একটু কথাও বলব না।[২]

মৃত্যুকষ্ট

লোকজন রাসূল (সা)-কে সুস্থ মনে করে চলে যান। কিছুক্ষণ পরই মৃত্যু কষ্ট আরম্ভ হয়। হযরত আয়েশার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন। এ সময় হযরত আয়েশার ভাই আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) হাতে মিসওয়াক নিয়ে আগমন করেন। নবী (সা) তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনাকে মিসওয়াক দেব? তিনি দেয়ার জন্য ইঙ্গিত করেন। আমি বললাম, এটা নরম করে দেব? তিনি ইঙ্গিতে হ্যাঁ বললেন। আমি চিবিয়ে ঐ মিস্ওয়াক রাসূলুল্লাহকে প্রদান করি। এ কারণে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) গৌরব ও নিয়ামতের উল্লেখ করে বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা শেষ সময়ে আমার মুখের লালা নবী (সা)-এর মুখের লালার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন রাসূল (সা)-এর ইনতিকাল আমার হুজরায়, আমার পালার দিন এবং আমার মধ্যে হয়েছে।

১. ইবন হিশাম, ৪ খ, পৃ. ৩০২।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ. পৃ. ২২৭।

মন্তব্য ঃ মোল্লা আলী-কারী তরীকতের শায়খগণ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ মিসওয়াক ব্যবহার করে, মৃত্যুর সময় তার মুখে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারিত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আফিম খায় তার মুখে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারিত হবে না।

নবী (সা)-এর নিকট পানির একটি পেয়ালা রাখা হয়েছিল। ব্যথায় অস্থির হয়ে তিনি ঐ পেয়ালায় হাত ভিজিয়ে মুখ মুছতেন এবং বলতেন ঃ لا اله الا الله ان للموت سكرات (আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, নিশ্চয়ই মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টকর) অতঃপর ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ أللهم يارفيق الاعلى (হে আল্লাহ, আমি রফীকে আ'লার নিকট যেতে চাই), অর্থাৎ হাযিরাতুল কুদ্স যা আম্বিয়ায়ে মুরসালীনের বাসস্থান, আমি সেখানে যেতে চাই।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন, আমি অনেকবার রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, কোন পয়গাম্বরের রূহ্ ঐ সময় পর্যন্ত কবয করা হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে তাঁর স্থান দেখানো না হয় এবং তাকে এ অধিকার দেয়া না হয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করবেন। যখন রাসূল (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে এই বাক্য উচ্চারিত হয়, তখনই আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, তিনি আর আমাদের মধ্যে থাকবেন না। তিনি মালায়ে আ'লা ও আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভ করেছেন। মূলত নবী (সা)-এর পবিত্র যবান থেকে اللهم فى الرفيق الاعلى। উচচারিত হতে থাকে এবং পবিত্র রূহ নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট গমন করে। انا لله وانا اليه راجعون

ইনতিকালের তারিখ

যে হৃদয় বিদারক ঘটনা দুনিয়াকে নবুওয়াত ও রিসালাতের ফয়েয, বরকত ও নূরের তাজাল্লী থেকে বঞ্চিত করে এবং নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন, ঐ তারিখ হলো ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার দ্বিপ্রহরের সময়। এতে কারো মত পার্থক্য নেই যে, তিনি রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার ইনতিকাল করেন। তবে দু'টি বিষয়ে মত-পার্থক্য রয়েছে। একটি হলো কোন্ সময়ে ইন্তিকাল করেন। দ্বিতীয়টি হলো রবিউল আউয়াল মাসের কোন তারিখে।

মাগাযী ইবন ইসহাকে বর্ণিত আছে, চাশতের সময় নবী (সা) ইনতিকাল করেন। মাগাযী মূসা ইবন উকবায় যুহরী এবং উরওয়া ইবন যুবায়র থেকে বর্ণিত হয়েছে দ্বিপ্রহরের (زوال) সময় তিনি ইনতিকাল করেন। এ রিওয়ায়াতেটি অধিক সহীহ। এটা সামান্য মতপার্থক্য। চাশত এবং দ্বিপ্রহরের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। অবশ্য ইনতিকালের তারিখ নিয়ে বিরাট মতপার্থক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে ১২ রবিউল আউয়াল তিনি ইনতিকাল করেন। মুসা ইবন উকবা, লাইস ইবন সা'দ এবং

খাওয়ারিযমী রবিউল আউয়ালের ১ তারিখে ইন্তিকালের কথা বর্ণনা করেছেন। কালবী এবং আবূ মাখনাফ রবিউল আউয়ালের ২ তারিখে ইন্তিকালের কথা উল্লেখ করেছেন বুখারীর শরাহ এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।[১]

বয়স

ইনতিকালের সময় নবী (সা) এর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। এটাই হলো জমহুরের (সর্বসম্মতিক্রমে বর্ণিত) মতামত। এটাই হলো সহীহ। আবার কেউ বলেছেন ৬৫, কেউ বলেছেন ৬০ বছর।[২]

সাহাবায়ে কিরামের অস্থিরতা ও মানসিক অশান্তি

নবী করীম (সা)-এর ইনতিকালে সমগ্র মদীনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ মর্মান্তিক সংবাদ শুনেই সাহাবা কিরামের হুঁশ-জ্ঞান ও বিবেক শূন্য হয়ে পড়েন। দুঃখ ও শোকে হযরত উসমান (রা) দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকেন এবং অত্যধিক শোকের কারণে কথা বলতে পারছিলেন না। হযরত আলী (রা) শোকে ক্রন্দন করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও উম্মুল মু'মিনীনগণের উপর সীমাহীন কষ্ট ও শোকের পাহাড় পতিত হয়। হযরত আব্বাস (রা) অত্যন্ত শোক ও পেরেশানীর কারণে অচেতন হয়ে পড়েন। হযরত উমরের কষ্ট ও বেদনার মাত্রা সীমাতিক্রম করে। তিনি তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, মুনাফিকদের ধারণা হলো রাসূল (সা) ইনতিকাল করেছেন। তিনি কখনো ইনতিকাল করেননি, বরং তিনি তাঁর প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গমন করেছেন। তিনি ফিরে আসবেন। আল্লাহর শপথ! তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং মুনাফিকদের হঠকারিতা ও বিদ্রোহ দমন করবেন। হযরত উমর (রা) আবেগ ও উত্তেজনায় কোষ থেকে তলোয়ার বের করেন। কারো সাহস ছিল না যে, তাঁকে বলে, রাসূল (সা) ইনতিকাল করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) ইন্তিকালের সময় উপস্থিত ছিলেন না। সোমবার সকালে তিনি যখন দেখলেন রাসূল (সা) সুস্থ রয়েছেন, তখন তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি পেলে ঘর থেকে ঘুরে আসি। নবী (সা) অনুমতি প্রদান করেন। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা) অনুমতি নিয়ে মদীনা থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত বাড়ি চলে গেলেন। এদিকে দ্বিপ্রহরের সময় রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন। হযরত আবূ বকর (রা) এ হৃদয় বিদারক সংবাদ পাওয়ামাত্র ঘোড়ায় আরোহণ করে দ্রুত মদীনায় পৌঁছেন। মসজিদে নব্বীর দরযায় ঘোড়া থেকে নেমে শোকে বিহ্বল পবিত্র হুজরার দিকে অগ্রসর হন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন। রাসূল (সা) পবিত্র

---

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৯৮;

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ১১০

বিছানায় শায়িত এবং সমস্ত উম্মুল মু'মিনীন চতুর্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের আগমনে হযরত আয়েশা (রা) ব্যতীত সবাই মুখ ঢেকে ফেলেন এবং পর্দা করেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) নূরানী চেহারা থেকে চাদর উঠিয়ে পবিত্র ললাটে চুমো খেলেন এবং ক্রন্দন করে বলেন ঃ وابنياه واخليلاه اصفياه তিনবার এরূপ বললেন। (আহমাদ, ইত্তিহাফ শরাহ্ আল ইহ্ইয়া, ১০ খ, পৃ. ৩০০)।

অতঃপর তিনি বলেন, আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আল্লাহর শপথ! দু'বার [১] আপনাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না। যে মৃত্যু আপনার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল তা এসে গিয়েছে। এটা বলেই তিনি পবিত্র হুজরা থেকে বাইরে আগমন করেন।

তিনি হযরত উমরকে আবেগ ও উত্তেজনা পূর্ণ দেখতে পেলেন। হযরত সিদ্দীক আকবার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন। হে উমর! তুমি কি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শোননি إنك ميت وإنهم ميتون এবং وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

তখন সমস্ত লোক হযরত উমরকে ছেড়ে হযরত সিদ্দীক আকবরের নিকট একত্রিত হন।

---

১. হযরত সিদ্দীক আকবরের (রা) উদ্দেশ্য ছিল ঐ লোকদের ধারণা বাতিল করা, যারা এটা বলে যে, নবী (সা) দ্বিতীয়বার জীবিত হবেন এবং মুনাফিকদের হাত পা কর্তন করবেন। কেননা যদি এরূপ হয় তাহলে রাসূল (সা)-এর ইনতিকাল দু'বার হবে। এ জন্য হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) বলেন, সে মৃত্যু আপনার জন্য লিপিবদ্ধ ছিল তা আগমন করেছে। সুতরাং দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার মৃত্যু আগমন করবে না। আল্লাহপাক দু'টি মৃত্যু আপনার উপর জমা করবেন না। যেমন-পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে বনী ইসরাঈলের লোকজন মৃত্যুর ভয়ে তাদের ঘর থেকে বের হয় এবং মঞ্জিলে পৌছার পর আল্লাহর গযবে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তাদের নবীর দু'আয় জীবিত হয় এবং নির্ধারিত সময় পুনরায় মৃত্যুবরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় দু'বার মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করান। তাদের কাহিনী কুরআনের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে -

اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ

আরো এক ব্যক্তি দু'বার মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করেছে। সে একটি গ্রামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে এক'শ বছরের জন্য মৃত হিসেবে রেখে দেন। অতঃপর তাকে জীবিত করেন। আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন ঃ

اَوْكَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ

সারকথা হলো, যেভাবে এ সমস্ত লোক দুনিয়ায় দু'বার মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর উপর দু'বার মৃত্যু জমা করবেন না। (ফাতহুল বারী, ৩ খ, পৃ. ৯১; যারকানী, ৮ খ, পৃ. ২৭৮; মাদারিজুন নবুওয়াত, ২ খ, পৃ. ৫৫৮; শারহে কাসতাল্লানী, ২ খ, পৃ. ৩৬১।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর খুতবা

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) নবী করীম (সা) এর মিম্বরের দিকে অগ্রসর হয়ে উচ্চস্বরে বলেন, চুপ কর, বসে যাও। সবাই বসে পড়েন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর এ খুতবা পেশ করেন ঃ

أما بعد، من كان يعبد الله فان الله حى لايموت ومن كان منكم يعبد محمداً صلى الله عليه وسلم فان محمداً قد مات قال الله تعالى وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ـ وقد قال الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم : اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ وقال الله تعالى كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ وقال الله تعالى : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ وقال الله تعالى : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ وقال ان الله عمَّرَ محمد صلى الله عليه وسلم وابقاه حتى اقام دين الله واظهر امر الله وبلغ رسالة الله وجاهد فى سبيل الله ثم توفاه الله على ذالك وقد ترككم على الطريقة فلن يهلك هالك الامن بعد البينة والشقاء فمن كان الله ربه فان الله حى لايموت ومن كان يعبد محمداً وينزله الها فقد هلك الهه فاتقوا الله ايها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فان دين الله قائم وان كلمة الله تامة وان الله ناصر من نصره ومعز دينه وان كتاب الله بين اظهرنا وهو النور والشفاء وبه هدى الله محمداً صلى الله عليه وسلم وفيه حلال الله وحرمه الله لانبالى من اجلب علينا من خلق الله ان سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلايبغين احد الاعلى نفسه-

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে সে এটা জেনে নিক যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব। তাঁর উপর কখনো মৃত্যু আপতিত হবে না। (যদি ধরে নেয়া হয় যে,) তোমাদের মধ্যে কেউ মুহাম্মদ (সা)-এর ইবাদত করে, তা হলে সে এটা

জেনে নিক যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ " আর মুহাম্মদ (সা) রাসূল ভিন্ন অন্য কিছু নন, তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি ইনতিকাল করেন অথবা তিনি শাহাদাত বরণ করেন, তাহলে তোমরা কি (দ্বীন ইসলাম থেকে) পশ্চাদপসরণ করবে? আর কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে তাহলে সে আল্লাহর কিছুই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না, এবং অচিরেই আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।" (আলে ইমরান ঃ ১৪৪)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন ঃ

"নিশ্চয়ই আপনিও মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" (সূরা যুমার : ৩০)

"প্রত্যেক বস্তু ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই নশ্বর বা ধ্বংসশীল, একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা অবিনশ্বর।" (সূরা আর রাহমান : ২৬-২৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-এর হায়াত দীর্ঘ করেছেন এবং তাঁকে বাকী রেখেছেন– ফলে তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন, আল্লাহর বিধান প্রকাশ করেন, আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁকে ওফাত দান করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদেরকে একটি সরল ও সুস্পষ্ট পথে উপর রেখে গিয়েছেন। সুতরাং এখন যে ব্যক্তি ধ্বংস ও পথভ্রষ্ট হবে সে হক ও সত্য প্রকাশ হওয়ার পর পথভ্রষ্ট হবে। অতএব আল্লাহ তা'আলা যার রব সে এটা জেনে নিক যে, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর ইবাদত করবে এবং তাঁকে মা'বূদ মনে করবে, সে এটা জেনে নিক যে, তার মা'বূদ বিলীন হয়ে গিয়েছে।

হে লোকসকল! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহর দীনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর দ্বীন চির প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহর অঙ্গীকার ও কালেমা পরিপূর্ণ হবে। আল্লাহ ঐ ব্যক্তির সাহায্যকারী, যে তার দ্বীনকে সাহায্য করে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনকে মর্যাদা দান ও জয়ী করবেন। আল্লাহর কিতাব আমাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহর কিতাবই নূরে হিদায়াত এবং অন্তরের শিফা। এত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে পথ প্রদর্শন করেছেন। এতে আল্লাহ পাকের হালাল ও হারামকৃত বস্তুসমূহের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহর শপথ! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ নেই সে আমাদের উপর সৈন্য পরিচালনা করে (এটা বিদ্রোহী ও মুরতাদদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার সে তলোয়ার আমাদের হাতে রয়েছে তা শত্রুদের উপর ব্যবহার করা হত। ঐ তলোয়ার আমরা হাত থেকে রেখে দেইনি। আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের বিরোধী ও শত্রুদের সাথে এভাবে জিহাদ করব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গী হয়ে করেছি। সুতরাং বিরোধীরা যেন এটা ভালভাবে উপলব্ধি করে এবং নিজেদের উপর যুল্‌ম না করে।[1]

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর এ সমস্ত আয়াত তিলাওয়াত করার সাথে মুহূর্তের মধ্যে সবার বিহ্বলতা দূর হয়ে যায়, গাফলতের পর্দা চোখ থেকে উঠে যায়। সবার এ দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে, নবী (সা) ইনতিকাল করেছেন। তখন সবার মনে হয়েছে যে, এর পূর্বে যেন কখনো এই আয়াত শোনেনি। ফলে তারা বারবার এ আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকে (যারকানী, তাবাকাত ইবন সা'দ)।

হযরত উমর (রা) বলেন, আমার অবস্থাও এই হয়, যেন আমি আজ এই আয়াত তিলাওয়াত করেছি এবং স্বীয় চিন্তাধারা থেকে মত পরিবর্তন করি।[2]

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) বলেন, হযরত ফারূক আযম (রা) খুব ভালভাবে জানতেন যে, নবী (সা) একদিন ইনতিকাল করবেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল এই যে, হুযুরের যা অবস্থা হয়েছে তা মৃত্যু নয় এবং অদৃশ্য কোন বিষয়ে নিমগ্ন থাকার কারণে বাহ্যিক অঙ্গের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। যেমন ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থা এরূপ হয়ে যেত, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর বক্তৃতার ফলে হযরত উমর ফারূকের এ ধারণা পরিবর্তন হয় এবং প্রকৃত অবস্থা তাঁর নিকট প্রকাশ হয়ে যায়। (কুররাতুল আয়নাইন, পৃ. ২৭০) এরূপ সংকটময় মুহূর্তে এরূপ ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রকাশ হযরত সিদ্দীকে আকবরই (রা)-এরই পরিপূর্ণ দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে।

অপর এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর নিকট যখন নবী (সা)-এর এ অবস্থায় তাঁর চোখ অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। হেঁচকি হচ্ছিল এবং মাটির পাত্রে ফুটন্ত পানির মত বুকের শ্বাস নির্গত হচ্ছিল। এ অবস্থায় দরূদ ও সালাম পাঠ করতে করতে পবিত্র হুজ্‌রায় প্রবেশ করেন, কিন্তু এরূপ দুঃখ ও বিষাদ সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তা এবং বক্তৃতার মধ্যে সামান্য ক্রটি বা ভারসাম্যহীনতা ছিল না।

নবী (সা)-এর পবিত্র চেহারার আবরণ খুলে কপালে চুমো খেলেন এবং বিলাপ করে কেঁদে কেঁদে বলেন, আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় পবিত্র ছিলেন। আপনার ইনতিকালে নবুওয়াত এবং ওহী চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, যা অন্য কোন নবীর ইনতিকালে বন্ধ হয়নি। আপনি প্রশংসার উর্ধ্বে এবং বিলাপ ও ক্রন্দন থেকে অমুখাপেক্ষী। আপনার পবিত্র সত্তা এ দৃষ্টিকোণ

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৩; যারকানী, ৮ খ, পৃ. ২৮০।

২. তাফসীরে কুরতুবী, ৪ খ, পৃ. ২২৩

থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, আপনার ইনতিকালে জনগণ সান্ত্বনা লাভ করবে। আপনি এটা অবগত আছেন যে, আপনার জন্য আমরা সবাই দুঃখ ও বিষাদে সমব্যথী। আপনার মৃত্যু যদি আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী না হতো (কেননা আল্লাহ তা'আলা তো আপনাকে অধিকার প্রদান করেছিলেন কিন্তু আপনি স্বয়ং আখিরাতকে গ্রহণ করেছেন), তা হলে আমরা আপনার ইনতিকালের কারণে আমাদের জীবন উৎসর্গ করতাম। যদি আপনি আমাদেরকে অধিক ক্রন্দন করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমরা ক্রন্দন করতে করতে আমাদের চোখের পানি নিঃশেষ করে দিতাম। অবশ্য দু'টি বিষয় এরূপ যা দূরীভূত করা আমাদের অধিকারভুক্ত নয়। এক তিরোধানের বেদনা, দ্বিতীয় দুঃখ ও বেদনায় দেহ দুর্বল হয়ে যাওয়া। এ দু'টি বিষয় পরস্পর পৃথক হতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদের এ অবস্থা আমাদের নবীকে পৌঁছিয়ে দাও। হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার প্রেমিকগণকে আল্লাহর দরবারে স্মরণ রাখুন। আমাদের আশা, আমরা আপনার সদয় দৃষ্টি ও বিবেচনায় থাকব।

যদি আপনি[১] আপনার আত্মিক প্রেরণা ও সাহচর্য দ্বারা আমাদের অন্তরে সান্ত্বনা দিয়ে না যেতেন তাহলে আমরা এই মর্মান্তিক তিরোধানের বেদনা কখনো সহ্য করতে পারতাম না।

অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হুজরা থেকে বাইরে আগমন করেন এবং লোকজনের সান্ত্বনার জন্য খুত্বা দান করেন।

খুতবার[২] অবশিষ্ট অংশ

أشهد ان لا اله الا اللهُ وَحده وصدق وعده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلله الحمد وحده -

---

১. এটা পূর্বে উল্লেখিত রিওয়ায়েতের বাকী অংশ যা 'রাওযুল উনুফ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। পূর্ববর্তী অংশ রওযুল উনূফ এবং ইহইয়াউল উলূম উভয় গ্রন্থে উল্লেখ ছিল ঐ অংশ শেষ হওয়ার পর উভয় কিতাবের সূত্র উল্লেখ করা হয়। এবার রওযুল ইনুফে উল্লেখিত বাকী অংশ উল্লেখ করা হলো ঃ

فلولا ماخلفت من السكينة لم نقم من الوحشه أللهم ابلغ نبيك عنا واحفظه فينا ثم خرج لماقضى الناس عراتهم وقام خطيباً فيهم بخطبة حلها الصلاة على النبى محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيها اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له الى الخطبةُ روض الانف صفـ٢٧٦ج٢

২. এ পর্যন্ত খুতবা ইহ্ইয়াউল উলূমের ইত্তিহাফের ৩০২ পৃ. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু দরূদ শরীফ ব্যতীত খুতবার কিছু অংশ রওযুল উনুফের ২য় খণ্ডের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। অত:পর অর্থাৎ ثم قال ايها الناس من كان يعبد محمداً الخ ..... ولاتنتظروه فيلحق بكم - পর্যন্ত উভয় কিতাবে বর্ণিত আছে।

وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخاتم انبياءه واشهد ان الكتاب كما نزل وان الدين كما شرح وان الحديث كما حدث وان القول كما قال وان الله هو الحق المبين ـ

أللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك و امينك وخيرتك وصفوتك بافضل ما صليت به على احد من خلقك اللهم واجعل صلواتك ومعافاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وامام المتقين محمد قائد الخير وامام الخير و رسول الرحمة اللهم قرب زلفة وعظم برهانه وكرم مقام وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون وانفعنامقامه المحمود يوم القيامة واخلفه فينا فى الدنيا والاخرة وبلغه الدرجة والوسيلة منَ الجنة اللهمَّ صلى على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد ـ

ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات من كان يعبد الله فان الله حى لم يميت وان الله تقدم لكم فى امره فلا تدعوه جزعا وان الله تبارك و تعالى قد اختار لنبيه عليه السلام ما عنده على ماعندكم وقبضه الى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبنيه فمن اخذبهما عرف ومن فرق بينهما انكر ـ يأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم ولايفتنكم عن دينكم وعاجنوا الشيطان بالخير وتعجزوه ولا تستنظروه فيلحق بكم ويفتنكم ـ১

فلما فرغ من خطبته قال ياعمر أنت الَّذى بلغنى عنك اِنَّك تقول على باب نبى الله والَّذى نفس عمر بيده مامات نبى الله اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم كذا كذا وقال الله عز وجل فى كتابه انك ميت وانهم ميتون ـ

১. অতঃপর فلما فرغ من خطبته থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু রওযুল উনুফে বর্ণিত আছে।

فقال عمر والله فكان لم اسمع بها فى كتاب الله تعالى قبل الان لما نزل بنا اشهد ان الكتاب كما نزل وان الحديث كما حدث و ان الله تبارك وتعالى حى لايموت انا لله وانا اليه راجعون صلوات الله على رسوله وعند الله نحتسب رسوله ـ١

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ তাঁর নবীর সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন, তা সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দার (নবীর) সাহায্য করেছেন, কাফিরদের দলকে পরাজিত করেছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল করীম এমনিভাবে বিদ্যমান আছে, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে এবং দীন এমনিভাবে আছে, যেমনিভাবে শরী'আত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাদীস এভাবে রয়েছে, যেভাবে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাণী এমনিভাবে রয়েছে যেভাবে নবী (সা) ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হলেন হক ও সত্য এবং সত্যকে তিনি প্রকাশ করেন।

হে আল্লাহ! তুমি তোমার বিশেষ রহমত নাযিল কর মুহাম্মদ (সা)-এর উপর, যিনি তোমার মনোনীত বান্দা, রাসূল, নবী, হাবীব, আমীন এবং তোমার সর্বোত্তম সৃষ্টি। তাঁর উপর এরূপ উত্তম সালাত ও সালাম নাযিল কর যা তুমি তোমার কোন খাস বান্দার উপর নাযিল করেছ। হে আল্লাহ! তুমি তোমার রহমত, বরকত ও আফিয়ত নাযিল কর সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবীয়্যিন, ইমামুল মুত্তাকীন, খায়র ও কল্যাণের নেতা এবং রহমতের রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর। হে আল্লাহ! তাঁর নৈকট্য লাভকে আরো বৃদ্ধি কর। তাঁর দলীলকে বৃহত্তর কর, তাঁর মাকামকে আরো মর্যাদাবান কর। তাঁকে মাকামে মাহমূদে (শাফা'আতের মাকাম) প্রতিষ্ঠিত কর, যার উপর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ ঈর্ষা করবে। কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর শাফা'আত দ্বারা উপকৃত ও ফায়দা দান কর। ইহকাল ও পরকালে তুমি তাঁর বিনিময়ে আমাদেরকে স্বীয় রহমত দান কর এবং তাঁকে বেহেশতে উচু মর্যাদা নসীব কর। হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি তোমার খাস রহমত ও বরকতসমূহ নাযিল কর। যেমনিভাবে তুমি হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা) ইবাদত করবে, সে জেনে রাখুক মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন। যে ব্যক্তি

১. রাওযুল উনুফ, ২খ. পৃ ৩৭৬

আল্লাহর ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর ইনতিকালের সম্পর্কে পূর্বেই তোমাদেরকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরিবর্তে নবীর জন্য তাঁর নৈকট্যকে পসন্দ করেছেন এবং প্রতিদানের দিকে তাঁকে আহ্বান করেছেন। নবীর পর তোমাদের হিদায়তের জন্য স্বীয় কিতাব (কুরআন) এবং তাঁর নবীর সুন্নাত তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাত আঁকড়ে ধরেছে, সে হক ও সত্যের পরিচয় লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে (যেমন-কুরআন মানে কিন্তু সুন্নাতকে মানে না) তাহলে সে হক ও সত্যের পরিচয় লাভ করতে পারল না। হে বিশ্বাসীগণ! হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও। নবী ইনতিকালের কারণে শয়তান যেন তোমাদেরকে দীন থেকে দূরে নিয়ে না যায়। তোমাদেরকে ফিতনায় জড়িয়ে ফেলার পূর্বে কল্যাণকে দ্রুত গ্রহণ কর। কল্যাণের অগ্রগামী হয়ে শয়তানকে অক্ষম বানিয়ে দাও। শয়তানকে এতটুকু সুযোগ দিবে না, যাতে সে তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে তোমাদেরকে কোন ফিতনার মধ্যে জড়িয়ে ফেলবে।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) খুতবা সমাপ্ত করে হযরত উমরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে উমর! তুমি ঐ ব্যক্তি যার সম্পর্কে আমার নিকট এই সংবাদ এসেছে যে, তুমি নবীর দরজার উপর দাঁড়িয়ে এ কথা ঘোষণা করেছ যে, নবী মৃত্যুবরণ করেননি। তুমি কি অবগত নও যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যু সম্পর্কে অমুক অমুক দিন এ কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআনে বলেছেন ঃ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ (তুমি অবশ্যই মারা যাবে এবং তারাও অবশ্যই মারা যাবে)।

হযরত উমর (রা) বলেন, আমার অবস্থা এই হলো যে, আমি যেন আল্লাহর কিতাবের এই আয়াত এর পূর্বে কখনো শুনিনি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, কুরআন এমনিভাবে আছে যেভাবে নাযিল হয়েছে। হাদীস এভাবে রয়েছে, যেভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব। তাঁর উপর কখনো মৃত্যু আপতিত হবে না, انا لله وانا اليه راجعون। আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর রাসূলের উপর বর্ষিত হোক। আমরা আল্লাহর দরবারে আশাবাদী যে, তিনি আমাদেরকে এ বিপদে সাহায্য করবেন।"

সাকীফায়ে বনী সায়েদায় আনসারগণের সমাবেশ

একদিকে তো এই হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে গেল। কিছুক্ষণ পর আনসারগণ সাকীফায়ে বনী সায়েদায় একত্রিত হলেন এবং নবী (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন এ বিষয়ে আলোচনা হতে লাগালো। মুহাজিরগণ হযরত সিদ্দীকে আকবরকে বললেন,

আপনিও সাকীফায়ে বনী সায়েদায় গমন করুন। আমরাও আপনার সাথে থাকব। হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমরকে সাথে নিয়ে সাকীফায় গমন করেন।

হযরত আবূ বকর ও উমরের এ আশংকা হয় যে, মুসলমানরা তাড়াহুড়া করে এমন কারো হাতে বায়'আত যেন না করে, যার ফলে এটা ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলমানদের জন্য বিপদ হয়ে যায়। যখন এ বিষয়ের সমাধান হয়ে গেল এবং সর্বসম্মতিক্রমে হযরত সিদ্দীকে আকবরকে খলীফা ও রাসূল (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মেনে নেয়া হলো, তখন পরবর্তী দিবসে নবী (সা)-এর দাফন কাফনের কাজ সম্পন্ন করা হলো। সাকীফায় সোমবার বিকালে লোকজন একত্রিত হয়েছিল। কেননা সোমবার দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন। এরপর হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) সুখ নামক স্থান থেকে আগমন করেন এবং খুতবা প্রদান করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটনার পর সন্ধ্যের দিকে সাকীফায় সমাবেশের ঘটনা ঘটে।

আহ্‌লে বায়তের সবাই নবী করীম (সা)-এর হুজরায় উপস্থিত ছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারূক আযম আনসারগণের একত্রিত হওয়ার সংবাদ শুনে সাকীফায় গমন করেন। তাঁদের এই চিন্তা ছিল যে, নবী করীমের (সা) ইনতিকাল হয়েছে এবং ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নবী (সা) আমাদেরকে আগত ফিতনা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এ সময় যেন উম্মাতের মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতার ফিতনা সৃষ্টি না হয়। যার ফলে ইসলামের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও আদর্শ ধ্বংস হয়ে না যায় এবং নবুওয়াতের ২৩ বছরে ইসলামের যে শৃংখলা ও নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আল্লাহ না করুন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলে উম্মাতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঐক্য ছিন্ন হয়ে ষাবে যা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন হবে। যদি কোন বাদশাহ্ ইনতিকাল করে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কোন উত্তরাধিকার মনোনীত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দাফনের কাজ সম্পন্ন হয় না। এরূপ মুহূর্তে দাফনের চেয়ে উত্তরাধিকার মনোনয়নের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব বহন করে থাকে। রাষ্ট্রের হিতাকাঙ্ক্ষীগণ এ চিন্তা করেন, যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যে কোন বিঘ্ন না ঘটে। অসতর্কতার সুযোগে যাতে শত্রুরা আক্রমণ করে না বসে। যার ফলে সমগ্র দেশের ধ্বংস হওয়ার আশংকা থাকে। বরং অনেক সময় যুক্তিসঙ্গত কারণে বাদশাহ্র মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখা হয় এবং উত্তরাধিকার মনোনয়নের পর তা প্রকাশ করা হয়।

বাদশাহ্র ইনতিকালের পর যদি রাজ্যে দু'জন আমীর মনোনীত হয়, তাহলে অবশ্যই সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। একই সাম্রাজ্যে দু'জন খলীফা মনোনীত হওয়া অনিষ্টতা ও ধ্বংস হওয়ার কারণ হয়ে যায়। নবী (সা)-এর ইনতিকালের পর মুনাফিক ও কাফিরদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ ও গোলযোগ সৃষ্টির আশংকা ছিল। এ সময় ইসলামের ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলার হিফাযত করা ছিল প্রাথমিক কাজ। এ ছাড়া হযরত সিদ্দীকে আকবরও হযরত উমর ফারূক (রা) এ ধারণা করেন যে, দাফন-কাফন তেমন কঠিন

কাজ নয়, বরং এ কাজ আহলে বায়ত করতে সক্ষম। সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এতে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন নেই।

নবী (সা) ২৩ বছরে ইসলামের অগ্রগতি ও প্রতিষ্ঠা এবং কুফরী মিটিয়ে দেয়ার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, এখন তা কল্পনা করাও যাচ্ছে না। এখন তিনি অস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালবাসী হয়েছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কাজসমূহের জন্য যদি কোন প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করা না হয়, তাহলে এটা আশংকা করা যায় যে, মুহূর্তের মধ্যে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং এত বছরের দুঃখ-কষ্ট, গাযওয়া, সারীয়া, তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়েছে তা মুহূর্তে নিষ্ফল ও অর্থহীন হয়ে যাবে, এর ফলে পূর্বের ন্যায় কুফরীর দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে এবং শয়তান লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে থাকবে। যেহেতু নবুওয়াত সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং এখন যদি কুফরীর অন্ধকার দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে লোকজন কোথা থেকে হিদায়াতের আলো পাবে।

چونکه شدخورشید ومارا کردداغ * چاره نبود درمقامش ازچراغ

"যেহেতু হিদায়াতের জ্যোতি (নবী করীম (সা) আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে বিদায় নিয়েছেন, তাই তাঁর শুন্যস্থান বিকল্প ব্যবস্থা না করে তো (ইসলামও উম্মাহ্‌র) উপায় নেই।"

এ জন্য হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) এ চিন্তা করলেন যে, রাসূল (সা) ইনতিকালের সাথে সাথে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করা উচিত, যাতে ইসলামী সাম্রাজ্য ও তার প্রশাসনিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকে এবং ওঁৎপেতে থাকা কোন মুনাফিক ও ইসলামের শত্রু মাথা উঁচু করতে না পারে। এর মধ্যে সমস্ত উম্মাতের কল্যাণ ও সফলতা নিহিত রয়েছে।

সুতরাং পূর্ণাঙ্গ দুরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ফিতনা-ফাসাদের সুযোগ ও আশংকা বন্ধ করে দিতে হবে এবং মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃংখলা থেকে হিফাযত করতে।

এদিকে আনসারগণ উত্তরাধিকারী নির্ধারনের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, একজন আমীর হবেন আনসার থেকে, একজন হবেন মুহাজির থেকে, এটা ছিল এক বিরাট ফিতনা। একই সাম্রাজ্যে দু'জন আমীর হওয়া সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ারই নামান্তর। সুতরাং হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) এ বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যখন উত্তরাধিকার মনোনয়নের বিষয়টি সমাধান হয়ে যায়, তখন শান্তভাবে কাফন-দাফনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

چشم بداند یش که برکنده باد عیب لما یدهنرش درنظر

"কুজনরা সর্বদা ব্যস্ত থাকে ছিদ্রান্বেষণে, তারা ভাল গুণাবলীকেও ত্রুটি আকারে উপস্থাপন করে।"

হযরত আবূ বকর (রা) সাকীফায় ফিতনা রোধ করার জন্য গমন করেন কিন্তু লোকজন হযরত আবূ বকরকেই খলীফা মনোনীত করেন। এতে হযরত আবূ বকরের কোন হাত নেই। তিনি বিষয়টি বিলম্ব করছিলেন, কিন্তু লোকজন একমাত্র তাঁকেই এ পদের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করেন। হযরত আবূ বকরের খিলাফতের ব্যাপারে কোন চিন্তা ও খেয়ালই ছিল না। শুধু ফিতনা ফাসাদ দমন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর এ ব্যাপারে কোন খবরই ছিল না যে, খিলাফতের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা হবে ।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

নবী (সা.)-এর দাফন-কাফন ও গোসল

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর হাতে বায়‘আত সম্পন্ন করার পর লোকজন নবী (সা)-এর দাফন-কাফনের কাজে নিয়োজিত হন। গোসল প্রদানের পূর্বে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, পবিত্র দেহ থেকে কাপড় খোলা হবে কিনা। কোন সিদ্ধান্ত হয়নি, এমনি মুহূর্তে সবার উপর তন্দ্রা সৃষ্টি হয় এবং অদৃশ্য থেকে এ আওয়ায শ্রুত হয় যে, আল্লাহর রাসূলকে উলঙ্গ করো না। পরিধানের কাপড়সহ গোসল দাও। সুতরাং পবিত্র পিরহানের সাথেই নবী (সা)-কে গোসল প্রদান করা হয়। পরে তা খুলে নেয়া হয়।

হযরত আলী (রা) গোসল প্রদান করেন। হযরত আব্বাস (রা) এবং তাঁর দু'পুত্র ফযল ও কসম পার্শ্ব পরিবর্তন করে দেন। হযরত উসামা ও শাকরান পানি ঢালেন।[১] গোসলের পর সহুলের তৈরি তিনটি কাপড়ের দ্বারা নবী (সা)-কে দাফন করা হয়। এ মধ্যে কোর্তা ও পাগড়ী ছিল এবং গোসলের সময় পরিহিত পিরহান খুলে রাখা হয়।[২]

দাফন কাফনের পর এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, নবীগণকে ঐ স্থানে দাফন করা হয় যেখানে তাঁদের রূহ করয করা হয়। (তিরমিযী ইবনে মাজাহ) সুতরাং ঐ স্থানে রাসূল (সা)-এর বিছানা সরিয়ে কবর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু এতেও পরস্পর মতানৈক্য সৃষ্টি হয় যে, কোন প্রকারের কবর খনন করা হবে। মুহাজিরগণ বলেন, মক্কার নিয়মানুযায়ী বগলী কবর খনন করতে হবে। আনসারগণ বলেন, মদীনার পদ্ধতি অনুযায়ী লহদ কবর তৈরি করতে হবে। আবূ উবায়দা বগলী এবং আবূ তালহা লহোদ কবর তৈরি করার ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের উভয়কে ডাকার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যে ব্যক্তি প্রথম আসবে সে তার কাজ করেন। আবূ তালহা প্রথম আগমন করেন এবং নবী (সা)-এর জন্য লাহাদ কবর তৈরী করেন।[৩] কবর উটের পিঠের উঁচু হাড়ের আকৃতির মত উঁচু করা হয়। (বুখারী)

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৬০।

২. ইত্তিহাফ, ১০ খ, পৃ. ৩০৪।

৩. যারকানী, ৮ খ, পৃ. ২৮৯-২৯২; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২ খ, পৃ. ৫৯

সমীক্ষা ঃ প্রত্যেক নবীর কবর তাঁদের ইনতিকালের জায়গায় হওয়ার অর্থ হলো তাঁদের যে স্থানে ইনতিকাল হবে সেখানেই দাফন করা উত্তম। যদি কোন বিশেষ কারণে অন্য কোথাও দাফন করা হয়, তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই।

জানাযার নামায

সুনানে ইবন মাজাহ শরীফে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, মঙ্গলবার দিন নবী (সা)-এর কাফন পরিধান করানোর পর পবিত্র জানাযা রওযার কিনারায় রেখে দেয়া হয়। এক-এক দল সেখানে আগমন করে একাকী নামায আদায় করে বাইরে চলে আসত। কেউ কারো ইমামত করত না।

শামাইলে তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত, লোকজন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানাযা কি পড়া হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ! জানাযা পড়। তারা জিজ্ঞাসা করলো, কিভাবে পড়বো ? হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, এক-এক দল পবিত্র হুজরায় গমন করে তাকবীর বলবে। অতঃপর দরূদ ও দু'আ পাঠ করে বের হয়ে আসবে। এরপর অন্য এক দল হুজরায় প্রবেশ করবে এবং তাকবীর বলার পর দরূদ ও দু'আ পাঠ করে ফিরে আসবে। এমনিভাবে সমস্ত লোক নামায আদায় করবে।

কাযী আয়ায (র) বলেন, সহীহ হলো এই যে, নবী (সা) জন্য জানাযার নামায পড়া হয়। এটাই অধিকাংশ ইমামদের মত। এটাকে ইমাম শাফিয়ী 'কিতাবুল উম্ম' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, হুযুর (সা) এর জন্য জানাযার নামায আদায় করা হয়।

কেউ কেউ বলেন, নবী (সা)-এর উপর জানাযার নামায আদায় করা হয়নি বরং লোকজন পবিত্র হুজরায় দলে দলে প্রবেশ করতেন এবং সালাত, সালাম এবং দরূদ ও দু'আ পাঠ করে ফিরে আসতেন।

ইবন সা'দের এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) একটি দল নিয়ে পবিত্র হুজরায় প্রবেশ করেন এবং জানাযার সামনে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করেন ঃ

السلام عليك أيها النبى ورحمة الله اللهم أنا نشهد انه قد بلغ ما انزل اليه ونصح لامته وجاهد فى سبيل الله حتى اعز الله دينه وتمت كلمة فاجعلنا ياالهنا ممن تبع القول للذى انزل معه واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه فانه كان بالمؤمنين رؤفا رحيما لانبتغ بالايمان بدلا ولانشترى به ثمنا ـ

" হে নবী! আপনার উপর সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ সমস্ত কিছু উম্মাতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন যা কিছু তাঁর উপর নাযিল করা হয়েছে এবং তিনি উম্মাতদেরকে নসীহত করেছেন। তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দীনকে জয়ী করেছেন এবং তাঁকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা আপনার ওহীর অনুসরণ করেছে। আমাদেরকে তাঁর সাথে একত্র করে দিন, যাতে তিনি আমাদেরকে এবং আমরা তাঁকে ও তাঁর পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হই। তিনি মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। আমরা ঈমানের পরিবর্তে কোন প্রতিদান ও মূল্য কামনা করছি না।" লোকজন তাঁদের সাথে আমীন বলেন, যখন পুরুষগণ সম্পন্ন করেন তখন মহিলা এবং এরপর শিশু-কিশোরগণ একই ভাবে জানাযার নামায আদায় করেন।"[১]

সমীক্ষা ঃ এই রিওয়ায়াতে সুস্পষ্টভাবে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর জানাযার নামায আদায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং এ বিষয়টি মুতাওয়াতির ও অকাট্য। সুতরাং তিনজন খলীফা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানাযায় অংশগ্রহণ করেননি বলে শী'আ সম্প্রদায় যে মন্তব্য করেছ তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিবেক বিরোধী।

মুসনাদে বাযযার ও মুসতাদরেক হাকিমে বর্ণিত, নবী (সা) একবার মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়া অবস্থায় আহলে বায়তের সবাইকে হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে ডাকালেন। আহল বায়তগণ আরয করলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জানাযার নামাযে কে ইমামতি করবেন? রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, আমার কাফন পরিধান সম্পন্ন হওয়ার পর তোমরা কিছু সময়ের জন্য হুজরা থেকে বের হয়ে যাবে সর্বপ্রথম আমার উপর হযরত জিবরাঈল নামায আদায় করবেন, অতঃপর হযরত মিকাঈল, এরপর হযরত ইসরাফীল অতঃপর হযরত মালাকুল মাউত, অতঃপর অবশিষ্ট ফেরেশ্তাগণ নামায আদায় করবেন। অতঃপর তোমরা একের পর এক দল ভিতরে প্রবেশ করবে এবং আমার উপর সালাত ও সালাম পেশ করবে।

আল্লামা সুহায়লী বলেন, আল্লাহপাক নবী (সা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা ও নবীর জন্য রহমতের দু'আ কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৬)

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৬৫।

এ আয়াতে প্রত্যেক মু'মিনকে আলাদা আলাদা সালাম পেশ করার জন্য নির্দেশ রয়েছে। যেভাবে রাসূল (সা)-এর জীবিতকালে ইমাম ও জামা'আত ব্যতীত সালাত ও সালাম পেশ করা ফরয ছিল তেমনিভাবে নবী (সা)-এর ইনতিকালের পরও কোন ইমাম ও জামা'আত ব্যতীত সালাত ও সালামের ফরয পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা হয়েছে।[১]

দ্রষ্টব্য ঃ ইবন দাহীয়া বর্ণনা করেন, ত্রিশ হাজার লোক রাসূল (সা)-এর জানাযার নামায আদায় করেন।

দাফন

নবী (সা) সোমবার দ্বিপ্রহরের সময় ইনতিকাল করেন। এটা ঐ দিন ও ঐ সময় ছিল, যখন তিনি হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেন। বুধবার দিন রাসূল (সা)-কে দাফন করা হয়। এটাই অধিকাংশ উলামা ও ঐতিহাসিকদের মতামত। অনেক রিওয়ায়াত এ সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট যে, এতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোন সুযোগ নেই। কেউ কেউ বলেছেন, মঙ্গলবার দিন দাফন করা হয়।

হযরত আলী, হযরত আব্বাস এবং তার দু'পুত্র ফযল ও কসম নবী করীম (সা) কে কবরে রাখেন। দাফন শেষ করে কবরকে উটের পিঠের উঁচু হাঁড়ের মত করা হয় এবং পানি ছিঁটানো হয়।

হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) দাফন সম্পন্ন করে শত আফসোস করে, রক্তের অশ্রু প্রবাহিত করে এই বিষাদময় মুসীবতে انا لله وانا اليه راجعون পাঠ করতে করতে বাড়ি ফিরে যান।

কয়েকটি সূক্ষ্ম জ্ঞাতব্য বিষয়

নবী করীম (সা)-ইনতিকাল সম্পর্কে পাঠকবৃন্দ অবগত হয়েছেন। এবার আমরা ইনতিকাল সম্পর্কিত কিছু সূক্ষ্মতত্ত্ব পেশ করব।

سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

"আপনি পবিত্র, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের আর কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা ঃ ৩২৯)

১. পরকালের সফরের প্রস্তুতি হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাত। আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকাল নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত বা সংবাদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী বা অদৃশ্য ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

میان عاشق ومعشوق رمز بست * کراماً کاتبین راهم خبر نیست

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২ খ, পৃ. ৭৪

" প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যে গোপন রহস্য বিরাজ করে, কিরামান কাতেবীনও সে সম্পর্কে খবর রাখে না।"

পূণ্যবান ব্যক্তিকে কোন কোন সময় ইল্হাম ও সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর আগাম খবর দেয়া হয়ে থাকে। নবুওয়াত সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু সত্য স্বপ্ন (رؤياء صالحه) উম্মাতের মধ্যে এখনো বাকী রয়েছে, যার মাধ্যমে কোন কোন সময় ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এবং কখনো ইঙ্গিতের মাধ্যমে অবহিত করা হয়। তবে এ বিষয়টিতে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে যে, স্বপ্ন দেখা কারো ইচ্ছাধীন নয়। স্বপ্ন দেখানো আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমতাধীন, যাকে ইচ্ছা, যে সময় যতটুকু এবং যেভাবে ইচ্ছা, দেখাবেন। ইচ্ছা বা অভিপ্রায় না হলে দেখাবেন না, এখানে কোন নিয়ম-নীতির ব্যাপার নেই।

এই ধাঁ ধাঁর রহস্য কেউ নিজেও বের করতে পারেনি আর অন্যের দ্বারাও তার জট খুলাতে পারেনি।

সাধারণভাবে মু'মিনদেরকেও কখনো কখনো স্বপ্ন এবং বয়সের চাহিদা, আবার কখনো রোগগ্রস্ত করার মাধ্যমে সতর্ক করা হয়ে থাকে যে, সময় নিকটবর্তী। কখনো কখনো সমবয়স্কদের ইনতিকাল প্রত্যক্ষ করে এ খেয়াল হয়ে থাকে যে, আমার সমবয়সীরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সুতরাং আমাকেও তৈরি হতে হবে। মৃত্যু আগমনের সবচেয়ে সুস্পষ্ট নিদর্শন হলো বয়স ষাট বছরে পৌঁছে যাওয়া এবং বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হওয়া, যার পর দলীল সমাপ্ত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন ঃ

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّايَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ -

"আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে ইচ্ছা করলে সতর্ক হতে পারতে। তোমাদের নিকট তো সতর্ককারী এসেছিল।" (সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

মোটকথা সতর্ক করার পন্থা একটি নয়, অনেক পন্থায় মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়। এরপর এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম হলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও নিষ্পাপ। তাঁদের মাগফিরাত নিশ্চিত। আমরা পাপী, আমলহীন, অনুপযুক্ত, আপাদমস্তক ক্রটি ও অন্যায়ে পরিপূর্ণ। সুতরাং মৃত্যুর প্রস্তুতিতে কোন ক্রটি হওয়া উচিত নয়। যতটুকু সম্ভব তাওবা ও ইসতিগফার করতে হবে এবং এ দু'আ পাঠ করবে ঃ

فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْتَ وَلِيّ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ - اٰمِيْنِ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

"হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুদান কর এবং আমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত কর।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১০১)

২. কাগজ চাওয়ার ঘটনা

কাগজ প্রদানের ঘটনা সম্পর্কে শী'আ সম্প্রদায় হযরত ফারূক আযম (রা)-এর উপর এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, অন্তিমকালে আল্লাহর নবীকে ওসীয়্যত করা থেকে তিনি বাধা প্রদান করেছেন এবং লিপিবদ্ধ করার জন্য কাগজ প্রদান করেন নি। এভাবে নবী (সা)-এর নাফরমানী ও নির্দেশ অমান্য করেছেন।

জবাব

এ অভিযোগের জবাব হলো এই যে, নবী করীম (সা)-এর নির্দেশের সম্বোধিত ব্যক্তি হযরত উমর (রা) একা ছিলেন না, বরং পবিত্র হুজরায় উপস্থিত সবাইকে কাগজ, কলম প্রদানের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, নবী করীম (সা)-এর হুজরায় উপস্থিত অধিকাংশই আহলে বায়ত বা নবী পরিবারের লোকজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রা)-ও ছিলেন। যদি হযরত উমর (রা) কাগজ ও কলম সরবরাহ না করে থাকেন তাহলে হযরত আলী এবং হযরত আব্বাসকে কে নিষেধ করেছে? যখন হযরত আলী ও আব্বাস (রা) কাগজ কলম সরবরাহ করেন নি, তখন এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের একই মত ছিল। যা হযরত উমরের মত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ অন্তিম মুহূর্তে এবং রোগের তীব্রতার সময় কষ্ট দেয়া উচিত নয়। যদি কাগজ আনার নির্দেশ ওয়াজিব বা ফরয অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কর্তব্য হিসেবে হত, তাহলে উপস্থিত সবাই পাপী এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ লংঘনকারী হতো। একমাত্র হযরত উমরের এখানে বিশেষত্ব কী ছিল যে, তাঁকেই অভিযোগের মূল লক্ষ্য বানানো হবে।

অধিকন্তু এ আলোচনা ও কথাবার্তার পর পাঁচ দিন পর্যন্ত রাসূল (সা) জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার কাগজ-কলম নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ প্রদান করেননি এবং আহলে বায়তের কেউ অথবা অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের কেউ এ ব্যাপারে কিছু বলেন নি।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ নির্দেশ ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক ছিল না। নতুবা রাসূল (সা) স্বয়ং এটা অবশ্যই লিখিয়ে দিতেন। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ـ

" হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন যদি তা না করেন, তাহলে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

হযরত আলী এ পাঁচ দিনের মধ্যে কোন এক সময় কাগজ কলম চেয়ে এই বাধ্যতামূলক কাজ অবশ্যই বাস্তবায়ন করতেন এবং নির্দেশ অমান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতেন না। হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর হুজরার পাহারাদার ছিলেন না যে, যার ফলে কোন ব্যক্তি তাঁর অনুমতি ব্যতীত কাগজ-কলম নিয়ে লিখিয়ে নিতে পারেন নি। হযরত উমরের আবেদন ছিল এরূপ যেমন-হযরত আলীকে রাসূলুল্লাহ (সা) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় সন্ধিপত্র থেকে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ তুলে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন কিন্তু হযরত আলী (রা) এ নির্দেশ পালন করেন নি। হযরত আলীর এই নির্দেশ পালন না করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও নাফরমানীর মধ্যে গণ্য হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল পরিপূর্ণ মহব্বত ও মর্যাদার নিদর্শন, যা হাজারো আনুগত্যের সমান।

হযরত উমরের এটা বলা حسبنا كتاب الله (আমাদের জন্য কুরআন যথেষ্ট) এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের হাদীসের প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ এই যে, দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখন দীনের কোন নুতন বিধান বাকী নেই। সম্ভবত স্নেহবশত আপনার এ আশংকা হয়ে থাকতে পারে যে, আমরা আপনার পর গোমরাহীর মধ্যে মগ্ন হয়ে না যাই। হযরত উমর (রা) মহব্বত ও সহানুভূতির কারণে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ অসুস্থ অবস্থায় কষ্ট স্বীকার করবেন না। আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং হযরত উমরের এ আরযে পূর্ণাঙ্গ মহব্বত ও কল্যাণ নিহিত, নাফরমানী ও আদেশ অমান্যকরণের লেশমাত্র নেই।

যদি এটা বলা হয় যে, নবী (সা) খিলাফত সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধ করানোর অভিপ্রায় করেছিলেন। এ অবস্থায় আমরা বিষয়টিকে দু'টি অবস্থায় সাথে সংযুক্ত বলব। এক, হযরত আবূ বকরের খিলাফত সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করানো কামনা করেছেন অথবা হযরত উমরের। প্রথমত রাসূল (সা) স্বয়ং এ বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত মুলতবী ঘোষণা করে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এবং মু'মিনগণ আবূ বকর ব্যতীত কারো খিলাফত কবূল করবেন না। এ বিষয়টি নবী করীম (সা) আল্লাহ তা'আলা এবং মুসলমানদের ইজ্‌মা' ও ঐক্যের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যদি হযরত আলীর খিলাফত সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করানোর বিষয়টি কামনা করতেন, তাহলে শী'আদের মতে এর প্রয়োজন ছিল না। কেননা এ ঘটনার পূর্বে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে গাদীরেখুমের ময়দানে হযরত আলীর বিলায়েতের খুতবা প্রদান করেন এবং হযরত আলীকে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর অভিভাবক বলে ঘোষণা প্রদান করেন। এ ঘটনা সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুতরাং এই প্রচার ও সাধারণ ঘোষণার পর একটি সীমাবদ্ধ হুজরার মধ্যে কয়েকজন আহলে বায়তের সামনে ঐ লিখিত বক্তব্যের কি প্রয়োজন রয়েছে?

৩. হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ইমামত

অসুস্থ অবস্থায় নবী (সা) কর্তৃক হযরত সিদ্দীকে আকবরকে নামাযের ইমাম মনোনীত করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত শায়খ জালালউদ্দীন সুয়ূতী (র) তারীখুল খুলাফায় উল্লেখ করেন যে, এ হাদীস হলো মুতাওয়াতির। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত আলী, আবদুল্লাহ, ইবন মাসঊদ, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ এবং হযরত হাফসা (রা) পৃথক পৃথক রিওয়ায়াত করেছেন।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রা) তিনবার অস্বীকার করেছেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূল (সা) বারবার এটাই বলেন যে, আবূ বকরকে নামায পড়াতে বল। অসংখ্য হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, নবী (সা) মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে তাকীদ প্রদান করেন যে, নামাযে এরূপ ব্যক্তিকে ইমাম নির্ধারণ কর যিনি ইলম্ কিরা'আত এবং তাক্ওয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ। শী'আ সম্প্রদায়ের মতে সর্বোত্তম ব্যক্তি ব্যতীত কাউকে ইমাম নির্বাচন করা জায়েয নেই।

এ নির্দেশাবলীর দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা) কর্তৃক হযরত আবূ বকর সিদ্দীককে ইমাম নিয়োগ করাই প্রমাণ করে যে, রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে হযরত আবূ বকর সবচেয়ে জ্ঞানী ও মুত্তাকী ছিলেন। যেমন-সমস্ত মুফাস্সীরের ইজ্মা হলো এই যে, সূরা লাইল এর আয়াত وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الاية (এবং এর থেকে অর্থাৎ প্রজ্বলিত অগ্নি দূরে রাখা হবে আল্লাহ ভীরু ব্যক্তিকে) হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং আয়াতে اتقى (সর্বাধিক মুত্তাকী) দ্বারা হযরত আবূ বকরকে বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আল্লাহপাক আরো ইরশাদ করেন ঃ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি মর্যাদাবান যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে) শী'আ সম্প্রদায় কি বলবেন যে, যদি হযরত আবূ বকর (রা) কাফির, ফাসিক অথবা মুনাফিক হবেন তাহলে নবী করীম (সা) তাঁকে কেন ইমাম বানিয়েছেন এবং নামাযে কেন তাঁর পিছনে ইকতিদা করেছেন। রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের পর হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত উসমান ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম কিভাবে তাঁর পিছনে নামাযে ইকতিদা করেন?

হাফিয আল্লামা ইবন কাসীর (র) বলেন ঃ

والمقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ابابكر اماماً للصحابة كلهم فى الصلاة التى هى اكبر أركان الاسلام العملية قال الشيخ أبو الحسن الاشعرى وتقديمه له امر معلوم بالضرورة من دين الاسلام قال وتقديمه له دليل على انه علم الصحابة واقرأهم لما ثبت

فى الخبر المتفق على صحة بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم القوم اقراهم الكتاب الله فان كانوا فى القرأة سواء فاعلماهم بالسنة سواء فاكبرهم سنا فان كانوا فى السن سواء فاقدمهم مسلما (اسلاما) قلت وهذا من كلام الاشعرى رحمة الله ممايـنبغى ان يكتب بمأ الذهب ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها فى رضى الله عنه وارضاه ـ(১)

"উদ্দেশ্য হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-কে ইমাম নিয়োগ করেন, যাতে তিনি তাদের নামায পড়ান। প্রকাশ থাকে যে, ইসলামের করণীয় আরকানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রুকন হলো নামায। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর বলেন, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বকরকে ইমামতের জন্য সামনে পেশ করা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল যে, হযরত আবূ বকর (রা) সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ইলম ও মর্যাদায় সর্বোত্তম। কেননা হাদীসে নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, কাওমের ইমামত ঐ ব্যক্তি করবেন যিনি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। যদি কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে সবাই সমকক্ষ বা সমপর্যায়ের জ্ঞানী হন তাহলে ঐ ব্যক্তি ইমামত করবে, যিনি নবীর সুন্নাত তথা হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। যদি ইলমে হাদীসেও সবাই সমান জ্ঞানী হন তাহলে ঐ ব্যক্তি ইমামত করবেন যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ (হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমান বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দেখে লজ্জাবোধ করেন)। যদি বয়সে সবাই সমান হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি ইমামত করবেন যিনি সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এই হাদীসের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে।

হাফিয ইবন কাসীর (র) বলেন, ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর এ কথা ও মতামত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করার মত। হযরত আবূ বকর (রা) এ সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন।"

শী'আ সম্প্রদায় এ কথা স্বীকার করেন যে, হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রা) নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হুজরায় প্রায়ই যাতায়াত করতেন। কিন্তু তিনি হযরত আবূ বকর ব্যতীত অন্য কাউকে ইমামতের জন্য নির্দেশ বা অনুমতি প্রদান করেন নি।

সাহাবায়ে কিরাম এ ইমামতকে হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর খিলাফতের উপর দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। ইবন আসাকির হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা) যখন হযরত আবূ বকরকে ইমামতের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন, আমরা তখন উপস্থিত ছিলাম। সুস্থ ছিলাম অসুস্থ ছিলাম না। সুতরাং যে ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সা) দীনের ব্যাপারে আমাদের ইমাম নিয়োগ করা পসন্দ করেছেন,

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ. পৃ. ২৩৬।

আমরা দুনিয়ার কার্যক্রমের জন্য তাঁকে ইমাম নির্বাচন করা কেন পসন্দ করব না। এ ছাড়া নবী করীম (সা)-এর সর্বশেষ খুতবায় হযরত সিদ্দীক আকবরের (রা) দরজা ব্যতীত সমস্ত দরজা বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি হযরত আবূ বকর ফযীলত ও খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

৪. একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন

সন্দেহ হলো এই যে, মুসনাদে আহমাদে হযরত সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الابواب الشارعة فى المسجد وترك باب على.

"নবী করীম (সা) নির্দেশ প্রদান করেন যে, মসজিদের দিকে যতগুলো দরজা খোলা রয়েছে সবগুলো বন্ধ করে দেয়া হোক, একমাত্র হযরত আলীর দরজা ব্যতীত। (মুসনাদে আহমাদ, ১ম খ, পৃ. ১৭৫) সুতরাং মুসনাদের এই রিওয়ায়াত এবং বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়াতের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। যাতে এই নির্দেশ রয়েছে যে, আবূ বকরের দরজা ব্যতীত সব দরযা বন্ধ করে দেয়া হোক।

জবাব ঃ উপরোক্ত হাদীসের জবাব হলো এই যে, মুসনাদে আহমাদের রিওয়ায়াত বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়েতের সমপর্যায়ের নয়। যদি মুসনাদের রিওয়ায়াত সহীহ হয়, তবুও বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়াত দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটা ছিল মৃত্যু রোগের সময়ের সর্বশেষ নির্দেশ এবং হযরত আলী (রা) সম্পর্কে নির্দেশ ছিল অনেক পূর্বের। এটা ছিল ঐ সময়ের নির্দেশ যখন মসজিদ নির্মাণের কাজ চলছিল এবং হযরত আলী (রা) মসজিদের দিকের দরজা দিয়ে যাতায়াত করতেন। হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে নির্দেশ প্রদান করেন যে, একমাত্র আবূ বকরের দরজা ব্যতীত মসজিদের দিকে আগমনের জন্য অন্যান্য দরজা বন্ধ করে দেয়া হোক। সর্বশেষ নির্দেশ পূর্ববর্তী নির্দেশকে খণ্ডন করে থাকে।

৫. হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামতের সময়কাল

ইমাম যুহরী (র) আবূ বকর ইবন আবূ সাবূরা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীক আকবার (রা) লোকজনকে নিয়ে সতের নামাযে ইমামত করেন। কারো কারো মতে বিশ নামায পড়িয়েছেন।[১] والله اعلم

আল্লামা সুহায়লী বলেন, হযরত হাসান বসরীর এক মুরসাল রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী (সা) দশ দিন অসুস্থ ছিলেন। এর মধ্যে নয়দিন হযরত আবূ বকর (রা)

---

১. মূল বাক্য হলো قال الزهرى عن أبى بكربن أبى سبرة ان ابابكر صلى بهم سبع عشرة صلاة وقال غير عشرين صلاة - আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ. পৃ. ২৩৫।

লোকজনকে নামায পড়িয়েছেন। দশম দিন রাসূল (সা) উসামা ও ফযল ইবন আব্বাস (রা)- এর সহযোগিতায় মসজিদে গমন করেন এবং হযরত আবূ বকরের পিছনে নামায আদায় করেন। এ হাদীস দারাকুতনী রিওয়ায়েত করেছেন। এ হাদীসটি গারীব।[১]

৬. ইনতিকালের তারিখ

উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন। কিন্তু ইনতিকালের তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হলো এই যে, ইনতিকাল হয়েছিল ১২ তারিখে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে নবী (সা) জুমু'আর দিন উকূফ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ছিল জুমু'আর দিন এবং যিলহজ্জ মাসের ১ম তারিখ ছিল বৃহস্পতিবার। এ হিসাব অনুযায়ী পরবর্তী বছরে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হতে পারে না। তাই তিন মাস অর্থাৎ যিলহজ্জ, মুহাররম ও সফর মাস ত্রিশ দিন হিসেবে গণনা করা হোক অথবা ঊনত্রিশ দিন হিসেবে অথবা কোন মাস ত্রিশ দিন এবং কোন মাস ঊনত্রিশ দিনে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন উলামায়ে কিরাম ইনতিকালের তারিখ ১৩ রবিউল আউয়াল গণ্য করেন। আবার কেউ ১৪, কেউ ১৫ রবিউল আউয়াল মনে করেন। কেউ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যেমন হাফিয ইবন রজব (র) لطائف المعارف নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

কোন কোন আলিম বলেছেন, মক্কা ও মদীনার তারিখের মধ্যে পার্থক্য সূর্য উদয়ের স্থানের পার্থক্যের কারণে হয়েছে এবং মদীনা শরীফে রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার হলে সোমবার ১২ রবিউল আউয়াল হবে। والله اعلم

আরো বিশদ বিবরণের জন্য মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবীর ফাতওয়া ৩য় খণ্ড দেখুন।

সমীক্ষা ১ঃ হাফিয ইবন কাসীর (র) বলেন, বুখারীর এই রিওয়ায়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল যে, নবী করীম (সা) সোমবার ভোরে ফজর নামাযে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হননি। শক্তি না পাওয়ার কারণে হুজরায় ফিরে গিয়েছেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা হলো ঃ

وارخى النبى صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات

"নবী করীম (সা) পর্দা উত্তোলন করেন কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে মসজিদে গমন করতে পারেন নি। অবশেষে না তিনি ইনতিকাল করেন।"

---

১. রাওযুল উনূফ, ২ খ, পৃ. ৩৬৯।

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী (সা) ফজর নামাযে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু এটা বর্ণনাকারীর ধারণা। কেননা বুখারী ও মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে এটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে যে. রাসূল (সা) ফজর নামাযে অংশগ্রহণ করেননি। বর্ণনাকারীর মনে পূর্ববর্তী যোহর নামাযে অংশগ্রহণই ফজরের বলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ নামায হিসেবে রাসূল (সা) মসজিদে যে নামায আদায় করেন, তা ছিল বৃহস্পতিবার দিন যোহরের নামায, যে নামাযের পর তিনি খুতবা প্রদান করেন। অতঃপর জুমু'আ, শনিবার ও রবিবার অতিবাহিত হয় কিন্তু রাসূল (সা) মসজিদে আগমন করেননি। সোমবার ভোরে পবিত্র হুজরা থেকে বের হলেও দুর্বলতার কারণে ফিরে গিয়েছেন।[১]

হাসান বসরীর এক মুরসাল রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী (সা) দশ দিন অসুস্থ ছিলেন এবং আবূ বকর (রা) নয়দিন লোকজনের ইমামত করেন।[২]

সমীক্ষা ২ ঃ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় আল্লাহর নবীর স্বীয় স্থানে কাউকে ইমাম নির্ধারণ করা, স্বীয় মুসাল্লার উপর তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন বাদশাহ্ কর্তৃক কাউকে তাঁর সিংহাসনে বসিয়ে কোথাও চলে যাওয়ার মত। নবী করীম (সা)-এর নামাযের মুসাল্লা বাদশাহর সিংহাসন থেকে কত মর্যাদাসম্পন্ন। এ জন্য নবী (সা)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে তাঁদের ইহকাল ও পরকালের ইমাম নির্বাচন করেন। কেননা, যেভাবে উম্মাতের চেয়ে নবীর উত্তম হওয়া জরুরী তেমনিভাবে নবীর খলীফা ও উত্তরাধিকারী ঐ ব্যক্তিই হতে পারেন যিনি সর্বাধিক উত্তম।

খিলাফতে রাশেদা হলো নবীর উত্তরাধিকারী। এটা দুনিয়ার কোন সিংহাসন বা রাজার উত্তরাধিকারী নয়। তাই সাহাবায়ে কিরাম যাকে সর্বাধিক উত্তম মনে করেছেন তাঁকেই নবী (সা)-এর খলীফা নির্বাচন করেন।

সমীক্ষা ৩ ঃ এত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকর (রা) রাসূল (সা)-এর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইমাম ছিলেন এবং শী'আদের এই উক্তি যে, নবী (সা) তাঁকে পদচ্যুত করেন এটা সম্পূর্ণ ভুল ও অসত্য।[৩]

৭. সাকীফায়ে বনূ সায়েদা এবং খিলাফতের বায়'আত

সোমবার দ্বিপ্রহরের সময় নবী (সা) অস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করে অনন্তকালের পথে প্রস্থান করেন। ইন্তিকালের সংবাদ শুনে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। কেউ কেউ মনে করেন, রাসূল (সা) এখনো ইনতিকাল করেননি। তবে এ

---

১. রাওযুল উনূফ, ৭ খ. পৃ. ৩৬৬।

২. যারকানী, ৮ খণ্ড. পৃ. ২৭৪।

৩. যারকানী, ৫খ, পৃ ২৭৪

ধারণা শুধু রাসূল (সা)-এর প্রতি অত্যধিক মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে হয়েছিল, অজ্ঞতার কারণে নয়। এ মর্মান্তিক সংবাদ শুনে হযরত আবূ বকর (রা) কেঁদে ফেলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন।

বিকালে এক ব্যক্তি এসে হযরত আবূ বকরকে এ সংবাদ প্রদান করে যে, আনসারগণ সাকীফায়ে বনী সায়েদায় একত্র হয়েছে এবং সা'দ ইবন উবাদার হাতে বায়'আত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করছে। কোন কোন আনসার এ মতামত প্রকাশ করে যে, একজন আমীর হবেন আনসার থেকে এবং একজন হবেন কুরায়শ থেকে। ধারণা ছিল এই যে, খিলাফতের হক তাদের বেশি। কেননা আনসারগণ দীনের সাহায্য করেছেন। এবং আল্লাহর রাসূলকে তাদের দেশে স্থান দিয়েছেন। নবী (সা)-এর সাথে একাত্ম হয়ে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। কেউ কেউ এ সত্যের বিরোধিতা করলেন, পরস্পর বিতর্ক হতে লাগলো।

ক্রমান্বয়ে এ সংবাদ হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর নিকট পৌছলো, তাঁরা উভয়ে হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) সহ মতানৈক্যের সমাধানের জন্য এবং যাতে কোন ফিতনা সৃষ্টি হতে না পারে, তজ্জন্য সাকীফায়ে বনী সায়েদায় গমন করেন। পথে আসিম ইবন আদী এবং উয়াইম ইবন সায়েদার সাথে সাক্ষাত হয়। তাঁরা হযরত আবূ বকর ও হযরত উমরকে সেখানে গমনের জন্য বাঁধা প্রদানে ইচ্ছা করে কিন্তু তা হয়নি। তাঁরা যত দ্রুত সম্ভব সাকীফায় আনসারদের সমাবেশে উপস্থিত হন। সেখানে তখনো পরস্পর বিতর্ক চলছিল।

হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) যখন সাকীফায় পৌঁছেন তখন হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) সেখানে কম্বল গায়ে জড়িয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। আনসারগণ তাঁকে আমীর নির্বাচন করার জন্য বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছেন।

হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর বক্তৃতা

হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) দাঁড়িয়ে আল্লাহপাকের প্রশংসা জ্ঞাপনের পর এ বক্তৃতা প্রদান করেন ঃ

أما بعد : فنحن الانصار وكتيبة الاسلام وأنتم يامعشر قريش رهط بيننا وقد دفت الينا دافة من قومكم فاذاهم يريدون ان يغصبونا الامر -

"আমরা আনসার অর্থাৎ ইসলামের সাহায্যকারী ও ইসলামের বাহিনী। হে কুরায়শগণ! (মুহাজিরগণ) তোমরা আমাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল (তোমরা অল্প সংখ্যক এবং আমরা অধিক সংখ্যক), তোমাদের কাওমের একটি ক্ষুদ্র দল আমাদের এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখন তারা আমাদের থেকে আমাদের খিলাফতের অধিকার জোরপূর্বক নেয়ার চেষ্টা করছে।"

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ

يامعشر الانصار لكم سابقة وفضيلة ليست لاحد من العرب ان محمداً صلى الله عليه وسلم لبث فى قومه بعض عشرة سنة يدعوهم فما امن به الا القليل ماكانوا يقدرون على منعه ولاعلى اعزاز دينه ولا على دفع ضيم حتى اراد الله بكم الفضيلة ساق اليكم الكرامة ورزقكم الايمان به وبرسوله والمنع له ولاصحابه والاعزازله ولدينه والجهاد لاعدائه فكنتم اشد الناس على عدوه حتى استقامت العرب لامر الله طوعًا وكرها واعطى البعيد المقادة صاغرا فدانت لرسوله باسيافكم العرب وتوفاه الله وهو عنكم راضٍ قرير العين ـ استبدوا بهذه الامر دون الناس فانه لكم دونهم ـ

"হে আনসারগণ! তোমরা দীন ইসলামের ব্যাপারে এরূপ অগ্রগামী ও ফযীলতের অধিকারী যা তোমাদের ছাড়া আরবে অন্য কেউ হাসিল করতে পারেনি। নবী (সা) তের বছর স্বীয় কাওমের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন কিন্তু খুব কম লোকই ঈমান গ্রহণ করে। নবী (সা)-এর হিফাযত করা, তাঁর দীনের মর্যাদা দান করা এবং মাথা উঁচু করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এমন কি কোন শত্রুর যুলম ও অত্যাচার প্রতিহত করার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ফযীলত ও মর্যাদা প্রদানের কামনা করেন, তখন সম্মান ও মর্যাদার আসবাব ও উপায় তোমাদেরকে দান করেন এবং তোমাদেরকে ঈমান গ্রহণের তাওফীক দান করেন। নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবাগণের হিফাযত ও স্বীয় দীনের হিফাযত তোমাদের মাধ্যমে করিয়েছেন। আল্লাহর শত্রুদের সাথে তোমরা জিহাদ করেছ এবং আল্লাহর শত্রুদের উপর তোমরা অত্যন্ত কঠোর বলে প্রমাণিত হয়েছ। ফলে সমস্ত আরববাসী আল্লাহর নির্দেশের প্রতি মাথা নত করে এবং দূরবর্তীগণও বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করে। তোমাদের তলোয়ারের মাধ্যমে সমস্ত আরববাসী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুগত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীকে ওফাত দান করেন। রাসূল (সা) যখন দুনিয়া থেকে ইনতিকাল করেন, তখন তিনি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন এবং নবী (সা)-এর পবিত্র চোখ তোমাদের কারণে ঠাণ্ডা অর্থাৎ তিনি সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। সুতরাং তোমরা খিলাফতের এ দায়িত্ব গ্রহণ কর। এটা তোমাদের হক, অন্য কারো নয়।"[১]

উপস্থিত সবাই এ বক্তৃতা পসন্দ করেন এবং চারদিক থেকে এর প্রশংসামূলক শ্লোগান হতে থাকে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়।

১. ইবন আসীর, ২ খ. পৃ. ১২৫

মুহাজিরগণ বিরোধিতা করে বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে প্রথম সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছি। নবী (সা)-এর গোত্র ও দল এবং তাঁর সাথেই হিজরত করেছি অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন ও দেশত্যাগ করে এখানে আগমন করেছি। কোন কোন আনসার বলেন, উত্তম হলো এই যে, দু'জন আমীর নির্বাচন করা হোক। একজন আনসার থেকে, একজন মুজাহির থেকে। উভয় আমীর পরস্পর পরামর্শ করে খিলাফতের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। হযরত সা'দ ইবন উবাদা শোনামাত্রই বলেন, এটা হলো প্রথম দুর্বলতা।

হযরত উমর (রা) কিছু বলার ইচ্ছা করেন কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি চুপ থাক। হযরত উমর (রা) যেহেতু হযরত আবূ বকরকে অসন্তুষ্ট করা সমীচীন মনে করেন না, ফলে তিনি বসে পড়েন। হযরত আবূ বকর (রা) বক্তৃতা শুরু করেন।

হযরত সিদ্দীক আকবরের ভাষণ

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) মহান আল্লাহর হামদ ও সানার পর বলেন ঃ

ان اللّه قد بعث فينا رسولا شهيدا على امة ليعبدوه ويوحدوه وهم يعبدون من دونه الهة شتى من حجر وخشب فعظم على العرب ان يتركوا دين اباءهم فخص الله المهاجرين الاولين من قومه بتصديقه والمواساة له والصبر معه على شدة اذى قومهم ويكذبهم اياه وكل الناس لهم مخالف زار عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس لهم فهم اول من عبد الله فى هذه الارض وامن بالله وبالرسول وهم اولياءه وعشيرته واحق الناس بهذه الامر من بعده لاينازعهم الاظالم وانتم يامعشر الانصار من لاينكر فضلهم فى الدين ولاسابقتهم فى الاسلام رضيكم الله انصار الدينه ورسوله وجعل اليكم هجرة فليس بعد المهاجرين الاولين عندنا بمنزلتكم فنحن الامراء وانتم الوزراء لاتقاونون بمشورة ولاتقضى دونكم الامور ـ (١)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি উম্মাতকে পথ প্রদর্শন করেন, যাতে লোকজন এক আল্লাহর ইবাদত করে। এ সমস্ত লোক নবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে পাথর ও কাঠের তৈরি মূর্তির পূজা করত। বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করা আরবদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়। অতঃপর আল্লাহ

১. ইবন আসীর, ২ খ. পৃ. ১২৫

তা'আলা রাসূল (সা)-এর কাওম থেকে অগ্রবর্তী মুজাহিরগণকে খাস তাওফীক দান করেন, যারা সর্বপ্রথম নবী (সা)-কে সত্য বলে বিশ্বাস করেন এবং সাহায্য ও সহযোগিতা করেন. কাওমের পক্ষ থেকে কঠোর নির্যাতন ও উৎপীড়নের সময় ধৈর্যধারণ করেন। অথচ ঐ সময় সমস্ত লোক তাঁদের বিরোধী ছিল কিন্তু সংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও লোকজনের শক্রতার কারণে ভীত হয়নি। এ অবস্থায়ও নবী (সা)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করেননি। সুতরাং তারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করে। এ সমস্ত লোকই হলেন নবী (সা)-এর সাথী ও আত্মীয়-স্বজন এবং এ সমস্ত লোকই নবী (সা)-এর পর খেলাফতের সর্বাধিক হকদার, যালিম ব্যতীত কেউ এ বিষয়ে ঝগড়া করতে পারে না। হে আনসারের দল। তোমাদের মর্যাদা ও দীন ইসলামে তোমাদের অগ্রগামিতার ব্যাপারে কারো কোন বিরোধিতা নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পসন্দ করে স্বীয় রাসূল ও দীনের সাহায্যকারী বানিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলকে তোমাদের নিকট হিজরত করিয়েছেন। সুতরাং প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরগণের পর আমাদের নিকট তোমাদের মর্যাদা অনেক বেশি যা অন্য কারো নেই। অতঃএব আমরা হলাম আমীর এবং তোমরা হলে উযীর। তোমাদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে না।"

অপর এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আনসারদের জবাবে বলেছেন ঃ

ماذكرتم من خير فانتم أهل وماتعرف العرب هذا الامر الالهذا الحى من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارًا (بخارى شريف صفـ.١٠١ كتاب المحاربين)

" হে আনসারগণ! তোমরা নিজেদের উত্তম কাজ ও ফযীলতের যে বর্ণনা করেছ নিশ্চয়ই তোমরা এটার হকদার, কিন্তু আরববাসীগণ আমীর নির্বাচনের ব্যাপারে কুরায়শ গোত্র ব্যতীত অন্য কারো নেতৃত্ব মানবে না। কেননা, কুরায়শ গোত্র বংশ মর্যাদা, অভিজাত্য ও বাড়ি ঘরের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (বুখারী শরীফ)

হযরত আবূ বকরের কথার মর্মার্থ ছিল এই যে, খলীফা এমন কাওম থেকে হতে হবে যাদের নেতৃত্ব ও বংশ মর্যাদা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়, যাতে জনগণ তাঁর নেতৃত্ব ও ইমারতের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং তাঁর আনুগত্য প্রকাশে কোন লজ্জা বা অনীহা প্রকাশ না করে। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকার মর্যাদা, সম্মান এবং বুযুর্গী স্বীকৃত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণ তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হয় না। বরং তাকে ঘৃণা ও নীচু মনে করে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কুরায়শদের ফযীলত ও মর্যাদা সমস্ত আরবে স্বীকৃত এবং আউস ও খাযরাজ

গোত্রকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে না। আনসার থেকে যদি আমীর নির্বাচন করা হয়, তাহলে আরব গোত্র তাঁর আনুগত্যের উপর সম্মত হবে না এবং দেশের জনসাধারণ তার নেতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। অধিকন্তু খিলাফত ও নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয় হলো এই যে, জনসাধারণ আমীরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং তাঁর নেতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা) আনসারগণের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

يامعشر الانصار انا والله ماننكر فضلكم ولابلائكم فى اسلام ولاحقكم الواجب علينا ولكن قد عرفتم ان هذا الحى من قريش بمنزلة من العرب فليس بها غيرهم وان العرب لن تجتمع الاعلى رجل منهم فنحن الامراء وانتم الوزراء فاتقوا الله ولاتصدموا الاسلام ولاتكونوا اول من احدث فى الاسلام الاوقد رضيت لكم احد هذين الرجلين لى اى عمر ولابى عبيدة فليهما بايعتم فهو لكم ثقة الحديث -(১)

"হে আনসারগণ! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ফযীলত, ইসলামের খেদমত ও সাহায্য এবং আমাদের কাছে তোমাদের অধিকারের কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তোমরা এটা খুব ভালভাবে অবগত রয়েছ যে, আরব দেশে কুরায়শ গোত্রের যে সম্মান ও মর্যাদা বিদ্যমান, তা অন্য কোন গোত্রের নেই এবং আরববাসীগণ কুরায়শ গোত্রের কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো নেতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না (ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন রাজ্য চলতে পারে না)। সুতরাং কুরায়শ আমীর হবে এবং আনসারগণ উযীর হবে। সুতরাং হে আনসারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলামের মধ্যে সর্বাগ্রে বিদ্‘আত প্রচলনকারী হয়ো না। আমার মতে খিলাফতের জন্য এ দু’ব্যক্তি উপযুক্ত, একজন হলেন উমর অপরজন হলেন আবূ উবায়দা, এদের মধ্যে যাঁর হাতে বায়‘আত গ্রহণ কর তিনিই তোমাদের জন্য নির্ভরযোগ্য আমীর হবেন।"

হযরত সিদ্দীকে আকবরের এ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর হাব্বাব ইবন মুনযির ইবন জামূহ দাঁড়িয়ে বলেন, সবচেয়ে উপযুক্ত হলো যে, একজন আমীর আমাদের (আনসার) থেকে, একজন তোমাদের (মুহাজির) থেকে, হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, لائمة من قريش। (খলীফা ও আমীর কুরায়শ থেকে হবে)।

১. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩৯।

আল্লামা কারী (র) বলেন, এ হাদীস সহীহ এবং চল্লিশজন সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে। যেমন-শারহে শামায়েল লিল আল্লামাতুল কারী।[১]

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক থেকে বর্ণিত. হযরত আবূ বকর (রা) এ সময় বলেছেন ঃ

انه لايحل ان يكون للمسلمين اميران فانه مهما يكن ذلك يختلف امرهم واحكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازعون فيما بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لاحد على ذالك صلاح وان هذا الامر فى قريش ما اطاعوا الله واستقاموا على امره قد بلغ كم ذالك او سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصبرين فنحن الامراء وانتم الوزاراء اخواننا فى الدين وانصارنا عليه ـ

"নিশ্চয়ই এটা সঠিক নয় যে, মুসলমানদের দু'জন আমীর নির্বাচিত হবে। এর দ্বারা মুসলমানদের কার্যক্রম ও আহ্কামের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে এবং দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে, পরস্পর ঝগড়া সৃষ্টি হবে। এ সময় সুন্নাত পরিত্যক্ত হবে, বিদ্'আত প্রকাশ পাবে, বিরাট ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। এতে মুসলমানের কোন কল্যাণ নেই। খিলাফতের দায়িত্ব কুরায়শদের উপর ন্যস্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কুরায়শগণ আল্লাহপাকের আনুগত্য করবে এবং তাঁর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে– এ হাদীস তোমাদের নিকট পৌঁছেছে অথবা তোমরা স্বয়ং রাসূল (সা) থেকে শ্রবণ করেছ। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, ভীরু হয়ে যাবে। তোমাদের কল্যাণ হবে। ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন। সুতরাং আমরা হলাম আমীর এবং তোমরা হলে উযীর ও আমাদের দীনি ভাই এবং দীনের কাজে আমাদের সাহায্যকারী।"

হযরত ফারূকে আযম (রা) বলেন, দু'টি তলোয়ার একটি কোষে রাখা যায় না এবং এক নারীর দু'জন স্বামী হতে পারে না অর্থাৎ এক সাম্রাজ্যে দু'জন আমীর কিভাবে হতে পারে।

হযরত ফারূক আযমের জবাব ছিল যুক্তি সমৃদ্ধ এবং হযরত সিদ্দীকে আকবরের জবাব ছিল তাত্ত্বিক। নবী করীম (সা)-এর সুস্পষ্ট ইরশাদ বর্ণনা করে দিয়েছেন। বশীর ইবন সা'দ আনসারী (রা) বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ হাদীস শ্রবণ করেছি। অন্যান্য আনসার ও মুহাজিরগণ এ হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। হাবীব ইবন মুনযির সহ যে সমস্ত আনসার খিলাফতের ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন, এ হাদীস শোনার সাথে সাথে তাঁদের ধারণা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সমাবেশে আমীর নির্বাচনের ব্যাপারে যে তর্কাতর্কি চলছিল, তা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়, সবাই চুপ হয়ে যান।

১. কানযুল উম্মাল, ২ খ, পৃ. ২১৯।

ওহী লিখক হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব নবী (সা)-এর খলীফা ও মুহাজিরগণের মধ্য থেকে হবে। আমরা যেভাবে নবী করীম (সা)-এর সাহায্যকারী ছিলাম, তেমনিভাবে আমরা তাঁর খলীফারও সাহায্যকারী হয়ে থাকব। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাত ধরে বললেন, ইনি তোমাদের খলীফা, তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ কর।[১]

হযরত সা'দ ইবন উবাদার স্বীকৃতি

قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبوعوانة عن داؤد بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمن قال توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر فى صائفته من المدينة قال فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال فذاك أبى وامى ما اطبك حيا وميتا مات محمد ورب الكعبة فذكر الحديث قال فانطلق أبوبكر وعمر يتعادان حتى اتوهم فتكلم أبوبكر فلم يترك شيئا أنزل فى الانصار الاذكره قال ولقد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوسلك الناس واديًا وسلكت الانصار واديا لسلكت وادى الانصار لقد علمتم ياسعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانت قاعد قريش ولاة هذا الامر خير الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد صرفت نحن الوزراء وانتم الامراء -

"ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের সময় হযরত আবূ বকর (রা) মদীনা থেকে অদূরে তাঁর বাড়িতে ছিলেন। সংবাদ শোনার সাথে সাথে তিনি মদীনায় ফিরে এসে পবিত্র হুজরায় প্রবেশ করেন এবং পবিত্র চেহারা থেকে চাদর উত্তোলন করে কপালে চুমো খেলেন। অতঃপর বলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি আমার নিকট সর্বাধিক শ্রদ্ধার পাত্র। সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন এবং কা'বার মালিক চিরঞ্জীব। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি অবগত হলেন, তখন হযরত আবূ বকর ও উমর দ্রুতগতিতে সাকীফায় গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তাঁর বক্তৃতায়

---

১. হযরত ফারূক আযমের এ উক্তি সীরাতে হালবীয়ায় উল্লেখ আছে। মূল عبارت হলো এই যে,

وفى رواية (اى عن عمر) قلت سيفان فى عمد واحد لايكونان هيهات لايجتمع فحلان فى مغرس كذا فى السيرة الحلبيه صفـــ٣٥٨ ووقع فى حديث سالم بن عبيد عند البزار وغيره فى قصة الوفات فقالت الانصار منا امير ومنكم امير فقال عمر واخذ بيد أبى بكر اسيفان فى عمد واحد لايصطحان الخ كذا فى فتح البارى صفحـــ٢٥ج٧ مناقب ابوبكر رضى الله عنه

আনসারগণের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। তিনি এটাও বলেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, যদি জনগণ একটি ময়দানে চলে এবং আনসারগণ অন্য ময়দান দিয়ে চলে, তাহলে আমি আনসারগণের সাথে চলব।' আল্লাহর শপথ, হে সা'দ! তুমি খুব ভালভাবে অবগত আছ যে, একবার যখন তুমি নবী করীম (সা)-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলে, তখন রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, কুরায়শই খিলাফতের নেতৃত্বে থাকবে। তাদের মধ্যে উত্তম উত্তমদের অনুগত থাকবে এবং মন্দ মন্দ লোকদের অনুগত থাকবে। সা'দ ইবন উবাদা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলেন, আপনি সত্য বলেছেন, আমরা হলাম উযীর এবং আপনার হলেন আমীর।"

এ রিওয়ায়েতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কে কসম দিয়ে বলেছেন, তোমাদের উপস্থিতিতে নবী করীম (সা) বলেছেন, খিলাফতের আমীর কুরায়শদের মধ্য থেকে হবে। হযরত সা'দ لَقَدْ صَدَّقْتَ বলে হযরত আবূ বকরের সত্যতা ঘোষণা করেছেন। এ জন্য হাফিয ইবন কাসীর এ রিওয়ায়েতের জন্য একটি বিশেষ শিরোনাম লিপিবদ্ধ করেছেন, তাহলো ঃ

ذكر اعتراف سعد بن عبادة بصحة ماقاله الصديق يوم السقيفة[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)[২] থেকে বর্ণিত, যখন আনসারগণ এটা বলেন, منا أمير ومنكم أمير "এক আমীর আমাদের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে", তখন হযরত উমর (রা) বলেন, হে আনসারগণ! তোমরা অবগত আছ

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৭।

২. في رواية النسائي وأبي يعلى والحاكم وصححه عن ابن مسعود انه قال لما قالت الانصار منا أمير ومنكم أمير فاتاهم عمر بن الخطاب فقال يامعشر الانصار الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ابابكر ان يوم الناس فايكم يطيب نفسًا ان يتقدم على أبي بكر فقالت الانصار نعوذ بالله ان نتقدم على ابي بكر كذا في شرح الشمائل فقالت الانصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر من له مثل هذه الثلاث (اى فضائل الثلاث التى لابى بكر) - ثانى اثنين اذهما فى الغار (٢) اذ يقول لصاحبه لاتحزن (٣) ان الله معنا - الحديث فاثبت الله تعالى فى هذه الاية ثلاثة فضائل لابى بكر الاول ثانى اثنين والثالث اثبات الصحبة له فى قوله تعالى اذيقول لصاحبه لاتحزن الثالثة اثبات المعية فى قوله تعالى ان الله معنا فاثباته تعالى تلك الفضائل الثلاث بنص القران يؤذن باحقية للخلافة - كذا فى شرح الشمائل للشيخ عبد الرؤف والعلامة القارى صفحه ٢٢. وقال الحافظ العسقلانى فى الفتح صفحه ٢٥ج٧ ووقع فى حديث سالم بن عبيد عبد البزار وغيره فى قصة الوفاة فقالت الانصار منا امير ومنكم امير فقال عمر واخذ بيد ابى بكر اسيفان فى غمد واحد لايصطلحان واخذ بيد ابى بكر فقال من له هذه الثلاثة اذهما فى الغار من هما اذ يقول لصاحبه من صاحبه لاتحزن ان الله معنا مع من ثم بسط يده فبايعه ثم قال بايعوه ثم قال فبايعه الناس - فتح البارى صفحه ٢٥ج٧ مناقب أبى بكر-

যে, নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকরকে ইমামের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে হযরত আবূ বকর (রা) থেকে অগ্রগামী হওয়া পসন্দ করে ? আনসারগণ বলেন, আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা কিভাবে হযরত আবূ বকর (রা) থেকে অগ্রগামী হব, (নাসাঈ, আবূ ইয়ালা, হাকীম, শারহে শামাইল, আল্লামা কারী, ২ খ, পৃ. ২১৯)

মূল অর্থ হলো এই যে, হযরত আবূ বকরকে বিশেষ তাগিদ ও জোর-জবরদস্তি করে নবী (সা) কর্তৃক ইমাম এবং স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করা এটা এ বিষয়ের দলীল ও প্রমাণ বহন করে যে, নবী (সা) এর দৃষ্টিতে সবচেয়ে উত্তম ও অগ্রগামী ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)।

শামাইলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, যখন আনসারগণ বলেন ঃ منا أمير ومنكم أمير তখন উমর ফারূক (রা) হযরত আবূ বকরের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন এবং প্রকাশ্য ঘোষণা করেন যে, বল, এ তিনটি বৈশিষ্ট্য হযরত আবূ বকর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা)-কে কুরআন মজীদে, ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ বলেছেন, হযরত আবূ বকরকে নবী করীম (সা) এর ثانى বা (দ্বিতীয়জন) বলেছেন এবং নবী (সা)–এর গুহার সঙ্গী আখ্যায়িত করেছেন। দ্বিতীয়ত হযরত আবূ বকর (রা)-কে বিশেষ প্রিয়জন চিহ্নিত বলেছেন ঃ

اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَتَحْزَنْ তৃতীয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ বকরের জন্য স্বীয় বিশেষ সহচরত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا। অন্যথায় ইলম ও পরিসীমার দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তা'আলার সাহচর্য বা সঙ্গ হলো ব্যাপক এবং সবাই এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন– আল্লাহ বলেছেন ঃ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ (এবং আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন) এ তিনটি ফযীলত হযরত আবূ বকরের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যার দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আবূ বকরই সবচেয়ে উত্তম এবং তিনিই খিলাফতের অধিকযোগ– (كذافى شرح الشمائل للعلامة القارى والشيخ المناوى صفحــ، ٢٢ج٢) হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত সিদ্দীকে আকবরের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে মাত্র তিনটি ফযীলত উল্লেখ করেছেন যা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু আয়াতের বর্ণনার প্রেক্ষাপটে হযরত সিদ্দীকে আকবরের ফযীলতের আরো দলীল বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ঃ

ان لاتنصروه فقد نصره الله ـ اذ أخرجه الذين كفروا الاية

এ আয়াতে হযরত আবূ বকর ব্যতীত সবাইকে রাসূলের সাহায্য পরিত্যাগ করার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে।

কেননা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিলেন এবং সাহায্যকারী ছিলেন। ফলে আবূ বকর (রা) তিরস্কার থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন।

দ্বিতীয় এই যে. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী করীম (সা)-এর সাহায্য হযরত আবূ বকরের সাহায্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা হযরত আবূ বকর (রা) নবী (সা)-এর সাথে ছিলেন। সুতরাং রাসূল (সা)-এর মত হযরত আবূ বকরও আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত ছিলেন। তাই তিনিই খিলাফতের অধিকযোগ্য।

তৃতীয় এই যে, فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلَيْهِ এর মধ্যে সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী عليه এর ضمير হযরত আবূ বকর সিদ্দীক-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শান্তি হযরত আবূ বকরের উপর নাযিল করেছেন। কেননা তিনিই নবী (সা)-এর মহব্বতে চূড়ান্ত পর্যায়ের উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষ প্রশান্তি প্রদানের মাধ্যমে মর্যাদা দান করেন।

চতুর্থ হলো, এই যে, বর্ণিত আয়াতে হযরত আবূ বকরকে ثانى اثنين অর্থাৎ দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় বলে উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আবূ বকর (রা) ইলম ও আমলের পূর্ণতায় নবী (সা) এর পরবর্তী ও স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন এবং তিনি হেরা গুহায় রাসূল (সা)-এর সাথী ছিলেন।

পঞ্চম হলো এই যে, قوله تعالى اذيقول لصاحبه এর মধ্যে صاحب (সাথী) দ্বারা মুফাস্‌সিরগণ সর্বসম্মতিক্রমে বলেন, হযরত আবূ বকর (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল করীমে বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীককে নবী (সা) বিশেষ সাথী, খাঁটি বন্ধু, আপাদমস্তক আন্তরিকতাপূর্ণ বলেছেন। এর দ্বারা এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথী ও বন্ধুত্ব হলো চিরস্থায়ী। দুনিয়ার জীবনে তিনি সাথী ও বন্ধু ছিলেন, আলমে বরযখ, আলমে আখিরাত, ময়দানে হাশর এবং হাউযে কাওসারেও তিনি রাসূল (সা)-এর সাথী থাকবেন। বেহেশতেও তিনি নবী (সা)-এর সাথী থাকবেন। এ জন্য কোন কোন উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকরের সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করে, সে কাফির। কেননা আল্লাহ পাকের বাণী الصاحب -এর মুনকির বা অস্বীকারকারী।

ষষ্ঠ হলো এই যে, হযরত আবূ বকরকে উদ্দেশ্য করে রাসূল (সা) বলেছেন, لاتحزن (হে আবূ বকর তুমি চিন্তান্বিত ও ব্যথিত হওনা) এ বাণী এই বিষয়ের প্রমাণ বহণ করে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক নবী (সা)-এর আশিক, জীবন উৎসর্গকারী ও সহব্যথী ছিলেন।

সপ্তম হলো এই যে, لَاتَحْزَنْ এর পর রাসূল (সা) বলেছেন, اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا এবং বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলা সঙ্গী ও সাথী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

(العلامة القارى فى شرح الشمائل)[১]

অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, উমর ও আবূ উবায়দা এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে যার হাতে ইচ্ছা তোমরা বায়'আত গ্রহণ কর। হযরত উমর ও আবূ উবায়দা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! এটা অসম্ভব যে, আপনি থাকতে আমরা খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করব। আপনি মুহাজিরগণের মধ্যে উত্তম, দ্বীনে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম রুকন নামাযে আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খলীফা এবং স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। হে আবূ বকর। আপনি হাত প্রসারিত করুন, আমরা আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করব।

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমরকে বলেন, হাত প্রসারিত কর, আমি তোমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করব। হযরত উমর (রা) আবূ বকরকে বলেন, আপনি হলেন সর্বোত্তম। আবূ বকর (রা) বলেন, انت أقوى منى (তুমি আমার চেয়ে শক্তিমান) এর উপর বিতর্ক চলতে থাকল। অবশেষে হযরত উমর (রা) বলেন, আমার শক্তি আপনার ফযীলতের সাথে মিলে কাজ করবে। অর্থাৎ যিনি উত্তম তিনি আমীর হবেন। যিনি শক্তিশালী তিনি তার উযীর হবেন। (শারহে শামাইল, আল্লামা আলী কারী, ২ খ, পৃ. ২৩১)

এরপর হযরত উমর (রা) পুনরায় বলেন, হাত প্রসারিত করুন। যখন হযরত উমর এবং হযরত আবূ উবায়দা (রা) বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন বশীর ইবন সা'দ আনসারী (রা) অগ্রসর হয়ে সর্বাগ্রে হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত উমর ও হযরত আবূ উবায়দা (রা) বায়'আত গ্রহণ করেন।

হাব্বাব ইবন মুনযির (রা) যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, বশীর ইবন সা'দ হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন, তখন চিৎকার করে বললেন, তুমি আত্মীয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখলে না এবং চাচাত ভাই (সা'দ ইবন উবাদার) আমীর হওয়া পসন্দ করলে না এবং তার প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করলে। বশীর ইবন সা'দ জবাবে বলেন, আল্লাহর শপথ! মূলকথা হলো এই যে, আমি মুহাজিরগণ থেকে তাঁদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া পসন্দ করিনি। এ ছাড়া আওস গোত্রের লোকজন খাযরাজ গোত্রের লোকের আমীর নির্বাচিত হওয়া পসন্দ করে না। তাঁদের আশংকা ছিল এই যে, যদি একবার সা'দ ইবন উবাদাকে আমীর নিয়োগ করা হয় এবং আমীরের পদ খাযরাজ গোত্রে চলে যায়, তাহলে কখনো আওস গোত্র এ মর্যাদা লাভ করতে পারবেনা। আওস গোত্রের নেতা উসায়দ ইবন হুযায়র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আওস গোত্রের লোকদেরকে এ পরামর্শ প্রদান করেন যে, উঠ এবং হযরত আবূ বকরের হাতে

১. শরহে শামায়েল, আল্লামা আলী কারী, ২, খ, পৃ. ২২০

বায়'আত গ্রহণ কর। তারা তৎক্ষণাত হযরত আবূ বকরের বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁদের বায়'আত গ্রহণ করার সাথে সাথে হযরত সা'দ এবং খাযরাজ গোত্রের লোকদের অভিপ্রায় নস্যাৎ হয়ে গেল।

অতঃপর চতুর্দিক থেকে লোকজন হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে দলে দলে আগমন করে। এমন কি কোথাও পা রাখার স্থান বাকী থাকল না। সা'দ ইবন উবাদা (রা) এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। কেউ বলে উঠলো, দেখ! সা'দ ও আবূ বকর মরে না যায়। হযরত উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তাকে মারবেন। সা'দ (রা)-উঠে ঘরে চলে যান এবং লোকজন বায়'আত গ্রহণ করে নিজেদের ঘরে ফিরে যান।

বিশেষ বায়'আতের পর সাধারণ বায়'আত

মোটকথা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুহাজির ও আনসারগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হন। বায়'আতের পর সমাবেশ শেষ হয়ে যায়। এ বায়'আত সোমবার বিকালে অনুষ্ঠিত হয়, যে দিন রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন। অর্থাৎ ১২ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী। সোমবার বিকালে বিশেষ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয় এবং ইনতিকালের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার মসজিদে নব্বীর মিম্বরে সাধারণ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়।

সাকীফার বায়'আতের[১] দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার জনসাধারণ মসজিদে নব্বীতে একত্রিত হয়। সাহাবায়ে কিরাম, মুহাজির ও আনসার সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত উমর (রা) প্রথমে মিম্বরে উপবেশন করে এক সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এ সময় হযরত আবূ বকর চুপ করে উপবিষ্ট ছিলেন।

সাধারণ বায়'আতের পূর্বে মসজিদে নব্বীতে হযরত উমরের বক্তৃতা

হযরত উমর (রা) বলেন, আমার আশা ছিল, নবী (সা)-এর ইনতিকাল আমাদের সবার শেষে হবে। তবুও যেহেতু রাসূল (সা) ইনতিকাল করেছেন, তবুও আল্লাহর দীনে কোন ত্রুটি সৃষ্টি হবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে এক নূরে হিদায়ত (কুরআন) বিদ্যমান রেখেছেন যা তোমাদের জন্য হিদায়াতের উপায় এবং রাসূলের সহচর তোমাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) রয়েছেন। যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হেরা গুহার সাথী দু'জনের মধ্যে একজন এবং নবী (সা)-এর বিশেষ সাথী ও বন্ধু।

---

১. قال الحافظ ابن كثير قلت كان هذا (اى امر البيعة فى السقيفة) فى بقية يوم الاثنين فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس فى المسجد فتمت البيعة من المهاجرين والانصار قاطبة وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، كذا فى البداية والنهاية صحـ٢٤٨ج٥

সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে তিনিই ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা হওয়ার অধিকযোগ্য ও হকদার। সুতরাং হে মুসলমানগণ, তোমরা উঠ এবং হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ কর।[১]

الزهرى أخبرنى انس بن مالك انه سمع خطبة عمر الاخيرة حين على المنبر وذالك الغد من يوم توفى رسول الله صلى الله٢-جلس عليه وسلم وأبوبكر صامت لايتكلم قال كنت أرجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يد برنا يريد بذالك ان يكون اخرهم فان يكن محمد قدمات فان الله عز وجل قد جعل بين اظهركم نور تهتدون به هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم وان ابابكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانى اثنين وانه اولى المسلمين باموركم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة قد بايعون قبل ذالك فى سقيفة بنى ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر ـ

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত ফারূক আযম (রা) বলেছেন, তোমরা বল! হযরত আবূ বকর ব্যতীত অন্য কার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঃ ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ বলেছেন। কোন ব্যক্তি রয়েছেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের বিশেষ সাথী বলেছেন ঃ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ কোন ব্যক্তি রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তাঁর সাথে রয়েছেন اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

মূলকথা হলো এই যে, এগুলো এরূপ উত্তম গুণ এবং যা হযরত আবূ বকরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বিশ্বজগতে অন্য কেউ এ সমস্ত গুণের দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ নেই। অতঃপর খিলাফতের হকদার হিসাবে কে তাঁর অংশীদার হতে পারে। এটা অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, যাকে আল্লাহ তা'আলা ثانى اثنين বলেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। সুতরাং হে মুসলিমগণ! তোমরা এ অদ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট অগ্রসর হয়ে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ কর। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতের পর এটা হলো দ্বিতীয় হাত।

শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (র) 'মানতিকুত তায়র' এ বলেন ঃ

خواجئه اول كه اول يار اء ست * ثانى اثنين اذهمافى الغار ادست

"প্রথম সম্মানী জনই তাঁর (নবীর) প্রথম বন্ধু; ছুর গুহায় যিনি ছিলেন দ্বিতীয় (আবু বকর (রা) মহান ব্যক্তিত্ব।"

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৮ মূল ভাষ্য এরূপ

صدردین صدیق اکبر قطب حق * درهمه چیزازهمه برده سبق

"(যিনি) ধর্মের প্রধান কাণ্ডারী, মহা সত্যবাদী ও সত্যের দিশারী সর্ব বিষয়ে সবার চেনে যিনি ছিলেন অগ্রগামী।

هرچه حق ازبارگاه کبریا * ریخت درصدر شریف مصطفیٰ

"মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যত কিছু বাস্তব ও যথার্থ; তা মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা) এর পবিত্র বক্ষে মহান আল্লাহ ঢেলে দিয়েছেন।"

اوهمه درسینئه صدیق إیخت * لاجرم تابود ازتحقیق ایخت

"আর তার সবকিছুই আবু বকর সিদ্দীকের অন্তরেও ঢেলে দেয়া হয়েছে; নিশ্চিত, তার সবকিছুই ছিল সত্য ও যথার্থ।"

چون توکردی ثانی اثنین قبول * ثانی اثنین اوبود بعد ازرسول

"আপনি (আল্লাহ) যখন তাঁকে দ্বিতীয় জনরূপে কবুল করেছেন; তাই (নবীর ইন্তেকালের পরও) তিনিই হচ্ছেন রাসূলের বিকল্প ২য় জন অর্থাৎ নবীজী (সা) ধর্মের প্রথম কাণ্ডারী এবং সিদ্দিকে আকার হবেন দ্বিতীয় কাণ্ডারী।"

হযরত সিদ্দীকে আকবরের নিকট বায়'আত নেয়ার আবেদন

হযরত উমর (রা) খুতবা সমাপ্ত করার পর হযরত আবূ বকরের নিকট আরয করেন اصْعَدِ الْمِنْبَرُ (মিম্বরের উপর আরোহণ করুন) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) একটু বিলম্ব করেন কিন্তু হযরত উমর (রা) বারবার তাগিদ করতে থাকেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) মিম্বরের উপর গিয়ে উপবেশন করেন এবং জনসাধারণ তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[১]

সাধারণ বায়'আতের পর হযরত সিদ্দীকে আকবরের প্রথম খুতবা

হযরত উমরের বারবার অনুরোধে হযরত আবূ বকর (রা) মিম্বরে উপবেশন করেন কিন্তু নবী করীম যে সোপান বা সিঁড়িতে উপবেশন করতেন, সেটা বাদ দিয়ে নিচের সোপানে বসেন। মুসলিম জনতা তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। বায়'আত গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে এক খুতবা প্রদান করে বলেন ঃ

أمابعد ايها ألناس فانى قد وليت عليكم ولست بخير كم فان أحسنت فاعينونى وان اسأت فقومونى الصدق امانة والكذب خيانة

---

১. قال الزهرى عن انس بن مالك سمعت عمر يقول يومئذ لابى بكر اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس علمة، كذا فى البداية والنهاية صفـ ٢٤٨ ج٥

والضعيف فيكم قوى عندى حتى ازيح علته ان شاء الله تعالى والقوى فيكم ضعيف حتى اخذ من الحق ان شاء الله تعالى لايدع قوم الجهاد فى سبيل الله الاضربهم الله بالذل ولاتشيع فى قوم قط الفاحشة الاعمهم الله بالبلاء اطيعونى ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة عليكم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله وهذا اسناد صحيح ـ(১)

"আম্মাবাদ। হে লোকসকল আমাকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু আমি তোমাদের থেকে উত্তম নই। যদি আমি উত্তম কাজ করি তাহলে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। যদি আমি কোন অন্যায় কাজ করি, তাহলে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। সততা হলো আমানত এবং মিথ্যা হলো খেয়ানত। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্বল সে আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তার কষ্ট দূর করে দেই অর্থাৎ তার হক আদায় করে দেই। ان شاء الله তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শক্তিশালী সে আমার নিকট দুর্বল। যতক্ষণ না আমি তার থেকে হক আদায় করব। যে কাওম আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ ঐ কাওমকে অপদস্থ করেন। যখন কোন জাতির মধ্যে নির্লজ্জতা, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন সমস্ত জাতির উপর কোন বালা-মুসীবত নাযিল হয়ে থাকে। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি। যখন আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী করব. তখন আমার আনুগত্য করার কোন প্রয়োজন নেই। এখন নামাযের জন্য উঠ, আল্লাহ্ তোমাদের উপর রহমন করুন।"

মূসা ইবন উকবা মাগাযীতে এবং হাকিম মুসতাদরিকে হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হাকিম এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

خطب أبوبكر فقال والله ماكنت حريصا على الامارة يوما وليلة قط ولاكنت راقبا ولاسألتها الله فى سر وعلانية ولكننى اشفقت من الفتنة ومالى من الامارة من راحة لقد قلدت امرا عظيما مالى به من طاقة ولايداً لابتقوية الله كذا فى شرح الشمائل للعلامة القارى ـ(২)

"হযরত আবূ বকর (রা) খুতবা প্রদান করেন এবং এতে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো ইমারত ও খিলাফত কামনা করিনি, না দিনে এবং না রাতে। এর দিকে

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৮; শারহে শামাইল, ২ খ, পৃ. ২২১; কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১২৯

২. শারহে শামায়েল, ২য় খ. পৃ. ২২২

কখনো আমার আসক্তি হয়নি। গোপনে বা প্রকাশ্যে কখনো আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট খিলাফতের জন্য দু'আ করিনি। অবশ্য আমার এই ভয় হয়েছে যে, কোন ফিতনা সৃষ্টি না হয়। নিতান্ত অপারগ হয়ে আমি এই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। খিলাফতের মধ্যে আমার জন্য কোন শান্তি নেই। আমার গর্দানের উপর বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যা উত্তোলনের ক্ষমতা আমার নেই, তবে আল্লাহ যদি আমাকে সাহায্য করেন।"

কানযুল উম্মাল গ্রন্থে খিলাফত অধ্যায়ে হযরত সিদ্দীক আকবরের খুতবা এভাবে উল্লেখ করেছে ঃ

عن أبى بكر انه قال يأيها الناس ان كنتم ظننتم انى اخذت خلافتكم رغبتة فيها او ارادة استيثار عليكم وعلى المسلمين فلا والذى نفسى بيده ما اخذتها رغبتة فيها ولا استيثارا عليكم ولا على احد من المسلمين ولا حرمت عليها ليلة ولاعلانية ولقد امرًا عظيما لاطاقة لى به الا ان يعين الله تعالى ولوردت انها الى اى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يعدل فيها فهى اليكم رد ولابيعة لكم عندى فادفعوا لمن احببتم فانما انا رجل منكم - رواه أبونعيم فى فضائل الصحابة -

"হযরত আবূ বকর (রা) খুতবায় বলেন, হে লোকসকল! যদি তোমাদের এই ধারণা হয় যে, আমি আগ্রহী হয়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, অথবা মুসলমানদের উপর স্বীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কামনা করেছি, তাহলে ঐ আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলছি– যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি এই কামনায় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিনি। আমি দিবারাতের একটি মুহূর্তেও খিলাফতের জন্য লোভ বা আকাঙ্ক্ষা করিনি। আর না প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহর দরবারে এ জন্য দু'আ করেছি। খিলাফত একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা পরিচালনা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আল্লাহ যদি আমাকে সাহায্য করেন। আমার আশা ছিল এই যে, আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে (সাহাবীকে) খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হোক যিনি মুসলমানদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এখন আমি তোমাদেরকে এটা বলছি যে, তোমাদের খিলাফত এবং আমীরের পদ তোমাদেরকে ফেরত দেয়া হলো এবং তোমরা আমার হাতে যে বায়'আত গ্রহণ করেছ তা শেষ করা হলো। এখন যাকে ইচ্ছা এই খিলাফত ও আমীরের পদ অর্পণ কর। আমিও তোমাদের মধ্যে একজন।"[১]

১. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩১

৮. হযরত আলী (রা) বায়'আত গ্রহণ

সমস্ত লোকের বায়'আত গ্রহণের পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) সমাবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। সেখানে হযরত আলী এবং হযরত যুবায়রকে দেখতে পেলেন না। ফলে তিনি তাঁদের উভয়কে ডেকে আনার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আনসারগণের মধ্য থেকে কয়েকজন উঠে গিয়ে হযরত আলী ও হযরত যুবায়র (রা)-কে ডেকে নিয়ে আসেন। (কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩১)

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) বলেন, হে রাসূলের (সা) চাচাত ভাই ও মেয়ের জামাই! তোমরা কি মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা পোষণ করছ? হযরত যুবায়রকে একই কথা বলেন। হযরত আলী ও হযরত যুবায়র (রা) বলেন, হে রাসূলের (সা) খলীফা! আপনি আমাদেরকে অভিযুক্ত করবেন না। আমরা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক নই। অতঃপর বলেন ঃ

قال على والزبير ما غضبنا الا لا أخذنا عن المشورة وانا نرى ابابكر أحق الناس بها انه لصاحب الغار وانا لنعرف شرفه وخيره ولقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى بالناس وهو حى ـ اسناد جيد والله الحمد والمنة ـ(١)

"হযরত আলী ও হযরত যুবায়র (রা) বলেন, আমাদের কোন বিষয়ে দুঃখ নেই তবে ভাবনা হলো যে, আমাদেরকে খিলাফতের বিষয়ে পরামর্শে শরীক করা হয়নি। কিন্তু একটি বিষয় আমাদের দৃঢ় আস্থাও বিশ্বাস যে, খিলাফতের সর্বাধিক যোগ্য ও হকদার হলেন হযরত আবূ বকর (রা)। তিনি নবী করীম (সা)-এর হেরা গুহার সাথী। তাঁর ফযীলত, মর্যাদা ও কল্যাণ সম্পর্কে খুব উত্তমভাবে আমরা অবগত রয়েছি।"

নবী করীম (সা) তাঁর জীবিতকালে লোকদের নামায পড়ানোর জন্য ইমাম নির্ধারণ করেন (এটাও তাঁর উত্তম হওয়ার দলীল)। এ রিওয়ায়াতের সনদ অতি উত্তম (جيد)।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে [২]

وفى رواية انه رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا

"হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকরকে আমাদের দ্বীনের জন্য পছন্দ করেছেন, আমরা কি তাঁকে আমাদের দুনিয়ার জন্য পছন্দ করব না?"

একথা বলেই হযরত আলী (রা) ও হযরত যুবায়র (রা) হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। (হাকীম, ইযালাতুল খাফা, ২ খ, পৃ. ২৭) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হযরত আলী (রা) ও হযরত যুবায়বের নিকট ওজর পেশ করে বলেন,

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৫; ইযালাতুল খাফা , ১ খ, পৃ. ৩১২।

২. শারহে শামায়েল, ২ খ, পৃ.২২২।

আল্লাহ্‌র শপথ এ আমীর হাওয়ার জন্য আমার সামান্যতম লোভ ছিল না, কখনো অন্তরে এর জন্য আগ্রহ ছিল না এবং কখনো গোপনে ও প্রকাশ্যে এর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিনি। অথচ এ বিষয়ে আমার ফিতনার[১] আশংকা হয়েছে। অর্থাৎ এ আশংকা সৃষ্টি হয় যে, যদি খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি তোমাদের আগমন পর্যন্ত বিলম্ব করি, তাহলে কোন ফিতনা বা গোলযোগ সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।[২]

শী'আ সম্প্রদায়ে বলে, হযরত আলীকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি এবং কেউ ডাকেনি। এক্ষেত্রে শী'আ সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমরকে কে জিজ্ঞাসা করেছে এবং কে ডেকেছে? ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে তাঁরা নিজেরাই বনী সায়েদায় উপস্থিতি হয়েছেন। এছাড়া খিলাফতের কাজ তাঁদের দৃষ্টিতে এমন কোন বিরাট কিছু ছিল না যার জন্য কারো কারো আসা-যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

বস্তুত হযরত আলী ও যুবায়র (রা) প্রথমেই হযরত সিদ্দীক আকবরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন,

وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبى سعيد الخدرى ان عليا بايع أبابكر فى أول الامر -

"ইবন হিব্বান এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর এ রিওয়ায়াতকে সহীহ বলেছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আলী ও হযরত যুবায়র (রা) শুরুতেই হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[৩]"

---

১ قال الامام أحمد حدثنا على ابن عباس حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنى يزيد بن سعيد عن عبد الملك بن عمير عن رافع الطائى رفيق ابى بكر الصديق فى غزوة ذات السلاسل قالت وسألته عما قيل فى بيعتهم فقال وهو يحدثه عما تقاولت به الانصار وماكلمهم به وماكلم به عمر بن الخطاب وما ذكرهم به من امامتى اياهم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه فبايعونى لذلك وقبلتها منهم تخوفت ان تكون فتنة بعد هاردة وهذا اسناد جيد قوى ومعنى هذا ان رضى الله عنه انما قبل الامامة تخوفا ان تقع فتنة اربى من تركه قبولها رضى الله عنه ماوارضاه - كذا فى البداية والنهاية صفحــ٢٤٧ج٥

অপর এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে–

فقال راى أبوبكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض والناس حديث عهد بكفر فخفت عليهم ان يرتدوا وان يختلفوا فدخلت فيها وانا كاره ولم يزل بى أصحابى فلم يزل يعتذر حتى عذرته - رواه ابن راهويه والعدنى والبغوى وابن خزيمة كذا فى كنز العمال صحفــ ١٢٥ ج٣

২. ইযালাতুল খিফা, ২ খ, পৃ. ২৭; সীরাতে হালাবীয়া, ৩ খ, পৃ. ৩৬০।

৩. ফাতহুল বারী, ৭ খ, পৃ. ৩৭৯।

হাফেয ইবন কাসীর (র) বলেন, সহীহ ও সঠিক হলো এই যে, হযরত আলী (রা) শুরুতেই হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা) কখনো হযরত আবূ বকর (রা) থেকে পৃথক হননি। সর্বদা তাঁর পিছনে নামায আদায় করেছেন।[১]

অধিকন্তু হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ব্যতীত অন্যান্য সাহাবা থেকেও বর্ণিত। হযরত আলী (রা) শুরুতেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এটা হাকীম ব্যতীত আবূ দাঊদ তায়ালিসী, ইবন সা'দ, ইবন আবূ শায়বা, ইবন জারীর, বায়হাকী এবং ইবন আসাকির রিওয়ায়াত করেছেন।[২]

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রা) ছ'মাস পর হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। কোন কোন উলামায়ে কিরাম বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম বায়হাকী ইবন হিব্বানের রিওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। কোন কোন উলামায়ে কিরাম উভয় রিওয়ায়েতের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, হযরত আলী (রা) প্রথমত এক বায়'আত গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন ফিদাকের ঘটনার কারণে দুঃখ ও বেদনার অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং এছাড়া হযরত ফাতিমার অসুস্থতার ফলে হযরত আবূ বকরের নিকট যাতায়াত করা হ্রাস পায়, তখন জনগণের মধ্যে এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, হযরত আলী (রা) হযরত সিদ্দীক আকবরের খিলাফতের উপর সন্তুষ্ট নন। সুতরাং এ সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্য হযরত আলী (রা) সাধারণ সমাবেশে দ্বিতীয়বার বায়'আত গ্রহণ করেন। কাজেই এ দ্বিতীয় বায়'আত মূলত প্রথম বায়'আতের নবায়ণ ছিল।[৩]

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকালের পর হযরত আলী (রা) হযরত আবূ বকরকে তাঁর বাড়ি আগমনের জন্য দাওয়াত প্রেরণ করেন। সাথে সাথে এটা বলেন যে, আপনার সাথে যেন কেউ না আসে (ইঙ্গিত ছিল হযরত উমরের দিকে, কেননা তিনি ছিলেন কঠোর এবং আবূ বকর ছিলেন কোমল)। হযরত উমর (রা) শুনে বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনি একাকী গমন করবেন না। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই গমন করব। আমার এই আশংকা নেই যে, তারা আমার সাথে কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ করবেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) সেখানে গমন করেন। হযরত আলী আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর বলেন,

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৯।

২. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩১।

৩. ফাতহুল বারী, ৭ খ, পৃ. ৩৭৯

ان قد عرفنا فضلك وما اعطا الله ونم تنفس عليك خيرا ساقة الله اليك ولكنك استبددت *-علينا بالامر وكنانرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا ابى بكر فلما تكلم ابوبكر قال والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى ان اصل قرابتى واما الذى شجر بينى وبينكم من هذه الاموال فلم الى فيها عن الخير ولم اترك امرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الاصنعة فقال على لابى بكر موعدك العيشة للبيعة فلما صلى أبوبكر الظهر فى المنبر فتشهد وذكر شان على وتخلفه عن البيعة وعذره بالذى اعتذراليه ثم استغفر وتشهد على ـ فعظم-[১] حق ابوبكر وحدث انه فلم يحمله على الذى ضع نفاسة على ابى بكر ولا انكار للذى فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا فى هذا الامر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا فى انفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا اصبت ـ[২]

* قوله ولكنك استبددت بالامر قال المازرى ولعل عليا اشار الى ان ابابكر استبد عليه بامور عظام كان مثله عليه ان يحضره فيها ويشاوره اوانه امثار الى انه لم يستشر فى قعد الخلافة له اولا ـ والعذر لابى بكر ان خشى من التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الانصار كما تقدم فى حديث السقيفة فلم ننتظر ـ فتح البارى صفـ ٣٧٩ج٧

"হে আবূ বকর! আমরা আপনার ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি। যে কল্যাণ ও মর্যাদা অর্থাৎ খিলাফতের দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়েছে, তা আমরা অবগত আছি। এতে আমাদের সামান্যতম হিংসা নেই। কিন্তু আমাদের অভিযোগ হলো এই যে, খিলাফতের ব্যাপারে আমাদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত তা সম্পন্ন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে পরামর্শের মধ্যে আমাদের অধিকার রয়েছে। হযরত আলী (রা) এমনিভাবে তাঁর অভিযোগ পেশ করছিলেন, এদিকে হযরত আবূ বকরের চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি বললেন, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, নবী করীম (সা)-এর আত্মীয়দের প্রতি

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খণ্ড , পৃ. ২৪৯।

২. ফাতহুল বারী ,৭ খ. পৃ. ৩৭৮।

সম্মান প্রদর্শন বা তাঁদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আমার আত্মীয়দের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়। ফিদাকের মালামাল ও বনী নযীরের সম্পর্কে পরস্পর যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে আমি সেখানে দানের ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করিনি এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নীতি পরিত্যাগ করিনি। যেভাবে তিনি এ সমস্ত মালামাল বিতরণের ব্যবস্থা করতেন, আমিও সেভাবেই করেছি। হযরত আলী (রা) হযরত সিদ্দীক আকবরকে বললেন, আপনার সাথে আমার অঙ্গীকার হলো এই যে, দ্বিপ্রহরের পর আমি বায়'আত গ্রহণের জন্য হাযির হব। হযরত আবূ বকর (রা) যুহর নামাযের পর মিম্বরের উপর আরোহণ করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করেন। অতঃপর হযরত আলীর মর্যাদা, তাঁর বায়'আত না করা এবং বিলম্ব করার ওযর বর্ণনা করেন এবং ইসতিগ্‌ফারের পর মিম্বর থেকে অবতরণ করেন। এরপর হযরত আলী (রা) আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করেন। অতঃপর হযরত আবূ বকরের ফযীলত ও অধিকারের কথা বর্ণনা করেন এবং তাঁর হাতে বায়'আত করেন। সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করেন যে, আমার বায়'আত গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার অর্থ এই নয় যে, হযরত সিদ্দীক আকবরের খিলাফতের উপর আমার কোন ঈর্ষা ছিল এবং না তার ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে আমার কোন অনীহা ছিল, বরং শুধু এতটুকু অভিযোগ ছিল যে, খিলাফতের ব্যাপারে আমাদের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) এককভাবে কাজ করেছেন এবং আমাদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পন্ন করেছেন। এর ফলে আমরা অন্তরে কিছুটা দুঃখ পেয়েছি। মুসলমানগণ হযরত আলীর এ কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং সবাই তাকে أصبت وأحسنت (সঠিক ও সুন্দর বলেছেন) বলেন।

এ সমস্ত রিওয়ায়াতের দ্বারা দিবালোকের ন্যায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, হযরত আবূ বকরের ফযীলত ও খিলাফতের ব্যাপারে হযরত আলীর সামান্যতম সন্দেহ ছিল না এবং তাঁর খিলাফতের ব্যাপার কোন ঈর্ষা ছিল না। আগ্রহ ভরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং অভিযোগ ছিল অধিক মহব্বতের কারণে। অন্যদের প্রতি কোন অভিযোগ হয় না বরং এ রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকরের প্রতি হযরত আলীর মহব্বত পূর্ণাঙ্গভাবে বিরাজমান ছিল। বায়'আত থেকে পিছিয়ে থাকার মূলে কোন হিংসা-বিদ্বেষ কার্যকর ছিল না। হযরত আবূ বকর বনী সায়েদায় নিজের প্রতি বায়'আত নেয়ার জন্য গমন করেননি, বরং মুহাজির ও আনসারগণের পরস্পর বিবাদ মিটানোর জন্য গমন করেন। সেখানে যাওয়ার পর নিজের বায়'আতের জন্য অনুরোধ করেননি; বরং উপস্থিত সবাই সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় যদি বায়'আত গ্রহণ না করতেন তাহলে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির আশংকা ছিল। এছাড়া বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরূপ দুর্বল ও বিপদজনক মুহূর্তে এটা বলা যে, অমুককে ডাকা হয়নি,

অমুকের সাথে পরামর্শ করা হয়নি, কখনো যুক্তিযুক্ত হয়নি। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) যখন হযরত আলীকে এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বললেন, তখন সমস্ত অভিযোগ মুহূর্তে দূরীভূত হয়ে গেল এবং আন্তরিকভাবে তিনি হযরত আবূ বকরের নিকট বায়'আত করেন।

আল্লামা হালাবী (র) সীরাতে হালাবীয়াতে উল্লেখ করেন যে, মুহাজির ও আনসারগণ বনী সায়েদায় একত্রিত হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আলী আলীকে ডেকে আনার জন্য লোক প্রেরণ করেন। হযরত আলী আগমনের পর হযরত আবূ বকর (রা) বলেন ঃ

ماخلفك ياعلى من أمر الناس قال خلفنى عظيم المعتبة ورا اتيكم استقليتم برايكم فاعتذر اليه ابوبكر بخوف الفتنة لواخر ثم اشرف على الناس وقال ايها الناس هذا على ابن أبى طالب لابيعة لى فى عنقه وهو بالخيار عن امر الاوانتم بالخيار جميعا فى بيعتكم فان رأيتم لها غيرى فانا اول من يبايعه فلما سمع ذالك على زال ماكان والنفر (١)قد داخله فقال اجل لاترى لها غيرك امدر يرك فبايعه هو الذين كانوا معه الخ ـ١

"হে আলী, বায়'আত গ্রহণের ব্যাপারে তুমি কি কারণে বিলম্ব করেছ? হযরত আলী (রা) বলেন, একটি বিরাট অভিযোগ ও বেদনার কারণে বিলম্ব হয়েছে। তা হলো এই যে, আমাদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত আপনি খিলাফতের (আমীর নির্বাচন) বিষয়টি সম্পন্ন করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) ওযর পেশ করে বলেন, ঐ সময় অত্যন্ত দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। বিষয়টি স্থগিত করা হলে ফিতনা সৃষ্টির আশংকা ছিল। অতঃপর হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) লোকজনের উদ্দেশ্য বললেন, হে লোকসকল! আলী ইবন আবূ তালিব (রা) তোমাদের সামনে রয়েছেন। এখনো তিনি আমার নিকট বায়'আত করেননি। আমার নিকট বায়'আত করা বা না করা এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ অধিকার রয়েছে। হে মুসলমানগণ! যদিও তোমরা আমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছ কিন্তু তোমাদের বায়'আত ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারও তোমাদের রয়েছে। যদি আমাকে ব্যতীত অন্য কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে যাকে ইচ্ছা দ্বিতীয়বার তাঁকে আমীর নির্বাচন করার অধিকারও তোমাদের রয়েছে। অন্য আমীরের হাতে সর্বপ্রথম বায়'আতকারী ব্যক্তি হব আমি। হযরত সিদ্দীক আকবরের এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত আলীর অন্তর থেকে সমস্ত দুঃখ-বেদনা দূরীভূত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, হে আবূ বকর! আমরা খিলাফতের জন্য আপনার চেয়ে

১. সীরাতে হালাবীয়া, ৩ খ, পৃ. ৩৬

অন্য কাউকে যোগ্যতম মনে করি না। আপনি হাত প্রসারিত করুন। তখন হযরত আলী (রা) এবং সেখানে উপস্থিত সবাই হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত করেন।

হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) এর বায়'আত

সাকীফায়ে বনী সায়েদায় সমস্ত লোক হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করে কিন্তু সা'দ ইবন উবাদা (রা) বায়'আত করতে অস্বীকার করে বাড়ি গমন করেন। কিছু দিন পর্যন্ত হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) তাঁর সাথে কোন যোগাযোগ করেননি। হযরত উমর (রা) বলেন, সা'দ থেকে অবশ্যই বায়'আত নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বশীর ইবন সা'দ বলেন, তিনি একাকী লোক তাঁকে ক্ষমা করুন এবং তাঁকে তাঁর অবস্থায় থাকতে দিন। একবার অস্বীকার করেছেন, দ্বিতীয়বার উৎপীড়ন করলে তাঁর গোত্রের লোকজন তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে এবং এতে রক্তপাতে আশংকা সৃষ্টি হবে। সবাই এ মতামত পছন্দ করলো। কিন্তু সা'দ ঐ ঘটনার পর হযরত আবূ বকরের পিছনে নামাযে অংশগ্রহণ করেননি (হয়ত অন্য কোন মসজিদে আদায় করেছেন) এবং তাঁর সাথে কোন কথাও বলেননি। অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা) ইনতিকাল করেন। হযরত আবূ বকরের ইনতিকালের পর হযরত সা'দ (রা) সিরিয়া গমন করেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। ইমাম তাবারী (র) বলেন হযরত সা'দ (রা) কিছুক্ষণ পর ঐ দিনেই হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। والله اعلم

খিলাফতের দায়িত্ব থেকে হযরত সিদ্দীক আকবরের অব্যাহতি লাভের অভিপ্রায়

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) ফিতনা ও অনৈক্য সৃষ্টির আশংকায় এবং জনগণের বারবার অনুরোধ ও তাগিদের কারণে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্তরে বেদনা নিয়ে বলেন, তুমি এই আমানতের বোঝা অর্থাৎ খিলাফতের দায়িত্ব কেন আমার মাথায় চাপিয়ে দিলে দুঃখ ও বিষাদ নিয়ে নিজের ঘরে বসে থাকেন। হযরত ফারূক[১]

বর্ণনার মূল ভাষা হলো ঃ

১. عن موسى بن ابراهيم عن رجل من ال ربعية ان بلغه ان ابابكر حين استخلف قعد فى بيته حزينا فدخل عليه عمر فاقبل عليه يلومه وقال انت الذى كلفتنى هذا الامر وشكا اليه الحكم بين الناس فقال له عمر او ماعلمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الوالى اذا اجتهد فاصاب الحق فله اجران وان اجتهد فاخطأ الحق فله اجر واحد مكانه سهل ـ على ابى بكر

ابن راهويه وخثيمة فى فضائل الصحابة ـ كنز العمال صفحــ١٣٥ج٥ كتاب الخلافة (ابن راهويه وخثيمه فى فضائل الصحابة)

আযম (রা) যখন হযরত সিদ্দীক আকবরের নিকট গমন করেন, তখন তিনি হযরত উমরকে খুব ভর্ৎসনা করেন এবং অভিযোগ করে বলেন, তুমি আমাকে এ বিপদে জড়িয়েছ। জনগণের মধ্যে ফয়সালা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। হযরত ফারুক আযম (রা) সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আপনার কি রাসূলের ঐ ইরশাদ মনে নেই যে, ওলী এবং হাকীম যদি ইজতিহাদ করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে, তা হলে তাদের জন্য ঐ ফয়সালায় দু'টি পুরস্কার রয়েছে। যদি ইজতিহাদে ভুল হয়ে যায়, তাহ্লে তার জন্য একটি পুরস্কার। এটা শুনে হযরত আবূ বকরের চিন্তা কিছু হাল্কা হলো।[১]

অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, বায়'আতের পর হযরত আবূ বকর (রা) তিন দিন দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকেন। যখন মসজিদে আগমন করতন তখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতেন,[২]

أيها الناس قد اقتكم بيعتكم فبايعوا من أحبتم كل ذلك يقوم اليه على بن أبى طالب فيقول لا والله لانقيلك ولا تستقيلك من ذا الذى يؤخرك وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ[৩]

"হে লোক সকল! আমি তোমাদের বায়'আত ফিরিয়ে দিচ্ছি। যার কাছে ইচ্ছা তোমার বায়'আত কর। তিনি বার বার এটা বলতেন। প্রত্যেকবার হযরত আলী (রা) দাঁড়িয়ে জবাবে বলতেন, আল্লাহর শপথ! এটা কখনো হতে পারে না। আমরা আপনাকে ফিরিয়ে দেব না এবং আপনার কাছ থেকে ফিরিয়েও নেব না। কে আপনাকে পিছনে হটিয়ে দেবে, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন।"

কাহিনী

عن يحى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص بعمان او بالبحرين فبلغتهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتماع الناس على أبى بكر فقال له اهل الارض من هذا الذى اجتمع الناس عليه ابن صاحبكم قال لاقالوا فاخوه قال لا قالوا فاقرب الناس اليه قال لا قالوا فما شأنه قال اختاروا خيرهم فأمروه فقالوا لن يزالوا بخير مافعلوا هذا (ابن جرير)– ৪

---

১. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩৫।

২. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৪০।

৩.

৪. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩৬।

"ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ কাসিম ইবন মুহাম্মদ থেকে রিওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওফাতের সময় আমর ইবনুল আ'স (রা) আম্মান অথবা বাহ্রাইনে অবস্থান করছিলেন। যখন সেখানে মহানবী (সা)-এর ইনতিকালের সংবাদ এবং সর্বসম্মতক্রমে হযরত আবূ বকরের খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে, তখন সেখানকার বাসিন্দাগণ আম্র ইবনুল আ'স (রা) এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তির খিলাফতের উপর লোকজন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, ইনি কে? তিনি কি তোমাদের নবীর পুত্র? আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন, না। লোকজন বলল, তাহলে তিনি নবীর ভাই? তিনি বললেন, না। লোকজন বললো, তাহলে কি তিনি তোমাদের নবীর নিকট আত্মীয়? আমর ইবনুল আ'স বললেন, না। তিনি নিকটাত্মীয় নন। লোকজন বললো, তাহলে ঐ ব্যক্তির এরূপ কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার ফলে লোকজন ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করেছে ? আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সবার মধ্যে সর্বোত্তম, তাঁকেই লোকজন আমীর নির্বাচন করেছে। তখন লোকজন বললো, তারা (মদীনার লোকজন) সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ করতে থাকবে।"

খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে যারা হিংসা পোষণ করে, তাদের বিষয়ে শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (র) বলেন ঃ

اے گرفتار لعصب مانده * دائما دربغض ودرحب مانده

"হে অন্যায় পক্ষপাতিত্বকারীগণ! যারা সর্বদা গোঁড়ামীতে আবদ্ধ রয়েছ; এক পক্ষে সর্বদা হিংসা ছড়াচ্ছ, আরেকদিকে (হযরত আলী) মহব্বত প্রদর্শন করছ।"

درخلافت نیست میل اے بخبر * میل کے آیدابوبکر عمر

"হে গাফিল! স্মরণ রেখো, খিলাফত বিষয়ে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি; হযরত আবু বকর ও ওমরের মত মহা মনীষীগণ কিভাবে পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন?"

میل گر بودے دران دومقتدا * هردو کردندے یسرد ابیشوا

"এ অনুসরণীয় দু'মনীষীর মধ্যে যদি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব থাকতো তাহলে তাঁরাই কোন ছেলে চোকরাকে খলীফা নির্বাচন করতেন।"

کے روا داری که أصحاب رسول * مرد ناحق راکنندا زجان قبول

"রাসূলের সাহাবীদের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ কিভাবে বৈধ হতে পারে যে, তাঁরা কোন অনুপযুক্তজনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করবেন?"

یانشانندش بجائے مصطفے * بر صحابه نیست این باطل روا -

"কিংবা তাঁরা নবী মোস্তফা (সা) এর স্থলাভিষিক্ত কোন অযোগ্যকে স্থির করতে পারেন? সাহাবাদের বিষয়ে তেমন বাতিল মনোভাবই অবৈধ।"

اختیا رجمله شان گرنیست راست * اختیار جمع قرآن بس خطا است

"এঁদের সকলের মনোনয়ন (আবু বকরকে) যদি বে-ঠিক হয়ে যায়, তাহলে তো (পরোক্ষভাবে) পবিত্র কুরআন সংকলনও বে-ঠিক হয়ে যায়!"

بلکه هرچه أصحاب پیغمبر کنند * حق کنندو لائق حق درکنند

"বরং নবী সাহাবাগণ যা-ই করেন, সঠিক ও যথার্থ করে থাকেন এবং মহান আল্লাহর কাঙ্খিত কিছুই করে থাকেন।"

گرخلافت ازهوامی راندمی * خویش رابرسلطنت بنشاندمی

"তাঁরা যদি প্রবৃত্তি অনুযায়ী খিলাফত বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, তাহলে নিজেরা নিজেদের পেশ করতেন।" (অথচ কোন একজন সাহাবীই নিজেকে পেশ করেননি, দাবী করেননি)

(হযরত ওয়েস করনী (র) সম্পর্কে নবীজী (সা) ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন, তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁকে পেলে তাঁর দ্বারা দু'আ করিয়ে নিতে সাহাবাদের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। সেই ওয়েস করনী (র) নিজ মায়ের ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রা) এর খিদমতে এলে যে কথোপকথন হয় সেই দিকে ইঙ্গিত করছেন হযরত ফরীদ উদ্দিন আত্তার (র)। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন অনেকটা সাহাবী হযরত আবু যর (রা) এর মতে দুনিয়া বিমুখ।)

چوں عمر پش اوس آمزمجوش * گفت افگندم خطافت رازدوش

"হযরত ওমর (রা) হযরত ওয়েস করনী (র) -এর সামনে আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, আমি অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেব!"

این خلافت گرخربد ارے بود * می فردشم گربد بنارے بود

"রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্ব যদি ক্রয় বিক্রয়যোগ্য কোন ব্যাপার হত, তাহলে তা (সর্বনিম্ন) ১ টাকাতেই তা আমি বিক্রয় করে ফেলতাম (অর্থাৎ এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতাম)"

হযরত ওয়েস করনী (রহ) ওমরের যবানী উক্ত বাক্য শুনে বলরেন ঃ

چون اوبس این حرف بشنود ازعمر * گفت توبگذازوفارغ درگزر

"আপনি যেমন আছেন তেমনি থাকেন, দায়িত্ব চালিয়ে এবং নিশ্চিন্তে দায়িত্ব পালন করে যান।"

توبیفگن هرکه می خواهدذراه * باربرگهردردو تایش گاه

"আপনি তা এমন কাউকে অর্পণ করবেন যারা তা কামনা করে (লাভ করে), তাহলে (ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আপনি জবাবদেহিতার মুখোমুখী হবেন।"

খলীফা ওমর (রা) যখন খিলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগ করার কথা প্রকাশ করলেন ততক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গী সাথীদের অনেকেই দাঁড়িয়ে গেলেন (বিস্ময়ে)!

چون خلافت خواست افکند امیر * آن زمان برخاست ازیاران نفیر

"এবং সকলেই নিবেদন করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তেমনটি করতে যাবেন না: আল্লাহর দিকে চেয়ে জনগণকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবেন না।"

جمله گفتندش مکن اے بیشوا * خلق راسرکشته ازبهرخدا

"হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) উক্ত দ্বায়িত্ব আপনার প্রতি সোপর্দ করে গেছেন তিনি তা না বুঝে-শুনে করেননি বরং যথাযোগ্যতা বাছাই করেই তা করে গেছেন।"

عهده درگردنت صدیق کرد * آن نه برعمیاکه برتحقیق کرد

"আপনি যদি তাঁর নির্দেশ ও অর্পিত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান, তাহলে এ মুহূর্তেই যেন আপনি তাঁকে কষ্ট দিলেন।"

گر قومی بیچی سرازفرمان او * ایں زمان ازتوبرنجد جان او

"হযরত ওমর (রা) (ওয়েস করনী ও সভাসদদের) এঁদের এ সব শক্ত দলীল প্রমাণ যখন শুনলেন, ইসলামী খিলাফতের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি আরও জরুরী রূপে তাঁর কাছে প্রতিভাত হল।"

چون شنوداین حجت محکم عمر * کارازین حجت بردشد سخت تر

"সুতরাং যাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের বেলায় এমন অনীহা তাদের বিষয়ে মন্তব্য করতে সাবধান হওয়া উচিত।"

ازربان توصحابه خسته اند * درزبان بت پرستان رسته اند

(তাই) হে শ্রোতা! সাহাবাদের মৌখিকভাবে কোন খারাপ মন্তব্য করে আহত করা মানেই, মূর্তিপুজক কাফির অবিশ্বাসীদের দায়িত্ব পালন করে তাদের মুখ পৌঁছানো।"

درفضولی مں کنی دپوان سیاه * گرئے بردی گزبان دای نگاه

(আর তা হচ্ছে,) অন্যায় অনর্থ কর্মে জড়িয়ে পড়ে আপনার নিজের আমলনামাকে বরবাদ করা। (অতএব এ সব না করে যদি) যবানের হিফাযত করেন বৈধ সীমায় ভেতর থেকে মেপে মেপে কথা বলেন তাহলে আপনি বিজয়মাল্য ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হবেন।" (মানতাকাত্ তায়র, পৃ. ২৮-৩১)

৯. ওসীয়্যতের মাসয়ালা

সমস্ত মুহাজির ও আনসারের সম্মতিক্রমে হযরত সিদ্দীক আকবরকে খলীফা নির্বাচন করা এ বিষয়ের ওপর প্রমাণ বহন করে যে, নবী (সা) কোন ব্যক্তির খিলাফতের জন্য ওসীয়্যত করেননি যে, আমার পর অমুক ব্যক্তি খলীফা হবে। সুস্পষ্টভাবে কোন ব্যক্তির খিলাফতের জন্য নাম উল্লেখ করেননি। না হযরত আবূ বকরের, না হযরত আলীর, অবশ্য হযরত সিদ্দীক আকবরের খিলাফতের ব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। সারা জীবন হযরত আবূ বকরের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছেন যা বাদশাহ তার উত্তরাধিকারীর সাথে করে থাকেন।

শী'আ সম্প্রদায় বলেন, হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওসীয়্যতপ্রাপ্ত ও খলীফা ছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশার নিকট জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কি হযরত আলীর জন্য ওসীয়্যত করে গিয়েছেন? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এটা কে বলেছে? অন্তিমকালে আমি হুযূরকে আমার বুকের সাথে লাগিয়ে বসে ছিলাম। এ অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেছেন। আমি অবগত নই যে, কখন নবী (সা) হযরত আলীর খিলাফত সম্পর্কে ওসীয়্যত করেছেন।

১. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, যখন হযরত উমর ফারূকের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করা হয় এবং লোকজন তাঁর জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ

الا تستخلف يا أمير المؤمنين فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير منى يعنى أبابكر وان اترك فقد ترك من هو خير منى يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কেন কাউকে আপনার উত্তরাধিকার নির্বাচন করে দিচ্ছেন না? হযরত উমর (রা) বলেন, যদি আমি কাউকে খলীফা নির্বাচন করি, তা হলে এতে কোন দোষ নেই। কেননা আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা) ইনতিকালের সময় স্বীয় খলীফা নির্ধারণ করেছিলেন। যদি আমি কাউকে খলীফা নির্ধারণ না করি, তাহলে এতেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা সর্বোত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) কাউকে খলীফা নির্ধারণ করেন নি।

২. হযরত আলীর নিকট অন্তিম মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ

الا تستخلف علينا فقال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف ولكن ان يرد الله بالناس خير فسيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم - أخرجه البيهقى واسناده جيد -

"হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কেন আমাদের জন্য কাউকে খলীফা মনোনীত করে দিচ্ছেন না? হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) কাউকে খলীফা মনোনীত করেন নি। সুতরাং আমি কেন তা করব? তবে লোকজনের কল্যাণ প্রদানের অভিপ্রায় যদি আল্লাহ তা'আলার থাকে, তাহলে আমার পর লোকজনকে কোন উত্তম ব্যক্তিকে মনোনীত করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করে দেবেন। যেরূপ আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর ইনতিকালের পর লোকজনকে একজন উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবূ বকরের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করে দেন। (হাদীসটি ইমাম বায়হাকী রিওয়ায়াত করেছেন এবং এর সনদ খুবই উত্তম)।

৩. সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, হযরত আব্বাস (রা) নবী (সা)-এর মৃত্যুরোগের (مرض الوفات) সময় বলেন, আল্লাহর শপথ, তোমরা তিন দিন পর লাঠির গোলাম হয়ে যাবে। অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের সময় নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা নবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও যে, তাঁরপর কে খলীফা হবে। হযরত আলী (রা) বলেন, এ বিষয়ে আমি রাসূল (সা)-এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করব না।

৪. সুফিয়ান সাত্তরী (র) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা) একবার খুতবায় বলেন ঃ

يأيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد الينا فى هذه الامارة شيئا حتى رأينا من الرأى ان تستخلف أبابكر فاقام واستقام حتى مضى لسبيله ثم ان أبابكر رأى من الرأى ان يستخلف عمر فاقام واستقام حتى مضى لسبيله - هذا كله من البداية والنهاية -

"হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহ (সা) ইমারত ও খিলাফতের ব্যাপারে কোন ওসীয়্যত করেননি। নবী (সা)-এর ইনতিকালের পর সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হন এবং তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে খিলাফত পরিচালনা করে ইনতিকাল করেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) ওসীয়্যত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হযরত উমরকে খলীফা মনোনীত করেন। হযরত উমর (রা) অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে খিলাফতের, কাজ বাস্তবায়ন করার পর ইনতিকাল করেন।"

৫. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা) তাঁর খুতবায় বলেন, যে ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং এ সহীফা যাতে দিয়ত (রক্তপাত) ও অন্যান্য বিষয়ের আহকাম রয়েছে, ব্যতীত অন্য কোন কিতাব ও কোন ওসীয়তনামা রয়েছে, তা হলে সে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে।

শী'আ সম্প্রদায় বলে থাকে, নবী (সা) আলীর জন্য খিলাফতের ওসীয়্যত করে গিয়েছেন। আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে, যদি মহানবী (সা) হযরত আলীর

খিলাফতের ব্যাপারে নাম উল্লেখ করতেন, তাহলে সাহাবায়ে কিরামের জন্য এটা বাস্তবায়ন না করা অসম্ভব ছিল। যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের জন্য জানমাল, আত্মীয়-স্বজন সমপ্ত উৎসর্গ করেন। তাঁদের সম্পর্কে এ খারাপ ধারণা পোষণ করা যে, তারা নবী (সা)-এর ওসীয়্যত বাতিল করে দিয়েছেন, এটা কুরআনুল করীমকে সুস্পষ্ট মিথ্যা প্রতিপন্ন করারই নামান্তর। এটা সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি। যদি হযরত আলী অথবা হযরত আব্বাসের প্রমুখ কারো খিলাফতের ব্যাপারে ওসীয়্যত করা হত, তাহলে এটা অবশ্যই মুতাওয়াতির-ব্যাপকভাবে প্রচারিত হত। এটা গোপন করা স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব ছিল। অবশ্যই তা মজলিসে পেশ করা হতো। যেমন হযরত আবূ বকর (রা) যখন আনসারগণের সামনে হাদীস পেশ করে বলেন ঃ الائمة من قريش তখন আনসারগণ সাথে সাথে এ হাদীসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁদের আমীর হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করেন।

যদি খিলাফতের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের কোন নির্দেশ থাকত, তাহলে কেউ না কেউ ঐ মজলিসে বলত যে, তোমরা কেন এ বিষয়ে বিতর্ক করছ। রাসূল (সা) অমুক ব্যক্তিকে তো ইমামত ও খিলাফতের জন্য নির্দিষ্টভাবে নাম উল্লেখ করেছেন। নবী করীম (সা) যদি হযরত আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কাউকে অর্থাৎ হযরত আলী অথবা হযরত আব্বাসকে মনোনীত করে যেতেন, তাহলে এটা প্রকাশ না করা সাহাবায়ে কিরামের জন্য অসম্ভব ছিল। সাকীফায়ে বনী সায়েদায় খলীফা মনোনয়নের জন্য সমাবেশ হয়েছিল। যদি খিলাফতের ব্যাপারে নবী (সা)-এর কোন বাণী থাকত তাহলে আনসারগণ منا أمير ومنكم أمير উল্লেখ করতেন না এবং সাকীফায়ে বনী সায়েদায় কারো মুখ থেকে এ কথা বের হয়নি যে, রাসূল (সা) গাদীরে খুমের খুতবায় من كنت مولاه على مولاه দ্বারা হযরত আলীর খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এখন এ আলোচনার প্রয়োজন নেই। যদি হযরত আলীর নিকট খিলাফতের ব্যাপারে দলীল থাকত, তাহলে সাহাবায়ে কিরামের নিকট তা পেশ করতেন। যদি তাঁরা মেনে না নিতেন, তাহলে তিনি হযরত আবূ বকর ও উমরের বিরুদ্ধে অবশ্যই জিহাদ ঘোষণা করতেন, যেমন হযরত মু'আবিয়ার সাথে জিহাদ করেছেন। বিশেষ করে যখন আবূ সুফিয়ান হযরত আলীকে বললেন, তুমি বায়'আতের জন্য হাত প্রসারিত কর, আমি তোমার হাতে বায়'আত করব। যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহলে আবূ বকরের মুকাবিলায় সমস্ত ময়দান সাওয়ার ও পদাতিক দ্বারা ভর্তি করে দেব।

হযরত আলী (রা) কঠোরভাবে জবাব প্রদান করেন যে, যাও, আমাকে তোমার নসীহত করার প্রয়োজন নেই। তোমরা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করছ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলীর নিকট খিলাফতের ব্যাপারে কোন বাণী বা ওসীয়্যত বিদ্যমান ছিল না। তিনি আন্তরিকভাবে হযরত সিদ্দীক

আকবরের খিলাফতকে হক ও রাশেদাহ্ মনে করতেন। তাঁর খিলাফতের বিরুদ্ধে কিছু বলা ফিতনা-ফাসাদ মনে করতেন।

হযরত আলীর নিকট যদি সিদ্দীক আকবরের খিলাফত হক ও ন্যায় না হত, তাহলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই মুকাবিলা ও জিহাদ করতেন। যেমন হযরত মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে করেছেন। কেননা আসাদুল্লাহ আল-গালিব হওয়ার পর আদাউল্লাহ বা আল্লাহর শত্রুদের সাথে মুকাবিলা না করা হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের ভীরুতা ও ঈমানী দুর্বলতা। সুতরাং হযরত আলীর এ চুপ থাকা যদি নিরুপায় ও বাধ্য হওয়ার কারণে ঘটে থাকে তাহলে এরূপ ব্যক্তি আমীর ও খলীফা হওয়ার উপযুক্ত নন। যদি এটা বলা হয় যে, হযরত আলী (রা) শক্তি থাকা সত্ত্বেও খিলাফত ও ওসীয়্যতের কথা তাকিয়্যার কারণে প্রকাশ করেননি, তাহলে এটা কাপুরুষতা ও ভীরুতা এবং মুনাফেকী। সুতরাং ভীরু ও মুনাফিক খলীফা হতে পারে না।

শী'আ সম্প্রদায় বলেন, পূর্ববর্তী তিন খলীফার প্রতি হযরত আলীর অনুগত থাকা, মসজিদে তাঁদের পিছনে নামায আদায় করা, তাঁদের মত কুরআন তিলাওয়াত করা, কোন বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা না করা এগুলো সবই ছিল তাকিয়্যার কারণে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে এই যে, হযরত আলী (রা) যখন স্বীয় খিলাফতকালে খুতবা প্রদানকালে তিনজন খলীফার ফযীলত বর্ণনা করতেন, সুতরাং এটাও যদি তাকিয়্যার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করবো যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) কিরূপ আসাদুল্লাহ (আল্লাহর বাঘ) ছিলেন, যিনি তিনজন খলীফার ইনতিকালের পরও তাঁদেরকে ভয় পেতেন এবং ভয় পেয়ে তাঁদের প্রশংসা করতেন! আফসোস আসাদুল্লাহ বা শেরে খোদা হয়ে মৃত্যুকে ভয় করেন, খলীফা ও বাদশাহ্ হওয়ার পরও তাঁদের মত ও নীতি অনুযায়ী আহকাম জারী করেন। মাশাআল্লাহ, হযরত আলী (রা) এরূপ ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন না। যেমনটি শী'আ সম্প্রদায় বলে থাকে।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো এই যে, হযরত আলী (রা) বাস্তবেই ছিলেন শেরে খোদা এবং তাঁর বাহির ও ভিতর একই ছিল। শী'আ সম্প্রদায় বলেন, তাঁর বাহির ও ভিতর ছিল আলাদা। বান্দা শুধু প্রকাশ্য অবয়ব প্রত্যক্ষ করে থাকে। অন্তরের খবর আল্লাহ ভাল জানেন। হযরত আলী (রা) যখন বাহ্যিকভাবে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে তিনজন খলীফার প্রশংসা করেন, তখন মুসলমানদের ফরয হলো এই যে, হযরত আলী (রা)-কে সত্যবাদী মনে করবে। শী'আদের মতে হযরত আলী (রা) নিষ্পাপ ছিলেন। নিষ্পাপ ব্যক্তির আনুগত্য করা ফরয এবং তাঁর নাফরমানী করা ফাসেকী। মূলত এ বিষয়ে পক্ষের স্বীকৃতি রয়েছে যে, হযরত আলী (রা) সিদ্দীক আকবরের খিলাফতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং এমনিভাবে হযরত উমর ফারূক ও হযরত উসমান (রা)-এর ফিলাফতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

তিনজন খলীফারই বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন। যত যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোতে পরামর্শসহ সর্বাবস্থায় তাঁদের সাথে শামিল ছিলেন এবং গনীমতের মাল থেকে নিজের অংশগ্রহণ করেছেন। নামাযে তাঁদের পিছনে ইকতিদা করেছেন। দীনের মাসয়ালার ব্যাপারে তাঁদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন। এ সমস্ত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল যে, হযরত আলী (রা) তিন খলীফার খিলাফতকে আন্তরিকভাবে হক মনে করতেন। হায়দারে কারার সাহিবে যুলফিকার -এর এই পঁচিশ বছরের আমলকে তাকিয়্যার উপর অনুমান করা শুধু শী'আ সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্ভব। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো এই যে, হযরত আলী (রা)-এর দাসের বা গোলামের মর্যাদা ও এর চেয়ে অনেক উচ্চ যে, আমরা অন্তরে যাকে কাফির মুনাফিক ও খেয়ানতকারী মনে করি, বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে বন্ধুত্বসূলভ ব্যবহার করব এবং তাদের পিছনে নামায আদায় করব, তাদের প্রদত্ত কুরআন তিলাওয়াত করব। لاحول ولاقوة الابالله

স্বয়ং নবী করীম (সা) কেন আমীর বা খলীফা মনোনীত করেন নি

জবাব ঃ এর জবাব হলো এই যে, নবী (সা) -এর উপর আমীর বা খলীফা নির্বাচন বা মনোনীত করা ওয়াজিব ছিল না। এ মাসায়ালাটি তিনি মুসলমানদের ইজতিহাদ এবং পরামর্শের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে তারা তাদের দূরদৃষ্টির দ্বারা কাউকে নিজেদের আমীর নির্বাচন করবে এবং ইঙ্গিতে স্বীয় পবিত্র উদ্দেশ্য এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, হযরত আবূ বকরকে নিজের জায়গায় নামাযের ইমাম নির্ধারণ করেন। এটা খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। যখন তিনি এটা উপলব্ধি করলেন যে, আমার এ ইঙ্গিত সাহাবাদের জন্য যথেষ্ট হবে, ফলে তিনি হযরত আবূ বকরের ওসীয়্যত লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এই যে, মুসলমানগণ আবূ বকর ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হবে না।

আল্লামা সুয়ূতী 'তারীখুল খুলাফা'তে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সা) কাউকে খলীফা নির্ধারণ না করার কারণ মুসনাদে বাযযারের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن حذيفة قال قالوا يارسول الله الاستخلف علينا قال ان استخلف عليكم فتعصوا خليفتى نزل عليكم العذاب - أخرجه الحاكم فى المستدرك -

"হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন লোকজন আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের জন্য কেন একজন আমীর ও খলীফা নির্বাচন করে যাচ্ছেন না? তিনি বললেন, যদি আমি কাউকে খলীফা নির্বাচন করি আর তোমরা যদি তার নাফরমানী কর, তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। (হাকীম, মুসতাদরাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

১০. খিলাফতের বিষয় আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং শী'আ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শী'আ সম্প্রদায়ের মধ্যে খিলাফতের মাসায়ালাটি হলো সবচেয়ে বিরাট মতপার্থক্যের বিষয়। সুতরাং আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করব যে, মতপার্থক্যের উদ্দেশ্য ও বিষয়টি কি ?

শী'আদের মতে খিলাফতের দায়িত্ব নিকটাত্মীয় ও বিবাহের সূত্র সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। তাই শী'আদের মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর খিলাফত হযরত আলীর পাওয়ার কথা ছিল। কেননা তিনি নবী (সা)-এর নিকটাত্মীয় ও জামাতা ছিলেন।

আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে খিলাফত লাভের জন্য শর্ত হলো নৈকট্য লাভ ও ঘনিষ্ঠতা অর্জন করা, আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর তা নির্ভর করে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অধিক ঘনিষ্ঠ হবেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খলীফা এবং নবীর স্থলাভিষিক্ত হবেন। খিলাফতের সাথে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। যদি আত্মীয় বা গোত্রের কারণে খিলাফত হাসিল হত, তাহলে মহানবী (সা)-এর পর তাঁর চাচা হযরত আব্বাস অথবা তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) খলীফা হতেন। বরং এ ক্ষেত্রে হযরত ফাতিমা (রা) খলীফা হতেন এবং কোন পুরুষ তাঁর পক্ষে খিলাফতের কাজ বাস্তবায়ন করতেন। হযরত ফাতিমার পর ইমাম হাসান দ্বিতীয় খলীফা, তাঁর পর ইমাম হুসায়ন তৃতীয় খলীফা এবং ইমাম হুসায়নের পর হযরত আলী (রা) জীবিত থাকলে তিনি চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হতেন।

মোটকথা যদি খিলাফতের যোগ্যতা আত্মীয়তা উপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে শী'আদের নীতি অনুযায়ী হযরত আলী চতুর্থ খলীফা হতেন। সুতরাং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যদি হযরত আলীকে চতুর্থ খলীফা নির্বাচন করে থাকেন তাহলে এতে অপরাধ হবে কেন। আনসার ও মুহাজিরদের বায়'আতের মধ্যেমেই হযরত আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। শী'আগণ তাঁকে কিছুই প্রদান করেন নি। যদি জামাতা হওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়, তাহলে এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত উসমান গণী (রা) ক্রমানুসারে খিলাফতের অধিক হকদার ছিলেন। কেননা তিনি পর্যায়ক্রমে নবী (সা)-এর দু'কন্যাকে বিয়ে করেন। এজন্য তিনি মুসলিম মিল্লাতের নিকট যিন্‌নূরাইনের (ذى النورين।) বিশেষ উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। বস্তুত হুযুরের যে দু'জন কন্যার পর্যায়ক্রমে হযরত উসমানের সাথে পরিণয় হয়েছিল–তাঁরা উভয়ই রাসূল (সা)-এর জীবিতকালেই ইনতিকাল করেন। কিন্তু এটা খিলাফতের অধিকারকে বাতিল করেনি। কেননা পরিণয়ের কারণেই তাঁর এ মর্যাদা হাসিল হয়েছিল। স্ত্রীর জীবিত থাকা বা না থাকার মধ্যে এতে কোন পরিবর্তন হয়নি। যেমন হযরত ফাতিমার ইনতিকালের পরও হযরত আলীর জামাতার মর্যাদা বহাল ছিল। হযরত আলীর এ মর্যাদা হযরত ফাতিমার ইনতিকালের কারণে রহিত হয়ে যায়নি।

এবার অপর একটি বিষয় হলো, শী'আগণ বলেন, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম এ দু'কন্যা মহা নবী (সা) এর ঔরষজাত ছিলেন না, বরং হযরত খাদীজার প্রথম স্বামীর ঔরষজাত ছিলেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট মিথ্যাচার ও ধোকা। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত তাদের কালিনী শরীফে পরিষ্কার বর্ণিত আছে ঃ

وتزوج خديجة وهو البس بضع وعشرين سنة فولد له منها قبل مبعثه القاسم ورقية وزينب وام كلثوم وولد له بعد المبعث الطيب والطاهر والفاطمة (اصول كافى كلينى صفحہ٢٨٧ مولود النبى ﷺ)

"নবী (সা) বিশ বছরের কিছু অধিক বয়সে হযরত খাদীজার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। নবুওয়াত লাভের পূর্বে হযরত খাদীজা গর্ভ থেকে কাসিম, রুকাইয়া, যয়নাব এবং উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করে এবং নবুওয়াত লাভের পর তাইয়্যেব, তাহির ও ফাতিমা (রা) জন্ম গ্রহণ করে। (উসূলে কাফী, কালিনী, পৃ. ২৭৮, নবী করীম (সা)-এর জন্ম অধ্যায়)

মূলত হযরত ফাতিমার মত রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুমও নবী (সা)-এর কন্যা ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত ফাতিমা নবুওয়াতের পর এবং রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম নবুওয়াতের পূর্বে জন্ম লাভ করেন। কিন্তু পূর্ব ও পরে জন্মগ্রহণ খিলাফতের মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। হযরত আলীর জামাতা হিসেবে যে মর্যাদা ছিল তাঁর (হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমার) ইনতিকালের পরও বিদ্যমান ছিল। তাঁর ইনতিকালের কারণে জামাতার মর্যাদা হ্রাস পায়নি। হযরত উসমান -এর ব্যাপারে একই নীতি প্রযোজ্য।

খিলাফতের ব্যাপারে শী'আ সম্প্রদায়ের বিস্ময়কর চিন্তাধারা উম্মতের জন্য মারাত্মক অনিষ্টকর। তারা বলেন, নবী (সা)-এর ইনতিকালের পর হযরত আলী (রা) দু'দিন পর্যন্ত স্বীয় পরিবারবর্গকে সাথে নিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য মুহাজির-আনসারগণের বাড়িতে গমন করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তাঁর খলীফা মনোনীত করেছেন। এ সমস্ত লোক আমার খিলাফত ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা আমার হক ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর। কিন্তু চার ব্যক্তি ব্যতীত কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। সুতরাং হযরত আলী (রা) অসহায় অবস্থায় বললেন, তোমাদের মত চার ব্যক্তি দ্বারা আমার কি হবে? (মূল ঘটনা 'হাক্কুল ইয়াকীন ও তাযকিরাতুল আইম্মা' গ্রন্থে দেখা যেতে পারে)।

সাইয়্যেদেনা হযরত আলী (রা) সম্পর্কে আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো এই যে, এ সমস্ত ঘটনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বিবেক বিরোধী। হযরত আলী (রা)-এর মত একজন মর্যাদাবান সাহাবীর উঁচুমানের আল্লাহ-প্রীতি ও নিঃস্বার্থপরতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

নবী করীম (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ

নবী (সা) সারা জীবন দরবেশ ও ফকীরের মত যাপন করেছেন। দু'দু'মাস পর্যন্ত ঘরে তাওয়া চড়িয়ে রুটি তৈরি করা হত না, পাকা ও কাঁচা খেজুর আহার করে দিন কাটিয়েছেন। কম্বল পরিধান করতেন এবং চটের উপর বসতেন। সুতরাং নবী (সা)-এর নিকট এমন কি থাকতে পারে যা ইনতিকালের পর তিনি স্বীয় ওয়ারিসগণের জন্য রেখে যেতে পারেন? উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া -এর ভাই হযরত আমর ইবন হারিস (রা) বলেন ঃ

ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهماً ولادينارا ولاَعبداً ولا امة ولاشيئا الابغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة - صحيح بخارى كتاب الوصايا -

"নবী (সা) ইনতিকালের সময় কোন দিরহাম, দীনার এবং কোন গোলাম বা বাঁদী রেখে যাননি। কেবল একটি সাদা খচ্চর, হাতিয়ার এবং কিছু জমি যা তিনি জীবিতকালে মুসলমানদের মধ্যে সাদাকা বা ওয়াকফ করে দিয়েছেন।" (বুখারী শরীফ ওসীয়্যত অধ্যায়)

আমর ইবন হারিসের হাদীসে যে জমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর দ্বারা তিনটি সম্পত্তির কথা বুঝানো হয়েছে ঃ

১. মদীনার সম্পত্তি, মদীনার সম্পত্তির দ্বারা বনূ নযীর থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি বুঝানো হয়েছে। যা আল্লাহ তা'আলার নবী (সা)-কে ফায় (فئ) হিসেবে দান করেছেন। কুরআনুল করীমে এর উল্লেখ রয়েছে। এ জমি সর্বদা রাসূল (সা)-এর অধিকারে ছিল। এ জমির উৎপাদন থেকে তিনি স্বীয় পরিবারের বছরের ব্যয় নির্বাহ করতেন। যা কিছু অবশিষ্ট থাকত তা দ্বারা হাতিয়ার, ঘোড়া এবং জিহাদের আসবাবপত্র ক্রয় করতেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, পৃ. ৭২৫, সূরা হাশর)

২. খায়বারের জমি, যা তিনি অংশ হিসেবে পেয়েছেন,

৩. ফিদাকের অর্ধেক জমি যা তিনি খায়বার বিজয়ের পর খায়বারবাসী থেকে সন্ধিসূত্রে লাভ করেছেন। খায়বার ও ফিদাকের উৎপন্ন ফসল থেকে দুর্যোগ ও আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যয় করতেন।

এ সমস্ত জমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনে করা হত এবং অমৃত্যু নবী (সা)-এর অধিকারে ছিল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল (সা)-কে এ জমি ব্যবহারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রাসূল (সা) এ জমির উৎপন্ন ফসল ও আয় থেকে পরিবারবর্গের শুধু প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন এবং অবশিষ্ট উৎপন্ন ফসল ও আয় দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রয়োজনে ব্যয় করতেন। নিজেদের সুখশান্তির জন্য

(মা'আযাল্লাহ) একটি পয়সাও ব্যয় করতেন না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মালিক হিসেবে ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিলেন মুতাওয়াল্লীর মত। এ সমস্ত জমি ছিল আল্লাহর অর্থাৎ ওয়াক্ফ এবং নবী (সা) আল্লাহর তা'আলার নির্দেশে এর মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই ব্যয় করতেন। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ নির্দেশ ছিল যে, এ সমস্ত জমির আয় থেকে স্বীয় পরিবারবর্গের বছরের ব্যয় প্রদান করবে, তাই রাসূল (সা) বনী নযীরের সম্পত্তির আয় থেকে উম্মুল মু'মিনীনদের বছরের ব্যয় প্রদান করতেন।

নবী (সা) এর ইনতিকালের পর আহলি বায়তের এ ধারণা হলো যে, এ সমস্ত জমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মালিকানাধীন এবং নিজস্ব সম্পদ ছিল। ফলে ওয়ারিস হিসেবে আহলি বায়তের মধ্যে বণ্টন করা উচিত। এ কারণে হযরত ফাতিমা (রা) খায়বার, ফিদাক এবং বনী নযীরের সম্পত্তি থেকে হযরত আবূ বকরের নিকট স্বীয় অংশ প্রদানের জন্য দাবী করেন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) জবাবে বলেন, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ "আমরা নবীগণ না কারো সম্পদের ওয়ারিস হয়ে থাকি এবং কেউ না আমাদের সম্পদের ওয়ারিস হয়ে থাকে। আমরা যা কিছু সম্পদ ত্যাগ করে যাব তা আল্লাহর রাহে সাদাকা ও খায়রাত হয়ে যাবে।" অবশ্য যে ব্যয় এতে নির্ধারিত রয়েছে, তা নিয়মানুযায়ী অব্যাহত থাকবে এবং যে সমস্ত কাজে নবী করীম (সা) ব্যয় করতেন হযরত আবূ বকর (রা) একইভাবে ঐ কাজে ব্যয় করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিবারবর্গ ঐ সম্পদ থেকে ততটুকু ভোগ করবে, যতটুকু নবী করীম (সা)-এর যুগে ভোগ করতেন। আল্লাহর শপথ, নবী (সা)-এর আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইহ্সান করা আমার নিকট স্বীয় আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইহসান করার চেয়ে অধিক প্রিয়।

হযরত সিদ্দীক আকবরের এ জবাবে হযরত ফাতিমা (রা) পছন্দ হয়নি এবং তিনি ব্যথিত হন। কেন ব্যথিত হলেন তা জানা যায় না। অথচ হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ফাতিমার সম্মানিত পিতা নবী করীম (সা)-এর সুস্পষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ওযর স্পষ্ট। কিন্তু হযরত ফাতিমার (রা) কষ্ট ও বিষাদের কারণে অত্যন্ত ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত ছিলেন।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) নবী (সা)-এর বাণীর উপর আমল করে তাঁর সম্পত্তি থেকে ওয়ারিস হিসেবে কাউকে কিছু প্রদান করেন নি। এমনকি স্বীয় কন্যা হযরত আয়েশা, হযরত উমরের কন্যা হযরত হাফসা এবং অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীনকে ওয়ারিস হিসেবে কিছুই প্রদান করেন নি। অবশ্য হযরত ফাতিমাকে সম্মত ও খুশি করানোর জন্য তাঁদের বাড়ি গমন করেন এবং তাঁদের নিকট ওযর পেশ করেন। ফলে হযরত ফাতিমা (রা) হযরত সিদ্দীক আকবরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।

হাফিস ইবন কাসীর[১] বলেন, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) প্রথমত মীরাস (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) বণ্টন করাকে অস্বীকার করেন। অতঃপর হযরত ফাতিমা (রা) সম্ভবত হযরত সিদ্দীক আকবরের নিকট এ আবেদন করে থাকবেন যে, খায়বার ও ফিদাকের জমির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হযরত আলীর উপর সোর্পদ করা হোক এবং হযরত আলী এ জমির পর্যবেক্ষণ ও হিফাযতের দায়িত্ব পালন করবেন। হযরত আবূ বকর (রা) এটাও অস্বীকার করে বলেন, নবী করীম (সা)-এর মত আমি নিজেই এর ব্যস্থাপনার দায়িত্ব পালন করব। এ কথায় হযরত ফাতিমা (রা) মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির কারণে ব্যথিত হন।[২]

হযরত সিদ্দীক আকবরের পর হযরত উমর (রা) দু'বছর পর্যন্ত এ সমস্ত জমির ব্যবস্থাপনা নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। দু'বছর পর যখন হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রা) ঐ বিষয়ে আলোচনা করেন তখন হযরত উমর (রা) নবী (সা) এবং হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর ব্যবস্থাপনার উদ্ধৃতি দিয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টনের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে ওযর পেশ করেন। অবশ্য মন আকৃষ্ট করার জন্য এ পদ্ধতি বের করলেন যে, মদীনার সম্পত্তি বনূ নযীরের জমির ব্যবস্থাপনা হযরত আব্বাস ও হযরত আলীর হাতে দিয়ে বলেন, তোমরা উভয়ে যৌথভাবে এ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন কর। তাদের থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তোমরা এর আয় ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে বণ্টন করবে রাসূলুলুল্লাহ (সা) যাদের মধ্যে বণ্টন করতেন। এ অঙ্গীকারের

---

১. এর মূলভাষ্য এরূপ ঃ

لما أخبرها الصديق انه قال لانورث ماتركنا فهو صدقة فحجها وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث بهذا النص الصريح فسألته ان ينظر على فى صدقة الارض التى بخيبر وفدك فلم يجها الى ذالك لانه رأى ان حقا عليه ان يقوم فى جميع ماكان يتولا لارسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضى الله عنه فحصل لها (وهى امرأة من البشر ليست براجية العصمة) عتب وتغضب ولم تكلم الصديق حتى ماتت (البداية والنهاية صفـ٢٤٩ج٥)

অতঃপর ইবন কাসিরের গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

وكانها سألته بعد هذا ان يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة فلم يجها الى ذالك لما قدمناه فتعتت عليه بسبب ذالك وهى امرأة من بنات ادم تأسف كما ياسفون وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روينا عن أبى بكر انه ترشى فاطمة وتلاينها قبل موتها فرضيت رضى الله عنها انتهى ثم ذكر حدث الاسترضاء فراجعه ـ

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৯।

মাধ্যমে তাঁদের উপর এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এটা মীরাস নয়; বরং এটা হলো ওয়াকফ। হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা) এটা গ্রহণ করেন এবং মালিক না হয়ে যৌথভাবে উভয়ে মদীনার সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হয়ে গেলেন।

খায়বার ও ফিদাকের জমির ব্যবস্থাপনা হযরত উমর (রা) নিজের হাতে রাখেন। এভাবে হযরত উমর (রা) নবী (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি দু'ভাগে বণ্টন করেন। একটি হলো বনূ নযীরের সম্পদ অর্থাৎ মদীনার সম্পদ যার আয় থেকে আহলি বায়ত ও উম্মুল মু'মিনীনের বাৎসরিক খরচাদি প্রদান করা হতো। এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হযরত আব্বাস ও হযরত আলীর উপর অর্পণ করেন। কেননা তাঁরা উভয়ে আহলি বায়তের প্রয়োজনীয়তা খুব ভালভাবে অবগত ছিলেন। এজন্য উভয়ে মুতাওয়াল্লী হওয়ার আশা পোষণ করতেন। কেননা নবীর ওয়াকফ-এর মধ্যে নিকটাত্মীয়েরও হক রয়েছে, বরং তাদের হক ও অধিকার অগ্রগণ্য। ফলে হযরত উমর (রা) মনে করেন যে, এ সমস্ত সম্পত্তির মুত্তাওয়াল্লী তাদেরকে নিয়োগ করা যথার্থ হবে এবং لانورث ماتركنا صدقة এ হাদীসের আলোচনা সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। এজন্য এখন এ আশংকা নেই যে, লোকজন এটা মীরাস মনে করবে। তদনুসারে বনূ নযীরের সম্পত্তি তাদের উভয়ের নিকট মুতাওয়াল্লী হিসেবে অর্পণ করেন। অপর সম্পত্তি অর্থাৎ ফিদাক ও খায়বারের সম্পত্তির আয় যেহেতু জনকল্যাণে ব্যয় করা হতো, ফলে খলীফা হিসেবে উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা হযরত উমর (রা) নিজের দায়িত্বে রাখেন। বেশ কিছু দিন হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রা) ঐকমত্যের ভিত্তিতে মদীনার সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। কিন্তু কিছু দিন পর উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। কেননা একই সম্পত্তির দু'জন মুতাওয়াল্লী হলে মতপার্থক্যের কারণে উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই ফয়সালার জন্য উভয়ে হযরত উমরের নিকট গমন করে আবেদন করেন যে, মদীনার সম্পত্তির মুতাওয়াল্লীগিরি দু'ভাগে বণ্টন করে দিন। এক অংশের মুতাওয়ালি হযরত আলীকে এবং অপর অংশের মুতাওয়ালি হযরত আব্বাসকে বানিয়ে দিন। যাতে পরস্পর মতানৈক্য ও বিরোধ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। কিন্তু হযরত উমর (রা) এর বিরোধিতা করে তা অস্বীকার করেন এবং এমত পেশ করেন যে, যদি প্রত্যেক মুতাওয়াল্লীর অংশ আলাদা করে দেয়া হয়, তাহলে এটা মীরাস বণ্টনের মত হয়ে যাবে। এজন্য হযরত উমর (রা) মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব দু'ভাগে বণ্টন করার বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং এটা কিয়ামত পর্যন্ত হবে না বলে ঘোষণা প্রদান করেন। (আশ্‌আতুল লুম'আত, ৩য় খ, পৃ. ৪৮০. ফায় অধ্যায়)

এবং এও বলেন যে, যদি তোমাদের দ্বারা মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে এ জমি আমাকে ফিরিয়ে দাও। আমি পূর্ববর্তীদের ন্যায় নিজেই এর ব্যবস্থা গ্রহণ করব। হযরত আব্বাস ও হযরত আলীর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রত্যেককে তার

অংশ অনুযায়ী পৃথকভাবে মুতাওয়াল্লী করা হোক, যাতে বিরোধ ও মতানৈক্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। তাঁরা মুতাওয়াল্লীগিরি বণ্টন চেয়েছেন, মীরাসের বণ্টন নয়। কিন্তু হযরত উমর (রা) এটা অনুমোদন করেননি। কারণ ভবিষ্যতে মানুষ যাতে এ মুতাওয়াল্লীগিরি বণ্টন দ্বারা মীরাসের বণ্টন মনে না করে।

কিছু দিন পর্যন্ত যৌথভাবে মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব চলতে থাকে। পরে হযরত আলী (রা) হযরত আব্বাসের অধিকার উঠিয়ে দেন এবং সমস্ত সম্পত্তির উপর তিনি নিজের একমাত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সঠিক ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে এর যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত আলীর এককভাবে এ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হওয়া এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করে যে, এ সম্পত্তি হযরত আলীর নিকটও ওয়াকফ ছিল, কারো মালিকানা বা মীরাস ছিল না। কেননা একজন মুতাওয়াল্লীর দ্বারা অপর মুতাওয়াল্লীর অধিকার রহিত করা যুলম নয়, বরং অনেক সময় কল্যাণ চিন্তা করে এরূপ করা হয়ে থাকে। অবশ্য কারো মালিকানা এবং মীরাসের উপর অধিকার গ্রহণ করা যুলম। হযরত আলী (রা) শী'আদের নিকট নিষ্পাপ এবং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকটও তিনি নিষ্পাপ। কারো মালিকানা এবং মীরাসের উপর হস্তক্ষেপ করা বা ছিনিয়ে নেয়া তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি এটা মীরাস হতো তাহলে এতে হযরত আব্বাস ব্যতীত উম্মুল মু'মিনীনদের অংশ থাকত এবং এটা প্রদান করাও জরুরী হতো।

হযরত আলী ও হযরত আব্বাস কর্তৃক (রা) হযরত উমর (রা)-এর নিকট অর্ধেক অর্ধেক করে জমির বণ্টন করে মুতাওয়াল্লী করে দেয়ার আবেদনের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের মধ্যে বিরোধ শুধু মুতাওয়াল্লী নিয়োগ সম্পর্কে ছিল, মীরাস সম্পর্কে ছিল না। মীরাস বণ্টন করে দেয়ার মধ্যে কোন জটিলতা বা অসুবিধা নেই; বরং যৌথ মালিকানাধীন কোন বস্তুকে দু'জন মালিকের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া বিবেকবুদ্ধি এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে উত্তম। এছাড়া তাঁদের থেকে হযরত উমরের এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা যে, তোমরা এ জমির আয় নবী করীম (সা) এর মত ব্যয় করবে। ঐ বিষয়টিও প্রমাণ করে যে, হযরত উমর (রা) তাঁদের মুতাওয়াল্লী বানিয়ে ছিলেন, নতুবা এ শর্তের কি অর্থ হতে পারে। যদি মীরাস হিসেবে বণ্টন করতেন, তাহলে মীরাসের মালিক তো হলেন অংশীদারগণ। স্বীয় বস্তু ব্যবহারের একমাত্র ক্ষমতা হলো মালিকের। সুতরাং মালিকের নিকট থেকে এ ধরনের অঙ্গীকার গ্রহণ করার কোন অর্থ হয় না। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত এর বিরোধী কোন নির্দেশ প্রদান করব না বলে হযরত উমরের উক্তি প্রমাণ করে যে, নবী করীম (সা) এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হয়রত আলী ও হযরত আব্বাসকে মুতাওয়াল্লী হিসেবে প্রদান করেছেন মীরাস হিসেবে নয়। কেননা মীরাস বণ্টনের মধ্যে কোন জটিলতা নেই। প্রত্যেক ওয়ারীসকে তার অংশ প্রদান করার মধ্যে দোষের কিছু নেই।

বরং প্রথমবার হযরত উমরের নিকট হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের গমন শুধু মুতাওয়াল্লীর পদ হাসিলের জন্য ছিল। যেমন ادفعها الينا শব্দ দ্বারা এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। কেননা دفع শব্দের অর্থ কোন বস্তু কারো নিকট সোপর্দ করা, মীরাস এবং মালিক হওয়ার সূত্রে কোন বস্তুর দেয়ার উপর دفع শব্দ আরোপ করা যায় না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) মুতাওয়াল্লী হিসেবে কাউকে কিছু দেয়া পছন্দ করেননি। কেননা হযরত ফাতিমার মীরাস লাভের আবেদন, ঘটনা তখন তাজা ছিল এবং এ ঘটনা সবাই অবহিত ছিল। এ সময় যদি মুতাওয়াল্লী হিসেবেও সম্পত্তি প্রদান করতেন, তাহলে সবাই এটা মীরাস মনে করত। এজন্য হযরত আবূ বকরের প্রতি হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের অসন্তোষ ছিল যে, তিনি তাদেরকে মুতাওয়াল্লী প্রদানেও সম্মত হননি এবং এটাও আশ্চর্য নয় যে, মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাঁদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, যদিও এই হাদীস لانورث ماتركنا صدقة নিঃসন্দেহের সহীহ। কিন্তু আমাদের অভিভাকত্বের অধিকার ও যোগ্যতার মধ্যেও সন্দেহ নেই, তথাপি এ জমি যা হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) স্বীয় অধিকারেই রেখেছেন, নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের এ ধারণা অথবা কোন উক্তির কারণে হযরত উমরের মনোবেদনা সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি সতর্কতা ও অভিযোগের সুরে বলেন, তোমরা কি হযরত আবূ বকরকে মিথ্যাবাদী, পাপী ও খেয়ানতকারী মনে করছ। যেমন, আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধব থেকে কোন অসতর্কতা অমনোযোগিতা প্রকাশ পায়, তখন অতিরঞ্জিতভাবে এটা বলে থাকে যে, তোমরা কি আমাকে ভাই বা বন্ধু মনে কর না, অথচ অন্তরের অন্তস্থলে তাদের মহব্বত স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্য কোন কথা বা ঘটনা সংঘটিত হলে এরূপ বলে থাকে। নিন্দা ও তিরস্কারের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালামেও এরূপ বাকপদ্ধতি রয়েছে। যেমন– ঃ

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاۤءَ هُمْ نَصْرُنَا ـ

"অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলো এবং ভাবল যে, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসল।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১১০)

মূলত আম্বিয়ায়ে কিরাম আন্তরিকভাবে এটা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য। একদিন অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য আসবে কিন্তু মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির কারণে যখন আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তরে অনিচ্ছাকৃত অস্থিরতা ও পেরেশানী সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরকে অভিযোগের সুরে বলেন, সাহায্য পৌঁছানোর মধ্যে একটু বিলম্ব হওয়ায় এই ধারণা করছ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণের সাথে মিথ্যা অঙ্গীকার করেছেন। এমনিভাবে হযরত উমর (রা) যখন প্রত্যক্ষ করেন যে, হযরত আলী এবং হযরত আব্বাসের কথায় হযরত সিদ্দীক

আকবরের বিরুদ্ধে মর্মবেদনার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তখন তিনি আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বসুলভ তিরস্কার ও অভিযোগের সুরে তাঁদের বলেন, তোমরা কি হযরত আবূ বকরকে মিথ্যাবাদী ও খেয়ানতকারী মনে করছ? আল্লাহর শপথ! হযরত আবূ বকর তো একজন নেককার সত্যপথের কাণ্ডারী ও হকপন্থী ছিলেন। বস্তুত হযরত উমর (রা) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের অন্তরে হযরত সিদ্দীক আকবরের মহব্বত এরূপ দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয়ে রয়েছে যে, যা কোনভাবেই দূরীভূত হবে না। সুতরাং যার দ্বারা দুঃখ ও বেদনা সৃষ্টি হতে পারে এরূপ বাক্য উচ্চারণ করা কোন সত্যিকার মহব্বতকারীর শানের উপযোগী নয়।

ফিদাকের বাগানের হাকীকত

ফিদাকের বাগানটি ছিল একটি ক্ষুদ্র খেজুরের বাগান। এ বাগানের আয় থেকে নবী (সা) স্বীয় পরিবারবর্গের সারা বছরের জীবকা নির্বাহের ব্যয় প্রদান করতেন। বাকী যা কিছু অবশিষ্ট থাকত, তা ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের পর হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) যখন প্রথম খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন হযরত ফাতিমা (রা) উক্ত বাগান ওয়ারিস হিসেবে তাঁকে প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) জবাবে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনেছি তিনি বলেছেন, "আমরা নবীগণের কেউ ওয়ারিস হয় না এবং আমরাও কারো ওয়ারিস হই না। আমরা যা কিছু পরিত্যাগ করি তা সাদাকা ও ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হবে।" হযরত ফাতিমা (রা) এটা শুনে লজ্জিত ও চিন্তিত হন। অতঃপর এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলেননি।

ফিদাকের বাগান একটি সাধারণ বাগান ছিল। এটা লাখো-কোটি টাকার জমিদারী ছিল না। যার সম্পর্কে এটা বলা যায় যে, এ বিশাল বাগান ছিনিয়ে নিয়ে খলীফা এর আয় দ্বারা স্বীয় পরিবারবর্গকে নিয়ে রাজকীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করছেন। কোন খলীফা এ বাগানকে তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য বায়নামা অথবা হেবানামা লিপিবদ্ধ করে দেননি, বরং শরী'আতের বিধান অনুযায়ী পাওনাদারদের মধ্যে বাগানের আয় বণ্টন করতেন। এমনকি যখন হযরত আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হন, তখন উক্ত বাগান যথারীতি তাঁর অধিকারে চলে আসে। এবং তিনি পূর্ববর্তী খলীফাদের নীতি এই বাগানের ব্যাপারে অব্যাহত রাখেন। ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ এতে প্রবেশাধিকার পেত না। হযরত আলী (রা) স্বীয় খিলাফতের সময় পূর্ববর্তী খলীফাদের মত এই বাগানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজ অধিকারে রাখেন। শী'আদের মতানুযায়ী যদি ফিদাকের বাগান আহলি বায়তের হক হয়ে থাকে এবং পূর্ববর্তী খলীফাগণ ছিনিয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে হযরত আলী (রা) স্বীয় খিলাফতকালে ছিনিয়ে নেয়া বস্তু কেন হকদারগণকে ফিরিয়ে দেননি?

শী'আগণ এর জবাবে বলেন, ফিদাকের বাগান যেহেতু ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ইমামগণের নীতি হলো এই যে, ছিনিয়ে নেয়া বস্তু ফিরিয়ে দেয়া হলেও তারা গ্রহণ করেন না। সুতরাং শী'আদের জবাবে আহলি সুন্নাত আল জামা'আত বলেন, শী'আদের মতে ফিদাকের বাগান যেমন ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তেমনি খিলাফতও ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু কি কারণে হযরত আলী (রা) এক সাধারণ বস্তু পরিত্যাগ করেন এবং খিলাফতের মত এক বিরাট বস্তুকে গ্রহণ করেন? খিলাফত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে বলে তাঁর ধারণাও হয়নি। অতঃপর ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে বলে দাবিকারীদের এ খেয়াল উদিত হয়নি যে, খুলাফায়ে কিরাম তাঁদের খিলাফতের সময় ফকীর ও দরবেশদের মত জীবন যাপন করেছেন এবং আহ্‌লি বায়তের সদস্যদেরকে ৫০/৬০ হাজার দীনার প্রদান করতেন। প্রত্যেকবারের দানের মূল্য কি ফিদাকের বাগানের চেয়ে কম হবে? এছাড়া একবারের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, হযরত উমর ফারূকের খিলাফতকালে ইরানের শাহজাদী শহরবানু অত্যন্ত শান ও মর্যাদার সাথে গ্রেফতার হয়ে আসেন। তখন খলীফা হযরত আলী ও হুসায়নকে গনীমতের অংশ দেয়ার পর তিনজনকে অতিরিক্ত ত্রিশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। এছাড়া শহ্‌রবানুকে সমস্ত অলংকারসহ হযরত হুসায়নকে দান করেন। যার প্রত্যেকটি মণিমুক্তা এত মূল্যবান ছিল যে, একটি মুক্তার মূল্য দ্বারা অনেকগুলো ফিদাকের বাগান ক্রয় করা যেত। সুতরাং যদি ধরে নেয়া যায় যে, ফিদাকের বাগান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে কিন্তু এর পর এত অধিক মূল্যবান হাদীয়া প্রদান করেছেন যার দ্বারা অসংখ্য ফিদাকের মত বাগান ক্রয় করা যেত। কাজেই শী'আগণ বিচার করতে পারেন যে তাদের অভিযোগ কি বেহুদা বা অনর্থক নয়? যদি কেউ কারো এক পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে এক হাজার দান করে তাহলে সে কি কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত নয় ?

শী'আদের নিকট আবেদন, শত শত বছর যাবত যে ইরানে লাখো লাখো শী'আ বাস করছে, ঐ ইরান ফারূক আযম (রা) কর্তৃক বিজিত হয়েছে। সুতরাং এখানে কি ছিনিয়ে নেয়া ফিদাক বাগানের ক্ষতিপূরণ শেষ হয়নি ?

একটি সন্দেহ এবং এর অপনোদন

হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা) যখন হযরত সিদ্দীক আকবরের নিকট নবী করীম (সা)-এর পরিত্যক্ত জমির মীরাস হিসেবে অংশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আম্বিয়া কিরামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির কেউ ওয়ারিস হয় না। নবীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আল্লাহর পথে সাদাকা হয়ে থাকে।

فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرة حتى توفيت ـ

(হযরত আবূ বকরের কথায়) "হযরত ফাতিমা (রা) অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আবূ বকরকে ত্যাগ করে চলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ অবস্থায় থাকেন।"

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা) নবী করীম (সা)-এর ইরশাদ لانورث ماتركنا صدقة শ্রবণ করার পর কেন অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হলেন, সন্তুষ্ট হওয়া ও রাসূলের বাণী গ্রহণ করার পরিবর্তে তিনি এর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) ত নবী বাণীর ভিত্তিতে বাধ্য ও অপারগ ছিলেন।

শী'আদের মতে হযরত ফাতিমা (রা) ছিলেন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক। ফলে তাদের মাযহাবের উপর একটি কঠিন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রাসূলে আকরাম (সা)-এর ইনতিকালের মাধ্যমে যখন এক হৃদয় বিদারক ঘটনার সৃষ্টি হয় এমন সময় দুনিয়ার একটি সামান্য বস্তুর জন্য বিবাদ সৃষ্টি করা এবং এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বীয় পরম সম্মানিত পিতার শ্বশুর ও স্থলাভিষিক্ত খলীফার সাথে সালাম কালাম বন্ধ করে দেয়া তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি কিনা?

এই সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাব প্রদান যেভাবে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দায়িত্ব রয়েছে, তেমনিভাবে শী'আ সম্প্রদায়েরও দায়িত্ব রয়েছে। তাদের এ জবাব প্রদান করা উচিত যে, হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা) কেন অন্যায়ভাবে রাগ বা অসন্তুষ্ট হলেন? রাফেযীদের মতামত বাতিলের মত খারেজীদের চিন্তাধারার ব্যাপারেও আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এই মত পোষণ করে যে, হয়ত কোন খারেজী হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমার পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের মধ্যে এ বল্গাহীন উক্তি করতে পারে যে, নবী করীম (সা)-এর ইনতিকাল সর্বসাধারণের জন্য এক হৃদয় বিদারক ঘটনা ছিল। এরূপ মুসীবতের সময় প্রথমত মীরাসের দাবি উত্থাপন করা উচিত হয়নি এবং তা হযরত ফাতিমার দুনিয়াবী স্বার্থবিমুখতা ও তাক্ওয়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না। শী'আদের মতে হযরত ফাতিমা (রা) নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। অথচ হযরত আবূ বকর (রা) যখন নবী (সা)-এর বাণী উল্লেখ করলেন তখন তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করা উচিত ছিল। বেদনা ও ক্রোধ প্রকাশের কি অর্থ হতে পারে? এ ঘটনায় হযরত সিদ্দীক আকবরের উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না। হযরত ফাতিমার (রা)-এর ধারণা ও দাবি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে। এ ব্যাপারে জবাব প্রদানের জন্য আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শী'আ সম্প্রদায়-উভয়েই দায়িত্ব রয়েছে। শী'আ সম্প্রদায় তাদের জবাব নিয়ে চিন্তা করুন। আহ্লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পক্ষ থেকে আহ্লি বায়তের প্রতি সর্বতোভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা)-এর সর্বাঙ্গীন পবিত্রতার সপক্ষে মতামত ও যুক্তি পেশ করা হলো।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের জবাব

হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমার (রা) অসন্তুষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। কোন কোন রিওয়ায়াতের فغضبت فاطمة এবং বুখারী মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে فوجدت فاطمة উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-বুখারী শরীফের ২য় খণ্ডের ৬০৯ পৃষ্ঠায় গাযওয়া খায়বার অধ্যায়ে فوجدت فاطمة على أبى بكر উল্লেখ করা হয়েছে। وجدت শব্দটি যেভাবে غضبت (ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এমনিভাবে حزنت শব্দের অর্থ (ব্যথিত, বেদনার্ত বা অসন্তুষ্টি ইত্যাদি) বুঝবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা) যখন হযরত সিদ্দীক আকবরের নিকট নিজের মীরাসের অংশের দাবি করেন এবং হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) নবী (সা)-এর এ হাদীস তাঁর নিকট বর্ণনা করেন, তখন এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, হযরত ফাতিমা (রা) স্বীয় দাবির কারণে অনুতপ্ত ও দুঃখিত হয়ে থাকতে পারেন। কেননা আম্বিয়া, মুরসালীন এবং কামিল ওলীগণের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, যদি তাদের থেকে সামান্যতম বেইনসাফী অথবা কোন প্রকার ভুলক্রুটি প্রকাশ পায়, তাহলে তাঁরা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন। যেমন ভুল করে হযরত আদম (আ)-এর গম ভক্ষণ করার পর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া, হযরত নূহ্ (আ)-এর পুত্রের মুক্তি ও নাজাতের জন্য দু'আ করার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং হযরত মূসা (আ)-এর জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করে অনুতপ্ত হওয়ার ঘটনা স্বয়ং কুরআনুল করীমে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং হযরত ফাতিমা (রা) এ বিষয়ে অনুতপ্ত হয়েছেন যে, আমি অজ্ঞতা সত্ত্বেও সে মীরাসের জন্য দাবি পেশ করলাম। যদি আমি প্রথম থেকেই لانورث ماتركنا صدقة হাদীস সম্পর্কে অবগত হতাম, তাহলে কখনো মীরাসের জন্য দাবি পেশ করতাম না। অতঃপর এই অনুতপ্ত হওয়া থেকেই হযরত ফাতিমার অসুস্থতা আরম্ভ হয়। যার ফলে হযরত সিদ্দীক আকবরের সাথে যোগাযোগ হ্রাস পায় এবং পূর্বের ন্যায় দেখা-সাক্ষাত অব্যাহত থাকেনি। রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের ব্যথাও অন্তর থেকে দূরীভূত হয়নি। তবে কথাবার্তা ও সালাম একেবারেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। এরূপ অবস্থায় তিন দিনের অধিক থাকা হারাম। আজীবনের জন্য তো প্রশ্নই আসে না। অবশ্য সবাই এটা অবগত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ফাতিমার মুহরিম ছিলেন না, যার সাথে সর্বদা তাঁর কথাবার্তা ও সালামের সুযোগ হবে এবং এ ঘটনার কারণে তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। কেননা মুহরিম ব্যতীত অন্য কারো সাথে বিনা প্রয়োজনে সালাম প্রদান ও কথা বলা জায়িয নয়।

সুতরাং হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা)-এর আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল মূলত এ অনুতাপ, স্বীয় অসুস্থতা ও পিতার ইনতিকালজনিত মর্মবেদনা। বাহ্যিক অবস্থা

পর্যবেক্ষণকারীগণ ধারণা করেছেন যে, হয়ত এ আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণ অসন্তুষ্টি ছিল, ফলে এ বর্ণনাকারীগণ তাদের ধারণা অনুযায়ী غضبت শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথবা নিচের বর্ণনাকারীগণ وجدت এর মূল রিওয়ায়াতের غضبت এর অর্থ মনে করে غضبت শব্দের সাথে روايت بالمعنى বা অর্থটি বর্ণনা করেছেন। মূলত এবং সঠিক রিওয়ায়েত হলো وجدت فاطمة অর্থ حزنت এবং غضبت فاطمة অর্থের রিওয়াতে যা বর্ণনাকারী অসন্তুষ্টি মনে করে স্বীয় ধারণা অনুযায়ী রিওয়ায়েত করেছেন। মূলত ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি ছিল না। বরং এই অসন্তোষ ও দুঃখভারক্রান্ত হওয়া ছিল মানবীয় ও স্বভাবজাত দাবী যা তাদের মহত্ত্বের পূর্ণতা প্রমাণ করে এবং সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ীভাবে ব্যথিত ও পেরেশানী হওয়া শানে নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন–হযরত মূসা ও হারূনের মধ্যে সংঘটিত হয়। এটাকে ঝগড়া বলা যাবে না। এরূপ ঘটতেই পারে এবং এটা খুব দ্রুত দূরীভূত হয়ে যায়। বরং অনেক সময় তা অধিক মহব্বতের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পূর্বের চেয়ে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে।

২. যদি আমরা এটা মেনেও নিই যে, হযরত ফাতিমা (রা) এ বিষয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তবুও এর দ্বারা হযরত সিদ্দীক আকবরের ত্রুটি প্রমাণিত হয় না। সম্ভবত হযরত ফাতিমা (রা) কোন ভুল বুঝাবুঝির কারণে হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর অসন্তুষ্ট হন। কোন খেয়ালের বশবর্তী হয়ে নবী ও রাসূলগণের মধ্যেও ক্রোধ ও রাগের উদ্রেক হয়ে থাকে। অথচ তাঁরা নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ। যেমন হযরত মূসার হযরত হারূনের উপর রাগান্বিত হওয়া কুরআনুল করীমে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং হযরত মূসা ও হযরত হারূন যেভাবে নিষ্পাপ ছিলেন, তেমনিভাবে মীরাসের বিষয়ে হযরত ফাতিমা ও হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) উভয়ে নিষ্পাপ ছিলেন।

৩. এতদসত্ত্বেও যদি শী'আ সম্প্রদায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর ত্রুটি রয়েছে বলে মনে করে, তাহলে যখন তিনি ভরাক্রান্ত হৃদয়ে হযরত ফাতিমার ঘরে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে সম্মত করিয়েছেন, তখন শী'আদেরও সন্তুষ্টও সম্মত হয়ে যাওয়া উচিত। হযরত ফাতিমা (রা) তাদের ধারণা অনুযায়ী নিষ্পাপ। কাজেই নিষ্পাপ ব্যক্তির অনুসরণ করা জরুরী। কিন্তু বিরোধিতা করা জায়েয নয়। হযরত ফাতিমার সম্মত হওয়ার পর যদি কেউ সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে চিন্তার কোন কারণ নেই।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন থাকে যে, হযরত ফাতিমা (রা) এরূপ বেদনা ও হৃদয় বিদারক ঘটনার সময় কেন মীরাসের দাবি করলেন। এর জবাব হলো এই যে, এতে ধন সম্পদেরই লোভ ছিল না বরং নবীর বরকত এবং পিতার স্মৃতিচিহ্ন হাসিল করার দৃষ্টিভঙ্গি এতে নিহিত ছিল। এছাড়া হালাল রিযকের অন্বেষণ করা আওলিয়া ও মুত্তাকীগণের তরীকা। কাজেই নবীর পরিত্যক্ত সম্পদের চেয়ে হালাল অন্য কিছুই হতে

পারে না। যাতে কোন প্রকার হারাম বা মাকরূহ থাকার কোন সন্দেহ বা আশংকা নেই। সুতরাং হযরত ফাতিমা (রা) এই ধারণা পোষণ করেন যে, যদি নবী (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ আমার হস্তগত হয়, তাহলে হালাল রিযিকের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হতে পারব এবং নবী (সা)-এর বরকত ও স্মৃতি মনের সান্ত্বনা লাভের উপায় হবে।

একটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

শী'আ সম্প্রদায় বলে থাকে হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা) হযরত আবূ বকর (রা) উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ فاطمة بضعة منى من اغضبها فقد اغضبنى। "ফাতিমা আমার কলিজার টুকরা, যে ফাতিমাকে অসন্তুষ্ট করবে, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করলো"

সুতরাং এটা অবগত হওয়া উচিত যে, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) এর অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা غضب ও اغضاب-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। غضب -র অর্থ ক্রোধান্বিত হওয়া বা অসন্তুষ্ট হওয়া اغضاب। -এর অর্থ বুঝেশুনে বা স্বজ্ঞানে অন্যকে অসন্তুষ্ট করা। মূলত হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) (মা'আযাল্লাহ) হযরত ফাতিমাকে অসন্তুষ্ট করেননি; বরং তিনি শুধু নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ ও বাণী প্রচার করেছেন, পালন করেছেন। হযরত ফাতিমা (রা) উক্ত হাদীস না জানার কারণে হযরত আবূ বকরের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। শী'আ সম্প্রদায় বলুন, কোন কারণ ব্যতীত তিনি কেন অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তো তাঁর অসন্তুষ্ট হওয়ার প্রবক্তা নয়। আমাদের মতে হযরত ফাতিমা (রা) নবী করীমের উক্ত হাদীস অবগত না হওয়ার কারণে মীরাসের দাবি করেছেন, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) যখন নবী করীম (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করেন তখন এই অন্যায় দাবি উত্থাপন করার কারণে হযরত ফাতিমা (রা) লজ্জিত হলেন, এই লজ্জার কারণে হযরত সিদ্দীক আকবরের সাথে যোগাযোগ পূর্বের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পায়। লোকজন এটাকে অসন্তুষ্টি মনে করেছে। নতুবা হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ফাতিমার মুহরিম ছিলেন না যার সাথে সর্বদা সালাম-কালাম অব্যাহত থাকবে। অতঃপর তা বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফল অসন্তুষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ হবে। হযরত ফাতিমা (রা)-এর আলাপ একটি বিশেষ প্রয়োজনে ছিল। যখন প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, তখন সালামের প্রয়োজনও বাকী থাকেনি।

উল্লেখ্য যে, হযরত আলী (রা) সর্বাবস্থায় হযরত আবূ বকরের সাথে ছিলেন এবং সর্বদা তাঁর পিছনে নামায আদায় করেন। এদিকে হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) বিনয় ও সৌজন্যের খাতিরে হযরত ফাতিমার বাড়ি গমন করেন এবং হযরত ফাতিমা অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা এই আশংকায় তাঁর নিকট ওযর পেশ করেন। ফলে তিনি হযরত সাইয়্যেদাকে রাযী ও সন্তুষ্ট করে বাড়ি ফিরে আসেন। মা'আযাল্লাহ! হযরত আবূ বকর

(রা) খিলাফত ও আমীরের পদের জন্য আগ্রহী ছিলেন না। যার ফলে হযরত ফাতিমার খোঁজ-খবর না নেয়ার মানসিকতা হযরত সিদ্দীক আকবরের অন্তরে কখনো সৃষ্টি হয়নি; বরং নবী (সা)-এর কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমার অসন্তুষ্টির আশংকা করে তিনি অস্থির হয়ে উঠেন এবং তাঁর বাড়িতে গমন করে তাঁকে কথাবার্তা ও আলোচনার মাধ্যমে রাযী ও সন্তুষ্ট করেন।

শী'আ সম্প্রদায় যদি এ আবেদনকে যথেষ্ট মনে না করেন এবং হযরত আবূ বকরকে অভিযুক্ত করেন, তাহলে তাদের নিকট আরয হলো এই যে, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) হযরত ফাতিমাকে কতটুকু অসন্তুষ্ট করেছেন। বরং হযরত আলী (রা) যখন আবূ জাহলের কন্যাকে বিবাহ করার কামনা ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন হযরত ফাতিমাকে ততোধিক অসন্তুষ্ট করেন। যার ফলে রাসূল (সা) খুতবা প্রদান করে বলেন ঃ فاطمة بضعة منى من اغضبها فقد اغضبنى সুতরাং শী'আগণ বলুন, হযরত আলী (রা) কিসের উপর ভিত্তি করে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পক্ষান্তরে হযরত আবূ বকরের নিকট ইরশাদে নববী لانورث ماتركنا صدقة দলীল বিদ্যমান ছিল। কিন্তু হযরত আলীর নিকট এ ধরনের কোন দলীল বিদ্যমান ছিল না; বরং পারিবারিক বিষয়ে প্রায়ই হযরত আলী ও হযরত ফাতিমার মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ ও মতানৈক্য সৃষ্টি হতো। ফলে একদিন পরস্পর মনোমালিন্যের কারণে হযরত আলী (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে মসজিদে নব্বীতে গিয়ে শুয়ে থাকেন। নবী (সা) এ কারণে হযরত আলীকে আবূ তুরাব (ابوتراب) উপাধিতে ভূষিত করেন।

নবী করীম (সা) -এর মীরাস

হযরত সিদ্দীক আকবর, হযরত ফারূক আযম, হযরত উসমান গণী, হযরত আলী মুর্তাযা এবং হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ "আমরা অর্থাৎ নবীগণের সম্পদে কোন মীরাস হয় না। আমরা যা কিছু পরিত্যাগ করে যাব, ঐ সমস্ত আল্লাহর পথে সাদাকা ও কল্যাণের কাজে ব্যবহৃত হবে।"

এতে হিকমত হলো এই যে,

১. আল্লাহপাকের সৃষ্টির সবাই যাতে এটা অবগত হয়ে যায় যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম সত্যের দাওয়াত ও দ্বীনের তাবলীগের জন্য যা কিছু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির জন্য করেছেন। এতে দুনিয়ার কোন বস্তু পাওয়ার কামনা ছিলনা। এমনকি এতে সন্তান-সন্ততির কোন অংশ নেই।

২. আম্বিয়ায়ে কিরাম হলেন উম্মতের জন্য রূহানী পিতা। সুতরাং তাদের সম্পদ সমস্ত উম্মতের জন্য ওয়াকফ হবে। কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য তা নির্দিষ্ট হবে না।

৩. আম্বিয়ায়ে কিরাম সর্বদা মহান আল্লাহর দরবারে হাযির থাকেন এবং প্রকৃত মালিকের ক্ষমতা প্রতি মুহূর্তে তাঁদের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান থাকে। এজন্য

নবীগণ নিজেকে কোন বস্তুর মালিক মনে করেন না। যেমন কোন বুযর্গ বলেছেন ঃ الانبياء لايشهدون ملكا مع الله। "নবীগণ আল্লাহর সামনে অন্য কারো মালিকানা দেখতে পায় না"

সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে প্রকৃত মালিকের (আল্লাহ্ তা'আলার) মালিকানা যেহেতু গোপন থাকে, ফলে তারা নিজেকে কৃত্রিম মালিক মনে করে। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম নিজদেরকে কৃত্রিম বা রূপক হিসেবেও মালিক মনে করেন না। যে বস্তু তাদের হাতে আসে তা আল্লাহ্ তা'আলারই মনে করেন এবং এ ধারণা পোষণ করেন যে, আমরা আল্লাহর তা'আলার দস্তরখানে বসে আছি। এর থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ কারণে এ সমস্ত মালের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না এবং ইনতিকালের পর ঐ মাল ও সম্পদে মীরাস ও ওসীয়্যত প্রযোজ্য হয় না।

হায়াতুন্নবী (সা)

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদা হলো এই যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ইনতিকালের পর তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন এবং নামায ও ইবাদতে নিমগ্ন আছেন। হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের এই কবরের জীবন সম্পর্কে যদিও আমাদের কোন অনুভূতি বা ধারণা নেই কিন্তু নিঃসন্দেহে এটা হলো দৈহিক জীবন। কেননা আত্মিক জীবন তো সাধারণ মু'মিনদের, এমনকি কাফিরদেরও থাকে।

সহীহ্ ও সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত আছে যে, কবরে মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করেন কিন্তু জবাব দিতে পারেন না। নবী করীম (সা) এর বদর যুদ্ধের শহীদগণের উদ্দেশ্যে সম্বোধন বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

مامن أحد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام ـ رواه ابن عبد البر وصححه أبو محمد عبد الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعرف من يغسله ويحمله ويدليه فى قبره رواه أحمد وغيره ـ

"যখন কোন ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইয়ের কবরের নিকট গিয়ে গমন করার সময় তার উপর সালাম পেশ করেন তখন ঐ মৃত ব্যক্তি তাকে চিনতে পারে এবং তার সালমের জবাব দিয়ে থাকে"। হাকিম ইবন আবদুল বার এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং শায়খ আবদুল হক দেহলবী (র) এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। নবী করীম (সা) আরো বলেছেন ঃ "নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে চিনতে পারে যে তাকে গোসল

দিয়ে থাকে, তার খাট উঠিয়ে থাকে এবং কবরের মধ্যে দাফন করে থাকে।" ইমাম আহমাদ (র) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (যারকানী. ৫ খ, পৃ. ৩৩৪)

মুসনাদে আবূ ইয়ালায় হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ الانبياء أحياء فى قبورهم يصلون। "আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের কবরে জীবিত ও নামাযে নিমগ্ন রয়েছেন।"

শায়খ জালালউদ্দিন সুয়ূতী (র) এ হাদীসকে হাসান বলেছেন এবং আল্লামা মুনাভী ফয়যুল কাদীর (শারহে জামি' সাগীর, ৩ খ. পৃ. ১৮৪) উল্লেখ করেন যে, এ হাদীস সহীহ। আল্লামা সুয়ূতী (র) হায়াতে আম্বিয়া সম্পর্কে বলেছেন, এ সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির স্তরে পৌছেছে এবং أبناء الاذكياء بحياة الأنبياء নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

حيات النبى صلى الله عليه وسلم فى قبره هو وسائر الانبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الادلة ذلك وتواترت به الاخبار الدالة على ذالك ـ

"নবী করীম (সা)-এর পবিত্র রওজায়ে জীবিত থাকা এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের তাঁদের কবরে জীবিত থাকা অকাট্য ও নিশ্চিত ইলম দ্বারা জানা যায়, কেননা হায়াতে আম্বিয়া দলীল ও হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত।"

এ হাদীস দ্বারা শুধু আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং এটা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, যেভাবে এ দুনিয়ার জীবনে আম্বিয়ায়ে কিরাম ইবাদতে মগ্ন থাকেন, তেমনিভাবে কবরেও ইবাদতে নিমগ্ন রয়েছেন। বালাগাতের নীতি হলো এই যে, বাক্যের মধ্যে সর্বশেষ শব্দটিকে নিয়েই বাক্য আবর্তিত হয়ে থাকে। সুতরাং الانبياء أحياء فى قبورهم يصلون। এর মধ্যে উদ্দেশ্য হলো কবরে নবীগণের সালাত ও ইবাদতের কথা বর্ণনা করা। আসল হায়াত ফয়সালাকৃত বা পূর্ব নির্ধারিত বিষয়। يصلون শব্দের পূর্বে ভূমিকা হিসেবে হায়াতের উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, নবীগণের পবিত্র দেহ যদিও এই জগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু দেহ পূর্বের মতই ইবাদতে মগ্ন রয়েছে। আমলসমূহ পূর্বের ন্যায় অব্যাহত রয়েছে। আমলসমূহের মধ্যে নামাযের বিষয় এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়ছে যে, ঈমানের পরই নামাযের স্থান এবং নামায আম্বিয়ায়ে কিরামের চোখ শীতলকারী।

মোটকথা নবীগণের হায়াত শুধু আত্মিক নয়, বরং দৈহিকভাবেই তাঁরা কবরে জীবিত। কেননা মৃত্যুর পর আত্মিক হায়াত, শ্রবণ ও অনুভূতি শুধু আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথেই বিশিষ্ট নয় বরং সমস্ত মানবজাতি এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন, জুমু'আর দিন তোমরা অধিক পরিমাণে আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের এই দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ঃ

كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت يقولون بليت فقال ان الله حرم على الارض ان تأكل أجساد الأنبياء ـ أخرجه أبوداؤد وقال البيهقى له شواهد وقال العلامة القارى رواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم وصححه وقال النووى اسناده صحيح ـ

"কিভাবে আমাদের দরূদ ও সালাম আপনার নিকট পেশ করা হবে। অথচ ইনতিকালের পর আপনার পবিত্র দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে। তখন নবী করীম (সা) বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ গ্রাস করা মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন।" আবূ দাঊদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (মিরকাত, ২ খ, পৃ.২১০)

সাহাবায়ে কিরামের এই প্রশ্ন ও নবী করীম (সা)-এর জবাব দ্বারা এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এখানে হায়াত দ্বারা দৈহিক হায়াতকে বুঝানো হয়েছে, শুধু রূহানী হায়াত উদ্দেশ্য নয়। যদি একমাত্র পবিত্র রূহের উপর দরূদ পেশ করা উদ্দেশ্য হত, তা হলে সাহাবাগণের এই প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে যেত। কারণ শুধু রূহের উপর আমল পেশ করার জন্য দেহের অস্তিত্ব জরুরী নয়, তা হলে রাসূলে করীম (সা) জবাবে এটা বলতেন যে, দেহ নিয়ে তোমাদের প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের জন্য দরূদ ও সালাম আমার রূহের উপর পেশ করা হবে। শুধু রূহের উপর আমল পেশ করা নবীগণের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, মৃত ব্যক্তি সালাম ও কথাবার্তা শ্রবণ করে থাকে। কোন কোন দিন তাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের আমল পেশ করা হয়। যেমন আল্লামা সুয়ূতী (র) রচিত "শারহিস- সুদূর ফী আহওয়ালিল মাওতা ওয়াল কুবূর" (شرح الصدور فى أحوال الموتى والقبور) নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। দেহের সাথে রূহের মিলিত অবস্থায় কবরে উম্মাতের আমল পেশ হওয়া একমাত্র নবী করীম (সা)-এর বৈশিষ্ট্য। (শারহে মিশকাত, আল্লামা কারী, ২ খ, পৃ. ২০৯)

সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবুদ- দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ বিশেষভাবে জুমু'আর দিন তোমরা আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ কর। জুমু'আর দিন হলো পেশ করা বা হাযিরার দিন। এই দিন অসংখ্য ফিরিশতা হাযির হয়ে থাকে। হযরত আবুদ- দারদা (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল!

وبعد الـمـوت قال ان الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبى الله حى يرزق رواه ابن ماجه قال الدميرى رجاله ثقات كذا فى فيض القدير -

“ইনতিকালের পরও কি আপনার উপর দরূদ পাঠ করা হবে? তখন নবী করীম (সা) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মাটির উপর আম্বিয়া কিরামের দেহ গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক নবী কবরের মধ্যে জীবিত আছেন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়।” (ফয়যুল কাদীর, ২ খ. পৃ. ৮৭)

যারকানী বলেছেন, এ হাদীস কয়েকজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী মারফূ' হিসেবে হযরত আবুদ-দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাজাহ শরীফে তা বর্ণিত হয়েছে। (যারকানী, ৫ খ, পৃ. ৩৩৬)

শায়খ তাকীউদ্দিন (র) বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর ফারূক (রা) মসজিদে নববীতে স্বর উঁচু করা অপসন্দ করতেন এবং যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে উঁচু স্বরে কথা বলত, তাকে সাবধান করে বলতেন, “তোমরা উঁচু স্বরে কথা বলে রাসূলে করীম (সা)-কে পবিত্র রওযায় কষ্ট দিয়েছ।” এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর মতে নবী করীম রওযা শরীফে পবিত্র দেহ ও রূহের সমন্বয়ে জীবিত আছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ الاية

“হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা পরস্পরের সাথে যেভাবে উঁচু স্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো না ...।” (সূরা হুজুরাত)

এই দুনিয়ার হায়াতেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল, তেমনি কবরের জীবনেও তাঁর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ।

মসজিদে নববীর সংলগ্ন কোথাও যদি পেরেক বা অন্য কিছু লাগানোর আওয়ায নবী করীম (সা)-এর হুজরা পর্যন্ত পৌঁছত, তখন হযরত আয়েশা (রা) সাথে সাথে বলতেনঃ

لاتؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেরেকের আওয়ায দ্বারা কষ্ট দিও না।”

শায়খ সুবকী (র) বর্ণনা করেন সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এবং পূর্ববর্তী নেককারগণের আমল ছিল এই যে, নবী (সা)-এর আদব ও সম্মানার্থে মসজিদে নববীতে স্বর উঁচু করতেন না। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى

"যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাক্ওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৩)

একবার হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আদবের সাথে হাঁটু পেতে বসে আরয করলেন ঃ ادنو منك يارسول الله হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনার নিকটবর্তী হয়ে বসব? তিনি অনুমতি প্রদান করেন। হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর উভয় হাঁটুর উপর হাত রেখে ক্ষীণ আওয়াযে ওহী পেশ করেন।

এমনিভাবে ইনতিকালের পূর্বে যখন মালাকুল মাউত নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হলেন, তখন আদব ও সম্মানার্থে ক্ষীণ স্বরে রূহ কবয করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ

"যারা ঘরের বাহির থেকে আপনাকে উঁচু স্বরে আহ্বান করে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৪)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا بلغته

"যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট এসে দরূদ পাঠ করে আমি স্বয়ং তা শুনে থাকি এবং যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উপর দরূপ পাঠ করে তা হলে ফিরিশতার মাধ্যমে তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়।"

সুতরাং এখানে নিকটবর্তী ও দূরের দৈহিকভাবে জীবিত থাকার সূত্রে রূহানী হায়াতের সূত্রে নয়।

আল্লামা মুনাভী (র) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন ঃ

وذالك لان لروحه تعلقا بمقر بدنه الشريف وحرام على الارض ان تأكل أجساد الأنبياء فحاله كحال النائم الذى ترقى روحه بحسب قواها الى ماشاء الله لم بحسب قدره عند الله فى الملكوت الاعلى ولها بالبدن تعلق ولذا أخبر بسماعه صلاة المصلى عليه عند قبره وذا لايبنافيه مامر لى خبره حيثما كنتم فصلوا علىَّ من ان معناه لاتتكلفوا المعاودة الى قبرى فان صلواتكم تبلغنى حيث كنتم ما ذالك

الا لان الصلاة فى الحضور مشافهة أفضل من الغيبة لكن المنهى عنه هو الاعتياد الرافع للحشمة المخالف لكمال الصية والاجلال -

"এর কারণ হলো এই যে, নবী (সা)-এর পবিত্র রূহ্ তাঁর পবিত্র দেহের সাথে সমন্বিতভাবে কবরে অবস্থান করে। আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ গ্রাস করা মাটির উপর প্রাকৃতিকভাবেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র রওযায় রাসূল (সা)-এর অবস্থা একজন শায়িত ব্যক্তির অবস্থার মত। তাঁর রূহের ঊর্ধ্বগমন হয়ে থাকে। আল্লাহর দরবারে তার মর্তবা অনুযায়ী আলমে মালাকূতে ঊর্ধ্বগমন হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।

এ কারণেই নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে আমার উপর দরূদ ও সালাম পেশ করবে, আমি স্বয়ং তা শ্রবণ করব। এ হাদীস ঐ হাদীসের বিরোধী নয় যাতে বলা হয়েছে, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদ প্রেরণ কর। এ হাদীসের অর্থ হলো এই যে, বার বার আমার কবরের নিকট হাযির হওয়ার জন্য কষ্ট করো না। তোমাদের দরূদ ও সালাম যে কোন স্থান থেকে আমার নিকট পৌঁছানো হয়"।[১]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রওযা পাকে উপস্থিত হয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করা দূর থেকে সালাম ও দরূদ পেশ করা থেকে উত্তম। অবশ্য খুব ঘন ঘন হাযির হওয়ার কারণে মহানবীর দরবার বা রওযা পাকের মর্যাদার অনুভূতি হ্রাস পাওয়ার আশংকায় তা নিষেধ করা হয়েছে।

মুসনাদে বায্যারে উত্তম সনদের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে মারফূ' হাদীস বর্ণিত, উম্মতের আমলসমূহ নবী করীম (সা)-এর নিকট পেশ করা হয় এবং মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা হয়।

এ সমস্ত রিওয়ায়াতের দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নবী করীম (সা) এবং অন্যান্য নবীগণ কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের পবিত্র দেহ কবরে বিনষ্ট হয় না এবং ইনতিকালের পর তাঁদের ইবাদত বন্ধ হয় না; বরং তাঁরা নামায আদায় করেন, হজ্জ পালন করেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়। পবিত্র রওযায় গিয়ে যদি কেউ সালাম পেশ করেন তা হলে স্বয়ং তিনি শুনেন এবং সালামের জবাব প্রদান করেন। উম্মাতের আমলসমূহ কবরেই নবী (সা)-এর নিকট পেশ করা হয়। এ সমস্ত বিষয় অকাট্য দলীল হিসেবে প্রমাণ করে যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত হলো দৈহিক এবং পবিত্র দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক বিদ্যমান। মোটকথা আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের পর উম্মাতগণ তাঁর পবিত্র দেহ কবরে দাফন

১. ফয়যুল কাদীর, ৬ খ, পৃ. ১৭০।

করেছেন এবং শরী'আতে পবিত্র রওযা যিয়ারতের তাগিদ করেছে। কবরেই নবী (সা) নামায আদায় করেন এবং আল্লাহ্ পাকের পাকের পক্ষ থেকে কবরেই রিযক প্রদান করা হয়। পবিত্র দেহ্ কবরে দাফন করার বিষয়টি প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা প্রমাণিত। যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং পবিত্র দেহ কবর থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। হাদীস মুতাওয়াতির দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামের যে হায়াত প্রমাণিত, তা কবরের হায়াত, আসমানের হায়াত নয়।[১]

কবরে পবিত্র দেহসমূহ আমানত রাখা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত হলো দৈহিক এবং কবরে রূহের মূল সম্পর্ক হলো দেহের সাথে। বস্তুত এ সমস্ত রিওয়ায়াতের দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইনতিকালের পর নবী করীম (সা)-এর প্রকৃত অবস্থান[২] হলো পবিত্র কবর, যেখানে নবী (সা)-এর পবিত্র দেহ সংরক্ষিত কিন্তু আসমানে নয়।

ঐ স্থানেই পবিত্র দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক রয়েছে এবং সেখানেই রাসূল (সা)-এর নিকট উম্মাতের আমলসমূহ পেশ করা হয়। পক্ষান্তরে ঊর্ধ্বজগতের সাথেও নবী (সা)-এর পবিত্র রূহের সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় অনুযায়ী যদি নবী (সা) এর পবিত্র রূহ ঊর্ধ্ব জগত এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করে, তা হলে এটা অসম্ভব কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলার এ ক্ষমতা রয়েছে যে, তাঁর মনোনীত বান্দাকে যেখানে ইচ্ছা পরিভ্রমণ করাবেন। পরকালের বিষয় ও দুনিয়ার অবস্থার সাথে কিয়াস করা বোকামী ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) শারহে শিফায়[৩] উল্লেখ করেন।

المعتقد المعتمد أنه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره كسائر الأنبياء فى قبورهم وهم أحياء عند ربهم وان لارواحهم تعلقا بالعالم العلوى والسفلى كما كانوا فى الحال الدنيوى فهم بحسب القلب عراشيون وباعتبار القالب فرشيون والله سبحانه أعلم بأحوال أرباب الكمال هذا شرح شفاء ـ

"পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম বুযূর্গদের আকীদা ও বিশ্বাস হলো এই যে, নবী করীম (সা) স্বীয় কবরে জীবিত আছেন। যেমন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের কবরে জীবিত আছেন এবং একই সময় ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগত (علم علوى وعالم سفلى) উভয়

১. জযবুল কুলূব, পৃ. ২০৪।

২. قال الحافظ فى الفتح صفحــ ٣٢٩ج٣ واما أجسادهم فهى فى القبور، فتح البارى باب التلبيه اذا انحدر فى الوادى ـ

৩. শারহে শিফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২।

জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে– যেমন দুনিয়ার জীবনে উভয়ের সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ ইনতিকালের পরও তেমনিভাবে উভয় জগতের সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। নবীগণ কাল্‌ব -এর ভিত্তিতে আরশের সাথে সম্পর্কিত এবং দেহের ভিত্তিতে নিম্নজগতের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তা'আলা নবীগণের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন।"

در نیابد حال پختہ هیچ خام * پس سخن کوتاه باید والسلام

"পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত মনীষীদের অনেক বাস্তব অবস্থা অপরিপক্করা বুঝে উঠতে পারে না, তাই সালাম দিয়ে কথা সংক্ষিপ্ত করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।"

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) নিঃসন্দেহে তাঁদের কবরে জীবিত আছেন এবং নামায ও ইবাদতে নিমগ্ন আছেন। কিন্তু পবিত্র মি'রাজের সময় নবী করীম (সা) এর সাথে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আক্‌সায় একত্র করা হয় এবং যাকে ইচ্ছা আকাশে আহ্বান করেন। এটাই সর্বজন স্বীকৃত যে, নবীগণের এ মোলাকাত রূহ ও দেহের সমন্বয়ে হয়েছে। যেমন শায়খ নুরুল হক দেহলভী (র) তায়সীরুল কারী[১] শারহে বুখারীতে[২] উল্লেখ করেছেন,[৩]। এটাও হতে পারে যে, লাইলাতুল মি'রাজে নবীগণের দেহ মুবারক কবরে অবস্থান করে এবং মসজিদে আকসায় নবী (সা)-এর সাথে মোলাকাতের জন্য তাঁদের পবিত্র রূহকে তাঁদের মূল দেহের আকৃতি স্বরূপ তৈরি করে একত্র করা হয়। কিন্তু সর্বজন স্বীকৃত বিষয় হলো এই যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম কবরে যে দেহ নিয়ে সংরক্ষিত রয়েছেন, দুনিয়ার ঐ দেহ নিয়ে মি'রাজে মোলাকাতের জন্য একত্রিত হয়েছেন। মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার দৃষ্টিতে আত্মিক, দৈহিক, দুনিয়া ও আসমানের সর্বপ্রকার মোলাকাত একই সমান। শুধু প্রাকৃতিক ও বাহ্যিকভাবে অসম্ভব মনে হওয়ার কারণে নবী করীম (সা)-এর হাদীসের বিরোধিতা করা অজ্ঞতা ও দীনের পরিপন্থি ধারণার প্রমাণ বহন করে। বস্তুত প্রকৃত রহস্য আল্লাহ তা'আলা ভাল অবগত আছেন যে, কি অবস্থা ও কোন মর্যাদা সহকারে মোলাকাত হয়েছিল।

হাদীসে বর্ণিত আছে, মু'মিনদের কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং বেহেশতের বাগানে পরিণত করা হয়। সুতরাং পবিত্র রওযাকে যদি ফিরদাউস সদৃশ্য এবং

---

১. তায়সীরুল কারী, ২ খ, পৃ, ৩১২।

২. প্রাগুক্ত। ২ খ. পৃ. ১৪২,

৩. ফাতহুল বারী, ৭ খণ্ডে হাফিয ইবন হাজার আসকালানী উল্লেখ করেন ঃ

واشتشكل روية الأنبياء فى السموات مع ان أجسادهم مستقرة فى قبوره
بالارض واجيب بان أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم او احضرت اجسادهم
لملاقاة النبى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تشريفا وتكريما ويويده لاحديث
عبد الرحمن بن هاسم عن أنس ففيه وبعث له ادم ومن دونه من الأنبياء ـ

ঊর্ধ্বজগতে পরিণত করা হয়, তা হলে এটা অসম্ভব কিছুই নয়। হযরত উসমান (রা)-এর নিকট অবরোধের সময় আরয করা হয় যে, আপনি সিরিয়া গমন করুন, যাতে আপনি সেখানে এই ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন। তখন তিনি বললেন, আমি হিজরতের স্থান (মদীনা মুনাওয়ারা) এবং নবী (সা)-এর নৈকট্য ও সাহচর্য ত্যাগ করতে পারব না।

একবার হযরত আলী (রা) নিজের বাড়ির কপাট তৈরি করার পূর্বে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, মদীনা থেকে দূরে গিয়ে কপাট তৈরি কর। যাতে এগুলো তৈরির শব্দ মসজিদে নববীতে না পৌঁছে এবং এ শব্দের কারণে যাতে কষ্ট না হয়। (যারকানী শারহে মাওয়াহিব, ২ খ. পৃ. ৩০৪; শিফাউস সিকাম, পৃ. ১৭৩)

আবূ নু'আঈম ও অন্যান্য গ্রন্থকার হযরত সাঈদ ইবন মুসাইয়্যেব থেকে রিওয়ায়াত করেন, যে সময় হাররার ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন মসজিদে নববীতে আমি ব্যতীত কেউ ছিল না। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হতো তখন নামাযের আযান হয়নি। আমি পবিত্র রওযা থেকে আযান শুনে নামায আদায় করেছি। (যারকানী, শারহে মাওয়াহিব, ৫ খ, পৃ. ৩৩২)

এ ঘটনার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, রূহ মুবারক ঐ দেহের সাথে সম্পর্ক রয়েছে যা রওয়ায়ে আকদাসে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সাইয়্যেদ সামহূদী 'ওফাউল ওফা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ঃ

وأما ادلة حياة الأنبياء فمقتضاها حياة الابدان كحالة الدينا مع الاستغناء عن الغذاء ومع قوة النحوذ فى العالم وقد اوضحنا المسئلة فى كتابنا المسمى بالوفا لما لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم -

"আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত সম্পর্কে সমস্ত দলীলের দাবি হলো এই যে, নবীগণ কবরে তাঁদের পবিত্র দেহের সাথেই জীবিত আছেন যেভাবে দুনিয়ায় দেহের সাথে জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ নবী (সা)-এর কবরের জীবন দৈহিক জীবন হওয়ার মধ্যে দুনিয়ার জীবনের সাদৃশ রয়েছে। পার্থক্য হলো এই যে, কবরের জীবনে দৈহিক জীবন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পানাহার থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা দান করেছেন।"

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমস্ত আলিম, নেককার ও মু'মিন ব্যক্তিদের মধ্যে এ ধারা চলে আসছে যে, যদি কেউ মদীনা শরীফে নবী করীম (সা)-এর যিযারতে গমন করে, তখন তাঁর মাধ্যমে রাসূল (সা)-এর খেদমতে সালাম পেশ করে থাকে। উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যে অনেক আওলিয়ায়ে কিরাম রয়েছেন যাঁরা রাসূল (সা)-এর রওযা মুবারকে সালাম পেশ করেন এবং রওযা থেকে

ওয়া আলাইকাস সালাম-এর আওয়ায নিজ কানে শ্রবণ করে থাকেন। (ফায়যুল কাদীর ২ খ. পৃ. ৪৭৯)

جان می وهم در آرزو اے قاصد آخر بازگو
در مجلس آن نازنمن حرفے که از نامی رود

"(নবী প্রেমে) আশায় আশায় জীবন শেষের পথে, হে বাহক পথিক! অবশ্যই পৌছাবে নবী দরবারে আমার আবেদন (সালাম) এ সব স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে (কিভাবে) আমাদের পক্ষে সমালোচনা ঠিক হতে পারে।"

এটা এ বিষয়ের দলীল ও প্রমাণ বহন করে যে, কবরে পবিত্র দেহের সাথে রূহ মুবারকের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। সেখানে সালাম পেশ করা হয় এবং সেখান থেকে সালামের জবাব শ্রবণ করা যায়।

একটি সন্দেহ ও এর জবাব

কুরআনুল করীমে নবী (সা)-এর ইনতিকাল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ 'নিশ্চয়ই আপনিও মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" (সূরা যুমার ঃ ৩০)

রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ انی رجل مقبوض "নিশ্চয়ই আমাকে কবয করা হবে।" হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের দিন তাঁর খুতবায় বলেন ঃ فان محمداً قد مات "অতঃপর নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন।" এ সংবাদ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ইনতিকাল সম্পর্কে এ সমস্ত দলীল থাকা সত্ত্বেও হায়াতুন্নবীর অর্থ কি হতে পারে?

জবাব ঃ আল্লাহ তা'আলার অকাট্যবাণী ঃ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ "জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী"। (সূরা আনকাবূত ঃ ৫৭)-এর পরিপ্রেক্ষিতে নবী (সা) কিছু সময়ের জন্য মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে জীবিত করেন এবং তিনি পবিত্র রওযায় দৈহিকভাবে জীবিত রয়েছেন। নবী করীম (সা)-এর পবিত্র দেহ গ্রাস করা আল্লাহ পাক মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন। তাঁর এ হায়াত, শহীদগণের হায়াতের চেয়ে অনেক উত্তম। (শারহে মাওয়াহিব, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৩; মাদারিজুন নবুওয়াত, ১ খ. পৃ. ১৬৬, ৫ম অধ্যায়, নবী (সা)-এর ফযীলতের বর্ণনা)।

ইমাম বায়হাকী উল্লেখ করেন ঃ

قال الامام البيهقى فى كتاب الاعتقاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد ما قبضوا ردت اليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء

"ইমাম বায়হাকী (র) 'কিতাবুল ই'তিকাদে' উল্লেখ করেন, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের রূহ্ একবার কবয করার পর তাঁদের রূহ পুনরায় তাঁদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর নবীগণ আল্লাহপাকের নিকট শহীদগণের মত, বরং তাঁদের চেয়ে উঁচু মর্যাদা নিয়ে কবরে জীবিত আছেন।" (ওফাউল ওফা, ২ খ, পৃ. ৪০৬)

শহীদগণের হায়াত সম্পর্কে আল্লামা আলূসী (র) রূহুল মা'আনী গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ঃ

واختلف فى هذه الحياة فذهب كثير من الصلف الى انها حقيقة بالروح والجسد ولكنا لاندركها فى هذه النشأة استدلوا بسياق قوله تعالى عندربهم يرزقون وبان الحياة الروحانية التى ليست بالجسد ليست من حواصهم فلايكون لهم امتياز بذلك على من عداهم وذهب البعض الى انها روحانية ـ

"শহীদগণের হায়াতের হাকীকত সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। পূর্ববর্তী অধিকাংশ আলিমগণের মত হলো এই যে, দেহ ও রূহের সমন্বয়ে গঠিত হলো এই হায়াত। কিন্তু আমরা তা অনুভব করতে পারি না। দলীল হিসেবে তারা পেশ করেছেন আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ 'বরং জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯) প্রকাশ থাকে যে, রিযিক তো দেহের জন্য প্রয়োজন। রূহের হায়াত শহীদগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়। মু'মিন হোক অথবা কাফির রূহানী হায়াত সমস্ত মুর্দার মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং আয়াত بَلْ اَحْيَاءٌ দ্বারা দৈহিক হায়াত উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো রূহানী হায়াত। অতঃপর শহীদগণের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য কি? অথচ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শহীদগণের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট এবং অন্যদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। প্রকাশ থাকে যে, ঐ বৈশিষ্ট্য হলো দৈহিক হায়াত। কোন কোন আলিমের মতে, শহীদগণের হায়াত হলো রূহানী।[১]

সুতরাং শহীদগণের হায়াত যেখানে দৈহিক, সেখানে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম যাঁরা শহীদগণের চেয়ে অনেক উত্তম ও উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন তাঁদের হায়াত অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই দৈহিক হবে।

---

১. قال السيوطى وقل الاوقد جمع مع النبوة وصف الشهادة فيدخلون فى عموم قوله تعالى ـ ولاتحسبن الذين قتلوا الاية ـ زرقانى صفحــ٣٣٣ ج٥

আল্লামা সুবকী (র) বলেন, নবীগণের চেয়ে উঁচু মর্যাদা লাভ করা শহীদগণের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া শহীদগণের এ মর্যাদা লাভ করা (দৈহিক হায়াত) নবীগণের শরী'আত ও মিল্লাতের একামতের জন্য জীবন উৎসর্গের কারণে হাসিল হয়েছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যারা আল্লাহর পক্ষে জিহাদ করবে এবং শাহাদাত বরণ করবে, এই সমস্ত শহীদের মত সাওয়াব নবী করীম (সা)-এর আমলের মধ্যে লিপিবদ্ধ হবে। নবী (সা)-এর মর্যাদা এ সমস্ত শহীদের চেয়ে হায়াতের দিক থেকে অনেক উঁচু মর্যাদা-সম্পন্ন হবে। কেননা দীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা ও স্থাপনকারী হলো নবী (সা) তাই নবী (সা)-এর একক হায়াত দুনিয়ার সমস্ত শহীদগণের হায়াতের চেয়ে অধিক ক্ষমতা ও উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন হবে (শিফাউস সিকাম, পৃ. ১৪০) এ ছাড়া নবী করীম (সা) শহীদও ছিলেন।

সুতরাং হযরত শায়খ জালালউদ্দীন সূয়ুতী (র) বলেন, খুব কম নবীই এরূপ ছিলেন, যেখানে নবূওয়াতের মর্যাদা শাহাদাতের মর্যাদার সাথে একত্র জমা করা হয়নি। কাজেই আম্বিয়ায়ে কিরাম নবী হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেও জীবিত এবং শহীদ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেও জীবিত। কেননা আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

"যারা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেছে, তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯) এর আওতার অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) শাহাদাতের মর্যাদা ও অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন। কেননা তিনি ঐ বিষের ক্রিয়ায় ইনতিকাল করেছেন যা ইয়াহূদীরা খায়বারে, তাঁকে প্রয়োগ করেছিল। (বুখারী)

أخرج أحمد وأبو يعلى والطبرانى والحاكم والبيهقى عن ابن مسعود قال لان احلف تسعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا احب الى من ان احلف واحده انه لم يقتل وذالك ان الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا -(١)

"ইমাম আহমাদ, আবূ ইয়ালা, তাবারানী, হাকিম এবং বায়হাকী রিওয়ায়াত করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি ন' বার এ শপথ করব যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শাহাদাত বরণ করেছেন। এটা উত্তম এর থেকে যে, আমি একবার এই শপথ করব যে, নবী করীম (সা) শাহাদাত বরণ করেন নি। এর কারণ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা নবী (সা) কে নবীও মনোনীত করেছেন এবং শহীদের মর্যাদাও দান করেছেন।

১. যুরকানী, ৫ খ, পৃ. ৩৩২।

বরং নবী (সা) হলেন 'সাইয়্যেদুশ শুহাদা'[১] বা শহীদগণের নেতা। কেননা সমস্ত শহীদের আমল নবী (সা)-এর আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং নবী করীম (সা)-এর হায়াত সমস্ত শহীদের হায়াত থেকে উত্তম ও উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন।

আল্লামা শিহাব খাফাজী (র) বলেন ঃ

الأنبياء والشهداء أحياء وحياة الأنبياء أقوى اذا لم يسلط عليهم الارض فهم كالنائمين والنائم لايسمع ولاينطق حتى يتبه حاشيه حياة الأنبياء للبيهقى -

"আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং শহীদগণ উভয়ই তাঁদের কবরে জীবিত কিন্তু নবীগণের হায়াত শহীদগণের হায়াত থেকে অনেক উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন এবং নবীগণের পবিত্র দেহ গ্রাস করার ক্ষমতা মাটিকে দেয়া হয়নি। আম্বিয়াকে কিরামের পবিত্র দেহ কবরে, যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে। তাঁদের অবস্থা শয়নকারীদের মত। যেমন শয়নকারী নিদ্রিত অবস্থায় জবাব প্রদানে অক্ষম থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দিকে দৃষ্টি না করে।"

হায়াতুন্নবী (সা) সম্পর্কে হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবীর সমাধান ও সমন্বয় সূচক বক্তব্য

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন। তাঁদের পবিত্র দেহ মাটির যে কোন ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে নিরাপদ রয়েছে এবং কবরে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নিমগ্ন রয়েছেন। আরব-অনারবের দার্শনিকবৃন্দ, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, আওলিয়া ও আরেফীন এ বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম ও বুযর্গ হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (র) হায়াতুন্নবী (সা)-এর উপর 'আবে হায়াত' শীর্ষক একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, মা'রিফাত ও বিস্ময়কর তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ এবং كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ এর আলোকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেন, হযরত ঈসা (আ) ব্যতীত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে।

১. সাইয়্যেদ সামহূদী (র) وفاء الوفاء গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৪০৫ পৃ.) উল্লেখ করেছেন ঃ

لاشك فى حياة صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكذاسائر الأنبياء عليهم السلام أحياء فى قبورهم حياة اكمد من حياة الشهداء التى اخبرالله تعالى بها فى كتابه العزيز ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء واعمال الشهداء فى ميزانه

তাঁদেরকে কাফন পরিধান করানোর পর কবরে দাফন করা হয়েছে। অতঃপর দার্শনিকবৃন্দ ও মুহাদ্দিসগণ বলেন, নবীগণের একবার মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পর তাঁদেরকে দ্বিতীয়বার জীবিত করা হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা কবরে জীবিত থাকবেন। নবীগণের উপর যদিও কিছু সময়ের জন্য মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে কিন্তু তা স্থায়ী ও অনন্তকালের জন্য নয় বরং অস্থায়ী ও কিছু সময়ে জন্য ছিল।

হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (র) হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকাল পবিত্র কুরআন ও হাদীস, ইজ্‌মায়ে উম্মাত ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ের উপর ই'তিকাদ ও বিশ্বাস একান্ত জরুরী, অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা জায়িয নয়। আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যুর হাকীকত ও অবস্থা সাধারণ মু'মিন থেকে আলাদা। সাধারণ মু'মিনের মৃত্যুর দ্বারা তার হায়াত সমাপ্ত হয়ে যায় এবং নবীগণের ইনতিকালে তাঁদের হায়াত সুপ্ত থাকে। কাজেই পুনরায় তাঁদেরকে জীবিত করার ফলে তাঁরা কবরে চিরঞ্জীব থাকেন। যেমন মেঘের ছায়ায় সূর্যের আলো ঢাকা পড়ে যায় আবার মেঘ দূরীভূত হলে সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মা'আযাল্লাহ! মাওলানা নানুতুবীর বক্তব্যের অর্থ–কখনো এ নয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর মৃত্যু সংঘটিত হয়নি। বরং তিনি নবীগণের ইনতিকালে বিশ্বাস করা আবশ্যক ও জরুরী মনে করেন। এবং তাঁর সমস্ত বক্তব্য নবীগণের ওফাতকে প্রতিষ্ঠা ও স্থির করে থাকে। এতে অস্বীকারের লেশমাত্রই নেই। যেমন দার্শনিকদের মধ্যে এ মতানৈক্য রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সিফাত ও গুণাবলী আল্লাহপাকের মূল সত্তার অন্তর্ভুক্ত অথবা অন্তর্ভুক্ত নয়। এই সিফাতের অবস্থা নির্ধারণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, মূল ও সিফাতের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। একইভাবে হযরত নানুতুবীর সমস্ত বক্তব্য, আম্বিয়া কিরামের মৃত্যুকে নিশ্চিত করে। এবং তিনি মৃত্যুর বিশ্বাসকে আবশ্যিক ও প্রয়োজনীয় মনে করেন। মাওলানা নানুতুবী বলেন, আমি আম্বিয়ায়ে কিরামদেরকে তাঁদের দুনিয়ার দেহের সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবিত মনে করি এবং আল্লাহপাকের কালাম ঃ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ও اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত নবীর ইনতিকালের ব্যাপারে বিশ্বাস জরুরী মনে করি।[১]

বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে নবীগণের জীবন মৃত্যুর অন্তরালে গোপন থাকে। তাঁদের ইনতিকালের দ্বারা হায়াত শেষ হয় না। হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের ইনতিকাল তাঁদের হায়াতের জন্য পর্দা স্বরূপ। হায়াত বন্ধ হওয়া হায়াত নিঃশেষ হওয়া নয়।[২]

---

১. লাতায়েফে কাসেমী, পৃ. ৪০৩।

২. আবে হায়াত, মাওলানা কাসেমী, পৃ. ৪২-৪৩।

বরং ইনতিকালের সময় আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত আরো অধিক উজ্জ্বল হয়ে থাকে। আম্বিয়ায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, যেমন কোন প্রদীপ হাড়ি বা কোন পাত্রে রেখে কোন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া এবং প্রদীপ নিভে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নিভে যাওয়াতে প্রদীপের আলো দূরীভূত হয়ে যায় কিন্তু প্রদীপ কোন পাত্রে রেখে ওপরে কোন ঢাকনা রেখে দেওয়ার ফলে আলো ঢেকে যায় কিন্তু দূরীভূত হয় না। বরং ঢাকনা দেয়ার ফলে সমস্ত আলো চারদিকে ছড়িয়ে না পড়ে ঐ পাত্রে জমা হয়, যার ফলে আলোর উজ্জ্বলতা আরো অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সাধারণ মু'মিনের মৃত্যুর মাধ্যমে তার হায়াতের নূর অনন্তকালের জন্য নিভে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকালের মাধ্যমে তাঁদের হায়াতের নূর নিভে যায় না; বরং কিছু সময়ের জন্য আবৃত হয়ে যায়। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে পার্থক্য প্রতীয়মান হয় না, প্রদীপ যদি নিভে যায় অথবা কোন পাত্রে রেখে দেয়ার কারণে এর আলো ঢেকে যায়, তা হলে অন্ধকার ঘরে উভয় অবস্থা একই সমান দৃষ্টিগোচর হবে।[১]

বাহ্যিক ইনতিকালের কারণে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের কবরে গোপন হয়ে যাওয়া চিল্লায় গমন অথবা পর্দার অন্তরালে গমন অথবা নির্জনতা অবলম্বন মনে করা হবে।[২] আম্বিয়ায়ে কিরামের কবরে জীবিত থাকা সম্পর্কে হযরত মাওলানা নানুতুবী (র) নিম্নলিখিত দলীল পেশ করেছেন।

১. হযরত আম্বিয়াতে কিরাম কবরে তাঁদের পবিত্র দেহ পূর্বের মত সঠিক থাকে। মাটি তাঁদের পবিত্র দেহ গ্রাস করতে পারে না, ফলে তা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকেন।

২. চিরদিনের জন্য আম্বিয়ায়ে কিরামের বিবিগণের পুনর্বিবাহ হারাম হয়ে যায়।

৩. আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্পদে কেউ অংশীদার হয় না।

উপরোল্লিখিত তিনটি দলীল দ্বারা হায়াতে আম্বিয়া প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া এটাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্র রূহের সম্পর্ক তাঁদের দেহের সাথে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না; বরং ইনতিকালের পরও আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক পূর্বে মতই বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে শহীদগণের মৃত্যুর কারণে দুনিয়ার দেহের সাথে তাদের রূহের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং জান্নাতের দেহের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ কারণেই শহীদগণের সম্পদে মীরাস (অংশীদারিত্ব) বন্টন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্পদে মীরাস বন্টন হয় না। অথচ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ করেন,

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান।" (সূরা নিসা ঃ ১১)-এর নির্দেশের মধ্যে সবাই অন্তর্ভুক্ত। সর্বসাধারণ হোক অথবা রাসূল হোক। এছাড়া শহীদগণের স্ত্রীদের ইদ্দত পালনের পর বিবাহের অনুমতি ও বিধান রয়েছে। এতে শহীদগণের হায়াত শেষ হয়ে যাওয়ার দলীল প্রমাণিত হয়, কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো ঃ لَاتَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا ঃ "নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীগণকে কখনো বিবাহ করো না।" অর্থাৎ উম্মাহাতুল মু'মিনীন -এর সাথে চিরদিনের জন্য বিবাহ বন্ধন হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা)-এর ইনতিকালের পরও বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়নি। যেমন ঃ ازواجه امهاتهم এর প্রমাণ বহন করে যে, স্ত্রীর সম্পর্ক পূর্বের মতই বিদ্যমান। কেননা ازواجه শব্দটি زوجه এর বহুবচন। এটা হলো সিফাতে মুশাব্বাহ (صفت مشبه) যা অব্যাহত অবস্থাকে নির্দেশ করে। এমনিভাবে পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে وَلَاتَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاءُكُمْ "নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না।" (সূরা নিসা ঃ ২২) সুতরাং যেখানে উম্মুল মু'মিনীনগণের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়নি, সেখানে উম্মুল মু'মিনীনগণ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءَ الاية "এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের নিষিদ্ধ।" (সূরা নিসা ঃ ২৪) আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[১]

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহের স্থায়িত্ব রূহ্ ও দেহ ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। শহীদগণের মধ্যে হায়াত সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় মাটির দেহের সাথে কোন সম্পর্ক বাকী থাকে না। শহীদ ও সাধারণ মু'মিনের পার্থক্য এই যে, শহীদগণের রূহের প্রথম দেহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর অন্য দেহের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ হিসাবে তাদের আত্মিক ও দৈহিক উভয় হায়াত হাসিল হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে উম্মাতের অন্যান্য মু'মিন বান্দাদের এর জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না। মোটকথা দুনিয়ার দেহের সাথে উভয়ের কোন সম্পর্ক থাকে না। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ দুনিয়ার দেহের সাথে কিভাবে সম্পর্ক রাখতে পারে যে, তাদের মাল-সম্পদ ও স্ত্রীগণকে তাদেরই সম্পদ ও স্ত্রী হিসেবে মনে করা হবে, অন্য কাউকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করা না হবে এবং অংশীদারগণকে উত্তরাধিকার বন্টন ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হবে না? কেননা রূহের সাথে দেহের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণেই স্ত্রী ও ধন-সম্পদের প্রয়োজন হয়ে থাকে; একমাত্র রূহের প্রয়োজনে নয়। সুতরাং দেহের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর স্ত্রী ও ধন-সম্পদের সাথে যে সমস্ত বিষয় ও বস্তু সম্পর্কিত ছিল, তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং

১. পূর্বোক্ত ১৮৫।

শহীদগণের হায়াত থাকা সত্ত্বেও তাদের স্ত্রীগণের অন্যান্য মুসলিম নারীর মতই ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর বিবাহের অধিকার থাকবে। তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মীরাস জারী হবে। অর্থাৎ তার অংশীদারগণ সম্পদের অংশ পাবে। শহীদগণের ইনতিকালে তাঁদের প্রথম হায়াত অবশ্যই সমাপ্ত হয়ে যায় এবং কুরআন মজীদ ও হাদীসে তাঁদের যে হায়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো দ্বিতীয় হায়াত। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ দ্বারা ঐ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তবে আম্বিয়া কিরামের হায়াত বিচ্ছিন্ন হয় না। এ জন্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন এবং নবী (সা)-এর সম্পদে তাঁর বৈবাহিক সূত্রের অধিকার ও মালিকানা পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান থাকবে এবং অন্য কোন ব্যক্তির জন্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে বিবাহ করার অধিকার ওয়ারিসগণের মাল ও সম্পদ বন্টনের অধিকার থাকবে না। বস্তুত আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যু এবং সাধারণের মৃত্যুর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একদিকে নবী করীম (সা)-এর ইনতিকাল পর্দার অন্তরালে গোপন রাখা হয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ লোকের হায়াত সমাপ্তির মাধ্যমে মৃত্যুর প্রকাশ্য বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত নবী করীম (সা) কে "اِنَّكَ مَيِّتٌ" বলে পৃথকভাবে সম্বোধন করেছেন এবং অন্যান্যদেরকে اِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ বলে পৃথকভাবে সম্বোধন করেছেন। যেমন সংযুক্ত আয়াত ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ (অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা তো পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে। (সূরা যুমার ঃ ৩১) সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে اِنَّكُمْ مَيِّتُوْنَ বলেন নি। সুতরাং ঐ মৃত্যুই মর্তবার পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে।

সুতরাং যেভাবে নবী (সা)-এর হায়াত এবং মু'মিনের হায়াতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং যেভাবে নবীর নিদ্রা ও মু'মিনের নিদ্রার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

تنام عيناى ولاينام قلبى وكذالك الأنبياء تنام أعينهم ولاتنام قلوبهم (بخارى)

"আমার চোখ নিদ্রা মগ্ন হয় কিন্তু আমার অন্তর নিদ্রামগ্ন হয় না। এমনিভাবে আম্বিয়াগণের চোখ নিদ্রামগ্ন হয় এবং তাঁদের অন্তর নিদ্রামগ্ন হয় না।"

এমনিভাবে নবী করীম (সা)-এর মৃত্যু এবং মু'মিনদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, النوم اخو الموت। (নিদ্রা মৃত্যুর ভাই) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ يَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ـ

"আল্লাহ জীবসমূহের (মানুষের) প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও (হরণ করেন) নিদ্রার সময়।" (সূরা যুমার ঃ ৪২) আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মৃত্যু এবং নিদ্রাকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং উভয়ের হাকীকত توفى এবং امساك। বর্ণনা করেছেন।

সাধারণ মু'মিনদের স্বপ্নের অবস্থায় রূহের হরণ ও বিরত রাখার কারণে তার জ্ঞান ও অনুভূতি বন্ধ রাখা হয় কিন্তু স্বপ্নে আম্বিয়ায়ে কিরামের এরূপ হয় না। এ কারণেই নবীগণের স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় ওহীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নবীগণের চোখ নিদ্রামগ্ন হয় এবং তাঁদের অন্তর জাগ্রত থাকে। তাঁদের স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় ওহী নাযিলের মত গণ্য হয়ে থাকে। যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর ঘটনা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

إِنِّىْ أَرٰى فِى الْمَنَامِ أَنِّىْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى [হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ) কে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, এতে তোমার অভিমত কি বল? –সূরা সাফ্ফাত ঃ ১০২] এ আয়াত এ বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে। স্বপ্নের সময় সাধারণ মু'মিনের জ্ঞান ও অনুভূতির শক্তি স্থগিত করা হয় কিন্তু হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্নের সময় ও জ্ঞান যথাযথ বিদ্যমান থাকে। এ পর্যন্ত হযরত মাওলানা নানুতুবী (র) এর আলোচনার সারাংশ সমাপ্ত করা হলো।

এ গ্রন্থের রচয়িতা হযরত মাওলানা ইদ্রিস কান্দুলভী (র) বলেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং নবী করীম (সা)-এর হাদীস দ্বারা হায়াতুন্নবীর বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) আত্মিক ও দৈহিকভাবে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে হযরত জিবরাঈল হযরত মিকাঈল এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তাগণের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন। হযরত আদমকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছেন। মাটির দেহকে নূরের তৈরি দেহের (ফিরিশতার) সিজ্দার স্থান বানিয়েছেন এবং হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামকে দৈহিকভাবে সাধারণ মানুষের উপর সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তাঁদের দেহ এরূপ পবিত্র, সূক্ষ্ম ও সুগন্ধময় করে সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁদের দেহ থেকে যে ঘাম নির্গত হয়, তা মিশক আম্বর থেকেও সুগন্ধময় হত।[১]

১. ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরের ২য় খণ্ডের ৪৫৫ পৃষ্ঠায় পবিত্র কুরআনের আয়াত ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العلمين (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম ও নূহ এবং হযরত ইবরাহীমের ও হযরত ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতের উপর মনোনীত করেছেন) এর তাফসীরে আল্লামা হুলায়মীর কথা বর্ণনা করেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম দৈহিক ও আত্মিক দিক দিয়ে দুনিয়ার সবার থেকে আলাদা ও মর্যাদাসম্পন্ন। (বিস্তারিত তাফসীরে কবীর দ্রষ্টব্য)।

أخرج البيهقي وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت يارسول الله انك تدخل الخلاء فاذا خرجت دخلت فى اثرك فما ارى شيئًا الا الى اجد روائحة المسك قال انا معشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح أهل الجنة فما خرج منها من شئ ابتلعته الارض ـ(خصائص كبرى، ص٧٠ج١

"ইমাম বায়হাকী (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর আমি আপনার পর পর সেখানে গমন করি কিন্তু আমি সেখানে কিছুই দেখতে পাই না, শুধু মিশক-আম্বরের সুগন্ধি পেয়ে থাকি। নবী (সা) বলেন, আমরা নবীদের বিশেষ মর্যাদা হলো এই যে, বেহেশতের রূহসমূহের মতই আমাদের দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে। যে কোন বস্তুই নবীগণের দেহ থেকে বের হয়, তা জমি ও মাটি শোষণ করে নেয়।"

অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ বেহেশতবাসীর রূহের মত সূক্ষ্ম ও পবিত্র হয়। বেহেশতবাসীর দেহ থেকে যা কিছু নির্গত হয় তা যেমন মিশক আম্বর থেকে অধিক পবিত্র ও সুগন্ধময় হয়, তেমনি আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ থেকে যা কিছু নির্গত হয় তা মিশক আম্বর থেকে অধিক সুগন্ধময় হয়ে থাকে। আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহের প্রকৃতি, হাকীকত, মানসিক অবস্থা ও গঠন প্রকৃতি বেহেশতবাসীর মতই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণেই আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্র দেহ ইনতিকালের পর বেহেশতের রূহ ও দেহের মত ধ্বংস ও পচন থেকে নিরাপদ থাকে। এজন্য আলিমদের একটি দল নবী (সা)-এর উচ্ছিষ্ট ও মলমূত্র পবিত্র বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। (শারহে শিফা, ১ খ. পৃ. ১৬০)

হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার যখন রাসূল (সা) শিঙ্গা লাগালেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, এ নির্গত রক্ত এরূপ কোন স্থানে ফেলে আসবে সেখানে কারো দৃষ্টিগোচর না হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) ঐ রক্ত নিজেই পান করে ফিরে আসেন। নবী (সা) জিজ্ঞাসা করেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি কি করেছে? আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঐ রক্ত অত্যন্ত গোপন স্থানে রেখে দিয়েছি যেখানে কারো দৃষ্টিগোচর হবে না। রাসূল (সা) বললেন, সম্ভবত তুমি তা পান করেছে। আফসোস! (আবূ ইয়ালা, তাবারানী, হাকিম ও বায়হাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)[১]

উম্মে আয়মান ও উম্মে ইউসুফ কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর প্রস্রাব পান করা এবং তাদের কখনো কোন অসুখ না হওয়া এটাও হাদীসে বর্ণিত আছে।[২]

১. খাসায়েসুল কুবরা, ১ খ, পৃ. ৬৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

মনে হয় হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ হলো তাঁদের পিতা হযরত আদম (আ)-এর দেহের নমুনা। যিনি বেহেশতে আল্লাহ পাকের কুদরতী হাতে তৈরি হয়েছেন। এজন্য ইনতিকালের পর মাটির ধ্বংস থেকে নিরাপদ ও হিফাযতে থাকেন। সেভাবে বেহেশতবাসীর দেহ কোন পরিবর্তন থেকে নিরাপদ থাকবে, তেমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহও ইনতিকালের পর কোন পরিবর্তন থেকে হিফাযতে থাকবে। হযরত আদমের মূল ও প্রিয় সন্তান হলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ الولد سر لابيه সুতরাং এটা আশ্চর্য নয় যে, ماخلقت بيدى-এর নূর ও বরকত এবং কুদরতী হাতে সৃষ্টি করার প্রভাব আম্বিয়া কিরামের মধ্যে তাদের সম্মানিত পিতা হযরত আদম (আ) থেকে অংশীদার হিসেবে লাভ করেছেন। যে বস্তু মনোনীত ও বাছাই করার উপাদানের অন্তর্ভুক্ত-এর অংশীদারিত্ব শুধু مصطفين الاخيار পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে এবং ইনতিকালের পর নবীগণের দেহ নিরাপদ থাকা হযরত আদমের ঐ মনোনীত হওয়ার উপাদানের অন্তর্ভুক্ত যার অংশীদারিত্ব বিশেষ মনোনীত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে কাযী ইয়াযের আল-শিফা ও খাসাইসুল কুবরা পর্যালোচনা করুন।

যে ব্যক্তি আম্বিয়ায়ে কিরামের দৈহিক ও আত্মিক বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে তার এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ থাকবে না যে, নবীগণ যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের মতই হায়াতের অধিকারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নবীগণের হায়াতের হাকীকত ও অবস্থা সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সমস্ত দুনিয়ার জাগরণ ও উপলব্ধি তাঁদের জাগরণের সাথে ততটুকু সম্পর্ক নেই যে সম্পর্ক দরিয়ার সাথে একফোঁটা পানির হয়ে থাকে। আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্নের অবস্থা হলো এই যে, স্বপ্নের সময় নবীগণের চোখ নিদ্রামগ্ন থাকে কিন্তু অন্তর সজাগ থাকে। যেমন বুখারী শরীফের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবীদের নিদ্রা অযূ ভঙ্গে কারণ হয় না। যেমন ঃ

نوم النبى عند الامام الأعظم لاينقض الوضوء حتما فاعلم

"ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে নবীগণের নিদ্রা অযূ ভঙ্গের কারণ হয় না।" হাদীসে আরো বর্ণিত আছে ঃ ماتثاب نبى قط وما احتلم قط (নবীগণের কখনো হাই উঠে না এবং নবীগণের কখনো স্বপ্নদোষ হয় না)। কেননা হাই উঠা এবং স্বপ্নদোষ শয়তানের খেলা হয়ে থাকে। আম্বিয়ায়ে কিরাম এর থেকে পবিত্র থাকেন।[১]

১. যারকানী, শারহে মাওয়াহিব, ৫ খ, পৃষ্ঠা, ২৪৮।

আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্ন ওহী। যেমন হযরত ইবরাহীম এর ঘটনা ঃ

اِنِّى اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى আয়াত এর সুস্পষ্ট দলীল এবং অসম্ভব যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্ন اضغاث احلام (অর্থহীন স্বপ্ন) এর পর্যায়ের হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

وكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا نام لم نوقظ حتى تكون هو يستقظ لانا لاندرى ما يحدث له فى نومه (بخارى) -

"সাহাবায়ে কিরাম বলেন, নবী করীম (সা) যখন শয়ন করতেন তখন আমরা তাঁকে জাগ্রত করতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজে জাগ্রত না হতেন। কেননা আমরা অবগত নই যে, স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী (সা)-এর উপর কি বিষয় নাযিল হয়। সুতরাং তাঁকে জাগ্রত করে এই ওহী বন্ধ বা বিচ্ছিন্ন করার কারণ কেন হব? (বুখারী শরীফ, কিতাবুত তায়াম্মুম, পবিত্র মাটি ও মুসলিমের অযূ, ১ খ, পৃ. ৪৯; কাসতাল্লানী, ১ খ, পৃ. ৩৬; ফাতহুল বারী, ১ খ, পৃ. ৩৮০)।

হযরত মূসা (আ) যখন শয়ন করেন তখন হযরত ইউসা (আ) বলেন, لا أوقظه অর্থাৎ আমি হযরত মূসাকে (আ) জাগ্রত করব না। (বুখারী)

সুতরাং যেভাবে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত, তাঁদের জাগরণ এবং তাঁদের স্বপ্ন সাধারণ মু'মিনদের হায়াত, জাগরণ এবং স্বপ্ন থেকে পৃথক, তেমনি আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকালের পরও সাধারণ মু'মিনের মৃত্যু থেকে আলাদা ও পৃথক।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا এর মধ্যে সাধারণ মানুষের মৃত্যুকে দু'ভাগে বিভক্ত করছেন। একটি হলো নিদ্রার মৃত্যু অপরটি হলো মৃত্যু। প্রকাশ থাকে যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের توفى منام বা স্বপ্নে মৃত্যু সাধারণ মানুষের توفى منام থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্বপ্ন দেখার সময় সাধারণ মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুভূতি ও জ্ঞান স্থগিত হয়ে যায় কিন্তু স্বপ্নের সময় আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুভূতি স্থগিত হয় না। কেননা তাঁদের চোখ নিদ্রামগ্ন হয় কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে। অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের নিদ্রা বা স্বপ্নের সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে অচেতন মনে হয় এবং অভ্যন্তরীণভাবে তাঁরা জাগ্রত থাকেন।

এমনিভাবে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকাল সাধারণ মানুষের মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও পৃথক এবং স্বপ্নের মত বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁদের ইনতিকাল হলেও অন্তরালে তাঁদের হায়াত গোপন থাকে।

হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্পর্কে এ ইতিকাদ ও বিশ্বাস একান্ত জরুরী ও আবশ্যক যে, মানবীয় চাহিদার কারণেই তাঁরা শয়ন করেন কিন্তু এ ইতিকাদ জরুরী নয় যে, তাঁদের শয়ন আমাদের শয়নের মত, বরং তাঁরা স্বপ্নেও জাগ্রত থাকেন। এমনিভাবে

হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে এ ইতিকাদ ও বিশ্বাস রাখা জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ এবং كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ -এর দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের উপরও মৃত্যু সংঘটিত হয়ে তাকে। তবে এ বিশ্বাস জরুরী নয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যু আমাদের মৃত্যুর মত। যেভাবে আমরা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে থাকি, তেমনিভাবে নবীগণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে থাকেন। বরং এরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ আদবের পরিপন্থি যা নিঃসন্দেহে নিজের মধ্যে অপরাধ গোপন রাখার নামান্তর। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় মর্তবা অনুযায়ী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে।

مرگ هر ایك اے پسر همورنگ اوست * پیش دشمن دشمن وبردوست دوست

"হে বৎস, প্রত্যেকের মৃত্যু অবস্থা অনুযায়ী সংঘটিত হয়, দুশমনের সামনে দুশমন এবং বন্ধুর সামনে বন্ধুর ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি আমল অনুয়ায়ী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে।"

خلق درباز اریکسان مے روند * آں یکے درذوق ودیگر دردمند

"এ দুনিয়ার বাজারে অর্থাৎ সমাজে মানুষ একত্রে চলাচল করে বসবাস করে। একজন আবেগে উৎফুল্ল হয়, আবার অন্যজন দুঃখিত ও ব্যথিত হয়।"

هم چنیں درمرگ یکساں مے رویم * نیم درخسران ونمیے خسرویم

"এভাবে আমরা মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছি, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হয়ে আবার, সফল হয়ে এ দুনিয়া ত্যাগ করছে।"

নৈকট্য লাভকারীগণের মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করে আরিফ রূমী বলেছেন ঃ

ظاهرش مرگ دبباطن زند گی * ظاهرش ابترنهاں پائنیدگی

"মৃত্যু এমন একটি জিনিস, যা বাহ্যত দেখতে মৃত্যু মনে হয় এবং চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া মনে হয় কিন্তু বাহ্যিকভাবে ধ্বংস বা হারিয়ে যাওয়া মনে হলেও এর মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে অনন্ত জীবন।"

মনীষীগণের উল্লিখিত উক্তি বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে শুধু এই যে, মাওলানা নানুতুবীর ব্যাখ্যা আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকালে হায়াত গোপন রাখা হয়েছে, হায়াত সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়নি। এরূপ ব্যাখ্যা নয় যে, যা অস্বীকার করার সুযোগ রয়েছে।

হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (র) স্বীয় রচিত গ্রন্থ 'আবে হায়াত' এবং অন্যান্য লেখায় এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ এবং كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ -এর প্রেক্ষাপটে আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকাল সম্পর্কে ইতিকাদ ও বিশ্বাস একান্ত জরুরী। শুধু এর

প্রকার নির্ধারণের ব্যাপারে কিছু বিষয় রয়েছে। প্রকাশ তাঁকে যে, সাধারণ বিষয়ের ঐক্য থাকার ফলে এটা জরুরী নয় যে, সম্মান-মর্যাদা, সিফাত বা গুণাবলী ও অবস্থার মধ্যে ঐকমত্য হতে হবে। মর্যাদা ও মর্তবার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য হবে।

گر فرق مراتب نکنی زند بقی

"ভালভাবে জেনে রেখো! সৃষ্টিকুলের বাহ্যিক অবসর (চেহারা) ই হচ্ছে অস্তিত্বহীনতা। বরং ধ্বংসের ওপর দাঁড়িয়েই তা তার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে।"

সুতরাং যেভাবে আম্বিয়ায়ে কিরামের নিদ্রা ও স্বপ্নে তাঁদের জাগরণ ও সচেতনতা গোপন থাকে, এমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকালে যদি তাঁদের হায়াত গোপন থাকে তাহলে এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই।

মনীষীগণ বলেন, সম্ভাবনা বিদ্যমান, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এগুলোর অস্থায়ী বিদ্যমানতার মধ্যে এদের অস্তিত্বহীনতা গোপন রয়েছে। হযরত খাযা বাকীবিল্লাহ (র) বলেছেন ঃ

بشناس که کائنات رودرعدم اند * بل درعدم ایستاده ثابت قدم اند

"জেনে রাখ প্রত্যেক সৃষ্টির পেছনে রয়েছে তার অনস্তিত্ব এবং তার অনস্তিত্বের মধ্যে তার স্থায়িত্ব বিরাজমান রয়েছে।"

সম্ভাব্য বিষয়ের বিদ্যমানতা মূলত হাকীকত বা যথার্থতার বিদ্যমানতা নয়। শুধু এক বাহ্যিক দৃষ্টির অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

كل مافى الكون وهم اوخيال * او عكوس فى المرايا أوظلال

"বিশ্বজগতে যা কিছু রয়েছে সবই কল্পনা বা খেয়াল অথবা প্রতিবিম্ব ও আলোকচিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।"

আমাদের এ অস্তিত্বই অস্তিত্বহীনতার আয়না, যার মধ্যে প্রতি পদে পদে অস্তিত্বহীনতা উজ্জ্বলভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। মানুষ যখন রোগগ্রস্থ হয় তখন সে তার হায়াতের মধ্যে মৃত্যু দেখতে পায় এবং এটা আমাদের জন্য আয়না স্বরূপ যাতে মানুষ তার মৃত্যু অবলোকন করে। যেখানে কোন বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয় সেখানে স্বীয় অস্থায়ী ক্ষমতার পর্দায় স্বীয় মূল অক্ষমতা দৃষ্টিগোচর হয়। যখন কোন সূক্ষ্ম মাসয়ালা সামনে উপস্থিত হয় এবং বিবেক এর সমাধানের জবাব প্রদান করে তখন স্বীয় লব্ধ জ্ঞানের পর্দায় নিজের প্রকৃত অজ্ঞানতার পর্দা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

সুতরাং এমনিভাবে যদি কোন আলিমে রাব্বানী ও আরিফ বিল্লাহ এবং চতুর্দশ' শতাব্দির একজন মৌলভী অর্থাৎ মাওলানা নানুতুবী স্বীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকালের পর্দায় তাঁদের মূল হায়াত অবলোকন করেন তাহলে এটা অসম্ভব হবে কেন?

নিঃসন্দেহে হায়াত এবং মউত বা জীবন-মরণ একটি অপরটির বিপরীত ও বিরোধী। কিন্তু একটি বিপরীতের আওতায় অপর বিপরীতের গোপন হয়ে যাওয়া আম্বিয়ায় ও ওলীগণের মধ্যে স্বীকৃত। আরিফ রূমী (র) বলেছেন ঃ

در عدم هستی برا درچون بود * ضد اندر ضد کے مکتون شود

"অবিনশ্বরতার মধ্যেই নশ্বরতা রয়েছে এবং বিপরীত বস্তুর মধ্যেই বিপরীত বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।"

মাওলানা রূমী মসনবী শরীফে আল্লাহর বাণী ঃ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ الاية এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

যখন পূববর্তী নেককারও ওলামায়ে রাব্বানীর পবিত্র হায়াত ও যিন্দিগীর কথা মনে আসে তখন এটা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের জীবন মৃত্যু সদৃশ এবং আমাদের জাগরণ স্বপ্ন সদৃশ অর্থাৎ আমাদের এই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ জীবন আমাদের মৃত্যু গোপনকারী। আমাদের নামসর্বস্ব জাগরণের মধ্যে আমাদের গাফিলতির স্বপ্ন লুক্কায়িত রয়েছে। আমাদের অবস্থা হলো এই যে,

وخبّرنى البواب انك نائم * فقلت اذ استيقظت ايضًا فنائم

"প্রহরী আমাকে এ সংবাদ প্রদান করে বলে যে, তুমি নিদ্রিত কিন্তু আমি বলি যখন আমি জাগ্রত তখনও আমি নিদ্রিত।" (কেননা জাগ্রত অবস্থায়ও আমি নিদ্রিত ব্যক্তির মতই গাফিল রয়েছি)।

হযরত মাওলানা আরিফ রূমী (র.) বলেন ঃ

آزمودم مرگ من درزندگی است
چوں رهم زیں زند گی پائند گی است

"আমি এটা উপলব্ধি করেছি যে, আমার মৃত্যুই আমার জীবন এবং আমার জীবনের অবসানই আমার স্থায়িত্ব।"

ইমাম কুরতবী (র) আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াতের দলীল বর্ণনা করার পর উল্লেখ করেন ঃ

يحصل من جملته القطع بان موت الأنبياء انما هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لاندركهم وان كانوا موجودين أحياء ولايراهم احد من نوعنا الا من خصه الله تعالى بكرامة من أولياءه انتهى كذا فى شرح المواهب للزرقانى صفحــ٢٣٤ ج٥ وكذا فى أبناء الاذكياء بحياة الأنبياء للسيوطى صفحــ١٤٩ ج٢ از مجموعة رسائل سيوطى -

"এ সমস্ত দলীল দ্বারা হায়াতুন্নবী সম্পর্কে দৃঢ় ও অকাট্য জ্ঞান লাভ করা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যুর হাকীকত শুধু এই যে, তাঁদেরকে আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখা হয়েছে কিন্তু আমরা তা অনুভব করতে সক্ষম নই। যদিও তাঁরা জীবিত ও বিদ্যমান এবং আমাদের কেউ তাঁদেরকে দেখতে পায় না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাঁর কোন ওলী ও নেক বান্দাকে কিরামত বা অলৌকিকভাবে জাগ্রত অবস্থায় কোন নবীর যিয়ারত নসীব করেন তা অবশ্য হতেই পারে।" (শারহে মাওয়াহিব যারকানী, ৫ খ. পৃ. ২৩৪; আবনাইল আসফিয়া বি হায়াতিল আম্বিয়া লিস-সূয়ূতী, ২ খ, পৃ. ১৪৯)

আল্লামা শিবলী, আল্লামা সুয়ূতী, আল্লামা যারকানী এবং হাফিস ইবন কায়্যিম-এর মতে এটাই উত্তম ও গ্রহণযোগ্য যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যুর হাকীকত শুধু এই যে, তাঁদেরকে আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন করে দেয়া হয়েছে। তাঁরা নিঃসন্দেহে জীবিত, যদিও আমরা আমাদের চোখে তাঁদের হায়াত পর্যবেক্ষণ বা অবলোকন করতে সক্ষম নই। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি মূলত জীবিত কিন্তু তার জীবিত থাকা আমরা অনুভব করতে পারি না। সমস্ত মুহাদ্দিসের এটাই মত।

ইমাম বায়হাকী (র) جزء حيات الأنبياء গ্রন্থের শেষ দিকে উল্লেখ করেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যু কোন দিক দিয়েই মৃত্যু নয় এবং তাঁদের মৃত্যুর হাকীকত শুধু সংজ্ঞাহীনতা অনুভূতি লোপ পাওয়ার পর্যায় পড়ে। আল্লামা মুনাভী 'ফয়যুল কাদীর' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, কখনো কখনো অনুভূতি স্থগিত হয়ে যাওয়াকে মৃত্যু আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। যেমন হাদীসে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا واليه النشور পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। এ হাদীসে أحيانا দ্বারা জাগ্রত করা এবং اماتنا দ্বারা শয়ন বা শায়িত করানো বুঝানো হয়েছে। نوم বা নিদ্রার উপর মৃত্যু শব্দটি আরোপ করা হয়েছে। শায়খ ইবন আল্লান মক্কী 'শারহে কিতাবুল আযকার'[১] এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আল্লামা যুবায়দী শারহে কামূসে[২] মউতের অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

این سخن رانست هرگز اختتام * ختم کن والله اعلم بالسلام

"এ আলোচ্য বিষয় তো কখন বলে শেষ করা যাবে না। মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত, তাই সালাম নিবেদন করে ইতি টানলাম।"

মহানবী (সা) এর পবিত্র স্ত্রীগণ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ

১. শরহে কিতাবুল আযকার, ১ খ, পৃ. ২৮৭।

২. কামূস ১ খ, পৃ. ৫৮৬।

"নবী করীম (স) মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।" (সূরা আহযাব ঃ ৬)

মু'মিনদের ঈমানের অস্তিত্ব ও তাদের আত্মিক জীবন নবীগণের সাথে সম্পর্ক এবং সান্নিধ্যের কারণে হাসিল হয়ে থাকে। এজন্য নবীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য আত্মিক পিতা। যেমন এক কিরাআতে আছে। وَهُوَ اَبٌ لَهُمْ নবী হলেন পিতার স্থলাভিসিক্ত এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে মা-এর মত।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَاتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا - وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى - وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ - اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا - وَاذْكُرْنَ مَايُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا.

"হে নবী পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তা হলে অন্য পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলী যুগের মত নিজদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় হলো তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করা এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করা। আল্লাহর আয়াত ও হিকমতের কথা যা তোমাদের গৃহে পাঠ করা হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে, আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২-৩৪)

কতিপয় প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম বিষয়

১. উম্মাহাতুল মু'মিনীন এই অতীব মর্যাদাসম্পন্ন উপাধি ঐ স্ত্রীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট যাঁরা নবী (সা)-এর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাঁরই আওতাধীন জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু বিবাহ উৎসব এবং ঘনিষ্ঠতা লাভের পূর্বেই যাদেরকে তালাক প্রদান করেছেন, তাদের জন্য উপাধি ব্যবহার করা যাবে না।

২. এ জন্যই নবীপত্নিগণকে মু'মিনদের সম্মানিত 'মা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (সা)-এর ইনতিকালের পর তাঁদের সাথে কোন ব্যক্তির বিবাহ

করা অবৈধ ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ আ'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَاَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا - اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَنْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ـ

"তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া সংগত নয় এবং তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনো বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা বড়ই অপরাধ। যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

একজন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন লোকের জন্য এটা চিন্তা করা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে, তার স্ত্রী তার পর অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হবে। প্রকাশ থাকে যে, নবী (সা) ব্যতীত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন বিরাট ব্যক্তি আর কে হতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, যখন তাঁদেরকে উম্মাহাতুল মু'মিনীন ঘোষণা করা হয়েছে, অতঃপর কারো সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া তাঁর মর্যাদা ও মর্তবার পরিপন্থি।

তৃতীয়ত, স্বীয় পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করা বিবেক ও সামাজিক সর্বদিক দিয়ে কদর্য ও গর্হিত কাজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفْ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَّ سَاءَ سَبِيْلاً ـ

"নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। পূর্বে যা হয়েছে তা নিশ্চয়ই অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।"(সূরা নিসা ঃ ২২)

اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً। এর দ্বারা বিবেকের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করা বিবেকের দৃষ্টিতে ও সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা ও ঘৃণ্য কাজ এবং وَسَاءَ سَبِيْلاً দ্বারা প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিতেও ঘৃণ্য– এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও গর্হিত আচরণ। হযরত বারাআ ইবন আযিব (রা) বর্ণনা করেন, আমি আমার মামাকে দেখলাম তিনি ঝান্ডা নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি জবাবে বললেন, এক ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। নবী (সা) তাকে হত্যা করার এবং তার মালামাল বাজেয়াপ্ত

করার জন্য আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। (আবদুর রাযযাক, ইবন আবূ শায়বা, আহমদ, হাকিম ও বায়হাকী থেকে বর্ণিত)।

সুতরাং জন্মদাতা পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করা যেখানে বিবেক, শরী'আত ও সামাজিক সর্বদিক দিয়ে ঘৃণ্য ও গর্হিত কাজ, সেখানে আত্মিক পিতা অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করার চিন্তা করা অধিকতর ঘৃণ্য ও গর্হিত কাজ হবে।

চতুর্থত, যদি কোন মহিলা দ্বিতীয় স্বামীর নিকট তার পূর্ববর্তী স্বামীর সৌন্দর্য ও গুণাবলী বর্ণনা করে, তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর স্বাভাবিকভাবেই তা অপসন্দ হবে। এ জন্য ইসলামী শরী'আত জাগতিক ও আত্মিক পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করার বিষয়ে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, যাতে স্বীয় জাগতিক ও আত্মিক পিতার ব্যাপারে অন্তরে কোন প্রকার ক্রোধ বা বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। বিশেষ করে আত্মিক পিতা অর্থাৎ নবীর প্রতি ঈর্ষা-বিদ্বেষ বা ক্রোধ রাখা কুফরী করার নামান্তর।

পঞ্চম হলো, এই যে, উম্মুল মু'মিনীন যারা নবী (সা)-এর বিবাহ বন্ধনে থেকে বিশেষভাবে নারীদের সম্পর্কে অতি জরুরী আহ্কাম ও মাসয়ালা অবগত হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে কোন দোদুল্যমানতা ব্যতীত সকলের নিকট পৌঁছে যাবে। যদি নবী (সা) এর ইনতিকালের পর অন্যের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন তাহলে উম্মুল মু'মিনীনগণের রিওয়ায়াতের সনদ ও নির্ভরযোগ্যতার মধ্যে দুর্নাম রটনারকারীগণ সামলোচনা করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

আয়াতে تطهير মূলত উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যেমন আয়াতের পূর্বাপর বিষয়বস্তু এর প্রমাণ বহন করে। এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উম্মুল মু'মিনীনকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু রাসূল (সা) হযরত আলী, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসায়ন এবং হযরত ফাতিমা (রা)-কে এই নীতি ও বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদেরকে একত্র করে দু'আ করেছেন ঃ

اللهم هؤلاء أهل بيتى اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا -

"হে আল্লাহ! এরাও আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাদের থেকেও পংকিলতা দূরীভূত কর এবং তাদেরকে পবিত্র কর।" যেমন আয়াত لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ "যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাক্ওয়ার উপর।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৮)

মূলত মসজিদে কুবা সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, কিন্তু নবী (সা) মসজিদে নব্বীকেও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা মসজিদে নব্বী অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই এর হকদার। এমনিভাবে আয়াতে تطهير মূলত উম্মুল মু'মিনীনগণ সম্পর্কে

নাযিল হয়েছে। কিন্তু নবী (সা)-এর পরিবারবর্গ যেহেতু অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এর হকদার, সুতরাং রাসূল (সা) তাঁদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বাকী উম্মুল মু'মিনীনগণ তো পূর্ব থেকেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

উম্মুল মু'মিনীন বা পবিত্র স্ত্রীগণের সংখ্যা এবং বিবাহের ক্রমধারা

নবী (সা)-এর এগারজন স্ত্রী ছিলেন। এঁদের মধ্যে দু'জন তাঁর জীবিতকালেই ইনতিকাল করেন। একজন হলেন হযরত খাদীজা (রা) অন্যজন হযরত যয়নাব বিন্ত খুযায়মা। নবী (সা)-এর ইনতিকালের সময় ন'জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন।

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتزوجت شيئًا من نسائى ولازوجت شيئًا من بناتى الابوحى جاءنى به جبرئيل عن ربى عز وجل، أخرجه عبد الملك بن محمد النيسابورى بسنده ـ١

"হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, না আমি নিজে বিবাহ করেছি এবং না স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিয়েছি– যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে আমার নিকট আগমন না করেছেন।"

এ হাদীস হযরত আবদুল মালিক ইবন মুহাম্মদ নিশাপুরী স্বীয় মুসনাদে রিওয়ায়াতে করেছেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিন্‌তে খুওয়াইলিদ (রা)

সবার ঐকমত্য অনুযায়ী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) নবী (সা)-এর প্রথমা স্ত্রী ছিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তিনি ছিলেন প্রথম মুসলমান। কোন পুরুষ ও মহিলা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর থেকে অগ্রগামী ছিলেন না। হযরত খাদীজা (রা) কুরায়শ বংশের ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল খুওয়াইলিদ এবং মাতার নাম ফাতিমা বিনতে যায়িদাহ্। কুরায়শ পর্যন্ত বংশধারা হলো খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ ইবন আবদুল উয্‌যা ইবন কুসাই। কুসাই পর্যন্ত পৌঁছে বংশধারা নবী (সা)-এর সাথে মিলে যায়।[2] যেহেতু হযরত খাদীজা (রা) জাহিলিয়াতের চাল-চলন ও অনৈতিকতা থেকে পবিত্র ছিলেন, এ জন্য নবী করীম (সা) এর আবির্ভাবের পূর্বেও তিনি তাহিরা (পবিত্রা) নামে খ্যাত ছিলেন।

আবূ হালা ইবন যুরারাহ তামীমির সাথে হযরত খাদীজার প্রথম বিবাহ হয়েছিল। তাদের ঔরষ থেকে হিন্দ এবং হালা দু'পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হিন্দ এবং হালা ইসলাম গ্রহণ করেন। উভয়েই সাহাবী ছিলেন। হিন্দ ইব্‌ন আবূ হালা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাষী ও বাগ্মী

১. উয়ূনুল আসার, ২ পৃ. ৩০০।

২. আল ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ২৮১।

ছিলেন, নবী করীম (সা)-এর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত রিওয়ায়াত তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।

আবূ হালার ইনতিকালের পর তিনি আতিক ইবন আয়েয মাখযূমীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের থেকে এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। তাঁর নাম ছিল হিন্দ। হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবার মর্যাদা লাভ করেন, কিন্তু তাঁর থেকে রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়নি। কিছু দিন পর আতিকও ইনতিকাল করেন এবং হযরত খাদীজা পুনরায় বিধবা হয়ে পড়েন।[১]

নাফিসা বিনতে মুনীবা থেকে বর্ণিত, হযরত খাদীজা (রা) অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন এবং ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন। যখন বিধবা হয়ে গেলেন তখন কুরায়শ গোত্রের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তাঁকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নবী (সা) যখন হযরত খাদীজার ব্যবসার মালামাল নিয়ে সফরে গমন করেন এবং বিরাট লাভবান হয়ে ফিরে আসেন, তখন হযরতের দিকে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেন। নাফিসা বলেন, রাসূল (সা)-এর এ ব্যাপারে মনোভাব অবগত হওয়ার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করেন। সুতরাং আমি রাসূলের নিকট গমন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, কি কারণে আপনি বিবাহ থেকে বিরত রয়েছেন? রাসূল (সা) বললেন, আমার হাতে অর্থ-সম্পদ কিছুই নেই। আমি বললাম, যদি ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ইত্যাদি সম্পর্কে আপনাকে আশ্বস্ত করা হয়, তাহলে তো কোন আপত্তি থাকবেনা? নবী (সা) বললেন, তিনি কে ? আমি (নাফিসা) বললাম, খাদীজা। রাসূল (সা) এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[২]

মূল কারণ হলো এই যে, নবুওয়াতের আবির্ভাবের সময় যত নিকটবর্তী হয়ে আসছিল, ততই নবী (সা)-এর কারামত ও আবির্ভাবের সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কখনো তাওরাত ও ইঞ্জিলের উলামার বাণী থেকে, কখনো গণকদের ভবিষ্যত উক্তি থেকে আর কখনো অদৃশ্য আওয়াজ থেকে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের যে কোন আলিম রাসূলকে প্রত্যক্ষ করতেন, তারা এটা বলতেন যে, এই শিশু, এই যুবকই শেষ যুগের ঐ নবী হবেন যার সম্পর্কে হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) ভবিষ্যতবাণী করেছেন।

এ সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে হযরত খাদীজা (রা) যথেষ্ট অবগত ছিলেন। ইতিপূর্বে স্বীয় গোলাম মায়সারা থেকে সিরিয়া সফরের ঘটনা ও জনৈক পাদ্রীর কাহিনী জেনেছেন। বাহিরা নামক পাদ্রীর ঘটনা এর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। অপরদিকে হযরত খাদীজার চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফেল তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরাট আলিম ছিলেন। তিনি শেষ যুগের নবীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। এ সমস্ত ঘটনার কারণে হযরত

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২২০।

২. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ২৮৩।

খাদীজার অন্তরে নবী (সা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কামনা ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় একদিন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যে, জাহেলিয়াতের এক ঈদে মক্কার মহিলারা একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা) উপস্থিত ছিলেন। দেখা গেল, এক ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো ঃ

انه سيكون فى بلد كن نبى يقال له أحمد فمن استطاع منكن ان تكون زوجة له فلتفعل فحصبنه الا خديجة فاغضت على قوله - رواه المدائنى عن ابن عباس - (১)

"হে নারীগণ! অচিরেই তোমাদের শহরে একজন নবীর আবির্ভাব হবে এবং তাঁর নাম হবে আহমাদ। তোমাদের মধ্যে যে তাঁর স্ত্রী হতে ইচ্ছুক, সে যেন এটা সম্পন্ন করে। এই আহ্বানকারীকে সমস্ত মহিলা পাথর নিক্ষেপ করে কিন্তু হযরত খাদীজা (রা) বিরত থাকেন এবং চুপ থাকেন। এ সৌভাগ্য হাসিলের জন্য হযরত খাদীজার মন পূর্ব থেকেই আকাঙ্ক্ষিত ছিল। তবে এ অদৃশ্য স্থান থেকে আহ্বানকারীর আহ্বান তাঁর কামনা-বাসনার আগুনকে আরো তীব্রভাবে বৃদ্ধি করে।

ইবন ইসহাকের বর্ণনা, হযরত খাদীজার গোলাম মায়সারা যখন সিরিয়ার সফর থেকে ফিরে আসে এবং নাসতূরা নামক পাদ্রীর কথাবার্তাসহ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে তখন হযরত খাদীজা তা শ্রবণ করে বলেন ঃ ان كان ما قال اليهودى حقاما ذاك الا هذا "যদি এই ইয়াহূদী গণকের কথা সত্য হয়, তা হলে ইনিই হবেন সেই মহান ব্যক্তি"।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈদের সময় নারীদের একত্র হওয়ার ঘটনা গোলাম মায়সারার সফর থেকে ফিরে আসার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত খাদীজার নাম তাহিরা রাখা হয়নি, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে লোকজনের মাধ্যমে 'তাহিরা' বলানো হয়েছে, যাতে তাঁর পবিত্রতা প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন নবী করীম (সা)-কে লোকজনের দ্বারা 'আমীন' বলানো হয়েছে। যাতে নবী (সা)-এর আমানতদারী ও সততা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় এবং এতে কারো সমালোচনা করার সুযোগ না থাকে। যেহেতু হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন স্বীয় যুগের মরিয়ম। এ জন্য হযরত মরিয়মের মত তাঁকেও وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ "হে মরিয়ম আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন।" (আলে ইমরান ঃ ৪২)-এর মর্যাদা থেকে বিশেষ অংশ হাসিল করেছেন এবং 'তাহিরা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, এরূপ পবিত্র নারীর মনের আকর্ষণ কোন পবিত্র ব্যক্তির দিকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২২০

এবং তাঁর চেয়ে সত্যবাদী কে হতে পারে? الطيبات للطيبين والطيبون للطيبت।
“সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।”
(সূরা নূর ঃ ২৬)

সবাই অবগত আছে যে, নবুওয়াত ও রিসালত কোন বাদশাহী নয়। দুনিয়ার আনন্দ উল্লাসের সাথে এর সামান্যতম সম্পর্কও নেই, নবী করীম (সা)-এর ঘরে দিরহাম ও দিনারের একটি রাত্র জমা থাকার সুযোগ নেই, তবে কোন পাওনাদারের অপেক্ষায় কিছু সময় হয়ত রাখা হত। সপ্তাহ এবং মাস অতিবাহিত হয়ে যেত, ঘরে চুলা জ্বালানো হত না, রাত শেষ হয়ে যেত কিন্তু ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হত না। এটাও সবাই অবগত আছে যে, ধন-সম্পদ, অলংকার ও আনন্দ-উল্লাসের প্রতি নারীদের আকর্ষণ প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু মক্কার সমস্ত সরদার ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির হযরত খাদীজার প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করে নবী (সা)-এর দিকে আগ্রহী হওয়া তাঁর পবিত্রতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর দ্বারা হযরত খাদীজার জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অনুমান করা যায়। নবীর সাথে বিবাহ বন্ধনের কামনা করা সাধারণ বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। চূড়ান্ত পর্যায়ের তীক্ষ্মবুদ্ধি ও বিচক্ষণতাই এ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কেননা জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এটা ধারণা করা যায় যে, নবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো, দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাস ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করে দারিদ্রতা গ্রহণ করতে হবে, এটাকে উত্তম মনে করতে হবে। নবীর স্ত্রী হওয়ার কামনা অর্থ দারিদ্রতা কামনা এবং দুঃখ ও বিপদকে আহ্বান করা।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি এই ওসীয়াত করে যে, মৃত্যুর পর আমার ধন-সম্পদ সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যেন দান করা হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর এরূপ ব্যক্তিকে ঐ ধন-সম্পদ প্রদান করতে হবে যিনি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাহিদ বা পরকালের জন্য সংসার বিমুখ বা পরকালকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন (كذا فى تنبيه المغترين للشعرانى صفـ ٥٠)। কেননা সবচেয়ে বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যিনি অস্থায়ীকে ছেড়ে চিরস্থায়ী বস্তুকে গ্রহণ করেন, ঐ ব্যক্তির চেয়ে বোকা আর কে হতে পারে যে পরকালের চিরস্থায়ী নি'আমতের পরিবর্তে এক মুর্দারকে ক্রয় করে। আল্লাহপাক বলেছেন ঃ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ “সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথে ও পরিচালিত নয়।” (সূরা বাকারা ঃ ১৬)

হযরত খাদীজা (রা) সমস্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা করে নিজের পক্ষ থেকে যোগাযোগের সূচনা করেন এবং মক্কার সর্দার ও নেতাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দেন। বলাবাহুল্য, যে পবিত্র নারী দুনিয়াকে ত্যাগ ও প্রত্যাখ্যান করার দৃঢ় সংকল্প

গ্রহণ করেছেন, তিনি দুনিয়ার অন্য কোন বস্তুর দিকে কিভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন, ধন-সম্পদের সাথে যাঁর কোন সম্পর্ক নেই, সন্তানদের প্রতি তাঁর কিভাবে আকর্ষণ থাকতে পারে? কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা নেতার ধন-সম্পদ তাঁকে কিভাবে প্রলুব্ধ করতে পারে, যিনি স্বীয় ধন-সম্পদই আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন।

নবী (সা) তাঁর প্রিয় চাচা আবূ তালিবের পরামর্শক্রমে এ পয়গাম কবূল করেন। হযরত খাদীজার পিতা খুইয়ালিদ পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন কিন্তু তাঁর চাচা আমর ইবন-আসাদ বিবাহের সময় জীবিত ছিলেন এবং বিবাহ্ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

নির্ধারিত তারিখে হযরত আবূ তালিব হযরত হামযা (রা) সহ গোত্রের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে হযরত খাদীজার বাড়ি আগমন করেন। বিবাহের রীতিনীতি সম্পন্ন করার পর আবূ তালিব বিবাহের খুতবা পাঠ করেন (গ্রন্থের প্রারম্ভে তা উল্লেখ করা হয়েছে) এবং পাঁচশ দিরহাম মাহর নির্ধারণ করেন।[১] বিবাহের সময় হযরত খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর এবং নবী (সা)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। আকদের মজলিসে ওয়ারাকা ইবন নওফেলও উপস্থিত ছিলেন। আবূ তালিবের খুতবা শেষ হওয়ার পর ওয়ারাকা ইবন নওফেল সংক্ষিপ্ত খুতবা পেশ করেন।[২]

ওলীমা

কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, ইজাব কবুলের পর হযরত খাদীজা (রা) একটি গাভী যবেহ করে খাবার তৈরি করেন এবং মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করেন।[২]

সারকথা

হযরত খাদীজার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন হলো, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ নবীর আবির্ভাব) এখনো বিলম্ব। আশা-নিরাশার দোলা ও অপেক্ষার অস্থিরতা ও চিন্তা সর্বদা অব্যাহত থাকে। একদিনের ঘটনা, নবী (সা) হযরত খাদীজার নিকট গমন করেন। হযরত খাদীজা (রা) দেখেই রাসূলকে জড়িয়ে ধরেন এবং বুকের সাথে চেপে ধরে বললেন ঃ

بأبى وأمى والله ما أفعل هذا شئ ولكنئ أرجوا أن تكون أنت النبى الذى ستبعث فان تكن هو فاعرف حقى ومنزلتى وادع الاله الذى بعثك لِى قالت فقال لها والله لئن كنت انا هو قد اصطنعت عندى مالا اضيعه أبدا وان يكن غيرى فان الاله الذى تضعين هذا الاجل لايضعك أبدا -(৩)

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

৩. ফাতহুল বারী, ৭ খ, পৃ. ২০০।

"আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, এ কাজ দ্বারা আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তবে আমার আশা হলো এই যে, সম্ভবত আপনিই ঐ নবী যাঁর অচিরেই আবির্ভূত হওয়ার কথা। সুতরাং আপনিই যদি ঐ নবী হন তাহলে আমার হক স্মরণ রাখবেন এবং যে আল্লাহ্ আপনাকে নবুওয়াত দান করে মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন তাঁর মহান দরবারে আমার জন্য দু'আ করবেন। নবী (সা) জবাবে বললেন, যদি আমিই ঐ নবী হই, তাহলে হলে জেনে রাখ, তুমি আমার উপর এরূপ ইহ্সান করেছ যা আমি কখনো ভুলতে পারব না। যদি আমাকে ব্যতীত অন্য কেউ নবী হয় তাহলেও এটা স্মরণ রাখবে যে, যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তুমি এ কাজ করেছ, তিনি কখনো তোমার এ আমলের প্রতিদান থেকে তোমাকে বিফল করবেন না।"

যুবায়র ইবন বাকার থেকে বর্ণিত, হযরত খাদীজা (রা) বার বার ওয়ারাকা ইবন নওফলের নিকট গমন করে নবী (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। ওয়ারাকা ইবন নওফেল বলতেন ঃ

ما اراه الانبى هذه الامة الذى بشربه موسى وعيسى عليهم السلام

"আমার ধারণা হলো এই যে, তিনিই ঐ নবী যাঁর সম্পর্কে হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) সুসংবাদ প্রদান করেছেন।"

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত খাদীজা (রা) ওয়ারাকার নিকট গমন করে নবী (সা)-এর অবস্থা বর্ণনা করেন। তখন ওয়ারাকা এক কাসীদা (পংক্তিমালা) আবৃত্তি করেন। যার কিছু পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

هذى خديجة تاتنى لاخبرها * ومالنا بخفى الغيب من خبر
بِاَن اَحمد ياتيه فيخبره * جبريل انك مبعوث الى البشر

"এই খাদীজা বার বার আমার নিকট আগমন করে যাতে আমি তাকে সংবাদ প্রদান করি। কিন্তু আমার নিকট অদৃশ্যের কোন খবর নেই যে, জিবরাঈল আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম নিয়ে নবী (সা)-এর নিকট আগমন করবেন এবং এ সংবাদ প্রদান করবেন যে, আপনাকে লোকজনের নিকট নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।"

فقلتُ على الذى ترجين ينجزه * لك الاله فرجى الخير وانتظرى

"ওয়ারাকা বলেন, আমি খাদীজাকে জবাব দান করেছি যে, আশ্চর্য নয় যে, যার তুমি কামনা করেছ, আল্লাহ তা পূর্ণ করবেন। তুমি আল্লাহপাকের দরবারে কল্যাণের আশা রাখ এবং অপেক্ষা কর।"

ওয়ারাকা ইবন নওফেলের এ কাসিদা মুসতাদরাকে উল্লেখ আছে। হাকেম ও যাহাবী এর উপর চুপ রয়েছেন। ওয়ারাকার আরো কাসীদা রয়েছে যার দ্বারা ওয়ারাকার আকাঙ্ক্ষা ও অপেক্ষার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়।[১]

সন্তান সন্ততি

হযরত খাদীজার গর্ভে নবী (সা)-এর ঔরস থেকে চার কন্যা যথা– যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা এবং দু'পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেন। (বিস্তারিত বর্ণনা পরে করা হবে)। পুত্র সন্তানগণ শিশুকালেই ইনতিকাল করেন। কন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁদের বিবাহ দেয়া হয়েছে।

ইনতিকাল

নবুওয়তের দশম বছর এবং হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা (রা) মক্কা মু'আয্‌যমায় ইনতিকাল করেন এবং হাজ্জু নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। নবী (সা) স্বয়ং কবরে নেমে দাফনের কাজ সম্পন্ন করেন। জানাযার নামায ঐ সময় পর্যন্ত শরী'আতের দ্বারা প্রচলিত হয়নি, পঁচিশ বছর নবী (সা)-এর সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। যতদিন পর্যন্ত হযরত খাদীজা (রা) জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত রাসূল (সা) দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। হযরত খাদীজা (রা) পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। انا لله وانا اليه راجعون

ফযীলত ও মর্যাদা

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত জিবরাঈল (আ) নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হযরত খাদীজা (রা) আপনার জন্য খাবার নিয়ে আগমন করছে। যখন আপনার নিকট পৌছবে, তখন আপনি তাঁকে তাঁর পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং তাঁকে বেহেশতের এমন এক মহলের সুসংবাদ প্রদান করবেন যা একটি মুক্তা দিয়ে তৈরি করা হবে, ঐ মহলের কোন হৈ চৈ হবে না এবং কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট হবে না। নাসাঈ শরীফের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত খাদীজা এ সুসংবাদ শুনে জবাবে বলেন ঃ

ان الله هو السلام وعلى جبريل السلام عليك يارسول الله السلام ورحمة الله وبركاته وزاد ابن السنى من وجه اخر وعلى من سمع السلام الا الشيطان ۔

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সালাম অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপর কিভাবে সালাম পেশ করব। হে জিবরাঈল। আপনার উপর সালাম, হে আল্লাহর রাসূল।

১. রাওযুল উনুফ, ১ খ, পৃ. ১২৫-১২৭।

আপনার উপর আল্লাহ্ পাকের শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক (যার ওসীলায় আমার উপর এ রহমত ও বরকতসমূহ নাযিল হয়েছে)।

ইবন সুন্নার রিওয়ায়েতে এরূপ এবং আরো অতিরিক্ত বর্ণিত আছে, তাদের উপরও সালাম বর্ষিত হোক যারা এটা শুনেছে একমাত্র শয়তান ব্যতীত।"

এ হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ফাতহুল বারী ১ খ, পৃ. ১০৫, নবী করীম (সা) ও হযরত খাদীজার বিবাহ ও ফযীলত অধ্যায় এবং যারকানী শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ. পৃ. ২২২ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

হাফিয ইবন কায়্যিম (র) বলেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে কাউকে সালাম প্রেরণ করা এমন এক ফযীলত ও মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়, যাতে হযরত খাদীজা (রা)-এর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। অর্থাৎ অন্য কারো এ সৌভাগ্য হয়নি।

উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন তিনজন, হযরত খাদীজা, হযরত ফাতিমা এবং হযরত আয়েশা। কিন্তু এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে যে, এই তিনজন মধ্যে কে সর্বোত্তম। হাফিয ইবন আবদুল বার (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর একটি মারফূ' রিওয়ায়েতে এ প্রশ্নের সমাধান রয়েছে। ঐ রিওয়ায়েতে হলো এই ঃ

سيدة نساء العلمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم اسية قال هذا حديث حسن

"বিশ্বজগতের নারীদের নেত্রী হলেন হযরত মরিয়ম (আ), অতঃপর হযরত ফাতিমা (রা), এরপর হযরত খাদীজা (রা) অতঃপর হযরত আসিয়া। ইবন আবদুল বার (র) বলেন, এ হাদীসটি হাসান। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যারকানী শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ ২২৩ এবং ফাতহুল বারী ও তাফসীরে রূহুল মা'আনীর সূরা আলে-ইমরানের আয়াত يَامَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ এর তাফসীর দেখা যেতে পারে।

উম্মুল মু'মিনীন সাওদা বিনতে যাম'আ (রা)

হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের কিছুদিন পর হযরত সাওদা (রা)-এর সাথে মহানবী (সা)-এর বিবাহ হয়। বংশ মর্যাদায় তিনি কুরায়শী ছিলেন। তাঁর বংশ সূত্র হচ্ছে, সাওদা বিনতে যামআ' ইবন কায়স ইবন আবদ শামস ইবন উদ-ইবন নসর ইবন মালিক ইবন হসল ইবন আমির ইবন লূয়াই-। (সীরাতে ইবনে হিশাম, উয়ূনুল্ আসার)

লূয়াই-ইবন গালিব পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর বংশ তালিকা মহানবী (সা)-এর বংশের সাথে মিশে যায়। মায়ের নাম শামস বিন্তে কায়স ইবন আমর ইবন যায়দ আনসারীয়া। তিনি আনসার গোত্র বনী নাজ্জারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল আপন চাচাত ভাই সুকরান ইবন আমরের সাথে। সাহাবায়ে কেরাম যখন হাবশায় (আবিসিনিয়া) দ্বিতীয়বার হিজরত করেন, তখন তিনি স্বামীসহ হাবশায় হিজরত করেন। হাবশা থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনের সময় পথে স্বামী ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় স্বামী আবদুর রহমান নামে একটি পুত্র সন্তান রেখে যান। আবদুর রহমান মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। জালূলার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

মহানবী (সা) হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের ফলে খুবই বিষন্ন ও ভারাক্রান্ত ছিলেন। সে সময় একদিন খাওলা বিনতে হাকীম তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে খাদীজার অবর্তমানে ভীষণ বিষণ্ন মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। ঘরের ব্যবস্থাপনা ও সন্তানদের দেখাশুনা প্রতিপালনের সব দায়িত্বই তাঁর ছিল। খাওলা বললেন, আমি কি আপনার জন্য কোথাও বিয়ের পয়গাম (প্রস্তাব) দেব? তিনি উত্তরে বললেন, ঠিক আছে, এসব কাজের জন্য মহিলারাই উপযোগী।

তিনি আরও বললেন, কোথায় পয়গাম দিতে চাচ্ছ? খাওলা বললেন, যদি আপনি কুমারী চান, তাহলে আপনার সবচেয়ে প্রিয়জন-এর কন্যা আয়েশাকে বিবাহ করুন। আর যদি বিধবা চান, তাহলে সাওদা বিনতে যাম'আ উপযুক্ত আছে। যিনি আপনার উপর ঈমান এনেছেন এবং আপনার অনুগত হয়েছেন। মহানবী (সা) বললেন ঃ দু'জায়গায়ই পয়গাম পাঠাও। খাওলা প্রথমে সাওদার নিকট গেলেন এবং বললেন, আমি তোমার জন্য মহানবী (সা)-এর পক্ষ হতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন, আমার কোন আপত্তি নেই, তবে বিষয়টি তুমি আমার পিতার সাথে আলোচনা কর। তাকে জাহিলী পদ্ধতিতে সালাম করবে। খাওলা বলেন, আমি তার পিতার নিকট গিয়ে জাহিলী পদ্ধতিতে أَنْعَمَ صَبَاحًا 'শুভ সকাল' বললাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, খাওলা। তিনি মারহাবা বলে প্রশ্ন করলেন, কেন এসেছ? আমি বললাম, তোমার মেয়ের জন্য মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিবের পক্ষ হতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন, এটা ত বিয়ের জন্য মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান (কুফূ), কিন্তু এ বিষয়ে সাওদার মতামত কি, তা আমার জানা নেই। আমি বললাম, সে এ বিষয়ে আগ্রহী। এরপর মহানবী (সা) সেখানে আগমন করলেন এবং বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হল।

হযরত সাওদার ভাই আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ তখনও ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে নি। যখন বিয়ের সংবাদ সে অবগত হল, লজ্জায় মাথায় মাটি ঢেলে দিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি এজন্য খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন। যখনই তাঁর এ ঘটনার কথা মনে পড়ত, তিনি বলতেন, সে সময় আমি কতই না মূর্খ ছিলাম যে,

মহানবী (সা) আমার বোনকে বিয়ে করেছেন এজন্য আমি দুঃখ অপমানে মাথায় মাটি নিক্ষেপ করেছি। এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ হাসান সূত্রে (সহীহ) বর্ণনা করেছেন।[১]

হযরত সাওদা (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) -এর বিবাহ সমসাময়িককালে হয়েছিল। এজন্য সীরাত বিশারদদের মধ্যে এ নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা যায় যে, কোন বিয়েটি প্রথমে হয়েছিল। নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে, হযরত সাওদা (রা)-এর বিয়েই প্রথমে হয়েছিল।[২] এক সময় মহানবী (সা) সাওদা (রা)-কে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করেন। তখন সাওদা (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমাকে আপনার দাম্পত্যে থাকার সুযোগ দিন। আমার কামনা যে, আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে আমাকে আপনার স্ত্রী হিসেবে উঠাবেন। যেহেতু আমি বৃদ্ধা হয়ে গেছি, এজন্য আমি আমার সাথে আপনার রাত্রি যাপনের পালা হযরত আয়েশাকে দিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। কোন কোন বর্ণনায় তিনি তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন এবং আবার ফিরিয়ে নেন্ বলে উল্লেখ আছে (সঠিক তথ্য আল্লাহই ভাল জানেন)।[১]

আকৃতি ঃ হযরত সাওদা (রা) শরীরের কাঠামো দীর্ঘ ও ভারী ছিল। রসিক স্বভাবের ছিলেন। কখনো মহানবী (সা)-কে হাসাতেন। ২৩ হিজরীতে হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের শেষভাগে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। (বুখারী সহীহ্ সনদে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

৫৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন বলেও বর্ণনা আছে। ওয়াকিদী এটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলেছেন।[৪]

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা)

হযরত আয়েশা (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা ছিলেন। মাতার নাম যয়নাব ও উপনাম উম্মে রুমান।[৫] হযরত আয়েশা (রা)-এর কোলে কোন সন্তান হয়নি। তবুও নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ ইবন যুবায়েরের নামে নিজকে উম্মে আবদুল্লাহ উপনামে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত সাওদা (রা)-এর পরে দশম হিজরীর শাওয়াল মাসে মহানবী (সা) তাঁকে বিবাহ করেন। খাওলা বিনতে হাকীম মহানবীর পক্ষ হতে

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২২৭।

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২২৭।

৩. আল-ইসাবা, ৪খ, পৃ. ৪৩৮

৪. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৪৩৮

৫. উম্মে রুমান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক হাতে বায়'আত করে ইসলাম গ্রহণ করেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর উম্মে রুমান আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মদীনা হিজরত করেন। প্রসিদ্ধ মতে, ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দেহ কবরে নামান এবং তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন। বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন ইসাবা, ৪র্থ, পৃ ৪৫০।

প্রস্তাব পেশ করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, মুত্‌ঈম ইবন আদী তার ছেলের জন্য আয়েশার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমি তাতে সম্মতি দিয়েছিলাম। وَاللّٰهِ مَا اَخْلَفَ اَبُوْبَكْرٍ وَعَدًا قَطٌّ "আল্লাহর কসম, আবূ বকর কখনো ওয়াদা খেলাফ করে নাই।"

এ কথা বলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সোজা মুত্‌ঈম-এর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, বিয়ের ব্যাপারে তোমার চিন্তা-ভাবনা কি? মুত্‌ঈমের স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিল। মুত্‌ঈম তাকে বলল, তোমার মতামত কি? স্ত্রী হযরত আবূ বকর (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ তোমার সাথে বিয়ের সম্পর্কের বিষয়ে আমার দারুণ আশঙ্কা রয়েছে যে, আমার ছেলে আবার ধর্ম ত্যাগী না হয়ে যায়। সে নিজ পিতৃপুরুষের ধর্ম বর্জন করে তোমাদের ধর্মে দাখিল হয়ে যাবে। আবূ বকর বললেন ওহে মুতঈম, তুমি কি বল? সে বলল ঃ বলল ঃ তুমি তো আমার স্ত্রীর বক্তব্য শুনেছ। এভাবে সে ও তার স্ত্রী দু'জনে একমত হয়ে প্রস্তাব প্রত্যাহার করল। এবার হযরত আবূ বকর (রা) বুঝলেন ও অনুধাবন করলেন যে এবার ওয়াদা ভঙ্গের দায় দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে না। এভাবে তিনি সোজা নিজ ঘরে ফিরে এসে খাওলাকে জানালেন, আমি প্রস্তাবে সম্মত আছি, মহানবী (সা) যখন ইচ্ছা আগমন করবেন। এরপর মহানবী (সা) তাশরীফ নেন এবং বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। মাহর হিসেবে চারশত দিরহাম নির্ধারণ করা হয়।

হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবুওয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ছয় বছর। হিজরতের সাত-আট মাস পরে শাওয়াল মাসেই নব বধূর স্বামীগৃহে গমনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। সে সময় তাঁর বয়স নয় বছর হয়েছিল। মহানবী (সা)-এর সাথে তাঁর দম্পত্য জীবন ৯ বছর ছিল। মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮ বছর। তারপর তিনি ৪৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। ৫৭ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। ওসীয়ত অনুযায়ী অন্যান্য পবিত্র বিবিদের মত তাঁকে রাতে জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় ৬৬ বছর বয়স হয়েছিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। কাসিম ইবন মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবন আবু আ'তীক, এবং হযরত যুবায়র (রা)-এর দু'ছেলে আবদুল্লাহ ও উরওয়া দু'জনই তাঁকে কবরস্থ করেন।[১]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনা যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। মহানবী (সা) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নারীর বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার

১. যারকানী, ৩ খ পৃ. ২২৯।

পক্ষ হতে ওহী না নিয়ে এসেছে, ততক্ষণ আমি কোন নারীকে বিবাহের সিদ্ধান্ত করিনি। এভাবে হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারেও এমনটি হয়েছিল। মহানবী (সা) বলেন জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে জানালেন আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের মেয়ের সাথে আপনার বিয়ে দিয়েছেন। জিবরাঈলের সাথে আয়েশার একটি ছবিও ছিল। ছবিটি আমাকে দেখিয়ে বললেন সে আপনার স্ত্রী।[১] বিষয়টি বুখারী মুসলিমের হাদীসেও আছে।

নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা, সূক্ষ্মদৃষ্টির মত গুণাবলী পিতা থেকে অর্জন করেছিলে। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মু রুমান। যাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা) মন্তব্য করেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন সুন্দরী হূর দেখতে ইচ্ছা করে, তাহলে সে উম্মু রুমানকে দেখতে পারে। ইমাম বুখারী (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[২]

এজন্য মহান আল্লাহ জালালুহুর করুণা ও অনুদান তার জন্য প্রত্যাশিত ছিল যে, প্রিয় নবীর গুহার সাথী ও প্রিয়জনের পূত-পবিত্র মেয়ে শিশু অবস্থায়ই নবীর দাম্পত্যে ও শিক্ষায় দিয়ে দেয়া হবে।

কেননা তাঁর হৃদয়-শরীর সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ছিল। কোন পাপের ছবি তখনো এ শিশুর উপর অংকিত হয়নি। নিষ্পাপ সময়ে ছিলেন। পিতা মাতার পক্ষ হতেও কোন পাপের ছবি পরিলক্ষিত হয়নি। পিতা ছিলেন সিদ্দীক। আর মা-ত সুন্দরী হূরের নমূনা। এধরনের পূত পবিত্র কাঠামোতে নবুওয়াতের বিদ্যার যে শিল্পচিত্রও চিহ্নিত হবে তা স্বচ্ছ স্বভাবতই নির্ভুল ও স্থায়ী রূপ লাভ করবে, যা কখনো ম্লান হবে না।

এভাবেই তিনি নয় বৎসরে (হযরত আয়েশা) এত ব্যাপক বিস্তীর্ণ গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। মহানবী (সা) ইন্তিকালের পর প্রবীন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোন বিষয়ে জটিলতা বা সন্দেহের সৃষ্টি হলে তা হযরত আয়েশা (রা) এর নিকট পেশ করা হতো। সাহাবায়ে কেরামের যুগে হযরত আয়েশা (রা) এর জ্ঞান এবং ইতিহাস ও বিধিবিধান বিষয়ক দক্ষতা ছিল স্বীকৃত। এমনকি এমনও বলা হয়েছে যে, ইসলাম বিধি বিধানের এক চতুর্থাংশ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম যদি কখনো কোন বিষয়ে সন্দেহ পড়তেন তখন হযরত আয়েশাকে প্রশ্ন করতেন। এবং তাঁর নিকট সে সমস্যার কোন সমাধান অবশ্যই পাওয়া যেত। –(তিরমিযী)

---

১. মহান আল্লাহ তা'আলা ছবি প্রেরণ করেছেন এ বিষয়টি দিয়ে মানুষের ছবি চর্চাকে বৈধতা দেয়ার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা ঠিক হবে না, এবং এ বিষয়ে (শরী'আতের বিধান যেমন) হাদীসে ছবির চর্চাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং ছবি চর্চাকারী গুনাহগার হবে (এ ধরনের বিধান প্রযোজ্য হবে)।

২. যারকানী , ৩ খ, ৩৩৪ পৃ.

ইল্‌ম-জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা

ইমাম যুহরী (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) এর ইল্‌ম বা জ্ঞান অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন ও সব মহিলাদের সাথে তুলনা করলে তাঁর অবস্থান–সেরাও বিজয়ী হবে।

ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অলংকারের দিক থেকে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে আমীর মু'আবিয়া (রা) বলেন : আমি বক্তা হিসেবে হযরত আয়েশা (রা) থেকে প্রাঞ্জলভাষী ও অলংকারপূর্ণ বক্তৃতার কোন বক্তা দেখিনি। (তাবারানী) আরবের ইতিহাস এবং ঘটনাবলী তাঁর আয়ত্তে ছিল। অনেক কবিতাও মুখস্থ ছিল। যখন কোন বক্তব্য দিতেন তখন তিনি কোন কবিতা অবশ্যই শুনাতেন। (আবু যিনাদ)[১]

যুহদ-ভোগ বিলাস বিমুখতা

এতক্ষণ তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার বাস্তব চিত্রের উল্লেখ ছিল। এখন তাঁর অবৈষয়িক ভোগ-বিলাসীতাবিহীন চরিত্রের একটি ঘটনা শুনুন। কেননা সত্যিকার মর্যাদা ও পূর্ণতার মাপকাঠি-জ্ঞান ও নির্লোভ-অবৈষয়িক চরিত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। পার্থিব বিষয়ের লোভ, ভালবাসা ও ভোগ বিলাস সব পাপের মূলসূত্র। একইভাবে যুহদ বা অবৈষয়িকতা নির্লোভ সব পূণ্যের ও কল্যাণের ভিত্তি।

اَللّٰهُمَّ زَهِدْنَا فِى الدُّنْيَا رَغِّبْنَا فِى الْاٰخِرَى -

"হে আল্লাহ! দুনিয়ার লোভনীয় বিষয় থেকে আমাদেরকে বিরত রাখ, এবং পরকালের প্রতি আমাদেরকে আগ্রহী কর।" আমীন!

ঘটনাটি হচ্ছে, উম্মু দারদা (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে আসা যাওয়া করতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে দু'বস্তা মুদ্রা প্রেরণ করেন। তাতে প্রায় একলাখ আশি হাজার দিরহাম ছিল। সন্ধ্যায় দেখা গেল, একটি দিরহামও বাকী নেই। সেদিন তিনি রোযা ছিলেন। ইফতারের সময় খাদেমকে ইফতার দিতে বললেন। খাদেম ইফতার হিসেবে রুটি ও যায়তুনের তেল এনে দিল। উম্মু দারদা (রা) বললেন, এক দিরহামের গোশত আনলে ভাল হত। হযরত আয়েশা (রা) বললেন : আগে স্মরণ করিয়ে দিলে তা আনার ব্যবস্থা করতাম।

উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) বলেন : আমি দেখেছি, হযরত আয়েশা (রা) সত্তর হাজার দিরহাম বিতরণ করতেন কিন্তু তাঁর গায়ে তালি লাগানো পোশাক ছিল। এসব মহত্ব ও বদান্যতার কারণেই মহানবী (সা) তাঁকে অধিক ভাল বাসতেন। শুধু কুমারী হওয়ার কারণে যদি এমনটি হত, তা হলেও হযরত খাদীজা (রা)-কে ভুলে যেতেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল এই যে, তিনি সর্বদা খাদীজা (রা)-এর স্মৃতিচারণ করতেন। শুধু তা-ই নয়, যখন কোন পশু যবাই করতেন তখন হযরত খাদীজা (রা)-এর বান্ধবী

১. যারকানী, পৃ. ৩৩৪

মহিলাদেরকে খুঁজে খুঁজে গোশ্‌ত বিতরণ করতেন। যতদিন খাদীজা (রা) জীবিত ছিলেন তিনি অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করেন নি। হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্তমানেও তিনি আটটি বিয়ে করেছেন এবং সকলেই বিধবা ছিলেন। এসব বিবাহের উদ্দেশ্য (নাউযুবিল্লাহ্!) যদি শুধুমাত্র প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করাই হত তা হলে তিনি একজন বিধবাকেও বিয়ে করতেন না। হযরত উম্মু সালামা (রা) এবং হযরত সাফিয়্যা (রা) তাঁরা ত হযরত আয়েশা (রা) থেকে অধিক সুন্দরী ছিলেন না (তা হলে তিনি এসব বিধবাকে কেন বিবাহ করতে গেলেন)? বস্তুত শুধুমাত্র দ্বীনের শিক্ষা চর্চাই তাঁর একাধিক বিবাহ করার উদ্দেশ্য ছিল। বিষয়াবলী ও বিধান বলী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত তা তাঁর পবিত্র পত্নীদের মাধ্যমেই সহজে নারী সমাজের মধ্যে প্রচারিত হতে পারতো। আসলে তাঁরা সকলেই মহিলা মাদ্রাসার ছাত্রী ছিলেন। পক্ষান্তরে মসজিদে নববীতে পুরুষদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেয়া হত। আর ঘরে পূত-পবিত্র বিবিদেরকে শিক্ষা দেয়া হত। কেননা পরবর্তী সময়ের জন্য এ বিবিগণ উম্মাতের নারীদের জন্য শিক্ষিকা হিসেবে পরিগণিত হবেন। সব বিবিই তাঁদের নিজস্ব যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর আয়েশা সিদ্দীকা (রা) শিক্ষা ও জ্ঞান লাভে অন্যান্য বিবিদের থেকে অগ্রগামী ছিলেন।

وَذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

এজন্যই উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) এবং হযরত ফাতিমাতুয্ যুহ্‌রা (রা), এরপর হযরত আয়েশা সিদ্দিকী (রা) সবচেয়ে মর্যাদাবান ও নেককার হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

সারকথা

আলোচনার সারাংশ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা জন্মগতভাবেই হযরত আয়েশা (রা)-কে পূর্ণতা ও নৈতিকতার উৎকর্ষ দান করেছেন। তারপর পয়গাম্বর (আ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁকে তাঁর দাম্পত্যে গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর আকর্ষণীয় সাহচর্যে ও প্রশিক্ষণ দানে সেই স্বভাবগত পূর্ণতার প্রকাশ ঘটবে এবং তাঁর জ্ঞান ও মহত্ব দ্বারা দুনিয়াবাসী উপকৃত হবে। তাই হয়েছিল। প্রবীণ সাহাবায়ে কিরাম তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর, হযরত আবু মূসা আশ'আরী এবং আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, প্রবীণ তাবিঈদের মধ্যে সাঈদ ইবন মুসায়্যাব, আম্‌র ইবন মায়মূন, আলকামা ইবন কায়স, মাসরূক, আবদুল্লাহ ইবন হাকীম, আস্‌ওয়াদ ইবন ইয়াযিদ, আবূ সালামা ইবন আবদুর রহমান প্রমুখ তাবিঈ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

এসব কাহিনী ও অবস্থার পরও কি কোন সমালোচক ও অপবাদকারীর একথা বলার সুযোগ আছে যে, নাউযুবিল্লাহ্। এই বিবাহ প্রবৃত্তির লালসা পূরণের স্বার্থে হয়েছিল? বরং সত্য হচ্ছে, এ বিয়ে মহা প্রভুর আসমানী নির্দেশে হয়েছে।

মর্যাদা ও মহত্ত্ব

১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন একদিন মহানবী (সা) বললেন : হে আয়েশা! এই যে জিবরাঈল তোমাকে সালাম জানাচ্ছে। আমি বললাম, আলাইহিস্সালাম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহূ, এবং আমি নিবেদন করলাম হে রাসূল! আপনি তাঁকে দেখছেন, আমি কিন্তু দেখছি না।

২. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলল্লাহ (সা) বলেছেন : পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতার মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে শুধু মরিয়ম বিনতে ইমরান, ফিরাউন পত্নী আসিয়া ব্যতীত কেউ পূর্ণতার মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। আর আয়েশার মর্যাদা অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে খাদ্যের মধ্যে সারীদের ন্যায় (তৎকালীন আরবে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ মজাদার খাদ্য বিশেষ)।

উক্তি দু'টি হাদীসই ইমাম বুখারী মানাকিব (মর্যাদা) অধ্যায়ে আয়েশা অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাকে দান করা হয়েছে। যা হযরত মরিয়ম (আ) ব্যতীত আর কোন মহিলাকে দান করা হয়নি। আল্লাহর শপথ! বিষয়টি আমি অহংকার প্রকাশের জন্য বলছি না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার (নিয়ামতকে প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য) তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ

(১) বিবিদের মধ্যে আমি ব্যতীত কেউ কুমারী ছিলেন না।

(২) বিয়ের পূর্বে ফেরেশ্তা আমার ছবি নিয়ে নাযিল হয়েছেন এবং রাসূল (সা)-কে দেখিয়ে বলা হয়েছে : এই যে আপনার বিবি। আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে আপনি তাকে বিয়ে করবেন।

(৩) রাসূলুল্লাহ, (সা) আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

(৪) মানুষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সব চেয়ে প্রিয়জন যিনি ছিলেন, আমি হচ্ছি তাঁর কন্যা। আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আসমান থেকে কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।

(৫) আমি পবিত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছি। পূত-পবিত্রের কাছে ছিলাম এবং আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য মাগফিরাত ও উত্তম রিযিকের ওয়াদা করেছেন।

(৬) আমি জিবরাঈলকে দেখেছি। আমি ব্যতীত অন্যান্য বিবিগণ জিবরাঈলকে দেখেননি।

(৭) আমি মহানবী (সা)-এর সাথে একই কম্বলের ভিতর ছিলাম, সে অবস্থায় জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে আসতেন। অন্য কোথায়ও এভাবে ওহী নাযিল হয়নি।

(৮) আমার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাত্রি যাপনের পালা দু'দিন দু'রাত ছিল এবং অন্যান্য বিবিদের পালা একদিন একরাত ছিল। ২য় দিনটি হযরত সাওদা (রা)-এর ছিল। তিনি বার্ধক্যে পৌছার কারণে হযরত আয়েশা (রা)-কে তাঁর অংশ দান করে দিয়েছিলেন।

(৯) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের সময় হযরতের মাথা মুবারক আমার কোলে ছিল।

(১০) রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওফাতের পর আমার হুজরায় তাঁকে দাফন করা হয়েছে।[১]

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিনতে ফারূকে আযম (রা)

হযরত হাফসা (রা) হযরত উমর ফারূক ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কন্যা ছিলেন। মাতার নাম যয়নাব বিনতে মাযয়ন (রা) হযরত হাফসা নবুয়্যতের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন, যখন কুরায়শগণ কা'বাঘরের নির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রথম বিবাহ খুনাইস ইবন হুযাফা সাহ্মী (রা)-এর সাথে হয়েছিল। স্বামীর সাথে মদীনায় হিজরত করেন। বদর যুদ্ধের পর স্বামী খুনাইস ইন্তিকাল করেন।[২]

হাফসা (রা) যখন বিধবা হলেন হযরত উমর (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনি যদি সম্মত হন তাহলে হাফসাকে আপনার সাথে বিবাহ দেব। হযরত উসমান (রা) উত্তর দিলেন, চিন্তাভাবনা করে বলব। তারপর যখন উসমান (রা) এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল তখন হযরত উসমান (রা) অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, তখন আমি আবূ বকরের সাথে দেখা করে তাঁকে বললাম, আপনি যদি চান তাহলে আমি হাফ্সাকে আপনার নিকট বিয়ে দেব। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কথা শুনে চুপচাপ রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। উমর (রা) বলেন, এতে আমি মনঃক্ষুণ্ন হলাম। তারপর তিন কি চার দিন গত হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলেন। তখন আমি তাঁর সাথে হাফসাকে বিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর একদিন আবূ বকর সিদ্দীকের সাথে দেখা হলে তিনি বললেন, উমর! তুমি হয়ত বা আমার উপর মনঃক্ষুণ্ন হয়েছ। আসলে আমি জানতাম রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। এজন্য আমি চুপচাপ ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোপন ব্যক্তিগত বিষয়কে প্রকাশ করে দেয়া সঠিক বলে মনে করি। তিনি যদি তাঁকে বিয়ে না করতেন তা হলে আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করতাম। এভাবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী তৃতীয় হিজরীতে নবী করীম (সা) হাফসা (রা)-কে বিয়ে করেন।

---

১. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৯ খ, পৃ. ২৪১

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৩৬

এক সময় মহানবী (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক দিলেন। তখন জিব্‌রাঈল (আ) ওহী নিয়ে এলেন।

ارجع حفصه فانها صوامة قوامة وانها زوجتك فى الجنة

"হযরত হাফসাকে আপনি ফিরিয়ে নিন্, তিনি অধিক রোযাদার ও অধিক ইবাদতকারী মহিলা এবং জান্নাতে আপনার বিবি।"

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। (ইবন সা'দও তাবারানী)[১]

৪৫ হিজরী সনে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। তখন হযরত মু'আবিয়ার খেলাফত যুগ ছিল। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬০। মারওয়ান ইবন হাকাম জানাযা নামাযের ইমামতি করেন।[২]

উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা) উপাধি উম্মুল মাসাকীন

নাম যায়নাব। জাহিলী যুগ থেকেই তিনি বদান্যতা ও দানশীলতার কারণে গরীবের মা বা 'উম্মুল মাসাকীন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পিতার নাম খুযায়মা ইবন হারিস হিলাল। প্রথম বিবাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-এর সাথে হয়েছিল। ৩য় হিজরীতে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। বিধবার জন্য নির্ধারিত শোক সময় অতিবাহিত হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিবাহ করেন।

৫০০ দিরহাম মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিয়ের দু'তিন মাস পরেই ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে জানাযার নামাযের ইমামতি করেছেন। জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিল ৩০ বছর।[৩]

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা বিনতে আবূ উমায়্যা (রা)

উম্মু সালামা তাঁর উপনাম নাম ছিল। তাঁর নাম ছিল হিন্দ। তাঁর পিতা ছিলেন আবূ উমায়্যা কারশী মাখযূমী। মায়ের নাম আতিকা বিনতে আ'মর ইবন বারী'আ। প্রথম বিবাহ চাচাত ভাই আবূ সালামা ইবন আবদুল আসাদ মাখ্‌যূমীর সাথে হয়েছিল। স্বামীর সাথে মুসলমান হয়েছেন এবং তাঁর সাথে হাবশায় হিজরত করেছেন। তারপর মক্কায় ফিরে এসে পুনরায় মদীনায় হিজরত করেন (এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা হিজরত অধ্যায়ে গত হয়েছে)।

হযরত আবূ সালামা (রা) বদর, উহুদ যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। ওহুদ যুদ্ধে তিনি বাহুতে মারাত্মকভাবে আহত হন। একমাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে যান। ৪র্থ হিজরীতে রাসূল (সা) মুহাররামে একটি অভিযানে তাঁকে আমীর করে প্রেরণ করেন, ২৯ দিন পর ফিরে আসেন। এরপর তাঁর ক্ষতস্থানে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং হিজরী ৪র্থ সালের ৮ই জমাদিউস সানীতে ইন্তিকাল করেন।[৪]

১. আল-ইসাবা, ৪ খণ্ড
২. যুরকানী, ৩ খ, পৃ. ৩৩৮
৩. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ২৪৯; উয়ূনুল আসার, ২ খ. পৃ. ৩০৩
৪. উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ৩০৪।

উম্মু সালামা (রা) বলেন, একবার আমার স্বামী আবূ সালামা ঘরে আসলেন এবং বললেন, আজ আমি রাসূল (সা) থেকে একটি হাদীস শুনে এসেছি। হাদীসটি আমার নিকট দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম। তা হচ্ছে কোন ব্যক্তি যদি কোন সমস্যা বা বিপদ মুসীবতে পতিত হয়, তখন যদি সে ইন্নালিল্লাহ্ ... পড়ে এবং এরপর দু'আ করে–

اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ هٰذِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَخْلِفْنِىْ فِيْهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا -

"হে আল্লাহ্! আমার এই বিপদে আমি তোমার নিকট উত্তম বিনিময় আশা করি। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদের পর আমাকে এর চেয়ে তুমি উত্তম বিনিময় দান কর।"

এই দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। (নাসাঈ)

উম্মু সালামা (রা) বলেন, আবূ সালামা ইন্তিকাল করার পর আমার এই হাদীসটি মনে পড়ে গেল। যখন আমি এই দু'আ করার ইচ্ছা করলাম; তখন মনে মনে ভাবলাম আমার জন্য আবূ সালামা থেকে উত্তম কে হতে পারে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন এজন্য আমি দু'আটি পড়লাম। ফলস্বরূপ আমার নির্ধারিত শোক দিবসের পর রাসূল (সা) আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন যার থেকে উত্তম ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না।[১]

মহানবী (সা) যখন তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখন তিনি কয়েকটি ওযর উল্লেখ করলেন।

(১) আমার বয়স বেশি।

(২) আমার সন্তান আছে, আমার সাথে ইয়াতীম শিশু আছে।

(৩) আমার আত্মমর্যাদাবোধ বেশি–(এজন্য আপনার সাথে অপ্রত্যাশিত কিছু হতে পারে) রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আপত্তির জবাবে বললেন : আমার বয়স তোমার থেকে বেশি। তোমার সন্তান রাসূলের সন্তান হবে। আর আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করব যেন তোমার মার্যাদাবোধ (যার স্পর্শকাতর স্বভাবের তুমি আশংকা করছ, তার ক্ষতিকর দিক) তোমার থেকে চলে যাক। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করেছিলেন এবং তা যথার্থই হয়েছিল।

হিজরী ৪র্থ সনের শাওয়াল মাসে তাঁর সাথে বিবাহ হয় (শাওয়ালের শেষ সপ্তাহ)। হযরত আনাস (রা) থেকে মুসনাদে বায্যায-এ বর্ণিত আছে মাহরানার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু সামগ্রীও তাঁকে দিয়েছিলেন যার মূল্য দশ দিরহাম হবে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, তিনি একটি লেপ্ যার ভিতর তুলার মত খেজুরের ছাল ছিল, একটি পেয়ালা এবং একটি রেকাবী ও একটি যাঁতা (গম পেষার) তাঁকে দিয়েছিলেন।[২]

---

১. আল ইসাবা, ২ খ, পৃ. ৩৩৫

২. যুরকানী, ৩ খ, পৃ. ২৪১।

ওফাত

তাঁর মৃত্যুর সন নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম বুখারী (রা) তারীখে কাবীরে বলেছেন, তিনি ৫৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেছেন ৫৯ হিজরীর কথা। আর ইবন হিব্বান বলেন, ৬১ হিজরীর দিকে তিনি ইন্তিকাল করেছেন, যখন ইমাম হাসান (রা) এর শাহাদাতের সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। আবু নু'আঈম বলেন, ৬২ সনে ইন্তিকাল করেছেন। আসকালানী আল-ইসাবা গ্রন্থে ৬২ সনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) জানাযার নামাযে ইমামতি করেছেন। উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ ইন্তিকাল করেছেন। (আল-ইসাবা ৪ খ, পৃ. ৪৫৯- অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দ বিনতে আবূ উমায়্যা)

প্রথম স্বামীর পক্ষের দু'সন্তান উমর এবং সালামা এবং আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমায়্যা ও আবদুল্লাহ ইবন ওহাব ইবন যাম'আ কবরে অবতরণসহ দাফনে শরীক ছিলেন। জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়।

মর্যাদা

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার উচ্চ মর্যাদা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, উপস্থিত বুদ্ধি স্বীকৃত ছিল। হুদায়বিয়ার সময় যখন রাসূল (সা) সবাইকে কুরবানীর জানোয়ার যবাই করার জন্য এবং মাথা মুণ্ডানোর জন্য তিনবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কেউই তা পালন করছিল না, উম্মু সালামাকে যখন তা অবগত করানো হলো, তিনি বললেন : হে রাসূল! সাহাবায়ে কিরাম এই চুক্তির বিষয়ে দুঃখভারাক্রান্ত, আপনি এদেরকে এ বিষয়ে আর কিছু বলবেন না, বরং আপনি নিজে আপনার জানোয়ার প্রথমে কুরবানী করে ফেলুন এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর কুরবানীর জানোয়ার যবাই করতে শুরু করলেন, তখনই সাহাবায়ে কিরামও নিজ নিজ পশু যবাই করে মাথা মুণ্ডাতে শুরু করলেন। হযরত উম্মু সালামার মতামত ও পরামর্শে এ ধরনের একটি জটিলতার অবসান হলো। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দিন! তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন : যখন উম্মু সালামাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বিয়ে করলেন তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে আমার মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়েছিল।[১]

উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা)

হযরত উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর ফুফী উমায়মা[২] বিনতে আবদুল মুত্তালিব-এর কন্যা ছিলেন। অর্থাৎ সম্পর্কে তিনি মহানবী (সা)-এর ফুফাত বোন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাম্পত্যে আসার পূর্বে তাঁর সাথে

১. আল-ইসাবা, ৪ খ. পৃ ৪৫৫

বিবাহ হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পালিতপুত্র ও আযাদ করা গোলাম হযরত যায়িদ ইবন হারিসার সাথে। তাঁদের মধ্যে পরস্পর মিলমিশ না হওয়ার কারণে তিনি তাঁকে তালাক দিয়ে দেন।

হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন আযাদকৃত গোলাম, পক্ষান্তরে হযরত যায়নাব ছিলেন অভিজাত বা মর্যাদাবান বংশের। তিনি নবী (সা)-এর ফুফাত বোনও ছিলেন। আরব সমাজে আযাদকৃত গোলামের সাথে মর্যাদাবানদের বিয়েকে অপমানকর মনে করার কুসংস্কার ছিল। ফলে রাসূল (সা) যখন হযরত যায়িদের জন্য যায়নাবের বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন, তখন যায়নাবের ভাই এবং যায়নাব দু'জনই এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। এ বিষয়ে তখন আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا ـ

এই আয়াতের মু'মিন বলতে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশকে অর্থাৎ হযরত যায়নাব (রা) এর আপন ভাইকে বুঝানো হয়েছে। এবং মু'মিনা বলতে হযরত যায়নাবকে বুঝানো হয়েছে। এখানে আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, কোন বিষয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা দেয়ার পর কোন মু'মিন বা মু'মিনার এই সুযোগ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালাকে অস্বীকার করবে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁরা দু'জনই এই প্রস্তাবে রাযী হয়ে যান। তারপর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে ত হয়ে গেল কিন্তু যায়নাবের দৃষ্টিতে যায়িদ নগণ্য ও তুচ্ছ হিসেবে মনে হচ্ছিল। এজন্য ঘরে দু'জনার মধ্যে মিলমিশ পয়দা হয়নি, বরং পরস্পর মতপার্থক্য লেগেই ছিল। যায়িদ যায়নাবের বেপরোয়াভাব নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে প্রায়ই অভিযোগ করতেন। এরপর তিনি যায়িদকে তালাক দেয়ার মনোভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে তালাক থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বিভিন্নভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, তুমি আমার মাধ্যমে এই বিয়ে করেছ, এইজন্য তুমি যদি তালাক দাও, তা-হলে আমার জন্য আমার বংশের নিকট তা অপমানজনক হবে। তারপর বারবার যখন তাদের পারস্পরিক ঝগড়া ও অভিযোগ আসতে লাগল তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন তাদের সম্পর্ক যদি ছিন্ন হয়েই যায়, তা-হলে তাঁকে তিনি স্বয়ং বিয়ে করা ব্যতীত যায়নাবের মানসিক অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। কিন্তু পিছনে মূর্খ লোকদের ও মুনাফিকদের কানাঘুষার আশংকা করলেন। তারা সমালোচনা করবে ও অপবাদ ছড়াবে যে, তিনি পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। যদিও পালিত পুত্রের বিষয়ের

২. উমায়মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। আল ইসাবা দ্র.।

বিধান এমনটি নয়। তৎকালীন আরবে দীর্ঘ দিন থেকে এ কুসংস্কার চালু ছিল যে, পালিত পুত্রের পরিত্যক্ত বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করা খুবই গর্হিত কাজ। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাও ছিল যে, মহানবী (সা)-এর কর্মের মাধ্যমে এই কুসংস্কার বিলোপ করা। ফলে ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে জানিয়ে দিলেন–যায়িদের তালাকের পর যায়নাব আপনার দাম্পত্যে আসবে। তা হলে লোকের এ ধারণা পাল্টে যাবে যে, পাতানো ছেলের বউকে আর নিজ ছেলের বউকে বিয়ে করা এক ধরনের নয়। কিন্তু ভবিষ্যত ঘটবে এধরনের অহীর নিদের্শনকে তিনি বিশ্বাস করার পরেও দুষ্ট ও কপট লোকদের কুৎসা ও সমালোচনার আশংকায় জনসম্মুখে প্রকাশ করা থেকে বিরত রইলেন। তিনি এমন অবস্থায় সময়ের অপেক্ষায় রইলেন। সময়ের ব্যবধানে অবশ্যই সবকিছু প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেও এ বিষয়টি প্রকাশ ও ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়নি। এ জন্য মহানবী (সা) বিষয়টি আল্লাহর পরিকল্পনা হিসেবে গোপন করে রাখেন। এবং প্রকাশ্য বিধান অনুসারে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান সমঝোতার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি যায়িদকে তালাক না দেয়ার পরামর্শ দেন ও স্ত্রীর বেপরওয়া দুঃখজনক অবস্থানকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করার জন্য চেষ্টা করতে বলেন।

কোন ব্যক্তি যদি ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়, যা আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তে অবশ্যই বাস্তবে ঘটবে, তবুও তাঁকে বর্তমান অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ হিসেবে প্রচলিত ও প্রকাশ্য বিধানের অনুসরণ করে যেতে হবে। তাকদীরী ফায়সালা সময়মত অবশ্যই প্রকাশিত হয়ে যাবে।

পরিশেষে একদিন হযরত যায়েদ (রা) এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অবস্থা নাজুক ও আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় আমি যায়নাবকে তালাক দিয়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) চুপচাপ রইলেন।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত যায়নাব (রা)-এর তালাকোত্তর নির্ধারিত সময় পূর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদ (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, তুমিই যায়নাবের নিকট যাও এবং আমার পক্ষ হতে তাকে বিয়ের প্রস্তাব পেশ কর (তাতে বিষয়টি প্রকাশ্যে প্রচারিত হবে যে, যায়িদের সম্মতিতে ঘটনাটি হয়েছে) হযরত যায়িদ মহানবী (সা)-এর প্রস্তাব নিয়ে যায়নাবের গৃহে গমন করেন। ঘরের দরজার সামনে বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়ালেন (যদিও তখনও পর্দার বিধান কার্যকর হয়নি, তবুও তা ছিল পূর্ণাঙ্গ তাক্ওয়ার দাবি)। তারপর বললেন, হে যায়নাব! আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) পাঠিয়েছেন তোমার নিকট তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য। হযরত যায়নব (রা) সাথে সাথে জবাব দিলেন। আমি এ বিষয়ে এখন কিছু বলতে পারব না, যতক্ষণ না আমি আমার মহা প্রভুর সাথে পরামর্শ করি (ইস্তিখারা করি)। তিনি তখন উঠে গিয়ে ঘরে নির্ধারিত নামাযের স্থানে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে ইসতিখারায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

যেহেতু হযরত যায়নাব (রা) পৃথিবীর কোন মানুষের সাথে পরামর্শ করেন নি, বরং আল্লাহ সুবহানাহুর নিকট পরামর্শ চেয়েছেন এবং আল্লাহর নিকটেও কল্যাণ কামনা করেছেন যিনি সতিকার অর্থে মু'মিনদের প্রকৃত মহামনিব, বন্ধু, অভিভাবক, এজন্য আল্লাহ তা'আলা নিজ অভিভাবকত্ব-ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে হযরত যায়নাবের বিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) সাথে দিয়েছেন। আসমানে এই ঘোষণা হয়ে গেল, এখন যমীনেও এর ঘোষণা প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) এই আয়াতটি নিয়ে নাযিল হলেন ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا ـ

'অতঃপর যখন যায়দ তার সাথে নিজ প্রয়োজন শেষ করল, (তালাক দিয়ে দিল) তখন আমি যায়নাবের বিয়ে তোমার সাথে দিয়ে দিলাম।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৭)

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাবের গৃহে গমন করলেন এবং অনুমতি না নিয়েই ঘরে প্রবেশ করলেন। (মুসলিম-আহমদ, নাসাঈ) ফাতহুল, বারী, তাফসীর অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ الاية[১]

এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত আয়েশা (রা) ঘরে তাশরিফ আনেন তখন এই আয়াত নাযিল হয়। যখন ওহী শেষ হয় তখন মুচকী হেসে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কে আছ, যে গিয়ে যায়নাবকে সুসংবাদ দিবে বলে তিনি

اِذْ يَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

আয়াত শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনালেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন আয়াতগুলো তিলাওয়াত শেষে হলো, তখন আমার মনে আসল যায়নাব এমনিতেই অধিক সুন্দরীই তারপরে তাঁর বিয়ে আসমানে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হয়েছে এই ব্যাপারে তিনি গর্ববোধ করবেন।[২]

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় রাসূলুল্লাহ (সা) যায়নাবের ঘরে গমন করার পূর্বেই বার্তাবাহকের মাধ্যমে খবর পৌঁছায়ে ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার বিয়ের ব্যাপারে এই আয়াতগুলো নাযিল করেছেন।

হযরত যায়নাব (রা) যখন অবগত হলেন তখন সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়লেন। (ইবনে সা'দ)[৩]

হযরত যায়নাব (রা) খোদায়ী ফায়সালা ও আসমানী ওহী পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন এজন্য মহানবী (সা)-এর তাঁর ঘরের অভ্যন্তরে দাখিল হওয়ার জন্য অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। আয়াতে 'বিবাহ দিয়ে দিলাম' শব্দ ও আসমানী বিয়ের ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ

১. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ২৪৫।

২. আল ইসাবা, ১ খ, পৃ. ৩১৩।

৩. প্রাগুক্ত।

(সা) বিষয়টি অবগত করানোর পর মৌখিক ও বাস্তবে কবুল করে নেয়া. শোকরানা, সিজ্‌দা আদায় করা এবং আনুষ্ঠানিক বিয়ের প্রস্তাব পূর্বেই যায়িদের মাধ্যমে পৌঁছা, এসব কিছু আনুষ্ঠানিক ও প্রচলিত বিবাহের থেকে অধিক বাস্তবতা পূর্ণ ছিল।

ঘরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম কি? যেহেতু তাঁর আসল নাম ছিল বাররাহ তিনি তা জানালেন। মহানবী (সা) বাররাহ -এর পরিবর্তে 'যায়নাব' নাম রেখে দিলেন। (ইবন আবদুল বার)

এই ঘটনার পর কিছু মুনাফিক কুৎসা রটনা করতে শুরু করল। তারা বলল, মহানবী (সা) একদিকে বলে থাকেন পুত্রবধু বিয়ে করা হারাম। অন্যদিকে তিনি নিজেই পুত্রবধু বিয়ে করেছেন। এ ধরনের কপট লোকদের সমালোচনার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَئٍ عَلِيْمًا ،

"হযরত মুহাম্মদ (সা) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন্, কাউকে তোমরা তাঁর ছেলে মনে করবে না বরং তিনি আল্লাহর রাসূল (এবং তিনি তোমাদের রূহানী পিতা, তোমরা তাঁর রূহানী ছেলে) তিনি আখেরী নবী। আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু জানেন।"

হযরত যায়নাব (রা)-এর বিয়ে সংক্রান্ত ঘটনা বিশেষজ্ঞদের নিকট এমনটিই, যা এখানে আমরা বর্ণনা করেছি। ইসলাম বিরোধী লোকেরা ও ধর্মদ্রোহীরা তাদের এ কথাকে প্রচার করেছে যে, নাউযুবিল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা) একবার যায়নাবের প্রতি দৃষ্টি পড়েছিল, তখন তাঁর অন্তর তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়। তখন তিনি সুব্হানাল্লাহ্ ...... পড়েছিলেন। আর تُخْفِى فِىْ نَفْسِكَ আয়াতের মধ্যে যায়নাবের ভালবাসা তাঁর হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকার অর্থে বর্ণিত হয়েছে! এই গল্প মুনাফিকরা মিথ্যা ও অপবাদ হিসেবে বানিয়েছে। কোন ঈমানদার ব্যক্তি কখনোই এ ধরনের কথা বিশ্বাস করতে পারেন না। এ ধরনের গল্পের কোন ভিত্তি নেই। অধিকাংশ মুফাস্‌সির এ ধরনের রটনাকে মিথ্যা মনগড়া ও অপবাদ বলে বর্ণনা করেছেন। যা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন, সূত্রবিহীন এবং যুক্তিবিরোধী। কেননা হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)এর আপন ফুফাত বোন। তিনি বাল্যকাল থেকেই তাঁকে দেখে আসছেন। তিনি তাঁকে বহুবার দেখেছেন ও তাদের পরস্পরে কোন পর্দা ছিল না। আর তখনো পর্দার বিধানও আসেনি, এ জন্য হযরত যায়নাব (রা) বিয়ের আগে-পরেও তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন। বিষয়টি এমন নয় যে, বিয়ের পরই তিনি তাঁকে প্রথম দেখেছেন। যদি তাঁকে তাঁর খুব পছন্দই হতো তাহলে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁকে যায়িদের সাথে বিয়ে দিলেন কেন? যেখানে হযরত যায়নাব ও তাঁর অভিভাবকগণ অনেকটা বিপদে পড়েই সম্মত হয়েছেন। তিনি

কেন সে সময় নিজে তাঁকে বিয়ে করেননি? আর তাঁকে তখন বিয়ে করতে চাইলে আত্মীয়-স্বজন খুশি হয়েই তা কবূল করত।

নবীর দৃষ্টির পবিত্রতা

যৌক্তিক বুদ্ধি ও তথ্য সূত্র থেকে নিশ্চিতভাবে বিষয়টি প্রমাণিত যে, আল্লাহর নবীগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাঁদের দৃষ্টি পূত-পবিত্র নিষ্কলঙ্ক হয়ে থাকে। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা) কতিপয় অপরাধী ব্যক্তির রক্ত বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তাদেরকে যদি কা'বা ঘরের গিলাফ ধরা অবস্থাও পাও তবুও তাদেরকে অব্যাহতি দিবে না, বরং হত্যা করে ফেলবে। তাদের অন্যতম ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবূ সারাহ। হযরত উসমান (রা) তার হাত ধরে মহানবী (সা)-এর দরবারে নিয়ে এলেন। তিনি বার বার মহানবী (সা)-কে আবেদন করছিলেন যে, তার বায়'আত গ্রহণ করুন, অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে দিন। নবী (সা) চুপ্চাপ ছিলেন। তারপর বার বার অনুরোধ করার পর তিনি বায়'আত মঞ্জুর করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সমবেতদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, আমিও চুপচাপ ছিলাম যে, তোমাদের মধ্যে একজন উঠে আবদুল্লাহকে হত্যা করে ফেলবে। একজন আনসারী আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল, চোখে কেন ইশারা করলেন না? তিনি বললেন :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنَّ يَكُوْنَ لَهٗ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ -

"কোন নবীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি তাঁর চোখ দ্বারা খেয়ানতের কাজ করবেন।"

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَاتُخْفِى الصُّدُوْرِ -

এতে বুঝা গেল নবীর চক্ষু খেয়ানত থেকে পূত্র পবিত্র হয়ে থাকে। যেমনিভাবে নবীগণ নিষ্পাপ, তেমনিভাবে নবীদের চক্ষুও নিষ্পাপ।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

এই আয়াত থেকেও জানা যায়, অবৈধ বস্তু থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখা ঈমানের পরিচায়ক। মহানবী (সা) হচ্ছেন সব মু'মিনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। এ বিষয়ে গোটা সৃষ্টি একমত ও আস্থাশীল।

সারা বিশ্বের ঈমান যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঈমানের অতি সামান্য ছায়ামাত্র, তেমনি সারা বিশ্বের দৃষ্টির পবিত্রতা ও লজ্জা তাঁরই দৃষ্টির পবিত্রতা, শালীনতা ও লজ্জার সামান্যতম ছায়ামাত্র। অনুরূপ তাঁর পূত-পবিত্র সত্তা ও প্রবৃত্তির লালসা থেকে মুক্ত ছিল এবং তাঁর ব্যক্তিগত সাথী, যা প্রতিটি মানুষের জন্য নির্ধারিত রয়েছে একজন করে শয়তান, সেও মহানবীর পরশে এসে বাধ্য হয়েই তাঁর অনুগত হয়েছে। উত্তম ও

কল্যাণের দিক ব্যতীত কোন কিছুর দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার সামর্থ্যই তাঁর ছিল না। (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)

وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ আয়াতের তাফসীর।

আমাদের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, কপট লোকদের বক্তব্য অনুসারে এই আয়াতে تخفى فى نفسك ما الله مبديه -দ্বারা যায়নাবের ভালবাসা হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখা অর্থ– সম্পূর্ণভাবে ভুল, মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত বরং সত্যি কথা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে এ সংবাদ জানিয়েছিলেন, যায়িদের তালাকের পর যায়নাব আপনার দাম্পত্যে আসবে। এভাবে যে বিষয়টি তাঁর অন্তরে লুকানো অবস্থায় ছিল তা ছিল এই বিয়ের আগমন সংবাদ। যে কথা আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী সময়ে زَوَّجْنَاكَهَا শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে দিয়েছেন تخشى الناس শব্দের অর্থ হচ্ছে তিনি বিষয়টি প্রকাশ করতে লজ্জা করছিলেন যে, তিনি কাউকে বলবেন তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। ভয় বলতে যে জিনিসের শরম করা অথবা আশংকা করা বুঝানো হয়েছে, তা হচ্ছে, মুনাফিকরা কুৎসা রটাবে ও সমালোচনা করবে অথবা লোকজন খারাপ ধারণা করে নিজেদের পরিণাম নষ্ট করবে।

সুদ্দী ও ইমাম যায়নুল আবেদীনের বর্ণনায় উক্ত আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন। তিরমিযী এই বর্ণনাকে উত্তম বলে বর্ণনা করেছেন। আর এটাকে ইবনে হাজার আসকালানী (র) [১] তাঁর বিখ্যাত হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারী গ্রন্থে সূরা আহ্যাবের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।

১. মূল ভাষা হলো ঃ

وقد أخرج أن أبى حاتم هذه القصة من طريق السّدى فساقهَا سياقًا واضحًا ولفظه بلغنا ان هذه الاية نزلت فى زينب بنت جعش وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم انها رضيت بماضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها ايه ـ ثم اعلم عزوجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد انها من ازواجه فكان يستحى ان يأمر بطلاقها وكان لايزال يكون بين زيد وزينب مايكون من الناس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسك عليه زوجه وان يتقى الله وكان يخشى الناس ان يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيدًا وعنده من طريق على بن زيد عن على بن الحسين ابن على ـ قال اعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان زينب ستكون من ازواجه قبل ان يتزوجها فلما اتاه زيد يشكوها اليه وقال له اتق الله وامسك عليه زوجك قال الله تعالى قد اخبرتك انى مزوجكها وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وقد اطنب الترمذى الحكيم فى تحسين هذه الرواية وقال انها من جواهر+

ইমাম কুরতুবী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইমাম যায়নুল আবেদীনের বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

قال علماءنا رحمة الله عليهم وهذا القول أحسن ماقيل فى هذه الاية وهو الذى عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهرى والقاضى بكر بن العلاء القشيرى والقاضى أبى بكر بن العربى وغيرهم الخ (تفسير قرطبى تفسير سوره احزاب)۔

"আমাদের উলামায়ে কেরামের মতামত হচ্ছে এই আয়াতের তাফসীরে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা সর্বোত্তম মত। বিজ্ঞ আলিম, দক্ষ মুফাস্‌সিরীন, যেমন ইমাম যুহরী, কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী ও কাযী বকর ইবন আ'লা কুশায়রী প্রমুখের একই মত।"[১]

বিয়ের তারিখ ও দেনমোহর

হাফিয ইবনে সায়্যেদুন নাস (র) বলেন, হিজরী ৪র্থ সনে হযরত যায়নাবের সাথে মহানবী (সা)-এর বিয়ে হয়। কেউ ৫ম হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। তখন হযরত যায়নাব (রা)-এর বয়স ৩৫ হয়েছিল।[২] চারশত দিরহাম মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছিল (সীরাতু ইবনে হিশাম)। ইবনে ইসহাক লিখেছেন এই বিয়ে হযরত যায়নাবের ভাই আবূ আহমাদ ইবন জাহাশ দিয়েছেন। বাহ্যিকভাবে পূর্বের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়। তবে হয়ত বা পরবর্তী সময়ে বিয়েও পড়ানো হয়েছিল (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

العلم المكنون وكان لم يقف على تفسير السدى الذى اوردته وهو اوضح سياقًا واصح اسنادا اليه لضعف على بن زيد بن جدعان (ثم قال الحافظ) ووردت اثار اخرى ونقلها كثير من المفسيرين لاينبغى التشاغل بها والذى اوردته منها هوا المعتمد والحاصل ان الذى يخفيه النبى صلى الله عليه وسلم هوا أخبار الله اياه انها ستصير زوجته والذى كان يحمله على اخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امراة ابنه واراد الله ابطال ما كان اهل الجاهلية عليه من أحكام التبنى بامر لاابلغ فى الابطال منه وهو تزوج امرأة الذى يدعى ابنا ووقوع ذلك من امام المسلمين ليكون ادعى لقبولهم وانما وقع الخبط فى تأويل متعلق الخشية والله أعلم۔ (فتح البارى ج ٨ ص۔٤٠٣ تفسير سورة الاحزاب)۔

১. তাফসীরে কুরতুবী, ৪ খ, পৃ. ১৯০।
২. উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ৩০৪।

অলীমা

এই বিয়ে যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ অভিভাবকত্বে আয়োজন করেছেন এবং এ বিষয়ে আল-কুরআনের আয়াতও নাযিল করেছিলেন। এই জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এই বিয়ে উপলক্ষে মেহ্মানদারী বা অলীমা বিশেষ গুরুত্বের সাথে আয়োজন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাবের বিয়েতে যত গুরুত্বের সাথে পর্যাপ্ত মেহমানদারীর (অলীমা) আয়োজন করেছেন, অন্যান্য বিবিদের কারো ক্ষেত্রে তা তিনি করেননি। একটি ছাগল যবাই করেছিলেন এবং লোকদেরকে দাওয়াত করে গোশত রুটি তৃপ্তিসহকারে আহার কারিয়েছিলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করে সব লোক চলে গেল, কিন্তু তিন ব্যক্তি অপেক্ষা করে গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে গেল। মহানবী (সা) চক্ষু লজ্জার কারণে তাঁদেরকে কিছু বলতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি মজলিস থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন যেন তাঁরা বুঝতে পারেন। তারপর তিনি হযরত আয়েশা (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে মোবারকবাদ জানালেন। এভাবে তিনি অন্যান্য বিবিদের ঘরেও চক্কর দিয়ে বেড়ালেন। তখন এই আয়াতগুলো নাযিল হলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ - وَلٰكِنْ اِذَادُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَامُسْتَانِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ - اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيْ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ وَلَايَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ذَالِكُم اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ -

"ওহে ঈমানদারগণ! নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। তবে যখন তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে আপ্যায়নের জন্য। যখন যাবে খানা পাকানোর অপেক্ষা করবে না। বরং যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে খাদ্য প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে তোমরা এখন আস, তখনই তোমরা আসবে। অতঃপর খানা খেয়ে উঠে চলে আসবে। গল্প গুজবে লেগে যাবে না, তাহলে নবীর কষ্ট হবে অথচ তিনি লজ্জার কারণে তা বলবেন না। তবে আল্লাহর হক কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই। অন্যদিকে যদি তোমরা বিবিদেরকে প্রয়োজনীয় কোন প্রশ্ন করতে চাও, তা হলে পর্দার আড়াল থেকে জানতে চাইবে। এটি হচ্ছে তোমাদের ও তাঁদের অন্তরের পবিত্রতা ও সততা।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

মর্যাদা

হযরত যায়নাব (রা) অন্যান্য পবিত্র বিবিদের মধ্যে গর্ববোধ করে বলতেন, তোমাদের বিবাহ তোমাদের অভিভাবকগণ দিয়েছেন, আর আমার বিয়ে সাত আকাশের উপর আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। (তিরমিযী)

প্রকৃতপক্ষে এটি গর্ববোধ ছিল না, বরং নিয়ামতের প্রচার ছিল। নিয়ামতদাতার মহব্বত তাঁকে এই মহান বিশাল নিয়ামতের প্রচার করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই জন্য মহানবী (সা) নিজেও এসব কথা শুনতেন এবং নীরব থাকতেন।

ইমাম শা'বী (র) বর্ণনা করেন হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতেন– হে আল্লাহর রাসূল আমি তিন কারণে আপনার সাথে গর্ব করতে পারি।

১. আপনার দাদা ও আমার নানা একই ব্যক্তি। অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব। এক বর্ণনায় আছে–আমি আপনার ফুফীর মেয়ে।

২. আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে আমার বিবাহ আসমানে দিয়েছেন।

৩. বিবাহের বিষয়ে হযরত জিবরাঈল আমীনের ভূমিকা ছিল।[১]

عن عائشة انها قالت كانت زينب بنت جحش تساميني فى المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومارأيت امرأة قط خيرًا فى الدين من زينب واتقى الله وأصدق حديثا واوصل للرحم وأعظم صدقة ـ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ মহানবী (সা)-এর সাথে ঘনিষ্ঠতায় আমার সমকক্ষ ছিলেন। আমি তাঁর থেকে কোন মহিলাকে অধিক দ্বীনদার, আল্লাহকে অধিক ভয়কারী, সবচেয়ে সত্যবাদী, অধিক আত্মীয়ের হক আদায়কারী ও অধিক সাদাকাকারী আর দেখিনি।

ইমাম যুহরীর বর্ণনায় আরও আছে ঃ

واشد تبذلا لنفسها فى العمل الذى تتصدق به وتتقرب به الى الله عز وجل ـ

"আর তাঁর মত নিজে অধিক পরিশ্রম করে সাদাকাকারী এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী কোন মহিলা আমি দেখিনি।" (ইসতি'আব ইবনে আবদুল বার)

পরহেযগারী ও সৌজন্যবোধ

মুনাফিকরা যখন হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ রটনা করল (যা বিস্তারিতভাবে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে), তখন সরলতার কারণের হযরত যায়নাবের

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৪৬

বোন হামনা বিনতে জাহাশ তাতে জড়িয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) যখন যায়নাবকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তখন তিনি এভাবে জবাব দেন ঃ

يارسول الله أحمى سمعى وبصرى والله ما علمت عليها الاخيرا۔ (رواه البخارى)

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার চক্ষু ও কানকে হিফাযত করি। আল্লাহর শপথ! আমি আয়েশার ব্যাপারে ভাল ছাড়া আর কিছু জানি না। (বুখারী)

এটা ত জানা কথা যে, হযরত আয়েশা (রা) হযরত যায়নাবের সতীন ছিলেন। তারপরেও তিনি জানতেন হযরত আয়েশা (রা) মহানবী (সা)-এর সবচেয়ে প্রিয়তমা। তিনি ইচ্ছা করলে সে সময় হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলে দিতে পারতেন যার কারণে আয়েশার সাথে মহানবী (সা)-এর সম্পর্কের অবনতি হতে পারত। কিন্তু তিনি ভদ্রতা ও তাক্ওয়ার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। শুধু তা-ই নয় তিনি মন্তব্য করলেন ঃ

وَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا اِلاَّ خَيْرًا

"আল্লাহর কসম! আমি আয়েশার ব্যাপারে ভাল বৈ অন্য কিছু জানি না।"

সহীহ্ বুখারীতে তাঁর তাক্ওয়া ও ভদ্রতার স্বীকৃতি হযরত আয়েশা (রা) এর যবানীতে রয়েছে ঃ

فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرْعِ .

"আল্লাহ তা'আলা যায়নাবের ভদ্রতা ও তাক্ওয়ার কারণে তাঁকে এ ফিতনা থেকে হিফাযত করেছেন।"

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত অন্য একটি বর্ণনায় এভাবে আছে ঃ

وَاِنَّ اللّٰهَ عَصَمَهَا بِالْوَرْعِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাক্ওয়ার সাহায্যে তাঁকে ফিতনা থেকে হিফাযত করেছেন"।[১]

ইবাদত

ইবাদতে হযরত যায়নাব (রা) খুব যত্নবান ছিলেন। বিনয় ও সতর্কতার সাথে তিনি ইবাদত করতেন। যখন হযরত যায়িদ (রা) তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)এর পক্ষ হতে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে ইস্তিখারার নামাযে মশগুল হয়ে যান।

হযরত মায়মূনা (রা) বর্ণনা করেন–একবার রাসূলুল্লাহ (সা) গনীমতের অর্থসম্পদ মহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করছিলেন, এর মধ্যে হযরত যায়নাব (রা) কিছু কথা বললেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, উমর! তাকে

১. আল ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩১৩।

কিছু বল না। অর্থাৎ যায়নাবের সাথে আপত্তি করো না, কেননা اِنَّهَا اَوَّاهَةٌ "নিশ্চয়ই সে কোমল হৃদয়ের অধিকারী।"

এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আওয়াহ্ অর্থ কি? তিনি উত্তরে বললেন, আওয়াহ্ বলতে বিনয়ী ও সতর্কতাকে বুঝানো হয়। তাঁরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَاِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ـ

"নিশ্চয়ই ইবরাহীম ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয় এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যোবর্তনকারী"।[১]

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ গৃহে গমন করেন। হযরত উমরও তাঁর সাথে ছিলেন। সেখানে দেখতে পেলেন হযরত যায়নাব (রা) নামায ও দু'আয় ব্যস্ত আছেন। তখন তিনি মন্তব্য করলেন ঃ اِنَّهَا لَاَوَّاهَةٌ "নিশ্চয়ই সে বড় নরম হৃদয়ের মহিলা।" (তাবারানী)

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) হযরত যায়নাব (রা) সম্পর্কে বলেন :

كَانَتْ صَالِحَةً صَوَّامَةً قَوَّامَةً صَنَاعًا تَصَدَّقَ بِذَالِكَ كُلَّهُ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ ـ (الاصابه)

"তিনি খবুই নেককার এবং অধিক রোযাদার ও বেশি তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন। হাতের কাজ করে অধিক উপার্জনকারী ছিলেন, যা তিনি সবই গরীব-মীসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন।"

যুহদ-ভোগ-বিলাসও দুনিয়া বিমুখতা

হযরত উমর (রা) যখন প্রথম হযরত যায়নাবের বাৎসরিক ভাতা প্রেরণ করলেন, তিনি মনে করলেন, হয়তবা এগুলো সব পবিত্র বিবিদের অংশ। তখন তিনি মন্তব্য করলেন, আল্লাহ হযরত উমরকে ক্ষমা করুন, তিনি এখানে আরও অধিক অংশ দিতে পারতেন।

قَالُوْا هٰذَا كُلُّهُ لَكَ قَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاسْتَتَرَتْ دُوْنَه بِثَوْبٍ ـ

"লোকেরা বলল, এসবটুকুই আপনার। তিনি বললেন : সুব্হানাল্লাহ! এবং তা কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢেকে দিলেন যেন সে অর্থ তাঁর দৃষ্টিতে না পড়ে।"

তারপর বারযাহ্ বিনতে রাফি'কে নির্দেশ দিলেন মুদ্রাগুলোকে একদিকে জড়ো কর এবং একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখ। তারপর বললেন, কাপড়ের ভিতর থেকে অমুক ইয়াতীমকে বাটিভরে দিয়ে আস। তারপর বাটিভরে অমুককে দেও। এভাবে সে অর্থ বণ্টন হতে থাকল, শেষে নামমাত্র কিছু বাকী রইল। শেষে বারযাহ বললেন : আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন ঃ এই অর্থে আমারও কিছু হক আছে। তিনি বললেন : ঠিক

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৪৭

আছে কাপড়ের নিচে যা আছে তুমি নিয়ে নাও। বারযাহ বলেন, কাপড় উঠিয়ে দেখি ৮৫ দিরহাম আছে। যখন সব অর্থ বণ্টন হয়ে গেল, তখন তিনি হাত তুলে মুনাজাত করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ لَايُدْرِكْنِىْ عَطَآءُ عُمَرَ بَعْدَ عَامِىْ هٰذَا ـ

"হে আল্লাহ! এ বছরের পর উমরের ভাতা যেন আমাকে আর না পায়।" (ইবন সা'দ)

অপর একটি বর্ণনায় আছে, হযরত যায়নাব (রা)-এর বাৎসরিক ভাতা বারহাজার দিরহাম ছিল। তা এক বছর মাত্র তিনি পেয়েছিলেন। যখন বার হাজার দিরহাম বায়তুল মাল থেকে তাঁর নিকট পৌঁছল, তিনি বার বার বলছিলেন

اَللّٰهُمَّ لَايُدْرِكْنِىْ هٰذَا الْمَالُ مِنْ قَابِلٍ فَانَّهُ فِتْنَةٌ

"হে আল্লাহ! আমাকে যেন ভবিষ্যতে এই অর্থ সম্পদ আর না পায়। নিশ্চয়ই এগুলো ফিতনা (প্রতিবন্ধক)।"[১]

এই কথা বলে তিনি তাঁর প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন এবং অভাবীদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। হযরত উমর (রা)-এর নিকট যখন এই খবর পৌঁছল, তিনি মন্তব্য করলেন, মনে হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যাপারে কল্যাণ ও বরকতের ফায়সালা করেছেন। সাথে সাথে তিনি আরও এক হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন এবং সালাম জানিয়ে সংবাদ পৌঁছালেন যে, যেহেতু আপনি বার হাজার দিরহাম খয়রাত করে ফেলেছেন, এজন্য এই এক হাজার দিরহাম আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য রেখে দিন। হযরত যায়নাব (রা) ঐ এক হাজার দিরহামও ঐ মুহূর্তে বণ্টন করে দিলেন।[২]

মৃত্যু

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন পবিত্র বিবিদেরকে বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার হাত অধিক লম্বা, সে-ই মৃত্যুর পর আমার সাথে সবার আগে মিলিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য দানশীলতা ও বদান্যতার প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। কিন্তু বিবিগণ এটিকে শাব্দিক অর্থে বুঝেছিলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর বিবিগণ যখন একত্রে সমবেত হতেন, তখন কার হাত লম্বা তা নির্ণয়ের জন্য পরস্পরের হাতের মাপ গ্রহণ করতেন।

হযরত যায়নাব (রা) আকৃতিতে ছোট ছিলেন। যখন তিনি সবার আগে ইন্তিকাল করলেন তখন প্রমাণিত হলো, তাঁর হাত দান-সাদাকায় সবচেয়ে বড় ছিল। তিনি হাতের কাজ জানতেন। হাতের কাজ করে তিনি প্রচুর অর্থ আয় করতেন এবং তা প্রায় সবই দান-সাদাকা করে দিতেন। মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন :

১. ফাতহুল বারী, ৩ খ, পৃ. ২২৮।

২. আল-ইসাবা, (যায়নাব বিনতে জাহাশ প্রবন্ধ)।

"আমি আমার কাফনের কাপড় তৈরি করে রেখেছি। হযরত উমর (রা) হয়তবা আমার কাফনের জন্য কাপড় পাঠাবে। একসেট কাফনে ব্যবহার করবে, অন্য সেট সাদাকা করে দিও। ওফাতের পর হযরত উমর (রা) খুশবু মেখে কাফনের জন্য পাঁচটি কাপড় প্রেরণ করলেন। হযরত উমরের প্রেরিত কাপড়ই তাঁকে কাফন পরানো হয় এবং তাঁর নিজের প্রস্তুত করা কাপড় তাঁর বোন হাম্না (রা) সাদাকা করে দেন।" (ইবন সা'দ)

হযরত উমর (রা) বলেন, হযরত যায়নাব (রা) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে এভাবে বলতে শুনেছি ঃ

لقد ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والارامل -

"আফসোস! আজকে এমন এক মহিলা চলে গেলেন যিনি প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন! অধিক ইবাদতকারী ছিলেন, ইয়াতীম ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল ছিলেন।"

হিজরী ২০ সনে তিনি পবিত্র মদীনায় ইন্তিকাল করেন। হযরত উমর (রা) জানাযার নামাযে ইমামতি করেছেন। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ৫০ অথবা ৫৩ বছর হয়েছিল। মহানবী (সা)-এর সাথে বিবাহের সময় বয়স ৩৫ ছিল। (আল্-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩১৪)

পর্দার উপর সামগ্রিক পর্যালোচনা

যিনা একটি অনৈতিক কাজ ও অপরাধ। এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল নবী-রাসূল (আ) আলিম, জ্ঞানী, দার্শনিক ও আত্মমর্যাদাবান মানুষ একমত। রুচিবোধ ও সম্মানবোধের জন্য যিনা একটি প্রতিবন্ধক। নৈতিক অধঃপতন ও চরিত্র ধ্বংসের সর্বনিম্ন কাজ হচ্ছে যিনা। মানুষের জীবনের একটি বাস্তবতা হচ্ছে, মহিলাদের প্রতি তাকালে পুরুষ অকৃষ্ট হয়। পুরুষগণের মনে মহিলাদের সাথে মিলিত হবার লালসা সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে মহিলাগণও পুরুষদের প্রতি তাকালে তাদের মনে পুরুষের প্রেম সৃষ্টি হয়। যা কখনো অবৈধভাবে অর্থাৎ বিনা বিবাহের কামনা ও প্রবণতা চরিতার্থ করার মাধ্যমে পরিণত হয় এবং উভয় পক্ষের ইজ্জত সম্মান, বংশ মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবার কারণ হিসেবে দেখা দেয়। এ বিষয়ে বাস্তব চিত্রগুলো খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য হিক্মত ও মর্যাদাবোধের দাবি হচ্ছে, এর প্রবেশপথ বন্ধ করতে হবে। এজন্যই পবিত্র শরী'আত যিনা থেকে হিফাযতের জন্য বিভিন্ন বিধানের ব্যবস্থা করেছে।

১. আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى -

"আর তোমরা ঘরে থাক এবং জাহেলী যুগের ন্যায় সাজগোজ করে বের হয়ো না। (সূরা আহযাব ঃ ৩৩)

২. যদি ঘরে থেকে পর পুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তা হলে বিধান এ রকম

لَاتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا

"যদি তোমাদের পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহলে কোমল, আকর্ষণীয় করে কথা বলবে না। কেননা যার হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির রোগ আছে সে তোমাদের হৃদয়ে লোভের সৃষ্টি করবে। এজন্য সোজা সাদামাটা কথা বলবে।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২)

৩. মহিলাদেরকে যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে তেমনি পুরুষদেরকে হুকুম দেয়া হচ্ছে ঃ

وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ -

"হে পুরুষগণ! যখন তোমরা নারীদের থেকে কোন কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এই প্রশ্ন করার পদ্ধতি তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের পবিত্রতার জন্য উত্তম মাধ্যম।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

৪. পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তোমরা যেন অন্য নারীদের প্রতি দৃষ্টি স্থির করে না দেখ ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ -

"হে রাসূল! মু'মিনদেরকে বলুন, তোমাদের দৃষ্টি অবনত রাখ এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।" (সূরা নূর ঃ ৩০)

৫. শরী'আতে মহিলাদের আযান, ইকামত ও ইমামতি নিষেধ করেছে।

৬. মহিলাদের প্রকাশ্য নামাযেও তাদের আওয়াজ করে কিরা'আত পড়াকে নিষেধ করেছে।

৭. হজ্জের মধ্যেও উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়াকে মহিলাদের জন্য নিষেধ করা হয়েছে।

৮. যুবতী মেয়েদের জন্য পরপুরুষকে সালাম করাও না জায়েয করা হয়েছে।

৯. পরপুরুষের শরীরের কোন সেবা পরমহিলা দিয়ে করা নিষিদ্ধ।

১০. আয়নায় অথবা পানির ছায়ায়ও বেগানা মহিলা দেখা নিষেধ, এভাবে বেগানা মহিলার ছবি দেখা জায়েয নেই। কেননা ছায়া, থেকে ছবি আরও বেশি শক্তিকর হতে পারে।

১১. বেগানা মহিলার আলোচনা দ্বারা স্বাদগ্রহণ নিষেধ।

১২. বেগানা মহিলার কল্পনা দ্বারা মানসিক তৃপ্তি অর্জনও হারাম।

১৩. এমনকি কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে বিনোদনের সময়ও বেগানা মহিলার স্থির কল্পনা নিষেধ।

১৪. পরপুরুষের সামনের অবশিষ্ট খাদ্য মহিলাদের জন্য গ্রহণে যদি তৃপ্তির মনোভাব থাকে, তাহলে সে খাদ্য গ্রহণও ভাল নয়।

১৫. বেগানা মহিলার সাথে করমর্দন বা হাতাহাতি করা নিষেধ। কোন কোন মূর্খপীর এমনটি করে হাত ধরে বায়'আত গ্রহণ করে, যা নাজায়িয, মহিলাদের বায়'আত নিতে হবে মুখে ও পর্দার আড়াল থেকে কথা দ্বারা হবে হাতে হাতে হবে না। জ্ঞানীগণ আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তিগণ চিন্তা করে দেখুন, যেনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য উত্তম এবং ইজ্জত-আবরু রক্ষার জন্য এর থেকে উত্তম আর কি ব্যবস্থা হতে পারে যা শরী'আত শিক্ষা দিয়েছে। এ উপমহাদেশে লজ্জাশরম, আত্মমর্যাদাবোধের চমৎকার উদাহরণ এক সময়ে ছিল, কিন্তু অধুনা নোংরা নতুন সংস্কৃতি তাদের সাহিত্যের মাধ্যমে সব নষ্ট করে দিয়েছে।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۔

মহানবী (সা)-এর একটি দীর্ঘ ভাষণ আছে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ঃ

اَلنِّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيْطَانِ ۔

"নারীগণ শয়তানের একটি জাল।" যার সাহায্যে যে পুরুষদেরকে শিকার করে। জালে আটকিয়ে প্রবৃত্তি লালসার পূজারী করে লোকদেরকে নিয়ে তামাশা করে। এ বিষয়ে নবী হযরত সুলায়মান (আ)এর একটি বাণী আছে ঃ

اِمْشِ وَرَاءَ الاَسَدِ وَلاَتَمْشِ وَرَاءَ الْمَرْأَةِ ۔

"সিংহের পিছনে ছুটতে পার কিন্তু কোন নারীর পিছনে নয়।"

অর্থাৎ সিংহের পিছনে চললে যত ক্ষতির আশংকা আছে তার থেকে অধিক আশংকা নারীর পিছনে চললে হতে পারে।

একজন দার্শনিক বলেছেন ঃ

اِيَّاكَ وَمُخَالَطَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّ لَحْظَاتِ الْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَلَفْظُهَاسَمٌّ ۔

"মহিলাদের সাথে অধিক মেলামেশা থেকে বিরত থাক। কেননা মহিলাদের দৃষ্টি হচ্ছে তীর, আর তাদের কথা হচ্ছে বিষ।"[১]

পর্দার সুফল ও পর্দাহীনতার কুফল

শরী'আত যেসব প্রয়োজন পর্দার নির্দেশ দিয়েছে তা হচ্ছে :

১. যেন যিনা থেকে হিফাযতে থাকা যায়,

২. ইজ্জত-আব্রু ও মহিলাদের শরীর ও চেহারা কুদৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকে।

৩. বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্যে কোন কালিমা আসবে না। সন্তানদের উপরও কোন অপবাদ কুধারণা আসবে না। যেন কেউ সন্দেহ করতে না পারে যে, এই সন্তান তার

---

১. ফায়যুল কাদীর, ২ খ, পৃ. ১৭৭।

মায়ের অথবা তার বাপের কি-না। তেমনিভাবে পিতাও দৃঢ় আস্থার সাথে বলতে পারবে যে, এটি আমার ছেলে, আমার মেয়ে। কিন্তু বেপর্দা মহিলার ছেলেমেয়ের সম্পর্কে এভাবে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, এরা তার স্বামীর সন্তান।

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে প্রতি তাকালে দেখতে পাবেন, সেখানে বেপর্দা ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে যিনা এত ব্যাপক হয়েছে যে, এর ফলে অবৈধ বা জারজ সন্তানের এত প্রাধান্য যে, নিজ বংশধর বলে কাউকে সনাক্ত করা মুশকিল হবে।

৪. পর্দার ফলে পুরুষ ও নারীর মনের শয়তানী কুধারণা থেকে পবিত্র থাকা যাবে। বেপর্দা হয়ে পুরুষ-নারী যখন পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তখন শয়তান তাদের অন্তরে মন্দ ধারণা সৃষ্টির সুযোগ পেয়ে যায়।

৫. পর্দার দ্বারা নারীর ইজ্জত-সম্মান স্বামী ও বংশের মর্যাদা থাকবে। একজন পুরুষ যখন দেখে তার স্ত্রী, মেয়ে অথবা বোন অন্য পুরুষের সাথে কথাবার্তা ও মেলামেশা করছে, তখন বুদ্ধিমান ও মর্যাদাবান পুরুষ হলে অবশ্যই তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আর আত্মমর্যাদাবোধ বিহীন ও বুদ্ধিবিহীন লোকের ব্যাপারে আমাদের কোন মন্তব্য থাকতে পারে না। এসব মর্যাদাবোধবিহীন লোকের চেহারাও আমরা দেখতে চাই না। এ ধরনের লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা জরুরী এবং এদের সাথে মেলামেশা ও তাদের সাথে উঠাবসা করা শরী'আতে দৃষ্টিতে যৌক্তিক কারণেও উচিত নয়।

কাহিনী

অভিশপ্ত ইবলীস মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার জন্য মহান আল্লাহর নিকট মজবূত ফাঁদ প্রদানের জন্য আবেদন জানাল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ফাঁদ তার সম্মুখে পেশ করা হলো। অবশেষে স্ত্রী লোকের জাল বা ফাঁদ দেয়া হলে ইবলীস খুশীতে নর্তন কুর্দন করতে লাগল।

মাওলানা রুমী (র.) তাঁর মূল্যবান কিতাব মসনবীর ৫ম খণ্ডে লিখেছেন ঃ

گفت ابلیس لعین دادار را

دام زفتے خواهم این اشکار را -

"অভিশপ্ত শয়তান প্রার্থনা জানাল, হে বিশাল জগতের মালিক! আমাকে একটি শক্ত ও মজবুত জাল দান করুন যা আমি আমার এ কাঙ্খিত শিকারের (মানবজাতিকে প্রথভ্রষ্ট করণ) উদ্দেশ্যে ব্যবহার কর।"

"ইবলিস যখন আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে বিতাড়িত হল, তখন সে কসম খেয়ে বলেছিল ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ -

"তোমার ইজ্জতের শপথ, অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করব, তাদের পালিয়ে যাবার সুযোগ থাকবে না। তবে তোমার নিষ্ঠাবান ও প্রিয় বান্দাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হব না।"

তারপর ইবলিস মহান ইনসাফ বরদার আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ জানাল, মানুষকে শিকার করার জন্য আমার মজবুত জাল প্রয়োজন, যেন তাতে ঢুকানোর পর মানুষ আর তা ছিন্ন করে বের হতে না পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন ইবলিসের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে তার জন্য কয়েকটি জাল পেশ করেন।

زروسیم دگله اسپش نمود
که بدین تانی خلائق راربود۔

"(তার আবেদনের প্রেক্ষিতে) তাকে সোনা রোপা ও ঘোড়ার পাল প্রদানের, প্রস্তাব করা হল যে, তুমি এসব সৃষ্টি দ্বারা বনী আদমকে তোমার পক্ষে নিয়ে যেতে পারবে।"

মহান আল্লাহ তা'আলা প্রথমে শয়তানের সামনে জাল হিসেবে পেশ করলেন স্বর্ণ, রৌপ্য ও ঘোড়ার পাল। তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি এসব বস্তু দ্বারা মানুষকে আটকাতে সক্ষম হবে, কেননা মানুষ স্বভাবগতভাবেই এসব বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট। এজন্য এসব কিছুর মাধ্যমে মানুষকে শিকারের ফাঁদে ফেলা সহজ হবে।

এই রকম কথাই আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۔

گفت شاباش وترش آویخت لنج
شدکر نجیده وترش همچوں ترنج ۔

"শয়তান তা প্রথমত কিছুটা সমর্থন করল বটে কিন্তু পরক্ষণেই দুঃশ্চিন্তায় তার ঠোঁট ঝুলিয়ে দিল। সে বিমর্ষ হল এবং তা ও অনেকটা মাকাল ফলের অনুরূপ।" (অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্যের প্রতি তো মানুষ আকর্ষিত হবে বটে কিন্তু তাতে তো কোন স্বাদ পাবে না। অনেকটা মাকালের মতো দেখতে সুন্দর হলে কি হবে? কামড় দিলে তো মজা পাবেন।)

শয়তান হক তা'আলার নিকট আরয করল ফাঁদ হিসেবে এসব ভাল, তবে আরও শক্তিশালী ফাঁদের প্রয়োজন।

پس جواهرهازمعدنها ئے خوش
کردان پس مانده راحق پیش کش

"অতঃপর মহান আল্লাহ্ এই বিতাড়িতকে নিজের সৃষ্টির বিভিন্ন মণিমুক্তা জহরতের মূল্যবান খনিজ পেশ করলেন।"

যখন লোভনীয় বিষয়ের ফাঁদ শয়তানের নিকট পসন্দনীয় হল না তখন সে আরও কিছু প্রত্যাশা করল। তার চাহিদা অনুযায়ী তারপর সুন্দর গহনা যা কানে পরিধান করা হয়, পেশ করা হল।

گیر این دام دگررا اے لعین

گفت زین افزون وه نعم المعین -

"(এবং বললেন) নাও! এ আরেকটি জাল হে অভিশপ্ত! শয়তান বলে উঠল ঃ হে সর্বোত্তম সাহায্যকারী সত্তা। এটিও একটি অন্যতম ফাঁন্দ বটে কিন্তু আমাকে আরও শক্ত একটি জাল দান করুন।"

সুন্দর গহনা পেশ করে শয়তানকে বলা হল ফাঁদ হিসেবে গহনাকে গ্রহণ কর। শয়তান বলল, পূর্বের লোভনীয় বিষয়ের মত গহনাও তেমন শক্তিশালী ফাঁদ নয়। আমাকে আরও অধিক কার্যকর ফাঁদ দান করুন।

چرب و شیرین وشرابات ثمین

دادش وبس جامه ابریشمیں

"মহান আল্লাহ্ অতঃপর তাকে সুস্বাদু সুমিষ্ট বল-বর্ধক ও পানীয় এবং রেশমী কাপড়ের অনুরূপ দামী দামী বস্ত্রের জাল গ্রহণের প্রস্তাব করলেন।"

শয়তানের আবেদনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য মানুষকে ধোঁকা দিতে ফাঁদ হিসেবে মদ পান ও রেশমী কাপড়কে দেখালেন এবং শয়তানের জন্য কার্যকর এসব ফাঁদ গ্রহণ করতে বলল

শয়তান ফরিয়াদ করল ঃ

گفت یارب بیش ازیں خواهم مدد

تابه بندم سان بحبل من مسد

"সে আরজ করল, প্রভূ হে! আপনার দরবারে আরও বেশী সাহায্যের নিবেদন করছি! যেন তাদের এমন মজবুত রশি দ্বারা বাঁধতে পারি যা ছিন্ন করা অসম্ভব হয়।"

শয়তান বলল, হে মাওলা! এটা থেকেও অধিক কিছু আমি চাচ্ছি। যেন আমি বনী আদমকে মজবুতভাবে আমার শিকারে বাঁধতে পারি। যে বাঁধ থেকে তারা বের হতে পারবে না এবং আপনার দরবারে দিকে দৌড়াতে না পারে।

تاکه مستانت که نروٌ پردلند * مرددارا ایں بندهارا بگسلند

تابدین دام درسنهائے هوا * مردتوگردد زنا مرداں جدا

"এতে করে যারা তোমার প্রেমে সত্যিকার প্রেমিক, যারা সত্যিই আল্লাহ্ভক্ত তারা এই জালকে ছিঁড়ে এবং প্রবৃত্তির পুজারী বান্দার তাতে আটকা পড়ে নর-নারীর পার্থক্যের অনুরূপ আসল-নকলের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত হয়ে যায়।"

হ্যাঁ, তবে অবশ্যই সে সব লোক যারা তোমার মহব্বতের শরাবে দেওয়ানা তারা অবশ্যই বাস্তব ময়দানের পুরুষ। তারা তোমার মহব্বতে হৃদয়কে সিক্ত করে রেখেছে সে সকল পুরুষ আমার এসব শক্তিশালী ফাঁদ ও রশি ছিন্ন করে বেরিয়ে যাবেই। তারা পৃথিবীর সোনা-রূপা, সৌন্দর্য-গহনার প্রতি মনোযোগী হবে না।

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ اِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ। দুনিয়ার ও প্রবৃত্তির পূজারী লোকেরা এ ফাঁদে আটকে যাবে। আর এভাবে তোমার পথে সবল পুরুষ ও দুর্বল লোকদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হবে। এজন্য আমি এখন মজবুত ফাঁদ চাচ্ছি যার মাধ্যমে পুরুষ ও দুর্বল লোক সবাইকে আটকে রাখা সম্ভব হয়।

دام دیگر خواهم ائے سلطان بخت
دام مرداندا ز وحیلت ساز سخت

"তারপরও সে বলল, হে মহা সম্রাট! আপনার কাছে আরেকটি এমন জাল প্রার্থনা করছি যা বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রেও এমন কার্যকরী হবে যে, যে কোন রকম চেষ্টা-তদবীর করেও তা থেকে পরিত্রাণ সুকঠিন হবে।"

হে দুনিয়ার মালিক! আমি আরও শক্তিশালী ফাঁদ চাই। যে ফাঁদকে অতিক্রম করা সক্ষম পুরুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন কৌশল অবলম্বন করে যেন এ ফাঁদকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না হয়।

خمرچنگ آودر پیش اونهاد * نیم خنده زد بداں شدنیم شاد

"মহান আল্লাহ তার সামনে মদ ও বাদ্য বাজনার জাল পেশ করলেন। এতে সে অর্ধেক পরিমাণ খুশীর হাসি হাস্‌ল এবং আধা সন্তুষ্ট হল।"

তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা শয়তানের জন্য আরও ফাঁদ প্রদর্শন করলেন। তাঁর সামনে মদ ও বাদ্যযন্ত্র রাখা হল। তাতে শয়তান কিছুটা খুশি হল। সে অর্ধেক হাসল ও মুচকি হেসে বুঝাল এ ফাঁদে কিছুটা কাজ হবে এবং তা পূর্বের যে কোন ফাঁদ থেকে উত্তম। তারপরেও সে এতে পুরোপুরি খুশি হতে পারেনি। তার অর্ধেক হাসির অর্থ হল, এ ফাঁদও স্থায়ী মজবুত ব্যবস্থা নয়। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য আরও শক্তিশালী ফাঁদ সংগ্রহের জন্য সে দরখাস্ত করল।

سوئے اضلال ازل پیغام کرد * که برارازقعر فتنه کرد

(অতঃপর যে আরও বড় জালের প্রার্থনা জানাল এভাবে) "পথভ্রষ্ট করার আদি ভাগ্য লিপিতে যেন তাকে শামিল করা হয়: যেন সে সমুদ্রের গভীর তলদেশের মত ফিতনা ফাসাদের গভীর তলদেশ ও তার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়।"

نے یکے ازبند گانت موسی است * پرده هادر بحر اوازگرد بست

"কেবল মূসার মতো নয় যিনি তোমার একজন বান্দা (নবী) ছিলেন এবং সমুদ্রের তলদেশে ধুলোবালির পর্দা ও দেয়াল প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন।" (আমাকে বরং তার চেয়ে বেশী ক্ষমতা প্রদান কর যেন)

آب ازهرسوعنان راوا كشيد * ازتگ دريا غبارے شد بديد -

"সর্বদিকের পানিই আমি শুকিয়ে দিতে পারি, সমূদ্র তলদেশে থেকে ধুলোবালি যেন প্রত্যক্ষ করা যায়।"

শয়তান আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করল যেন তাঁকে এমন গুমরাহীর ফাঁদ দেয়া হয় যা ফিত্নার সাগরের মত হবে। সাগরের গভীরতা থেকে শয়তান ধূলোবালি ছড়াবে যা দেখে দুনিয়ার মানুষ সাগরকে পানি না ভেবে শুষ্ক প্রান্তর হিসেবে ভুল করবে। আর তার সে সাগরে ডুবে মরে যাবে। যেমনিভাবে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিপক্ষ উম্মত সাগরকে শুষ্কপথ ভেবে সাগরে ডুবে মরে গিয়েছিল। হে প্রভু! তুমি আমার জন্য ফেত্নার সাগর বানিয়ে দাও। যেখানে আমি বনী আদমকে টেনে এনে ডুবিয়ে হালাক করব। হযরত মূসা (আ) যেমন পানিতে ডুবে মরা থেকে তাঁর অনুগত উম্মাতকে রক্ষা করেছিলো এবং প্রতিপক্ষ বাহিনীকে নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিলো। তেমনিভাবে আমি যেন ফেতনার নদীতে ডুবিয়ে মানুষকে গুমরাহ করতে পারি আর আমি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে হযরত মূসা (আ) এর মত ইমাম ও নেতা হতে পারি। হযরত মূসা (আ) ছিলেন হিদায়তের ইমাম আর আমি শয়তানের হব গুমরাহীর ইমাম।

(সম্ভবত শয়তান লৌহে মাহফূযে হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ভাগ্য লিখন দেখে আগাম ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল)। আল্লাহই ভাল জানেন।

دام محكم ده كه تا گردد تمام * وافگنم دركام ايشان چوه لجام

دركمند آرم كشم شان كش كشان* تاكه نتوانند سرپيچيد ازاں

"আমাকে মজবুত জাল দান কর, যেন উদ্দিষ্ট লক্ষ্য একেবারে পূর্ণ হয়ে যায় এবং মিশন সফল হয়ে যায়। এবং তা লাগামের অনুরূপ তাকের মুখে লাগিয়ে ইচ্ছে মত আমি ঘুরাতে পারি।"

শয়তান বলল, এমন ফাঁদ ও জাল প্রদান কর যা চূড়ান্ত ও কার্যকর। মানুষের মুখে যেন তা লাগামের মত লাগিয়ে দিতে পারি যা ছিন্ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি তখন ইচ্ছামত তাদেরকে যেদিকে চাইব, নিয়ে যেতে পারব। দুনিয়ার প্রবৃত্তির তামাশা দুনিয়াবাসী দেখতে পাবে (তাদের করুণ পরিণতি)।

چوكه خوبى زنان با اونمود * كه زعقل وصبر مرداں مى ربود -

"ফান্দে ফেলে, কোমরে রসি বেঁধে যেন তার ইচ্ছে মত এদিকে সেদিক টেনে নিতে পারি: তাতে তারা আমায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দিকেই মাথা ঘুরাতে পারবে না।"

"শয়তান যখন কোন ফাঁদেই পুরোপুরি খুশি হতে পারেনি, তখন আল্লাহ তা'আলা শেষ পর্যন্ত নারীদের রূপ-সৌন্দয্য সাজসজ্জা তাকে দেখালেন যা পুরুষের বুদ্ধি-বিবেক ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান এবং যাও তোমার জন্য উপযোগী কার্যকর এ ফাঁদে নিয়ে যাও আর লোকদেরকে গোমরাহ করার চেষ্টা কর। আর ফেত্‌নার সাগরের গভীর থেকে ধুলাবালি উড়াতে থাক।

پس زدانگشنك برقص اندرفتاد * كه بده زد ترسيدم برمراد ـ

"(পরিশেষে) মহান আল্লাহ যখন শয়তানকে নারী জাতির রূপ সৌন্দর্যের জাল দেখালেন; যাতে কিনা পুরুষ জাতির বুদ্ধি বিবেক-ধৈর্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

যখন শয়তানকে স্ত্রীলোকের রূপ-সৌন্দর্য দেখানে হল, তখন শয়তান মনের সুখে নাচতে শুরু করল। নাচতে নাচতে সে হাতে তালি দিতে লাগল। সে বুঝতে পারল স্ত্রী লোকের রূপ-সৌন্দর্য হল ফিতনার সাগর। এটা থেকে রক্ষা ও নিরাপদ থাকা কোন মানুষের সম্ভব হবে না। এবার শয়তান বলতে লাগল হে প্রভু! তাড়াতাড়ি আমাকে এ ধরনের নারী ফিতনার ফাঁদ প্রদান করুন। আমি এবার আমার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হব। মানুষকে শিকার করার জন্য একটি কার্যকর ফাঁদ। নিম্নে ফিতনার অবস্থা সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ

چوں بدیدآں چشمهائے برخمار * كه كند عقل وخردرا درخمار

"নারী জাতিরূপ জাল দর্শনে সে মহাখুশিতে নাচ-গান হাত-তারী দেয়া শুরু করল (এবং বলল) : এ জাল দ্বারাই আমি সর্বাগ্রে আমার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হব।"

সে নারীর দৃশ্যে দেখল যে, নারীর চোখের দৃষ্টিতে এমন যাদুকরী মদিরা রয়েছে যা বুদ্ধি-বিবেককে পর্দা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে।

واں صفائے عارض آدن لبراں * كه بسوزد چوں سپندایں دل براں ـ

"সে যখন দেখল নারী জাতির নয়নযুগলের অন্তরালে এমন আকর্ষণ লুকানো যে, তা বৃদ্ধি বিবেকের ওপর পর্দা টেনে দেয়।"

সে নারী দৃশ্যে দেখল সুন্দরীদের গালের শুভ্রতায় হৃদয়ে পেট্রোলের আগুনের ন্যায় জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

روے خبال وابرو ولب چو عقیق * گوئیا خورتافت ازپرده رقیق

"আর এ চিত্ত হরনকারী দেয় মুখাবয়বের লাবণ্যতা এতই আকর্ষনীয় যে, আগর কাঠের মতো তা দর্শকের অন্তরকে জ্বালিয়ে দেয়।"

সে আরও দেখল তাদের মুখমণ্ডল ও গাল আনারের মত লাল ঠোঁট চমকাচ্ছে। যেমন সূর্য হালকা পর্দার আড়ালে চমকায়।

قدچوں سرو خرامان دره چسمن *

خدا همچوں یا سمین ونسترن

"(সে আরও দেখল ঃ) নারীজাতির দেহ সৌন্দর্য ও আকর্ষনীয় চলন বাগানের ফুলবৃক্ষ বিশেষের ন্যায় বাতাসে হেলেদুলে ফুলবৃত্তের মত নারীর চলনভঙ্গিও আকর্ষণীয়) : গাল-যুগল যেমন কিনা বাগানে ফুটন্ত ইয়াসমীন ও নাসরীন ফুলের ন্যায়।"

چوں که دیدان غبغ بر حسب اوسك

چوں تجلی حق از پرده تنك -

" নারী জাতির উক্ত সব যাদুকরী ও মনোহরী কেরেশমা প্রত্যক্ষ করে সে মহাখুশীতে উদ্বেলিত হয়ে উঠল; যা কিনা প্রকৃতপক্ষে মহান সত্তার আসল রূপ সৌন্দর্যেরই হালকা ছিঁটা বা বিচ্ছুরণ মাত্র।"

নারীদের আবারও রূপের চমক দেখে শয়তান বুঝেছে মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে শিকার ধরার জন্য নারীরাই সর্বোত্তম কার্যকর অস্ত্র হতে পারে.............।

عالم شد واله وحیران ودنگ * زاں کرشم وزاں دلال نیك شنگ -

"এই আল্লাহ প্রদত্ত যাদুকরী আকর্ষণ, শ্রেষ্ঠ দিশারী (মন্দ অর্থে) ও অপহরকের প্রভাবে জগত-সংসারের বিশাল একটি জনগোষ্ঠী দিশেহারা ও বিস্ময়ে বিভোর।"[১]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস ইবন যিরার (রা)

হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা) বনী মুস্‌তালিকের সরদার হারিস ইবন যিরার-এর কন্যা ছিলেন। তাঁর প্রথম বিবাহ মুস্‌তালিক গোত্রের মুসফাহ্ ইবন সাফওয়ান এর সাথে হয়েছিল। সে মুরাইসী যুদ্ধে নিহত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে অনেক পুরুষ, মহিলা ও শিশু বন্দী হয়। তাদের মধ্যে জুওয়াইরিয়াও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে স্বাধীন করে দেন এবং তাঁকে চারশত দিরহাম মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা বনী মুস্‌তালিক যুদ্ধের অধ্যায়ে গত হয়েছে। ৫ হিজরীতে মহানবী (সা) এর সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২০ বছর। অতঃপর রবিউল আউয়াল ৫০ হিজরীতে ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তৎকালীন মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবন হাকাম জানাযার নামাযের ইমামতি করেন এবং তাঁকে মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।[২]

ইবাদত-বন্দেগীতে আগ্রহী ছিলেন। ইবাদতের জন্য ঘরে মসজিদ নামে একটি স্থান নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকালের দিকে হযরত জুওয়াইরিয়ার ঘরে তাশরীফ নিলেন, তিনি বলেন, তখন আমি মসজিদে ইবাদত মশগুল ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরে গেলেন। তারপর দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে আবার আগমন করলেন, তখনো

১. মসনবী, ৫ খ, পৃ. ৪১৩।

২. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ২৬৫।

ইবাদতের অবস্থায় আমাকে মশগুল দেখে বললেন, তুমি সে সময় থেকেই এ অবস্থায় আছ? আমি বললাম জ্বি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে কয়েকটি কালেমা শিখিয়ে দিচ্ছি– তা হচ্ছে ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ তিনবার سُبْحَانَ اللّٰهِ رَضَانَفْسِهٖ তিনবার سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ তিনবার سُبْحَانَ اللّٰهِ مَدَادَ كَلِمَاتِهٖ তিনবার এগুলো তুমি পড়বে। (তিরমিযী)

মুসলিম ও আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে তিনি বললেন, আমি তোমার পরে এ চারটি কালেমা তিনবার করে পড়েছি, অথচ তুমি সকাল থেকে শুরু করে যত তাসবীহ্ পড়েছ তার সাথে এগুলোকে একত্রে ওজন করলে এই চার কালেমার ওজন বেশি হবে। আর সেগুলো হচ্ছে ঃ

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضانفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ـ (زرقانى ص ٢٥٥)

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবাহ বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা)

তাঁর নাম রামলাহ্, উম্মু হাবীবাহ্ তাঁর উপনাম ছিল। বিখ্যাত কুরায়শ সরদার আবূ সুফিয়ান ইবন হারব (রা) এর কন্যা ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল সাফিয়্যা বিনতে আবুল আ'স, যিনি হযরত উসমান (রা–-এর ফুফু ছিলেন। নবুওয়াতের ১৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রথম বিবাহ ওবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশের সাথে হয়েছিল।

উম্মু হাবীবাহ (রা) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বামী ও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা দু'জনই হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে তার একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। যার নাম হাবীবাহ রাখা হয়েছিল এবং তিনি মেয়ের নামে উম্মু হাবীবাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিছু দিন পর স্বামী ওবায়দুল্লাহ্ ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়, কিন্তু উম্মু হাবীবাহ সর্বদা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

উম্মু হাবীবাহ (রা) বর্ণনা করেন, ওবায়দুল্লাহ মুরতাদ হওয়ার পূর্বে আমি স্বপ্নে তাকে ভীষণ ও কুৎসিত আকৃতিতে দেখেছি। এতে আমি ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম। সকালে আমি অবগত হলাম যে সে ঈসায়ী হয়ে গেছে। আমি তাঁকে আমার স্বপ্নের বিষয় অবহিত করলাম। কিন্তু তাতে তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম না। বরং সে মদের নেশায় মত্ত ছিল। এ অবস্থায়ই সে মারা যায়। কিছু দিন পর আমি পুনরায় স্বপ্ন দেখলাম কেউ যেন আমাকে উম্মুল মু'মিনীন বলে আওয়াজ দিচ্ছে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, এদিকে বিধবা নারীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিয়ের প্রস্তাব এসে পৌঁছল (ইবন সা'দ)।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আম্র ইবন উমাইয়াকে বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নিকট এই বার্তা দিয়ে পাঠালেন–উম্মু হাবীবাহ্ যদি আমার সাথে বিয়েতে সম্মত হয়, তা-হলে আপনি উকীল হিসেবে বিয়ের আয়োজন করে তাঁকে আমার দরবারে পাঠিয়ে দিবেন। হযরত নাজ্জাশী (রা) আবরাহা নামক নিজ দাসীকে এই সংবাদ দিয়ে হযরত উম্মু হাবীবাহ (রা) এর নিকট পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার বিষয়ে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তুমি সম্মত হলে একজন উকীল নির্বাচন কর। হযরত উম্মু হাবীবাহ (রা) মহানবী (সা)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আ'সকে তাঁর উকীল নির্বাচন করলেন। এই সুসংবাদ ও আনন্দের পুরস্কার হিসেবে নিজ হাত পায়ের মূল্যবান গহনা নাজ্জাশীর উদ্দেশ্যে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন। সন্ধ্যায় হযরত নাজ্জাশী হযরত জা'ফর (রা) সহ সকল মুসলমানকে একত্রিত করে নিজে বক্তৃতা দিয়ে বিয়ে পড়ায়ে দিলেন। তিনি বক্তৃতায় এ কথাগুলো বলেছিলেন ঃ

ألحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وانه الذى بشربه عيسى بن مريم صلى الله عليهما وسلم أما بعد ـ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى ان ازوجه ام حبيبة بنت أبى سفيان فاجبت الى مادعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصدقتها أربعمائه دينار ـ

"যাবতীয় প্রশংসা স্তুতি মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সব কিছুর মালিক মহাপবিত্র পরাক্রমশালী বিজয়ী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। নিশ্চয়ই তাঁর সুসংবাদ দিয়েছিলেন হযরত ঈসা ইবন মরিয়ম (আ)। তারপরের বক্তব্য হচ্ছে ঃ

আল্লাহর রাসূল (সা) আমার নিকট লিখিত সংবাদ পৌঁছিয়েছিলেন আমি যেন উম্মু হাবীবার সাথে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করে দেই। আমি তাঁর আহবান অনুযায়ী তা সম্পন্ন করেছি এবং আমি উম্মু হাবীবার জন্য চারশত দিনার মোহর ঘোষণা করলাম।"

সাথে সাথে তিনি চারশত দিনার হযরত খালিদ ইবন সাঈদের নিকট সমর্পণ করলেন। অতঃপর খালিদ ইবন সাঈদ উঠলেন এবং নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করলেন ঃ

ألحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ـ

أما بعد فقد اجبت الى مادعا اليه رسول الله صلى الله عليه وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم -

"আল-হামদুলিল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি ঘোষণা করছি এবং তাঁর নিকট মাগফিরাত কামনা করি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আল্লাহ একক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হক দ্বীন ও হিদায়াত সহকারে প্রেরণ করেছেন। যেন তিনি সকল দীনের উপর এ দ্বীনকে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকদের তা অপছন্দনীয়।

তারপর কথা হচ্ছে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রত্যাশা অনুযায়ী তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেছি এবং আমি উম্মু হাবীবাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য এতে বরকতের ফায়সালা করুন।"

সমবেত জনতা উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করলে নাজ্জাশী বললেন, আপনারা বসুন! আম্বিয়ায়ে কিরামের নিয়ম ও সুন্নাতের অনুসরণে বিয়ের পর আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তারপর খাদ্য পরিবেশন করা হয় এবং সকলে খাওয়া দাওয়া সেরে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন মোহরের অর্থ উম্মু হাবীবার নিকট পৌঁছল তখন তিনি দাসী আবরাহকে ৫০ দিনার প্রদান করলেন। আবরাহা এই ৫০ দিনারসহ পূর্বে তাঁর দেয়া গহনাদি তাঁকে ফেরত দিয়ে বললেন : বাদশাহ নাজ্জাশী আপনার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করতে জোর নিষেধ করেছেন। আপনি বিশ্বাস করুন আমি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর ঈমান এনে তাঁর অনুসারী হয়েছি এবং আল্লাহ তা'আলার দীন ইসলাম গ্রহণ করেছি। আজকে মহান বাদশাহ তাঁর রাণীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাদের কাছে যত খুশবু ও আতর আছে অবশ্যই তা নবী বিবি উম্মু হাবীবার নিকট উপহার হিসেবে পাঠাবে।

এভাবে পরের দিন আবরাহ রাণীদের অনেক উপহার নিয়ে হযরত উম্মু হাবীবার নিকট আসল। হযরত উম্মু হাবীবাহ (রা) বলেন, আমি সেসব সুগন্ধি সামগ্রী সযত্নে রেখে দিলাম এবং সাথে করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে নিয়ে আসলাম। তখন আবরাহা বললেন, আপনার নিকট আমার একটি আবেদন আছে, তা হচ্ছে আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে আমার সালাম জানাবেন এবং হযরতকে বলবেন, আমি তাঁর দ্বীনের অনুসারী হয়েছি। আমার রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত আবরাহার অবস্থা এরূপ ছিল। যখন আমি চলে আসি তখনও সে বলতেছিল দেখুন। আমার আবেদনটুকু যেন ভুলে না যান। যখন আমি মদীনায় পৌঁছলাম এই সব ঘটনার কথা মহানবী (সা) নিকট বর্ণনা করলাম, তিনি মুচকি হাসছিলেন শেষ পর্যন্ত আমি আবরাহার সালাম পৌঁছালাম। তখন তিনি বললেন[১] وعليها السلام ورحمة الله وبركاته

---

১. সাফওয়াতুস, সাকওয়া, ২ খ, পৃ. ২২; যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৪৩।

হযরত উম্মু হাবীবাহ (রা) ৪৪ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। দামেশকে ইন্তিকাল করেছেন বলেও এক বর্ণনায় আছে। তবে মদীনায় ইন্তিকালের বর্ণনাই অধিক গ্রহণযোগ্য। তাঁর জন্ম নবুওয়াতের ১৭ বছর পূর্বে হয়েছিল হিসেবে মৃত্যুর সময় তার বয়স ৭৪ বছর ছিল। এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ৩৭ বছর ছিল।[১]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, উম্মু হাবীবার মৃত্যুর সময় তিনি আমাকে খবর দিলেন। আমি উপস্থিত হলে তিনি বললেন, তুমি ভাল করে জান সতীনদের মধ্যে পারস্পরিক কিছু হয়ে থাকে। যা কিছু হয়েছে তুমি আমাকে মাফ করে দিও। আল্লাহ্ আমাকে ও তোমাকে মাফ করুক। আমি বললাম সব কিছু মাফ! আল্লাহ তা'আলা আমাকেও তোমাকে মাফ করুন। তখন উম্মু হাবীবাহ্ (রা) বললেন, আয়েশা, তুমি আমাকে খুশী করেছ, আল্লাহ্ যেন তোমাকেও খুশী রাখে। তারপর তিনি উম্মু সালামাকে ডাকলেন এবং তাঁর সাথেও এই ধরনের কথাবার্তা বললেন। (ইবন সা'দ)[২]

উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যা বিনত হুয়্যি (রা)

হযরত সাফিয়্যা বনী নাযীর গোত্রের সারদার হুয়াই ইবন আখতাব-এর কন্যা ছিলেন। আখতাব ছিল হযরত মূসা (আ) এর ভাই হযরত হারূন (আ)-এর অধস্তন বংশধর। হযরত সুফিয়্যার মায়ের নাম ছিল দাররাহ্। প্রথমে হযরত সাফিয়্যার বিয়ে সালাম ইবন মিশবামের সাথে হয়েছিল। তার সাথে বিচ্ছেদের পর কিনানা ইবন আবীল হাকীমের সাথে বিয়ে হয়েছিল।[৩] কিনানা খায়বারের যুদ্ধে নিহত হয়। হযরত সাফিয়্যা যুদ্ধে বন্দী হন। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বাধীন করে দিয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁকে মুক্ত করাকে মোহর হিসেবে গণ্য করেন। খায়বার থেকে এক মনযিল দূরে সাহবা নামক স্থানে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হল এবং সেখানে প্রীতি আপ্যায়নের (অলীমা) ব্যবস্থা করা হয়।[৪]

ধুমধামের সাথে প্রীতি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। চামড়ার একটি দস্তারখানা বিছানা হয় এবং হযরত আনাস (রা)-কে ঘোষণা দিতে বলা হয় যে, যার কাছে খাদ্য সামগ্রী হিসেবে যা কিছু আছে, তা যেন একত্রিত করা হয়। কেউ খেজুর আনল, কেউ পনীর, কেউ ছাতু আর কেউ ঘি ইত্যাদি। যখন খাদ্য সামগ্রী একত্রে জড়া করা হলো তখন সকলে সমবেতভাবে এক সাথে আহার করলেন। এই প্রীতি আপ্যায়নে গোশত ও রুটি কিছুই ছিল না। (বুখারী মুসলিম) সাহবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) তিনদিন

---

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৪৫।

২. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ২৩৬; সাকওয়াতুস সাকওয়া, ২য় খ, পৃ. ২৪।

৩. কোন স্বামী থেকেই কোন সন্তান হয়নি। উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ৩০৭।

৪. উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ৩০৭।

অবস্থান করলেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) পর্দায় অবস্থান করলেন। যখন সেখানে থেকে রওয়ানা করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে তাঁকে উটে আরোহণ করালেন এবং নিজ চাদর দিয়ে তাঁকে পর্দা করলেন, যেন কেউ তাঁকে না দেখে। কার্যত এটি একটি ঘোষণা ছিল যে, তিনি দাসী নন্ বরং উম্মুল মু'মিনীন। (বুখারী ও মুসলিম)[১]

হযরত সাফিয়্যা (রা) যখন মহানবীর স্ত্রীর মর্যাদা পেলেন মহানবী (সা) তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে চোখের উপর একটু নীল দাগ দেখতে পেলেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, এ দাগ কিভাবে হয়েছে? তখন হযরত সাফিয়্যা (রা) বর্ণনা করলেন : একদিন আমি আমার পূর্ব স্বামীর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আকাশের চাঁদ আমার কোলে এসে পড়েছে। আমি ঘুম থেকে উঠে আমার স্বামীকে আমার স্বপ্নের কথা বলার সাথে সাথে সে আমাকে প্রচণ্ডভাবে একটি চড় মারল এবং বলল, তুমি (ইয়াসরিব) মদীনার শাসককে কামনা করছ। অর্থাৎ সে মহানবী (সা)-কে ইঙ্গিত করেছিল। (হযরত ইবন উমর (রা)-কে তাবরানীর বর্ণনা)[২]

হযরত সাফিয়্যা (রা) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন তিনি হারিসা ইবন নু'মানের গৃহে উঠেন। তাঁর সৌন্দর্যের কথা প্রচারিত হওয়ায় মদীনার অনেক আনসারী মহিলা তাঁকে দেখতে ভীড় করেন। এমনকি চোহরায় পর্দা দিয়ে লুকিয়ে হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে দেখতে যান, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে চিনে ফেলেন। পরক্ষণে তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে প্রশ্ন করেন : আয়েশা! কেমন দেখলে? জবাবে তিনি জানালেন হ্যাঁ, এই ইয়াহূদীয়াকে দেখে এলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি এভাবে বল না। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ উত্তমভাবেই করেছে। (ইবনে সা'দ)[৩]

একদা মহানবী (সা) হযরত সাফিয়্যার নিকট আগমন করে দেখলেন সাফিয়্যা কাঁদছে তিনি তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, হযরত আয়েশা এবং হযরত হাফসা তাঁকে অপমান করে বলেছে–আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অধিক মর্যাদাবান, কেননা আমরা তাঁর বিবি হওয়ার সাথে সাথে তাঁর চাচাদের কন্যাও বটে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন, তুমি তাদেরকে কেন এভাবে বলতে পারলে না যে, তোমরা আমার থেকে কিভাবে অধিক মর্যাদাবান হতে পার, আমার আদি পিতা হচ্ছেন হযরত হারূন (আ) আর আমার চাচা হচ্ছেন, হযরত মূসা (আ) এবং আমার স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সা)! (তিরমিযী)[৪]

---

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৫৭।

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৫৭।

৩. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩৪৭।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭; ৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললাম সাফিয়্যা এতটুকুতেই যথেষ্ট, সে এরকম এরকম অর্থাৎ এতটুকু ছোট। তিনি বললেন : আয়েশা ! তুমি এমন খারাপ শব্দ বলেছ যা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে সমুদ্রের পানি ময়লা হয়ে যাবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

একবার সফরে হযরত সফিয়্যাও রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে ছিলেন। তাঁর উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন হযরত যায়নাব (রা)-এর অতিরিক্ত উট ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন : সাফিয়্যাকে তুমি একটি উট দিয়ে দিলে ভাল হয়। উত্তরে হযরত যায়নাব বললেন : আমি এই ইয়াহূদীকে উট দেব ? তিনি একথা শুনে খুব নাখোশ হলেন। এমনকি দু'তিন মাস তিনি যায়নাবের কাছে যাননি। (ইবনে সা'দ)[৩]

একবার মহানবী (সা)-এর মৃত্যুরোগের সময় সমস্ত নবী সহধর্মিনী তাঁর খিদমতে একত্র হলেন। তখন হযরত সাফিয়্যা বললেন : হে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রোগ তাঁর পরিবর্তে আমাকে দাও। বিবিগণ এ কথা শুনে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ

وَ اللّٰهِ اِنَّهَا لَصَادِقَةٌ

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই সে সত্যবাদী (ইবনে সা'দ)

আবূ উমর (ইবন আবদুল বার) বলেন, হযরত সাফিয়্যা (রা) খুব বুদ্ধিমতী, জ্ঞানী ধৈর্যশীলা ও মর্যাদার অধিকারী নারী ছিলেন। একবার হযরত সাফিয়্যার এক দাসী হযরত উমর (রা)-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করল যে, হযরত সাফিয়্যা ইয়াহূদী সংস্কৃতি অনুকরণে শনিবারকে গুরুত্ব দেন এবং ইয়াহূদীদের সাথে ভাল আচরণ করেন।

হযরত উমর (রা) হযরত সাফিয়্যা (রা) থেকে বিষয়টি জানতে চাইলেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) জবাবে জানালেন : যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে শনিবারের পরিবর্তে শুক্রবার দান করেছেন তখন থেকে আমি শনিবারকে আর পছন্দ করি না। অন্যদিকে আমার কিছু ইয়াহূদী আত্মীয় আছে, আমি তাদের আত্মীয়ের হক অনুযায়ী ভাল আচরণ করি। তিনি হযরত উমর (রা)-কে এই জবাব জানিয়ে পাঠালেন অন্যদিক সেই বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে আমার বিরুদ্ধে একাজে কে উস্কে দিয়েছে? সে সত্যি সত্যি জবাব দিল শয়তান আমাকে প্ররোচনা দিয়েছে। হযরত সাফিয়্যা (রা) বললেন : ঠিক আছে, তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।[১]

বিখ্যাত তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) বর্ণনা করেন, হযরত সাফিয়্যা (রা) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তাঁর কিছু সোনার গহনা ছিল, তিনি কিছু হযরত ফাতিমা (রা)-কে দিলেন এবং কিছু অন্যান্য মহিলাদেরকে দিয়ে দিলেন। (ইবন সা'দ)[২]

সুবহানাল্লাহ্, তিনি নবী (সা)-এর দাম্পত্যে এসে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসী জীবনের সমাপ্তি টানেন। ৫০ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।[৩]

---

১. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩৪৭।

২. প্রাগুক্ত।

৩. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৫৯।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা[১] বিনতে হারিস (রা)[২]

হযরত মায়মূনা (রা)-এর পিতার নাম ছিল হারিস এবং মাতার নাম ছিল হিন্দ। ৭ম হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি-উত্তর মক্কা শরীফে কাযা উমরা পালন সময়কালে তাঁকে মহানবী (সা) বিবাহ করেন। ইবন সা'দ বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। তাঁরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আর কাউকে বিবাহ করেননি। প্রথমে হযরত মায়মূনা (রা)-এর বিবাহ আবূ রুহম এর সাথে হয়েছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে বিবাহ হয়। ৫০০ দিরহাম মোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মায়মূনার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন, তখন তিনি হযরত আব্বাস (রা)-কে তাঁর উকীল নির্বাচন করেন। হযরত আব্বাস (রা) হযরত মায়মূনা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। (আহমাদ ও নাসাঈ)

বিভিন্ন বর্ণনায় এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, বিয়ের সময় তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না-কি ইহরামমুক্ত অবস্থায় ছিলেন। ইমাম বুখারীর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে : তিনি মুহরিম অবস্থায় ছিলেন। পবিত্র মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে সরফ নামক স্থানে গিয়ে বিয়ের বাসর অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন বর্ণনা এমনও আছে যে, বিয়ে ও বাসর সরফেই হয়েছিল এবং ৫১ হিজরীতে যে স্থানে বাসর হয়েছিল একই স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁকে কবর দেয়া হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৫] তাঁকে কবরে নামান হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, ইয়াযীদ ইবন আসাম এবং আবদুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ ও আবদুল্লাহ খাওলানী। তাঁর প্রথম তিনজনের তিনি খালা হতেন এবং চতুর্থজন তাঁর পালিত ইয়াতীম সন্তান ছিলেন।[৩]

এখানে ১১ জন পবিত্র বিবির আলোচনা করা হলো। যারা মহানবী (সা)-এর সাথে বিবাহিত সূত্রে দাম্পত্য জীবনে ছিলেন। তাঁরা সকলেই 'উম্মুহাতুল মু'মিনীন' উপাধিতে ভূষিত ও বিখ্যাত ছিলেন।

এই ১১ জনের অতিরিক্ত আরও কয়েকজন মহিলার সাথে মহানবী (সা)-এর বিয়ে হয়েছিল কিন্তু মিলিত হওয়া বা সংসার করার পূর্বেই তারা পৃথক হয়ে গেছেন। যেমন আসমা বিনতে নু'মান জাওনিয়াহ ও আমরাহ্ বিনতে ইয়াযীদ কিলাবিয়াহ। তাঁদের আলোচনা এখানে করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি এজন্য আলোচনায় আসেনি।[৪]

---

১. হযরত মায়মূনা (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর খালা ছিলেন।

২. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৪১১।

৩. আল-ইসতি'আব, ৪ খ, পৃ. ৪০৮।

৪. তাঁর সাথে বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন ফাতহুল বারী, ৯ খ, পৃ. ৩১০-৩১৫।

দাসীগণ

মহানবী (সা)-এর পবিত্র দাসী পত্নী-ছিলেন চারজন। তাঁদের মধ্যে দু'জন বিখ্যাত ছিলেন

১. হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)

হযরত মারিয়া (রা) দাসী ছিলেন। মহানবী (সা)-এর ছেলে হযরত ইব্‌রাহীম তাঁর উদর থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইসকান্দারিয়ার রাজা মুকাওকাশ হাদিয়া স্বরূপ মহানবী (সা)-কে হযরত মারিয়াকে দান করেছিলেন। তিনি হিজরী ১৬ সনে হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। 'জান্নাতুল বাকী' গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

২. হযরত রায়হানা বিনতে শামঊন (রা)

হযরত রায়হানা বনী নযীর অথবা বনী কুরায়যা গোত্রের ছিলেন। যুদ্ধবন্দীনী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা) দরবারে উপস্থিত হন এবং দাসী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংসারে ছিলেন। ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের পর ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

এক বর্ণনায় আছে তাঁকে মুক্ত করে রাসূলুল্লাহ (সা) বিবাহ করেছিলেন। (আল্লাহ্ ভাল জানেন)

৩. নাফীসা (রা)

হযরত নাফীসা (রা) প্রকৃতপক্ষে হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ উম্মুল মু'মিনীন-এর দাসী ছিলেন। হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, একবার হযরত সাফিয়্যা (রা) প্রসঙ্গে মহানবী (সা) হযরত যায়নাবের উপর নাখোশ হয়ে দু'তিন মাস ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবার রাযী হলেন, হযরত যায়নাব (রা) খুশি হয়ে নিজ দাসী নাফীসাকে তাঁকে দান করেন।

এছাড়া আরও একজন দাসী ছিলেন যার বিস্তারিত নাম ধাম জানা যায় না। (যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৭১-২৭৪)

বহু বিবাহ[১] প্রসঙ্গ

১. একজন মহিলার জন্য একাধিক স্বামী নিষিদ্ধ হওয়ার যুক্তি হচ্ছে ঃ

পৃথিবীর ইতিহাস এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামের পূর্বেই গোটা দুনিয়ায় বহু বিবাহ প্রচলিত ও স্বীকৃত ছিল। একজন পুরুষের একাধিক পত্নী থাকায় এই প্রচলন থেকে আম্বিয়ায়ে-কিরামও ব্যতিক্রম ছিলেন না।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর দু'জন স্ত্রী ছিলেন। হযরত ইসহাক এবং হযরত মূসা (আ)-এরও একাধিক পত্নী ছিল।

---

১. একজন স্ত্রীর যদি কয়েকজন স্বামী থাকে তা হলে সকল স্বামীরই স্ত্রীর প্রতি তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয় অধিকার সাব্যস্ত হবে। হয়তবা একই সময় একাধিক স্বামীর স্ত্রীর প্রতি চাহিদা ও প্রয়োজন দেখা দিবে। তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এই নিয়ে ঝগড়া হবে। এমনকি তা হত্যা পর্যন্ত গড়াতে পারে। (বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর বহুসংখ্যক পত্নী ছিলেন। এবং হযরত দাঊদ (আ)-এর পত্নী সংখ্যা ছিল একশত। ইঞ্জিল ও তাওরীত কিতাবেও অন্যান্য নবীদের বহুপত্নী বিষয়ক আলোচনার উল্লেখ রয়েছে। বহুপত্নী বিষয়ে কোন আসমানী কিতাবেই কোন আপত্তির সামান্যতম কথাও উল্লেখ নেই।

হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ) দু'জন নবী বিয়েই করেননি। তাঁদের বিপত্নীক হওয়া যদি দলীল হিসেবে নেয়া হয় তাহলে এক বিয়ে ও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। হাদীসে আছে, হযরত ঈসা (আ) আকাশে গমনের পূর্বে বিয়ে করেননি কিন্তু পুনরায় যমীনে অবতরণের পর তিনি বিবাহ করবেন এবং তিনি সন্তানের পিতাও হবেন। যেমনটি হাদীসে রয়েছে। মোটকথা এজন্য কোন ইয়াহূদী বা খ্রিস্টানের এ বিষয়ে অভিযোগ করার কোন অধিকার যে ইসলাম এসেই বহু বিবাহ প্রচলন করেছে। বরং ইসলাম এসে পত্নীর সংখ্যা সীমিত করে দিয়েছে। তা হচ্ছে, চার জনের সংখ্যার অতিক্রম করা যাবে না।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের

২. পুরুষ স্বভাবগতভাবে শাসক হয়ে থাকে এবং স্ত্রী তার অধীন। এজন্য তালাকের অধিকার পুরুষকে দেয়া হয়েছে। পুরুষ যতক্ষণ স্ত্রীকে মুক্ত না করে ততক্ষণ সে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহবদ্ধ হতেও পারে না, যেভাবে দাসদাসী মনিব কর্তৃক মুক্ত না হলে নিজে নিজে মুক্ত হতে পারে না। দ্বিতীয় পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না। যেমন দাসী ও গোলাম নিজেরা স্বাধীন হতে পারে না, যতক্ষণ না মালিক তাদেরকে মুক্ত করে দেয়। এমনিভাবে স্ত্রীও নিজে নিজে বিয়ে থেকে মুক্ত হতে পারেনা, যতক্ষণ না স্বামী তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে না দেয়।
গোলামদের জন্য যেখানে আযাদ করে দেয়ার নিয়ম আছে মহিলাদের জন্য তেমন তালাক। বহু স্বামীর ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, এক মহিলার কয়েকজন স্বামী তার উপর কর্তৃত্ব করবে এভাবে অধিক কর্তার কর্তৃত্ব অধীনস্থের লাঞ্ছনার কারণ হয়ে পড়বে। এ জন্য একজন কর্তার অধীনে অনেক অধীনস্থ থাকা কোন সমস্যার বিষয় নয়। একজন কর্মকর্তার অধীনে হাজারে হাজার কর্মচারী থাকতে পারে। একজন রাজা বা শাসকের অধীনে দেশের সকলে প্রজা হতে পারে। এটি কোন অপমান বা কষ্টের কারণ হতে পারে না। এতে বুঝা গেল, একজন স্ত্রীর বহু স্বামী হলে তা তার জন্য চরম অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। শুধু তা-ই নয়, একাধিক স্বামীর খেদমত করা এবং সবাইকে খুশি করা অসম্ভব ও দুঃখ-যাতনার বিষয়। এজন্যই ইসলামী শরী'আত একজন নারীকে দুই বা চারজন স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়নি। যাতে করে নারী অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ও অপমান থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। চারজন স্বামী একই স্থানে অবস্থান করুক অথবা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করুক, একজন স্ত্রীর পক্ষে সকলের খেদমত করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? যেসব নারী একাধিক স্বামীর প্রচলনের কথা বলেন তাদেরকে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

৩. যদি একজন মহিলার কয়েকজন স্বামীর সাথে সম্পর্ক থাকে তাহলে সন্তান জন্মগ্রহণের পর সন্তানদের সাথে স্বামীর পরিচয় একক থাকবে না-কি যৌথ থাকবে? সন্তান কিভাবে বন্টন করা হবে? যদি একটি সন্তান হয় তবে চার পিতার মধ্যে কিভাবে বন্টন করা হবে। আর যদি কয়েকটি বাচ্চা হয় এবং বাচ্চাগুলো পিতাদের মধ্যে বন্টনের প্রশ্ন আসে তবে লিঙ্গের ভিন্নতা, চোহারার বিচিত্রতা, চারিত্রিক পার্থক্য; শক্তিমত্তার বিভিন্নতা, বুদ্ধিমত্তার বৈষম্য নিরুপণ করা সম্ভব হবে না।
(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, লজ্জাস্থানের হেফাযত ও নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা ও যিনা থেকে হিফাযতে থাকা। চার পত্নীর মধ্যে প্রত্যেকের নিকট তিন রাত পরপর ফিরে আসার নিয়মে দাম্পত্য চাহিদার মধ্যে তেমন কোন প্রভাব পড়বে না।

ইসলামী বিধান ভারসাম্যপূর্ণ ও চূড়ান্ত ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করেছে। জাহেলিয়াতের যুগের মত সীমাহীন বিয়ের যেমন অনুমতি দেয়নি, যেখানে যৌন প্রবৃত্তির দরজা খুলে যায়, তেমনিভাবে বিষয়টি এতটা সংকুচিতও করা হয়নি যে এক পত্নীর অধিক বিয়ে করা যাবে না, বরং মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে চার পত্নী পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে। যাতে–

১. বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিক পবিত্রতা, লজ্জাস্থানের বৈধ ব্যবহারের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন। দৃষ্টির পবিত্রতা রক্ষা করা এবং সুন্দরভাবে সন্তান, বংশধর জন্ম। শুধু তা-ই নয় বিয়ের মাধ্যমে যিনা ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। কোন ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে অধিক শক্তিশালী এবং স্বচ্ছল হয়ে থাকে, তাদের জন্য একজন স্ত্রী যথেষ্ট না-ও হতে পারে। আল্লাহ প্রদত্ত স্বাস্থ্য সামর্থ ও আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে যিনি চার পত্নীর অধিকার পূরণ করার মত সামর্থ্যবান হয়েছেন। এ ধরনের পুরুষদেরকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধা দিলে নৈতিক পবিত্রতা ও তাক্‌ওয়া সীমালঙ্ঘিত হতে পারে এবং যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পক্ষান্তরে একজন সমার্থ্যবান কোটিপতি পুরুষ যদি তার বংশের চারজন মহিলাকে এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করেন যে তাদের দরিদ্রতা ও দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থার পরিবর্তন করে তারা সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মধ্যে প্রবেশ করবে। এর মাধ্যমে মহিলাগণ

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

এ বিচিত্র পার্থক্যের কারণে সন্তানগুলো বন্টন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমনিতর অবস্থায় পিতাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদের কি অবস্থা আত্মপ্রকাশ করবে তা বলা মুশকিল। তদুপরি সন্তানদের মধ্যে স্নেহ মমতার ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া আল্লাহই জানেন আরও কত ফিতনার সৃষ্টি হবে যা নিয়ম শৃংখলার পরিবর্তে ধ্বংসের দ্বার উন্মুক্ত করে দিবে। এ কারণেই ইসলামী শরী'আতে একজন মহিলার জন্য একই সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে। হিন্দুদের কোন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে এক স্ত্রীলোকের একই সাথে পাঁচ জনের বিবাহ বৈধ। এ ধরনের মর্যাদাহীনদের আদৌ অনুভূতি নেই যে, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে কখনো একজনের সাথে যৌন মিলন আবার আরেক জনের সাথে যৌন মিলন সরাসরি মর্যাদাহানীকর ও সৌজন্য পরিপন্থী। ইসলাম ইজ্জত ও পবিত্রতার ধর্ম। এতে এ ধরনের মর্যাদাহানীকর ও অসৌজন্য বোধের কোন স্থান নেই। হ্যাঁ, যদি কোন স্ত্রী লোক মর্যাদা ও সৌজন্য বোধের জলাঞ্জলী দিয়ে কিছু করতে চায় সে অধিকার তার আছে। হিন্দুদের মত সে যদি পাঁচজন স্বামী গ্রহণ করতে চায় করতে পারে। আম্বিয়া কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت "যদি তোমার লজ্জা শরম বিলুপ্ত হয়ে থাকে তবে যা ইচ্ছে করতে পার।"

আল্লাহর নিয়ামতের শোকর করবে। আশা করা যায় এ ধরনের নিয়্যতে বিয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদাতের মর্যাদার কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে এবং জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি জাতীয় খেদমত ও সম্প্রীতি হিসেবে বিবেচিত হবে। একজন ধনী ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ দ্বারা যদি দশহাজার নারী-পুরুষ মাসিক মজুরীর হিসেবে দশ হাজার বংশের লোক প্রতিপালিত হতে পারে, সেখানে সে ধনী ব্যক্তির চারজন মহিলাও তার ঘরে সংসারে প্রবেশ করতে পারে যেখানে তারা আরাম আয়েশ ও নিরাপত্তা ও ইজ্জতের সাথে জীবন যাপন করবে। বুদ্ধি-বিবেচনায় দৃষ্টিভঙ্গি ও শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি কোন খারাপ কিছু হতে পারে না।

যদি কোন বাদশাহ অথবা দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী অথবা কোন ধনী শিল্পপতি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিনি যদি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা করেন যে, আমি চারজন মহিলাকে বিয়ে করতে চাচ্ছি। প্রত্যেক মহিলাকে এক লক্ষ টাকা মোহর দিব এবং প্রত্যেককে একটি করে বাংলো করে দেব। যারা এই শর্তে আমার সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী, তাদেরকে আবেদন পেশ করতে পারে।

এমন অবস্থায় ঐসব তথাকথিত প্রগতিশীল মহিলাগণই সবই প্রথমে আবেদন করবেন। যারা বহু বিবাহ বিষয়ে আন্দোলন করছেন। এসব পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারক মহিলাগণ সবার আগে নিজেরা ও নিজ কন্যা-ভাতিজী-ভাগিনীসহ সকলে মিলে আমীর ও মন্ত্রীদের বাংলোতে নিজেরা উপস্থিত হয়ে ভীড় করবেন। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, এদের ভীতজনিত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ তলব করতে হবে।

যদি আমীর ও মন্ত্রীগণ এ ধরনের মহিলাকে বহু বিবাহের পত্নী হিসেবে বিয়ের বিষয়টি স্থগিত রাখেন, তা হলে এ অভিজাত মহিলাগণই বহু বিবাহের সুফল মন্ত্রীদের বুঝানোর চেষ্টাই লেগে যাবেন।

২. মহিলাগণ সব সময় স্বামীর শয্যাসঙ্গী হওয়ার মত অনুকূল অবস্থায় থাকে না। কেননা প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক মহিলা প্রতিমাসে ৫-১০ দিন প্রতিকূল অবস্থায় থাকেন। অর্থাৎ রক্তস্রাবের সময়ে অবশ্যই পুরুষের সাথে মিলিত হবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অন্যদিকে গর্ভবতী অবস্থায়ও মহিলাদেরকে স্বামীর সাথে শয্যাসঙ্গী হবার ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়। যাতে গর্ভস্থ সন্তানের কোন ক্ষতি না হয়।

কখনো এমনও হয় যে, একজন স্ত্রী গর্ভবতী বা সন্তান প্রসবের পরবর্তী প্রতিকূল অবস্থায় থাকার কারণে স্বামীর সাথে শয্যাসঙ্গী হবার জন্য উপযোগী থাকে না। এমতাবস্থায় স্বামীর চাহিদা অনুযায়ী তাঁকে ব্যভিচার থেকে নিরাপদ থাকার জন্য যুক্তিপূর্ণ কথা হচ্ছে তাকে হয় বিবাহের অনুমতি দেয়া উচিত, অন্যথায় পুরুষ চরম চাহিদার সময় অবৈধ পথে তা পূরণ সচেষ্ট হবে এমন আশংকা থেকে যায়।

একটি কাহিনী

এক বুযর্গের স্ত্রী অন্ধ হয়ে যায়। তিনি প্রথম স্ত্রীর খেদমত করার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বুদ্ধিজীবিগণ ফাতওয়া দিন, কারো যদি প্রথম স্ত্রী অন্ধ হয়ে যায় তখন স্বামী হয় বিয়ে এজন্য করেছেন যেন দ্বিতীয় স্ত্রী প্রথম স্ত্রীর খেদমত এবং তার শিশু সন্তানদের প্রতিপালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ করা কি মানবিক ও যুক্তিযুক্ত হবে না?

৩. কখনো কোন মহিলা অসুস্থতার কারণে বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে, ফলে তার সন্তান ও বংশ-বৃদ্ধির যোগ্যতা থাকে না। আর পুরুষের প্রকৃতি হচ্ছে প্রজন্ম রেখে যাওয়া। এই অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীকে বিনা দোষে তালাক দেয়া, অথবা তাকে দোষারোপ করে তালাক দেয়া (যেমন ইউরোপ সচরাচর হচ্ছে) উত্তম হবে, না-কি স্ত্রীর দাম্পত্য অধিকার রক্ষা করে স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেয়া ভাল হবে।

সম্মানীত পাঠক বলুন, কোনটি উত্তম।

যদি কখনো সরকার জাতীয় প্রয়োজনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করে, তা হলে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে পুরুষগণ একাধিক বিবাহ করবে। যাতে অধিক সন্তানের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জাহেলী যুগে কেউ ত দরিদ্রতার ভয়ে কন্যা শিশুকে হত্যা করত, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার যুগে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ঔষধ ও উপকরণের মাধ্যমে যেভাবে পর্দাহীনতা, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, তা অনেকেই গুরুত্ব দিচ্ছে না।

৪. বাস্তব অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ আদম শুমারীর চিত্র থেকে জানা যায় পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। এটা বহু বিবাহের পক্ষে একটি প্রমাণ স্বরূপ। পুরুষ থেকে নারীর জন্ম বেশি হয়। মৃত্যু হয় বেশি পুরুষের। যুদ্ধে পুরুষরাই মৃত্যুবরণ করে। সড়ক দুর্ঘটনা, খনিতে আটকা পড়া, নদীতে ডুবে যাওয়া, এভাবে বিভিন্ন স্থানে অধিক সংখ্যক পুরুষ মারা যাচ্ছে। কিন্তু আনুপাতিক হারে নারীর মৃত্যু কম হচ্ছে। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি একাধিক বিবাহের অনুমতি না থাকে তাহলে অতিরিক্ত মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে? তেমনিভাবে অবিবাহিত মহিলাদের জৈবিক চাহিদা পূরণের বৈধ ব্যবস্থার অভাবে কিভাবে তারা অনৈতিক ব্যভিচার থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হবে? এরূপক্ষেত্রে একাধিক বিবাহ হচ্ছে নারীর নিরাপত্তা ও ইজ্জত-আবরুর একমাত্র রক্ষা কবচ। ইসলাম এর মাধ্যমে নারীদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। ইসলাম তাদেরকে কষ্ট-নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছে, শান্তি ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। তেমনিভাবে লোকদের অপবাদ থেকেও হিফাযত করেছে। যখন কোন মহাযুদ্ধ হয় তখন নিহত লোকের সিংহভাগ থাকে পুরুষ। তখন নারীদের সংখ্যা বিশেষ করে বিধবাদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। সে সময় দরদী মানুষের দৃষ্টি

বহুবিবাহের ইসলামী বিধানের প্রতি ধাবিত হয়। মাত্র পঁচিশ বছর পূর্বের কথা। মহাযুদ্ধের পর জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে, যেখানে একাধিক বিয়ের বৈধতা ছিল না কিন্তু বিধবাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের অভ্যন্তরীণভাবে একাধিক বিবাহকে বৈধতার ফাত্ওয়া দিতে হয়েছে।

যারা একাধিক পত্নীর বিষয়টিকে খারাপ মনে করেন, তাদের প্রতি আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যখন নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি হয়, তখন তাদের জৈবিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনাদের নিকট কি সমাধান রয়েছে? এবং অসংখ্য বিধবা ও অসহায় মহিলাদের সমস্যা ও বিপদ নিরসনে আপনারা কি বিধান রচনা করেছেন?

হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) তাঁর রচিত 'আল মাসালিহুল আকলিয়া" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"বিগত আদম শুমারীতে শুধুমাত্র বাংলায় পুরুষ ও মহিলাদের পরিসংখ্যানের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখা গেছে যে, সেখানে পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যা বেশি। এটি হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে বহু বিবাহের পক্ষে জোরালো সমর্থন। এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ হলে ভারতের আদম শুমারীর সরকারি কাগজপত্র সংগ্রহ করলে প্রমাণিত হবে, পুরুষের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যাই অধিক। এজন্য আমরা এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিতে যাচ্ছি যে, ইউরোপের যেসব দেশ নিজেদেরকে একাধিক বিয়ে থেকে মুক্ত ও পবিত্র মনে করতে যাচ্ছে, সেসব দেশে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কত বেশি। যেমন বৃটেন ১ম মহাযুদ্ধের পূর্বে ১২,২৯,৩৫০ অতিরিক্ত মহিলা ছিল, একপত্নী হিসেবের বিধান কার্যকর থাকলে এদের ভাগ্যে স্বামী জুটতো না। ১৯০০ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ফ্রান্সে পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা ৪,২৩৭০৯ জন বেশি। জার্মানীতেও ১৯০০ সালের আদম শুমারীতে প্রতি হাজার পুরুষের বিপরীতে ১০৩২ জন নারী অতিরিক্ত ছিল। অবস্থা ছিল যেন গোটা দেশে ৮,৮৭,৬৪৮ জন অতিরিক্ত নারী ছিল যাদেরকে বিবাহ করার মত কোন পুরুষ ছিল না। এভাবে দেখা যাচ্ছে ১৯০১ সালের আদম শুমারীতে সুইডেনে ১,২২,৮৭০ জন অতিরিক্ত মহিলা এবং স্পেনে ১৮৯০ সালের আদম শুমারীতে ৪,৫৭,২৬২ জন্য অতিরিক্ত মহিলা ছিল। অন্যদিকে অষ্ট্রিয়াতে ১৮৯০ সালের আদম শুমারীতে মহিলাদের সংখ্যা ছিল পুরুষদের থেকে ৬,৪৪,৭৯৬ জন বেশি।

এবার আমরা প্রশ্ন করতে চাই, আমরা একাধিক পত্নীকে খারাপ মনে করি বলে অহমিকাভাব দেখানো সহজ কিন্তু আমাদেরকে বলুন কমপক্ষে চল্লিশ লাখ মহিলার জন্য কি বিধি ব্যবস্থা নেয়া যায়, কেননা এক বিবাহের সুবাদে ইউরোপে স্বামী পাবার সুযোগ নেই। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে বিধান মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনে বানানো হয়ে থাকে, তা অবশ্যই মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য হতে হবে। যে বিধান একাধিক

পত্নীকে নিষিদ্ধ করছে, যা চল্লিশ লক্ষ নারীকে এই ঘোষণাই দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রাকৃতিক ও জৈবিক চাহিদার বিপরীতে চল। পুরুষের প্রতি যেন তাদের কোন আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটি অবাস্তব ও অসম্ভব একটি বিষয়। এর পক্ষে বাস্তবতা নেই। বস্তুত এর ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, বৈধ পথকে রুদ্ধ করে দেয়ার কারণে তারা অবৈধ পথ অবলম্বন করবে। এভাবেই ব্যভিচারের সয়লাব বয়ে যাবে। সেদিকে মোটেই খেয়াল নেই; বরং বাস্তবতা হচ্ছে হাজারো জারজ সন্তান প্রতি বছর জন্ম নিচ্ছে।" (থানবী)

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে পাশ্চাত্য অধিবাসীগণ ইসলামের একাধিক পত্নির বিধানকে নিছক বিলাসিতা বলে ঘৃণা করছে। অন্যদিকে অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যভিচারের বাজার গরম করাকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি মনে করছে, যা সমস্ত নবীরই শরী'আতে হারাম এবং সকল জ্ঞানীগণ যাকে ঘৃণা করেন ও অশ্লীলতার কাজ মনে করেন। কিন্তু সংস্কৃতির দাবিদার পাশ্চাত্য এর ঘৃণ্য দিকের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে না। একাধিক বিবাহকে যেখানে আম্বিয়া কেরাম ও জ্ঞানী দার্শনিকগণ বৈধ ও কল্যাণকর বলে মত দিয়েছেন, সেখানে তাদের দৃষ্টিতে তা হচ্ছে নিন্দিত। তাদের নিকট একাধিক পত্নী গ্রহণ অন্যায়। কিন্তু ব্যভিচার ও ভিন্ন নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক কোন অপরাধ নয়। তথাকথিত এইসব প্রগতিশীল জাতি একাধিক পত্নীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন চালু করেছে, কিন্তু ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করে কোন আইন তৈরি করেনি।

৫. আসলে বহু বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিক চরিত্রকে রক্ষা করা তাক্ওয়া-পরহেযগারীর মত নিয়ামতকে এর মাধ্যমে হিফাযত করা। যারা বহু বিবাহের বিরোধিতা করে, তাদের ভিতরকার প্রবৃত্তি ও প্রকাশ্য কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, যেসব লোক বহু বিবাহকে অস্বীকার করে তারা বাস্তব জীবনে অপবিত্র নোংরা। অর্থাৎ তারা যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত থেকে প্রকারান্তরে তাদের কামনা বাসনা ও চাহিদার মাধ্যমে বহু বিবাহকেই প্রত্যাশা করে থাকে। অন্যথায় তারা এক স্ত্রীতেই খুশি থাকত। বস্তুত এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা যিনি সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী, তাঁর বিধানে মানুষের ব্যাপক চাহিদা ও অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রেখে এমন বিধান ঠিক করেছেন যার মাধ্যমে চরম আবেগী ও বিলাসী মানুষও পবিত্রতা ও নৈতিক চরিত্রের সীমার মধ্যে অবস্থান করতে সক্ষম হবে।

মহানবী (সা) একাধিক বিয়ে কেন করেছিলেন?

হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ধ্বংস ও সমস্যা থেকে বের করে নিয়ে আসা। এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান এবং নির্বাহী সংবিধান তথা আল-কুরআন নাযিল করেছেন। যারপর কিয়ামত পর্যন্ত কোন নতুন কোন বিধানের প্রয়োজন হবে না। অন্যদিকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র যিন্দেগীকে নমুনা স্বরূপ বানিয়েছেন, মানুষ যা দেখে কাজ করবে। এজন্য বলা যায়, শুধুমাত্র কোন

বিধান মানুষের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হয় না যতক্ষণ না সে বিধানের বাস্তব মডেল বা নমুনা তার সামনে উপস্থিত না থাকে– যার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে। পৃথিবীবাসী দেখেছে, মহানবী (সা)-কে মহান আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ের দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তিনি কথা ও কর্মের মাধ্যমে তার সামান্যতম ব্যতিক্রম করেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

মানব জীবনের দু'টি দিক

প্রত্যেক মানুষের জীবনে দু'টি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে বাহ্যিক দিক আরেকটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ দিক। কারো জীবনের কাজকে মূল্যায়ন করতে হলে তার জীবনে দু'টি দিকের পর্দাই উন্মোচন করতে হবে।

বাহ্যিক জীবন হচ্ছে, যা একজন মানুষ সাধারণ মানুষের সামনে যাপন করে থাকে। জীবনের এই অংশকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে ব্যাপক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়।

অভ্যন্তরীণ জীবন বলতে ঘরোয়া জীবনকে বুঝায়, যার মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক অবস্থার সার্বিক রূপ পাওয়া যায়। প্রতিটি মানুষ নিজ গৃহের চার দেয়ালে মুক্ত স্বাধীন থাকে। পরিবার ও ঘরের লোকদের নিকট সে অকৃত্রিম হয়ে থাকে। তার চরিত্র ও নৈতিকতার দুর্বল দিকগুলো পরিবারের সদস্যদের নিকট গোপন থাকে না। এই অবস্থায় মানুষের বাস্তব জীবনের মূল্যায়ন করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে তার ঘরোয়া জীবন সমাজের নিকট উন্মুক্ত করা।

এমনিভাবে মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনেরও দু'টি দিক ছিল। এক বাহ্যিক জীবন এবং ঘরোয়া জীবন। বাহ্যিক জীবনের যাবতীয় অবস্থা ও পরিচিতি, সাহাবায়ে কিরাম দক্ষতা ও পূর্ণতার সাথে পৃথিবীর নিকট উপস্থাপন করেছেন, যার তুলনা দুনিয়ার কোন জাতির মধ্যে এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। তারা নিজ নবীর বিস্তারিত জীবন ও অবস্থাকে নিশ্চিতভাবে ও পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি, বরং এর দশভাগের একভাগও দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি।

তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের অবস্থান ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পবিত্র বিবিগণ জগতবাসীর নিকট প্রকাশ্যে উপস্থাপন করেছেন। যার মধ্যে মহানবী (সা)-এর গৃহের অবস্থা, ইবাদত, তাহাজ্জুদ, রাত্রি জাগরণ, দরিদ্রতা-কৃচ্ছ্রতা এবং চারিত্রিক ও নৈতিক জীবনের চিত্র ও কর্মময় জীবনের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সকল বিষয় দুনিয়ার মানুষের সামনে এসে গেছে। এভাবে মহানবী (সা)-এর পবিত্র নূরানী জীবনের পরিচ্ছন্নতা স্বচ্ছতা, আল্লাহর দরবারে জবাবদিহীতা দিবালোকের মত স্পষ্ট ও আলোকিতরূপে প্রকাশিত হয়েছে। রাতের আঁধারে যখন আলিমুল গায়ব আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ দেখার ছিল না, তখনও মহানবী (সা) কিভাবে আল্লাহর ইবাদতে আন্তরিকতা ও আবেগ-অনুরাগ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন এ বিষয়ে সূরা মুয্যাম্মিলে সঠিক চিত্র অংকিত হয়েছে।

এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খাদীজা (রা) ছাড়াও আরও দশজন মহিলাকে বিবাহ করেছেন। যেন একদল নারী মহানবী (সা)-এর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে দুনিয়ার মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন। কেননা স্ত্রীগণ যতটা স্বামীর নিবীড় ও ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়ে অবগত হতে পারে, অন্যদের পক্ষে তা কখনো সম্ভব হয় না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বহু বিবাহ করেছেন। যার মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তি জীবনের সকল অবস্থা এবং তাঁর পারিবারিক জীবনের চিত্র নিখুঁতভাবে দুনিয়াবাসীর সামনে এসে যাবে। একদল ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে আসার কারণে কারো মনে এ বিষয়ে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্ধ ও সংশয় থাকবে না। আর শরী'আতে যেসব বিধান বিশেষভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও তা পুরুষের নিকট বর্ণনা করা লজ্জাজনক এবং পর্দার খেলাফ, এ ধরনের বিধানাবলী পবিত্র স্ত্রীদের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার লাভ করবে। বস্তুত মহানবী (সা)-এর বহু বিবাহ (নাউযুবিল্লাহ) কুপ্রবৃত্তির তাড়নার কারণে ছিল না।

এর প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন কুমারী ব্যতীত অবশিষ্ট সকল স্ত্রী বিধবা ছিলেন। যারা সুন্দরী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন না অথবা অর্থ-সম্পদের অধিকারী হিসেবেও বিখ্যাত ছিলেন না। বস্তুত এর বিপরীত অবস্থাই ছিল। কেননা তাঁদের জীবনে ভোগ-বিলাসিতার কোন উপকরণ ছিল না, আসলে উদ্দেশ্য ত শুধু এটাই ছিল যে, নারীদের সাথে সম্পৃক্ত শরী'আতের বিধানাবলী নারীদের মাধ্যমেই প্রচার প্রসার হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র বিবিদের গৃহগুলো উম্মাতের জন্য মা ও শিক্ষিকার ক্লাসরুম ছিল।

যেই পূণ্যময়ী বরকতের ঘরে দু'মাস পর্যন্ত চুলায় হাঁড়ি উঠে নাই, শুধুমাত্র পানি ও খেজুর খেয়ে তাঁর ও বিবিদের দিন কেটেছে, আর যিনি দিনে মজসিদে ও রাতে জায়-নামাযে দাঁড়িয়ে কাটাতেন এবং এভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে পা ফুলিয়ে দিতেন। তাঁর সম্পর্কে ভোগ-বিলাসিতার কল্পনাও করা যায় না।

মহা নবী (সা)-এর সন্তানবৃন্দ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্তানদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হচ্ছে, তাঁর তিন ছেলে এবং চার কন্যা সন্তান ছিল।

১. কাসেম ; ২. আবদুল্লাহ ; যাঁদের তায়্যিব ও তাহির নামেও ডাকা হতো। ৩. ইবরাহীম; ৪. যায়নাব; ৫. রুকাইয়্যা; ৬. উম্মু কুলসুম; ৭. হযরত ফাতমাতুয্ যুহ্রা। কন্যাদের সংখ্যার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, কন্যাদের সংখ্যা চার এবং তাঁরা সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁরা বিবাহিতা ছিলেন। হযরত ইবরাহীমের ব্যাপারেও কোন দ্বিমত নেই। তিনি মুক্তদাসী হযরত মারিয়া কিব্তীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শিশু বয়সেই ইন্তিকাল করেছেন। হযরত ইবরাহীম ব্যতীত সকল সন্তানই হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য কোন বিবির পক্ষ হতে তাঁর কোন সন্তান ছিল না। হযরত খাদীজা (রা) থেকে যত পুত্র

সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই শিশু বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এজন্য তাঁদের সংখ্যার মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সীরাত বিশেষজ্ঞ আলিমদের অধিকাংশের মতামত হচ্ছে, হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভ থেকে দু'জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন। একজন হচ্ছেন কাসেম আর দ্বিতীয় জন হচ্ছেন আবদুল্লাহ্। আর আবদুল্লাহ্র উপনাম ছিল তায়্যিব ও তাহির। কেউ বলে থাকেন তায়্যিব ও তাহির নামে তাঁর দুই পুত্র ছিল। যাঁরা হযরত কাসেম এবং হযরত আবদুল্লাহর অতিরিক্ত ছিলেন। এই মতের ভিত্তিতে হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভের পুত্রের সংখ্যা ও কন্যার সংখ্যা সমান সমান হয়ে যায়। কেউ বলে থাকেন, হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভ থেকে ছয়জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫ম ও ৬ষ্ঠ জনের নাম হচ্ছে মুতায়্যাব ও মুতাহ্হার।[১] (আল্লাহই সঠিক জানেন)।

হযরত কাসেম (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সন্তানদের মধ্যে হযরত কাসেম প্রথম জন্মগ্রহণ করেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তিনি দু'বছর বেঁচে ছিলেন। কেউ বলেছেন তিনি কিশোর বয়সে পৌঁছে ইন্তিকাল করেছেন। এই পুত্রের সাথে সম্পৃক্ত করেই মহানবী (সা)-কে আবুল কাসেম উপনামে আখ্যায়িত করা হয়।[২]

হযরত যায়নাব (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জ্যৈষ্ঠ কন্যার নাম যায়নাব, এ বিষয়ে সকলে একমত। নবুওয়াতের দশ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করেছেন, বদর যুদ্ধের পর হিজরত করেছেন। আপন খালাত ভাই আবুল আ'স ইবন রাবী-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। হযরত যায়নাব (রা)-এর হিজরতের বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধের বন্দীদের ঘটনার অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ৮ম হিজরীর ১ম ভাগে ইন্তিকাল করেন। এক পুত্র সন্তান ও এক কন্যা স্মৃতি স্বরূপ রেখে যান। পুত্রের নাম আলী এবং কন্যার নাম উমামা ছিল।

আলীর বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। বিখ্যাত মত হচ্ছে, কিশোর বয়সে পিতা আবুল আ'স (রা)-এর জীবদ্দশায়ই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। এক বর্ণনা হচ্ছে ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

উমামার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গভীর স্নেহের সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর খুবই প্রিয় ছিলেন। কখনো উমামা নামাযের সময় মহানবী (সা)-এর পিঠে চড়ে বসতেন। তখন তিনি তাঁকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বর্ণিত আছে, একবার মহানবী (সা)-এর কাছে হাদীয়া স্বরূপ একটি মুক্তার মালা আসল। সব পবিত্র বিবিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে ঘরের এক কোণে

---

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ১৯৩।

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ১৯৪।

উমামা মাটি নিয়ে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এই হার আমি আমার সবচেয়ে প্রিয়জনকে দেব। সবাই ভাবল হারটি তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কেই দিবেন। কিন্তু তিনি উমামাকে কাছে ডাকলেন এবং পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর চোখ মুছে দিলেন। তারপর তাঁর গলায় মালাটি পরিয়ে দিলেন।[১]

হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পরে হযরত আলী (রা) হযরত উমামাকে বিবাহ করলেন। যখন হযরত আলী (রা) শাহাদত পেলেন সে সময় তিনি হযরত মুগীরা ইবন নাওফলকে ওসীয়্যত করে যান যেন তিনি হযরত উমামা (রা)-কে বিবাহ করেন। কেউ বলেন মুগীরা (রা)-এর ঘরে হযরত উমামার এক ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাঁর নাম ছিল ইয়াহইয়া। আর কেউ বলেন, উমামার কোন সন্তান হয়নি। হযরত উমামা (রা) হযরত মুগীরা (রা)-এর কাছে মৃত্যুবরণ করেছেন।[২]

হযরত রুকাইয়্যা (রা)

হযরত রুকাইয়্যা এবং হযরত উম্মু কুলসুম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'কন্যা আবূ লাহাবের ছেলেদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কেননা হযরত রুকাইয়্যা (রা) উত্‌বা ইবন আবূ লাহাব এবং হযরত উম্মু কুলসুম-এর উতায়বা ইবন আবূ লাহাব-এর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বাসর হয়নি (যেহেতু তারা কমবয়স্কা বালিকা ছিলেন)। যখন কুরআনের আয়াত تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ নাযিল হলো, তখন আবূ লাহাব ছেলেদেরকে ডেকে বলল, তোমরা যদি মুহাম্মদের মেয়েদেরকে তালাক না দিয়ে দাও তাহলে তোমাদের সাথে আমার উঠাবসা হারাম হয়ে যাবে। পিতার নির্দেশ পালন করে দু'ছেলেই বাসরের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যাদ্বয়কে তালাক দিয়ে দিল। হযরত নবী করীম (সা) হযরত উসমান (রা)-এর সাথে হযরত রুকাইয়্যা (রা)-কে বিয়ে দিলেন। হযরত উসমান (রা) যখন হাবশায় হিজরত করেন তখন হযরত রুকাইয়্যা (রা) তাঁর সাথে সহযাত্রী ছিলেন। হিজরতের পর কিছুদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের খোঁজখবর পাননি। এক মহিলা (হাবশা থেকে এসে) জানালেন যে, সে তাদের দু'জনকেই হাবশায় দেখেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ

صَحِبَهُمَا اللّٰهُ اَنَّ عُثْمَانَ اَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بِاَهْلِهٖ بَعْدَ لُوْطٍ ـ

"আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনের সাথে থাকুন! নিশ্চয়ই উসমান হচ্ছে নবী লূতের পর পরিবারসহ প্রথম হিজরতকারী" (ইবনুল মুবারক)।

সেখানে হিজরতের পর তাঁদের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যার নাম ছিল আবদুল্লাহ। যিনি ছয় বছর জীবিত থেকে ইন্তিকাল করেন।

---

১. ইবন সা'দ, আহমাদ, আবূ ইয়া'লা।
২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ১৯৫।

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন সে মুহূর্তে হযরত রুকাইয়্যা (রা) অসুস্থ ছিলেন। এজন্য হযরত উসমান (রা) বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। যেদিন হযরত যায়িদ ইবন হারিসা মুশরিকদের পরাজয় এবং মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন সেদিন হযরত রুকাইয়্যা (রা) ইন্তিকাল করেন। এদিকে হযরত উসামা ইবন যায়িদ (রা)-ও বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। কেননা তিনি অসুস্থ রুকাইয়ার সেবার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। যখন তাঁর দাফন-কাফনে সবাই ব্যস্ত ছিলেন এমন সময় তাকবীর ধ্বনি শুনা গেল। হযরত উসমান (রা) উসামাকে জিজ্ঞেস করলেন, উসামা দেখ কিসের আওয়াজ হচ্ছে। উসামা দেখতে পেলেন হযরত যায়িদ ইবন হারিসা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনীর উপর সাওয়ার হয়ে মুশরিকদেরকে নিহত হওয়ার সুসংবাদবার্তা নিয়ে আগমন করেছেন। ইন্তিকালের সময় হযরত রুকাইয়্যা (রা)-এর বয়স বিশ বছর হয়েছিল।[১]

হযরত উম্মু কুলসূম (রা)

হযরত উম্মু কুলসূম (রা) এই উপনামেই বিখ্যাত ও এই নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর অন্য নাম জানা যায় না। হযরত রুকাইয়্যা (রা)-এর ইন্তিকালের পর ৩য় হিজরীতে বরীউল আউয়াল মাসে হযরত উসমান (রা)-এর সাথে বিবাহ হয়। ছয় বছর হযরত উসমান (রা)-এর দাম্পত্যে ছিলেন। কোন সন্তান জন্ম হয়নি। নবম হিজরীর শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানাযার নামায পড়িয়েছেন। হযরত আলী, ফযল ইবন আব্বাস এবং হযরত উসামা ইবন যায়িদ (রা) তাঁকে কবরে নামিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কবরের পাশে বসে ছিলেন, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বয়ে যাচ্ছিল।[২]

হযরত উম্মু কুলসূমের প্রথমে আবূ লাহাবের ছেলে উতায়বার সাথে বিয়ে হয়। পিতার কথামত সে তাঁকে তালাক দিয়ে দেয়। আবূ লাহাবের দ্বিতীয় ছেলে উত্বাও তালাক দিয়ে ক্ষান্ত ছিল না, বরং সে তালাক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বলল ঃ আমি আপনার দীনকে অস্বীকার করি এবং আপনার মেয়েকেও তালাক দিয়ে দিলাম। সে আমাকে পছন্দ করে না আর আমিও তাকে পছন্দ করি না। তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর চড়াও হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জামা ছিঁড়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বদ্দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তার উপর কোন হিংস্র জানোয়ারকে চড়াও করুন। অতঃপর এক সময় কুরায়শের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার পথে রওয়ানা করে। পথে যুরকা নামক স্থানে কাফেলা যাত্রা বিরতি করে। আবূ লাহাব ও উতায়বা সে কাফেলায় ছিল। রাতে একটি বাঘ আসল। বাঘটি কাফেলার

১. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩০৪।

২. যারকানী, ৩ খ,পৃ. ১৯৯।

সদস্যদের চেহারা দেখে তাদের ঘ্রাণ নিচ্ছিল। যখন উতায়বাকে দেখতে পেল তখন তার মাথা চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। এভাবে উতায়বা মারা যায়। বাঘটি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তার কোন হদীস পাওয়া গেল না। বিস্তারিত ঘটনা ইনশাআল্লাহ মু'জিযা অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।[১]

হযরত উম্ম কুলসূমের ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান, যদি আমার দশটি মেয়েও থাকত, তা হলে এ অবস্থায় একের পর এক মেয়েকে আমি উসমানের সাথে বিয়ে দিতে থাকতাম।[২]

হযরত ফাতিমা (রা)

ফাতিমা তাঁর নাম এবং যাহ্রা ও বতুল তাঁর উপাধী ছিল। তাঁকে বতুল এজন্য বলা হত যে বতুল অর্থ হচ্ছে বিচ্ছিন্ন। তিনি মর্যাদা ও পূর্ণতার দিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য মহিলার চেয়ে অনন্যা ছিলেন। অথবা আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার গুণের কারণে এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঔজ্জ্বল্যের কারণে যাহ্রা নামে অভিহিত ছিলেন।

ইবন আবদুল বার (র) বলেন, নবুওয়াতের প্রথম বৎসরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইবন জাওযী বলেন, নবুওয়াতে পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন যখন কুরায়শগণ পবিত্র কা'বার সংস্কার করছিল।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকল কন্যা সন্তানের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রা) সবচেয়ে কনিষ্ঠ ছিলেন। সবচেয়ে বড় ছিলেন হযরত যায়নাব (রা), তাঁর পর হযরত রুকাইয়্যা (রা) অতঃপর হযরত উম্মু কুলসূম সর্বশেষ হযরত ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

২য় হিজরীতে হযরত আলী (রা)-এর সাথে বিবাহ হয়। প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল পনর বছর, সাড়ে পাঁচ মাস। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী উনিশ বছর দেড় মাস। হযরত আলী (রা)-এর বয়স সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে যে, তিনি কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এক বর্ণনা হচ্ছে, আট বছর আর অপর বর্ণনায় তিনি দশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী বিবাহের সময় হযরত আলী (রা)-এর বয়স ২১ বৎসর ৫ মাস হয় এবং দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী ২৪ বছর দেড় মাস হয়। (যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২০৪)

হযরত ফাতিমা (রা) এর বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলীতে গত হয়েছে। হযরত ফাতিমা (রা)-এর ৫ জন সন্তান হয়েছিল। তিনজন পুত্র এবং দু'জন কন্যা। ১. হাসান, ২. হুসায়ন, ৩. মুহসিন, ৪. উম্ম কুলসূম ও ৫. যায়নাব (রা)

১. প্রাগুক্ত।
২. মাজমাউয যাওয়াহিদ, ৯ খ. পৃ. ২১৭।
৩. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ২০২।
৪. আল-ইস্তি'আব, ইবন আবদুল বার, ৪ খ, পৃ. ৩৭৩ টীকা আল-ইসাবা।

হযরত ফাতিমা (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন সন্তানের মাধ্যমে তাঁর বংশধারা অব্যাহত থাকেনি। মুহসিন বাল্যবয়সে ইন্তিকাল করেন। হযরত উম্মু কুলসূমের সাথে হযরত উমর (রা)-এর বিবাহ হয়েছিল কিন্তু কোন সন্তান জন্ম হয়নি।

অন্যদিকে হযরত যায়নাবের বিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাফরের সাথে হয়েছিল এবং তাঁদের সন্তানও হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের ছয়মাস পর ১১ হিজরীতে রমযান মাসে হযরত ফাতিমা (রা) ইন্তেকাল করেন। হযরত আব্বাস (রা) নামাযে জানাযা পড়িয়েছেন। হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা), হযরত ফযল ইবন আব্বাস (রা) তাঁকে কবরে নামান।[১]

মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রিয়তম কন্যা ছিলেন হযরত ফাতিমা (রা)। তিনি অনেকবার ইরশাদ করেছেন ঃ হে ফাতিমা! তুমি কি এ বিষয়ে খুশি হবে না যে, তুমি জান্নাতে সকল মহিলার নেত্রী হবে। এক বর্ণনায় আছে, তুমি পৃথিবীর সব নারীর নেত্রী, হযরত মরিয়ম (আ) ব্যতীত সকলেই তাঁর আওতায় হবেন। যখন নবী করীম (সা) সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন সর্বপ্রথম হযরত ফাতিমার সাথে দেখা করতেন এবং এভাবে সফরে বের হওয়ার সময়ও সর্বশেষ তাঁর সাথে দেখা করে রওয়ানা হতেন।

হযরত ফাতিমা (রা)-এর মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণনার জন্য আলাদা একটি গ্রন্থ্ রচিত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য এখানে আমরা সংক্ষেপে শেষ করছি।

হযরত ইবরাহীম (রা)

হযরত ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ সন্তান, যিনি ৮ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে হযরত মাবিয়া কিবতীয়া (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সপ্তম দিবসে তাঁর আকীকায় দু'টি দুম্বা যবেহ করা হয়। মাথা মুড়িয়ে চুল বরাবর রৌপ্য সাদাকা করা হয়েছে। চুলগুলো মাটিতে দাফন করা হয়েছে এবং ইবরাহীম নাম রেখেছেন। আউয়ালী (উপশহরে) এলাকায় এক দুধ মার কাছে রেখেছেন। মাঝে মধ্যে তিনি সেখানে তাশরীফ নিতেন, কোলে নিয়ে আদর করতেন। প্রায় পনর কি ষোল মাস পর্যন্ত জীবিত থেকে দশম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। যেদিন হযরত ইব্‌রাহীম ইন্তিকাল করেন সেদিন ঘটনাক্রমে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তৎকালীন আরবের বিশ্বাস ছিল, যদি কোন মহান ব্যক্তিত্ব মারা যায় তাহলে সূর্যগ্রহণ হয়। এজন্য এ কুসংস্কার বিশ্বাস দূর করার জন্য তিনি খুতবা দিলেন যে, কারো মৃত্যুতে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হয় না, বরং চাঁদ-সূর্য আল্লাহর নিদর্শন এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সতর্ক করে থাকেন। যখন এমনটি দেখবে, তখন তোমরা নামায পড়বে, দু'আ করবে এবং সাদাকা করবে।[২]

---

১. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩৭৯।

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২১৪।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুলিয়া মুবারক (আকৃতি)

হযরত নবী আকরাম (সা) অধিক দীর্ঘও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না, বরং তিনি মধ্যম অবয়বের ছিলেন। কেশ মুবারক ঘন ছিল। মাথা মুবারক এবং দাঁড়ি মুবারকের আনুমানিক ২০ থেকে ২৫টি কেশ মুবারক সাদা হয়েছিল। চেহারা মুবারক অনুপম সুন্দর ও নূরানী ছিল। যিনিই মহানবী (সা)-এর পবিত্র নূরানী চেহারা দেখেছেন তিনিই তাঁর চেহারা মুবারককে ১৪ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় আলোকিত বলে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর পবিত্র শরীরের ঘামে বিশেষ ধরনের সুগন্ধি ছিল। পবিত্র চেহারা মুবারক থেকে যখন ঘামের ফোঁটা নির্গত হত, তখন মুক্তা মনে হতো। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রেশমের কাপড়কে মহানবী (সা)-এর শরীর মুবারক থেকে অধিক নরম ও কোমল দেখিনি। মেশক আম্বর সুগন্ধিকেও রাসূলুল্লাহ (সা)এর দেহ মুবারকের সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত পাইনি।

মুহ্‌রে নবুওয়াত

পৃষ্ঠদেশে দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ডান কাঁধের কিছুটা কাছাকাছি স্থানে মুহ্‌রে নবুওয়াত ছিল। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে কবুতরের ডিমের মত লাল গোশতের টুক্‌রা ছিল।

এই মুহর হযরত নবী (সা) এর নবুওয়াতের বিশেষ নিদর্শন স্বরূপ ছিল। যার আলোচনা পূর্বের আসমানী কিতাব এবং আম্বিয়ে কেরামের ভবিষ্যদ্বাণীতে ছিল। ইয়াহূদী আলিমগণ এই নিদর্শন দেখে তাঁকে শনাক্ত করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হচ্ছেন শেষ যমানার নবী, যাঁর সুসংবাদ পূর্বের নবীগণ দিয়েছেন। এবং তাঁরা নবীর নিদর্শন (মুহরে নবুওয়াত)-এর বর্ণনা করেছেন তা তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। এটি যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সীল ও সনদ স্বরূপ ছিল। (মাদারেজুন্ নবুওয়াত) ১ খ, পৃ. ২১।

আল্লামা সুহায়লী (র.) বলেন , মুহ্‌রে নবুওয়াত হযরত নবী (সা)-এর বামদিকে কাঁধের নিকট ছিল। এর কারণ হচ্ছে মানুষের শরীরে শয়তান প্রবেশের এটিই পথ। পিছনের দিক থেকে এসে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার সৃষ্টি করে। এজন্য তাঁর দেহ মুবারকের এই স্থনে মুহরে নবুওয়াত স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে শয়তানের আসার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর পবিত্র হৃদয়ে কোন পথেই শয়তান কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারবে না।[১]

কোন কোন বর্ণনায় এমনও আছে যে, হযরত নবী (সা) এর পৃষ্ঠদেশের মুহরে নবুওয়াতের মধ্যে জন্মগতভাবে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' (مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ) লেখা বুঝা যেত।

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১ খ, পৃ. ৬০।

اخرج ابن عساكر والحاكم فى تاريخ نيسابور عن ابن عمر قال كان خاتم النبوة على ظهر النبى صلى الله عليه وسلم مثل البندقة من لحم مكتوب فيها باللحم محمد رسول الله (خصائص الكبرى للسيوطى)

"হাফেয ইবন আসাকির ও হাকেম তারীখে নিসাপূরে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পৃষ্ঠে মুহরে নবুওয়াত গোশতের পিণ্ডের মত ছিল এবং গোশ্‌তের মধ্যেই লেখা ছিল محمد رسول الله 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।"[১]

আল্লামা যারকানী (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, কিছু দুর্বল সূত্রের বর্ণনা। শায়খ আবদুর রাউফ মানাবী (র) শামাইল গ্রন্থের ভাষ্যে (প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬০) লিখেছেন যে, হাফেয কুতুবুদ্দীন হালবী এবং অনুগামী হাফেয মুগালতাঈ এই বর্ণনাকারীদের বিষয়ে দোষক্রুটির সমালোচনা করেছেন, কিন্তু এ বিষয়ে অন্য কোন রিওয়ায়াতও সহীহের মর্যাদায় পৌঁছেনি। আল্লামা কারীও শামায়েলের ভাষ্যে (১ খ, পৃ ৫৯) লিখেছেন, এই রিওয়ায়াতটি প্রতিষ্ঠিত বর্ণনার পর্যায়ে পড়ে না।

মাথার চুল বেশির ভাগ সময় কাঁধ পর্যন্ত এবং কখনো কানের লতি পর্যন্ত ঝুলে থাকত। চুলে চিরুনি করতেন। চোখে সুরমা ব্যবহার করতেন। যদিও প্রাকৃতিকভাবে চোখে সুরমার ব্যবস্থাও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নয়ন প্রশস্ত ও দৃষ্টিনন্দন ছিল এবং খুব কালো ও লালিমায় মিশ্রিত ছিল। বক্ষদেশ থেকে শুরু করে নাভী পর্যন্ত সরু খুবই সুন্দর একটি রেখা ছিল। উভয় বাহু ও কাঁধ মাংসল ছিল। হযরত নবী (সা) যখন হাঁটতেন, মনে হত তিনি ধীর পদক্ষেপে উপর থেকে নিচে নামছেন। মোটকথা এমনিভাবে তাঁর পবিত্র দেহ মুবারক পবিত্র চেহারা মুবারকসহ তাঁর বাহ্যিক অবয়ব ও আধ্যাত্মিক নৈতিক দিক সব দিক থেকেই তিনি অনুপম সুন্দর ছিলেন। মুচকি হাসতেন, কখনো অট্টহাসি দিতেন না। হাদীসে আছে, অবয়বে ও চরিত্রে তাঁর সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধিক সাদৃশ ছিল।

দাঁড়ি মুবারক

দাঁড়ি মুবারক ঘন ছিল। নবী (সা) দাঁড়ি ছাঁটতেন না, তবে গোঁফ ছাটতেন, কিন্তু বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে যাওয়া দাঁড়ি ছাটতেন, যেন দেখতে অসুন্দর মনে না হয়। দাঁড়ি রাখা সমস্ত নবী (আ.)-এর সুন্নাত ছিল। নাউযুবিল্লাহ, দাঁড়ি রাখা সামাজিক ও দেশী প্রথা হিসেবে ছিল না, যেমনটি আজকাল কোন কোন অজ্ঞ ও গুমরাহ লোক মনে করে থাকে।

---

১. প্রাগুক্ত, যারকানী ও শারহে মাওয়াহিব, ১ খ, পৃ. ১৫৬।

দাঁড়ি শুধুমাত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সুন্নাত ও ইসলামের নীতিই নয়, বরং সকল নবীর, যাঁদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, সকলেরই সুন্নাত। যেমন হাদীসে আছে مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ সকল নবী ও রাসূলের সুন্নাত।

গীর্জায় বর্তমানকালেও হযরত ঈসা (আ)-এর যে ছবি রাখা হয় তাতে তাঁর দাঁড়ি আছে। অন্যদিকে খ্রিস্টান ও ইয়াহূদী আলিমদের অধিকাংশই দীর্ঘ দাঁড়ি রাখেন। অতএব এসব ধর্মীয় ব্যক্তির দাঁড়ি রাখাও প্রত্যক্ষ এ কথার প্রমাণ স্বরূপ যে, দাঁড়ি নবীদের সুন্নাত। হযরত হারুন (আ)-এর দাঁড়ির আলোচনা কুরআনুল করীমে আছে ঃ

يَا ابْنَ اُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَلاَ بِرَأْسِىْ

আরবদেশে যারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জাতীয়তার অনুসারী ছিল, তারা দাঁড়ি রাখত। আর বেশির ভাগ মুশরিক দাঁড়ি কামিয়ে ফেলত। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ اِحْفُو الشَّوَارِبَ وَاعْفُوْا لُّلحٰى ـ

"মুশরিকদেরকে বিরোধিতা কর। তাদের মত দাঁড়ি কামাবে না, আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাত অনুযায়ী গোঁফ কামাও এবং দাঁড়ি বড় কর, আর মুশরিকদের সাদৃশ হওয়া থেকে নিজেদেরকে হিফাযত কর। এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের আকার-আকৃতি পোশাকের অনুসরণ কর। সত্যনিষ্ঠ বান্দাদের আকৃতিও জনপ্রিয় হয়ে থাকে। তেমনিভাবে مَغضوب عليهم ولا الضّالين ـ ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনুসরণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও পথভ্রষ্টতার আশংকা রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, দাঁড়ি সকল নবী ও রাসূল এবং সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও সকল ওলী আল্লাহর চিরন্তন সুন্নাত এবং এটা ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। দাঁড়ি না রাখা মারাত্মক অপরাধ। ইসলামের নিদর্শনকে প্রকাশ্যে অপমান করা ও দাঁড়ি নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা কুফরের শামিল। কেননা দাঁড়িকে তিরস্কার ও অপমান করার মানে হচ্ছে সকল নবী ও রাসূলকে অপমান ও তামাশা করা এবং সকল শরী'আতে সাব্যস্ত একটি হুকুমকে অপমান করা। আর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং চৌদ্দশত বছরের সকল আলিম, আওলিয়ায়ে কিরাম, সালেহীন ও ইসলাম, রাষ্ট্রের শাসকবৃন্দকে বোকা ও মূর্খ সাব্যস্ত করা হয়। দাঁড়ি নিয়ে ঠাট্টা ও বিদ্রুপকারীদের এ কথা বুঝে আসে না যে, ৫০ বছর পূর্বে তাদের বংশের সকল পিতা, দাদা, পরদাদা সকলেই দাঁড়ি রাখতেন। এসব বিদ্রুপকারীর নিকট তাহলে তাদের পিতা, দাদা পরদাদার উপর মূর্খতার সাইনবোর্ড লাগিয়েছিলেন। আল্লাহ এ ধরনের অবুঝকে বিবেক দান করুন।

পুরুষের জন্য দাঁড়ি এবং নারীদের জন্য বেণী

মাথার চুল এবং বেণী নারীদের জন্য যেমন সৌন্দর্য ও সাজ হিসেবে পরিগণিত, তেমনিভাবে পুরুষের জন্য দাঁড়িও সাজ হিসেবে স্বীকৃত।

এই জন্যই নারীদেরকে মাথার চুল বড় করতে বলা হয়েছে এবং চুল কামাতে নিষেধ করা হয়েছে। নাসায়ীতে হযরত আলী (রা) থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ تَحْلُقَ الْمَرْأَةُ رَاْسُهَا ـ

"রাসূলুল্লাহ (সা) নারীদেরকে নিজেদের মাথার চুল কামাতে নিষেধ করেছেন।"

পুরুষদেরকে চুল রাখা ও কামিয়ে ফেলার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। তবে তাদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, পুরুষ যেন চুলকে এতটা লম্বা না করে যাতে নারীর মত মনে হতে পারে। বরং তার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এই নির্ধারিত সীমা সে যেন অতিক্রম না করে। অর্থাৎ কানের লতি পর্যন্ত অথবা কাঁধ পর্যন্ত।

قال النبى صلى عليه وسلم نعم الرجل خريم لولا طول جمته وأسبال ازاره فبلغ ذلك خريما فاخذ مشفرة فقطع بها جمته الى اذنه ورفع ازاره الى نصف ساقيه (رواه أبوداؤد عن ابن خجلة)

হযরত নবী (সা) বলেন, খারীম আসাদী উত্তম লোক, যদি তার মাথার চুল কাঁধের সীমা থেকে দীর্ঘ না হতো এবং তার পরিধেয় টাখ্নুর নিচে না পড়ত। যখন খারীমের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা পৌছল, তিনি কাঁচি নিয়ে কানের লতি পর্যন্ত চুল কেটে ফেললেন এবং পরিধেয় পায়ের অর্ধেক গোছার মধ্যে রাখলেন।"

যারা মাথা মুণ্ডাতে চায় তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি মাথা মুণ্ডাও তা হলে সব চুল মুণ্ডাতে হবে। কিছু রেখে কিছু চুল মুণ্ডানো যাবে না। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে রিওয়ায়াতে আছে ঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأٰى صَبِيًّا قَدْ عَلَقَ بَعْضَ رَأسَهٗ وَتَرَكَ بَعْضَهٗ فَنَهَاهُمْ عَنِ ذٰلِكَ وَقَالَ احْلِقُوْا كُلَّهٗ اَوِ اتْرُكُوْا كُلَّهٗ ـ

"হযরত নবী (সা) একবার একটি ছেলেকে দেখালেন, তার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডানো আর কিছু অংশ মুণ্ডানো হয়নি। তখন মহানবী (সা) তাদের এমনটি করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ হয় পুরোটা কামাবে অথবা পুরো মাথা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে।" (মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَيَنْهٰى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَالْقَزَعُ اَنْ يَتْرُكَ بِنَاصِيَةِ شَعْرِ وَلَيْسَ فِىْ رَأسِهِ غَيْرِهِ وَكَذٰلِكَ شَقَّ رَأسَهٗ وَهٰذَا وَهٰذَا ـ

"আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাযা' করতে নিষেধ করতে শুনেছি। ওবায়দুল্লাহ বলেন, আর কাযা' হচ্ছে ঃ কপালের দিকের কিছু চুল রেখে অবশিষ্ট মাথায় চুল না রাখা অথবা এভাবে এভাবে দু'পাশে চুল রেখে বাকী মাথায় চুল না রাখা।"

এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে, এর মধ্যে ইয়াহূদীদের অনুসরণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সুনানে আবূ দাঊদ এ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। فَانَّ ذٰلِكَ زِى الْيَهُوْدِ অর্থাৎ এটি ইয়াহূদীদের আচরণ ও রীতি। যখন এটা ছোট ছেলেদের জন্য নাজায়েয হলো, তখন বড়দের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথম পর্যায়ের তা অবৈধ হবে। একইভাবে খ্রিস্টানদের অনুসরণও নাজায়েয হবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টিগত ও প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। মহিলাদেরকে নাজুক ও কোমল স্বভাব এবং প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে বানিয়েছেন। এজন্য তাদেরকে রূপ ও সৌন্দর্য এবং মাথায় চুল দান করেছেন। অন্যদিকে পুরুষদেরকে প্রশাসক বানিয়েছেন। সে অনুযায়ী তাদেরকে বলিষ্ঠ করে তৈরি করেছেন। পুরুষের চেহারা ও আকার প্রকৃতি শৌর্য ও বিক্রম ও দর্শনীয়। এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের চেহারা দাঁড়ি গোঁফ এর রং লাগিয়েছেন এবং তাদের অঙ্গে সক্ষমতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করেছেন। তাদের গঠনে তেজিভাব সৃষ্টি করেছেন। তাদের চালচলনে বীরত্ব ও সাহসিকতার ছাপ পয়দা করে দিয়েছেন। তাদের হৃদয়ে গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী কামনার স্বপ্ন সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে নারীদের স্বভাব প্রকৃতিতে নাজুকতা ও কোমলতা এবং প্রজনন, দুগ্ধপান, শিশুপালন-এর চাহিদা তৈরি করেছেন। এজন্যই দেখা যায়, আজ পর্যন্ত কোন সরকার নারীদেরকে দিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করেনি। কেননা সৈন্যদের জন্য বীরত্ব প্রয়োজন, নাজুকতা ও কোমলতা প্রত্যাশিত নয়। আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও মহিলাদেরকে গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরি করেছেন। এজন্যই পুরুষদেরকে বলা হয়েছে তারা যেন নারীদের মত না হয়। তেমনিভাবে নারীরাও যেন পুরুষদের মত না হয়, তা হলে প্রকৃতির বিধান লংঘন করা হবে। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর নিজস্ব বিষয়গুলো গ্রহণ করবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইসলাম পুরুষদেরকে রেশমী ও জরির কাপড় পরিধান করা যা নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। তেমনিভাবে পুরুষগণ গহণা পরিধান করবে না, পায়ে ঝুমুর-নুপুর পরবে না, মাথায় টিক্ লাগাতে পারবে না। হাতে বালা চুড়ি পরতে পারবে না এবং সম্পূর্ণ লাল পোশাক পরবে না। চলাফেরায় মেয়েলি চাল ধারণ করবে না এবং দাঁড়ি কামাবে না বরং দাঁড়ি ছেড়ে দিয়ে রাখবে ও গোঁফ কেটে রাখবে। দাঁড়ি লম্ব করা এবং গোঁফ কেটে রাখা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত এবং প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

হযরত নবী (সা)-এর যামানায় অগ্নিপুজকরা প্রকৃতি বিরোধী এসব কাজে জড়িত ছিল। তারা গোঁফ বড় রাখত এবং দাঁড়ি কেটে ফেলত। এজন্য হযরত নবী করীম (সা)

মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা অগ্নিপুজকদের বিরোধিতা কর। তারা প্রকৃতি বিরোধী কাজ করে, তোমরা দাঁড়ি ছেড়ে দিয়ে (বড়) রাখ এবং গোঁফ কেটে রাখ।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخو اللحى وخالفوا المجوس -

"রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা অগ্নিপুজকদের বিপরীত গোঁফ কেটে ফেল এবং দাঁড়ি বড় করে রাখ।"

অনেক হাদীসেই এই প্রসংগটি এসেছে যে, দাঁড়ি বড় করে রাখা এবং গোঁফ কেটে রাখা নবীদের সুন্নাত এবং প্রাকৃতির বিষয়ের সাথে স্বভাবসম্মত যে, ছোট ও বয়স্ক লোক, পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে পার্থক্যের চিহ্ন থাকা প্রয়োজন তা দাঁড়ির মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এছাড়াও দাঁড়ি সৌন্দর্যের প্রতীক, বীরত্ব ও সাহসিকতারও প্রতীক, ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখুন।

পরীক্ষার পদ্ধতি

সমবয়সী কিছু যুবক কিছু মধ্য বয়সী এবং বৃদ্ধ বয়সী লোককে সমবেত করুন, তারপর দাঁড়িওয়ালা ব্যক্তিদেরকে এক কাতারে এবং দাঁড়িবিহীনদেরকে ভিন্ন কাতারে দাঁড় করান। এবার দুই কাতারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখুন, কোন কাতারকে সুন্দর মনে হয়, আর কোন কাতারকে অসুন্দর মনে হয়। এক নযরেই দাঁড়ির সৌন্দর্য বুঝা যাবে। যেমন কেশের বেণীওয়ালীকে বেনীবিহীন মহিলা থেকে সুন্দর ও নান্দনিক মনে হবে। এভাবে দাঁড়িওয়ালা পুরুষ সমবয়সী দাঁড়িবিহীন পুরুষ থেকে তাদের ন্যায় অধিক সুন্দর ও ভাল মনে হবে। ইচ্ছা করলে যে কেউ তা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

কলেজে কিছু ছাত্র দ্বীনদারও আছে, যারা দাঁড়ি রাখে। সেসব নওজোয়ান দাঁড়িওয়ালাদেরকে সমবয়সী দাঁড়িবিহীন নওজোয়ানদের সাথে একসাথে দাঁড় করিয়ে দেখা যাবে কারা অধিক সুন্দর।

অথবা লণ্ডন ও জার্মানীর এমন দু'জন সমবয়সী নওজোয়ানকে সমবেত করুন যাদের দাঁড়ি গজাবার সময় মাত্র শুরু হয়েছে। ছয় মাস পর্যন্ত তারা দু'জন দাঁড়ি কামাবে না। তারপর একজন দাঁড়ি কামাবে আর অন্য সমবয়সী দাঁড়ি কামাবে না। তখন দু'জনকে দাঁড় করিয়ে দেখা যাবে কাকে অধিক সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হয়। আপনি এক নযরেই ফায়সালা দিবেন যে, দাঁড়িওয়ালা খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয়, দাঁড়িবিহীন যুবক নয়।

সুতরাং যেমনিভাবে চুল লম্বা রাখাও বেনী করা স্ত্রী লোকদের অংকার তেমনি পুরুষের জন্য দাঁড়ি অলংকার বিশেষ। যদি অলংকার সংরক্ষনের কেউ প্রয়োজন মনে না করেন, তবে মহিলাদেরকে মাথা মুন্ডানো উচিত।

কাহিনী

কথিত আছে, ইউরোপের কোন এক এলাকায় কিছু মহিলার খেয়াল চাপল যে, তারা মাথা নেড়ে করে ফেলবে, তাতে তাদের মগজের তাপ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে পুরুষের ন্যায় তাদের মেধা ও ধীশক্তি বৃদ্ধি পাবে ও মস্তিষ্কের উন্নতি হবে। মহিলারা যখন কয়েকবার মাথা নেড়ে করল তখন তাদের মুখে দাঁড়ি গজাতে শুরু করল। তখন তারা মাথা নেড়ে করা বন্ধ করে দিল।

মাসয়ালা

কতিপয় ফিকহ্‌বিদ লিখেছেন, তোমরা বল কোন দাঁড়ি কামান জরুরী? তারপর তারা জবাব দিয়েছেন, মহিলাদের যদি দাঁড়ি গজায় তাহলে তা কামিয়ে ফেলা জরুরী।

মহানবী (সা)-এর পোশাক

হযরত নবী (সা)-এর পোশাক সাদাসিধা সাধারণ ও জৌলুসবিহীন ছিল। তাঁর যিন্দেগী ছিল বিলাসিতাবিহীন ও দরিদ্র ধরনের। তাঁর সাধারণ পোশাক ছিল তহবন্দ (লুঙ্গী), চাদর, কোর্তা ও জুব্বা এবং তালিযুক্ত কম্বল।

তিনি সবুজ পোশাক পছন্দ করতেন তবে তাঁর পোশাক সাধারণত সাদা হতো।

চাদর ঃ ইয়ামেনী চাদর যাতে সবুজ ও লাল ডোরা (রেখা) হতো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয় ছিল। তা ইয়ামেনী চাদর হিসেবে পরিচিত ছিল। সম্পূর্ণ লাল চাদরকে তিনি নিষেধ করতেন।

টুপি ঃ টুপি মাথার সাথে মিশে থাকত। খুব উঁচু টুপি কখনো ব্যবহার করেননি। আবূ কাবশা আগারী (র) থেকে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরামের টুপি মাথার সাথে মিলে থাকত, উঁচু হত না।

পাগড়ী ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) পাগড়ীর নিচে অবশ্যই টুপি রাখতেন। তিনি ফরমান, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, আমরা পাগড়ীর নিচে টুপি পরিধান করি। (আবূ দাঊদ)

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পাগড়ী পরিধান করতেন তখন পিঠে দু'কাঁধের মাঝখানে পাগড়ীর মাথা ঝুলিয়ে দিতেন। কপালে ডান কাঁধের দিকে অথবা বা কাঁধের দিকেও ঝুলিয়ে দিতেন। অথবা কখনো হয়ত থুতনীর নিচেও পাগড়ীর প্রান্ত ঝুলিয়ে রাখতেন। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বদর যুদ্ধে এবং হুনায়নের যুদ্ধে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য পাগড়ীবিশিষ্ট ফিরিশতা প্রেরণ করেছেন। যে বিষয়ে পবিত্র আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ -

পায়জামা ঃ হাদীসে আছে, হযরত নবী (সা) মিনার বাজারে পায়জামা বিক্রি হতে দেখলেন তখন তিনি তা পছন্দ করলেন এবং মন্তব্য করলেন ঃ এটি তহবন্দ থেকে

পর্দার জন্য অধিক কার্যকর। তিনি পায়জামা খরিদ করেছেন, তবে তিনি তা পরিধান ও ব্যবহার করেছিলেন কি-না তা জানা যায় না।

কামীস ঃ (কোর্তা) ঃ কামীস তাঁর খুব প্রিয় পোশাক ছিল। কাঁধের সাথে কোর্তা গিরা দেয়া হতো। আবার কখনো বুকের দিকে খোলা হতো।

লুঙ্গী ঃ (তহ্বন্দ) ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর সব পোশাক পায়ের টাখ্নু থেকে উপরে থাকত। বিশেষ করে তাঁর তহবন্দ বা লুঙ্গী পায়ের গোছার মাঝামাঝি পর্যন্ত হতো।

মোজা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মোজা পরতেন এবং মোজার উপর মাসেহ্ করতেন।

বালিশ ঃ তাঁর বালিশ চামড়ার খোলের তৈরি হত। ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি করা ছিল। আবার কখনো মহানবী (সা) খালি চাটাইয়ে শয়ন করতেন। চাটাই বা বস্তা তাঁর বিছানা ছিল।

আংটি ঃ পবিত্র হাত মুবারকে রূপার আংটি ব্যবহার করতেন। হযরত নবী (সা) যখন রোম সম্রাট কায়সার ও হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাসীসহ অন্যান্যদেরকে ইসলামের দাওয়াতী পত্র লেখার সংকল্প করেন, তখন তিনি অবহিত হন যে, শাসক ও রাজা-বাদশাহগণ মোহর বা সীল ব্যতীত কোন পত্র গ্রহণ করেন না। তখন তিনি রূপার একটি আংটি তৈরি করেন। যাতে তিন লাইনে উপর থেকে মুহাম্মদ, রাসূল, আল্লাহ লিখা ছিল।

জুতা মুবারক ঃ নবী (সা)-এর জুতা চপ্পল বা স্যান্ডেলের ন্যায় ছিল যে, নিচে তলি এবং উপরে দু'টি ফিতা লাগানো ছিল যাতে তিনি আঙ্গুল স্থাপন করতেন।[১]

নবী (সা) -এর কম্বল মুবারক

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ

অন্য আয়াতে ইরশাদ ফরমান ঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَانْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ -

اے برادر در لباس صوف باش

باصفتهائے خدا موصوف باش -

'হে ভায়েরা! সূফীদের পোষাক ইখতিয়ার কর, মহান আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হও।"

রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট পশমের তৈরি একটি কালো কম্বলও ছিল যাতে তালি লাগানো ছিল। যা খিরকা (গুদড়ী) নামে অভিহিত ছিল। কালো পশমী তালি লাগানো কম্বল আম্বিয়ায়ে কেরামের বিশেষ ভূষণ হিসেবে প্রচলিত (সুন্নাত)– যা আল্লাহর অলীগণ ও দরবেশগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। আজকে আফসোস হচ্ছে, এই রীতি বর্তমান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। সূফীদেরকে এইজন্যই সূফী বলা হতো যে, তাঁরা

১. যারকানী, ৫ খ, পৃ. ৪৫।

নবীদের অনুকরণে পশমী কম্বল পরিধান করতেন এবং দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়ে চিন্তামুক্ত হয়ে শাহী আসন অভিজাত পোশাককে দরবেশী কম্বলের মুকাবিলায় নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করেছেন।

گرچه درویشی بود سخت اے پسند
هم نه درویشی نه باشد خوب تر

"হে বৎস! যদিও দরবেশী অবলম্বন কঠোর মনে হচ্ছে; তারপরও প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে দরবেশীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই।"

قال ابن مسعود كانت الأنبياء يركبون الحمر ويلبسون الصوف ويحتلبون الشاة رواه الطيالسى، وعنه صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وكمته صوف وجبة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من حمار ميت رواه الترمذى وقال غريب والحاكم صححه على شرط البخارى زرقانى -

"হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ হযরত আম্বিয়া কেরাম গাধায় আরোহণ করতেন, পশমের পোশাক পরিধান করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন। আবূ দাঊদ তায়ালিসী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) থেকে ভিন্ন একটি বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে দিন হযরত মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ তা'আলার কথা হয়েছিল, সেদিন হযরত মূসা (আ)-এর গায়ে পশমের কম্বল ছিল ও পশমী টুপি ছিল এবং তাঁর জুব্বা ও পায়জামাও পশমী ছিল। আর মৃত গাধার চামড়া দিয়ে তাঁর জুতা তৈরি ছিল। এই হাদীসটি তিরমিযী রিওয়ায়াতে করেছেন এবং তিনি এর সনদের দিক থেকে হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। হাকেমও হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, ইমাম বুখারীর শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ।"[১]

হযরত আবূ বুরদা ইবন আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছেন, একদিন হযরত আয়েশা (রা) একটি মোটা কম্বল যাতে তালি লাগানো ছিল এবং একটা মোটা কাপড়ের তহবন্দ (লুঙ্গী) বের করে দেখালেন এবং বললেন, নবী (সা)-এর ইন্তিকাল এ দু'কাপড় পরিহিত অবস্থায় হয়েছে।

এখানে হযরত আয়েশা (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল মহানবী (সা)-এর জীবনের অনাড়ম্বর ও বিলাস ও জৌলুসবিহীন সাদাসিধা জীবন যাপন পদ্ধতিকে তুলে ধরা যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনধারা এমনটিই ছিল (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ)[২]

১. যারকানী, ৫ খ, পৃ. ১৬।

২. যারকানী, ৫ খ, পৃ. ২৫।

এ বিষয়ের প্রতি আদর সোহাগের দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يايها المدثر এবং يايها المزّمل

এই আয়াতে মর্ম অনুযায়ী আল্লাহর নিকট কম্বল ও চাদর অত্যন্ত প্রিয় পোশাক হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এজন্য ওহে কম্বলধারী! বলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করেছেন। এজন্যই হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (র) লিখেছেন ঃ আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট সূরা মুযযাম্মিল সূরা খিরকাহ নামে অভিহিত, যেখানে খিরকার আদব ও শর্তাবলীর আলোচনা আছে। দেখুন, তাফসীরে আযীযী।

হযরত নবী (সা)-এর পোশাক হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অনুরূপ ছিল। (নাউযুবিল্লাহ, তা জাতীয় ও দেশীয় পোশাক ছিল না।)

হযরত নবী করীম (সা)-এর পোশাক কোন জাতীয় বা দেশীয় লোকাচারের অনুসরণে ছিল না, বরং অহীয়ে রাব্বানী তথা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশনার আলোকে ছিল। আরবে প্রাচীন যুগ থেকে চাদর ও তহ্‌বন্দ-এর প্রচলন চলে আসছিল। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পোশাকও এরূপ ছিল। এ বিষয়ে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আযারবাইজানের আরবদেরকে চাদর পরতে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, এটি হচ্ছে তোমাদের পিতা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পোশাক।

أما بعد فاتزروا وارتد عليكم بلباس أبيكم اسمعيل واياكم
والتنعم وزى العجم -

"তহ্‌বন্দ ও চাদর পরিধান কর এবং আপন পিতা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পোশাক অবশ্যই ধারণ করবে।"

নাউযুবিল্লাহ! নবী (সা)-এর পোশাক সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক অনুকরণে ছিল না। আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে ও তাঁর নির্দেশনার দ্বারা জাতির বিশ্বাস, আখ্‌লাক ও কর্মকাণ্ড এবং ইবাদত, সামাজিকতা সব কিছুর বিষয়ে হেদায়েত ও নির্দেশনা প্রদান করেন। এমনকি কথাবার্তার আদব শিষ্টাচারও শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

জীবন ও সমাজের এমন কোন অধ্যায় নেই যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কোন ইঙ্গিত ইশারা অথবা নির্দেশনা (ইলহাম) ছিল না, এটা অসম্ভব বরং তা ছিল অসম্ভব যে, নবী (সা) সাধারণ লোকদের রীতিনীতি প্রথার অনুসরণ করবেন। নবী (সা)-এর পোশাকের বিষয়েও নির্দেশনা ছিল যে, এটি জায়েয, এটি হারাম ইত্যাদি। শুধু তা-ই নয়, এক্ষেত্রে মুসলমান ও কাফিরের পোশাক আলাদা বৈশিষ্ট্যের হয়ে গিয়েছিল। আর এ বিষয়ে মহানবী (সা)-এর অনেক হাদীস রয়েছে যেখানে তিনি কাফিরদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের বিরোধিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে যে পোশাকে অহংকার, অপব্যয় ও বিলাসিতা

জৌলুস প্রকাশ প্রায় তা থেকেও নিষেধ করেছেন। আল্লাহর দুশমনদের পোশাকের অনুকরণ করতেও নিষেধ করেছেন, তারা রেশমী পোশাক পরিধান করতো, তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি ঐ পোশাককেও নিষেধ করেছেন যা আল্লাহর দুশমনদের সাদৃশ হওয়ার কারণ হয়। মুশরিকেরা অহংকার করে লুঙ্গী-প্যান্ট-পায়জামা (ইযার) টাখ্নুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তা নাজায়েয ঘোষণা করেছেন। জরীর কারুকাজ করা পোশাক পরতে (পুরুষের জন্য) নিষেধ করেছেন যেন অহমিকা, বিলাসিতা ও অপব্যয়ের সুযোগ না থাকে। মুশরিকরা টুপির উপর পাগড়ী পরে না। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

فرق مابيننا وبين المشركين العمائم على القلانس -

"আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আমরা টুপির উপর পাগড়ী পরিধান করে থাকি।"

এভাবে হযরত নবী (সা) মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পোশাকের ক্ষেত্রে পার্থক্য ও বিভাজন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

خالفوا المشركين اوفروا للحى واحفوا الشوارب -

"কাফিরদের বিপরীত কর, দাঁড়ি বড় কর যার গোঁফ ছোট কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ নিজেরদের আকার-আকৃতি কাফিরদের মত করবে না, তোমাদের মৌলিকত্ব কাফিরদের থেকে অবশ্যই ভিন্নতর হতে হবে।

قَالَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাদৃশ অবলম্বন করে সে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হবে।" (আহমাদ, আবূ দাউদ, রাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা))

এই হাদীসের ভাষ্যে আল্লামা কারী (র) বলেন ঃ এই হাদীসে তাশাব্বুহ বা সাদৃশ বলতে পোশাকের অনুকরণ ও বাহ্যিক বেশভূষার অনুকরণকে বুঝানো হয়েছে। নৈতিক ও চারিত্রিক মুশাব্বাহ বা সাদৃশ অনুকরণের বিষয়কে তাশাব্বুহ বলা হয় না, বরং 'তাখাল্লাকা' বলা হয়।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسُهَا -

"এইসব কাফিরদের মত পোশাক (কাপড়), তাই তোমরা এগুলো পরবে না।"

যা হোক, এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পোশাক ও তাঁর যাবতীয় আচরণ আল্লাহ তা'আলার মরযী অনুযায়ী ছিল। সম্প্রদায়িক জাতীয় ও দেশীয় সংস্কৃতির অনুসারী ছিল না। যদি রাসূলুল্লাহ (সা) জার্মানী বা লণ্ডনে আবির্ভূত হতেন তবে

সেখানেও তিনি লন্ডনের বেহায়া ও পশুত্বকে সংস্কার ও সংশোধন করতেন। যেমনটি তিনি মক্কার অসভ্য লোকদেরকে করেছিলেন। তাদের প্রবৃত্তির গোলামী থেকে তাদেরকে আল্লাহর বন্দেগীতে, পর্দাহীনতাকে ও অশ্লীলতাকে পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও শালীনতায় পরিবর্তন করেছিলেন। এজন্য কোন আহমক ব্যক্তির এ ধরনের কল্পনার অবকাশ নেই যে, নাউযুবিল্লাহ–যদি হযরত নবী (সা) লন্ডন অথবা জার্মানীতে আবির্ভূত হতেন তা হলে তিনি পশ্চিমা রীতিনীতি ও বেশভূষার অনুকরণ করতেন। এ ধরনের কল্পনা হীনমন্যতা নীচতা ও গোলামী চিন্তার এবং বিবেক বিবর্জিত বোকামী চিন্তার ফানূস ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না, যা পাগলামী বৈ কিছু নয়। হযরত নবী (সা) আল্লাহ তা'আলার অহীর অনুসারী ছিলেন। اِنْ اتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحٰى اِلَىَّ

নাউযুবিল্লাহ কোন নবী দেশ ও সম্প্রদায়ের অনুসারী হতে পারে না বরং নিজ সম্প্রদায়কে তাঁর আনুগত্য করার দিকে আহ্বান জানিয়ে থাকেন এবং صِبْغَةُ اللّٰه বা আল্লাহর রঙে রঙীন করে থাকেন।

صِبْغَةُ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُوْنَ -

সিবগাতুল্লাহ বা আল্লাহর রঙ অনুযায়ী মুসলমানদের জীবন রঙীন করা এতে নির্ভর করে যে, মুসলমানগণ পোশাক-পরিচ্ছেদে কাফিরদেরকে সম্পূর্ণ পরিহার করবে। জীবনের সব শাখা ও প্রশাখায় কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পুরোপুরি ঈমানের রঙে জীবনের সব দিককে রঙীন করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে পেশ করা হচ্ছে।

কাফিরদের মত হওয়ার বিষয়ে সতর্কতা অর্থাৎ কাফিরদের সাদৃশ অবলম্বন জনিত সমস্যার বিষয়ে সাধারণ আলোচনা

আল-হামদুলিল্লাহ! এ বিষয়টি পূর্বের আলোচনায় ভালভাবে স্পষ্ট হয়েছে যে, নবী করীম (সা) নিজ পোশাক যথা লুঙ্গী, চাদর, জুব্বা (কুর্তা) পাগড়ী ও প্রকাশ্য বেশভূষায় স্বীয় পূর্বপুরুষ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অনুসারী ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ দেশ ও সম্প্রদায় এবং মক্কার মুশরিকদের অনুসারী ছিলেন না। যৌক্তিক হচ্ছে, সত্য ও হকের সন্ধানীদের জন্য এ বিষয়ে সতর্কতার জন্য এই সমস্যার স্বরূপ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

বস্তুত বিজাতির অনুকরণ সমস্যা ইসলামের জন্য একটি জটিল সমস্যা। কেননা এ অনুকরণ চলতে থাকলে ইসলামের অনেক বিধান পালন করা সম্ভব হবে না। এ জন্য দেখা যায়, যারা পশ্চাত্যের সৃষ্ট সংস্কৃতির ভক্ত এবং যারা ইসলামের বিধি-বিধানের সীমা ও শর্তাবলী থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়, তারা প্রথমেই হামলা করে বসে ইসলামের এই অনুকরণ বিষয়ে। তারা তাদের সকল প্রচেষ্টাকে এই লক্ষ্যে নিয়োজিত

করে যেন তাদের জন্য পরবর্তী সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। যেন ইসলামের শিক্ষা ও ইউরোপীয় তমদ্দুন বা সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে। এরা কথায়-বার্তায় থাকবে মুসলমান, কিন্তু লেনদেন, সামাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সূরতে-আকৃতিতে পোশাক-পরিচ্ছদে ইংরেজ হয়ে যায়।

این خیال است ومحال است وجنون -

"এমনটি একান্তই কল্পনা বিলাস, অসম্ভব ও মাতলামীর নামান্তর।"

যেহেতু ইসলামী শরী'আতে কাফিরদের অনুকরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এজন্য তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্, আকাইদের কোন গ্রন্থ এমন নেই যেখানে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়নি।

ফুকাহা ও ইসলামী পণ্ডিতগণ অনুকরণ সমস্যাকে মুর্তাদ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। মুসলমান যে কাজ করলে ইসলামের সীমা থেকে বেরিয়ে মুরতাদ হয়ে যেতে পারে এমন বিষয়ের অন্যতম হচ্ছে কাফিরদের অনুকরণ। এর প্রত্যেকটি বিষয়ের আলাদা গুরুত্ব ও হুকুম রয়েছে।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর জগত বিখ্যাত আলিম শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া খারানী (র) (মৃ. ঃ ৭২৮ হি.) এই সমস্যার স্বরূপ স্পষ্ট করার জন্য اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم নামে একটি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেখানে তিনি অনুকরণ সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রমাণাদি তথা কুরআন-হাদীসের সূত্র সহ যুক্তি ও বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যেখানে দ্বীনি ও দুনিয়াবী জীবনকে শিরক-এর অপবিত্রতা ও অন্ধকারের অনুকরণ থেকে ইসলামের অনুসারীদেরকে সতর্ক করা হয়নি এবং এ কথাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, সিরাতুল মুস্তাকীমের দাবি হচ্ছে, মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দালীন-অভিশপ্ত ও বিপথগামী দুই জাতি অর্থাৎ যথাক্রমে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের অনুকরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

বর্তমান ইংরেজ ও পাশ্চাত্যের যুগের এ পর্যায়ে এই অনুকরণের ফিতনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে দ্বীনের উলামায়ে কেরাম নিজের পুরো প্রচেষ্টা এ বিষয়ে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু এ পর্যায়ে অনুকরণ সমস্যা বিষয়ক কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার গ্রন্থ রচিত হয়নি, যে গ্রন্থে এ সমস্যার শাখা-প্রশাখা সবদিকের উপর সাজানো গোছানো আলোচনা ও দলীল–প্রমাণ ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে এবং যাতে সংশয়বাদী ও কুমন্ত্রণাকারীদের কুমন্ত্রণা কুধারণা বিদূরিত করে এসবের মূল উৎপাটনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেন এ বিষয়ে এগুলোর কোন সুযোগ ও অবকাশ না থাকে। পরিশেষে আল-হামদুলিল্লাহ, আমাদের মুরব্বী, আলিমদের শিরোমণি মাওলানা

কারী হাফেয মুহাম্মদ তায়্যিব (র)[১] দ্বীনি এই প্রয়োজন ও চাহিদা প্রেক্ষিতে التشبه فى الاسلام বা 'ইসলামে অনুকরণ' নামে দুই খণ্ডে এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে কিতাবটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যার তুলনা দ্বিতীয়টি নেই। হাকীমুল উম্মাত মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ আলী থানবী (র) উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন ঃ

"আল্লাহর হামদ ও দরূদের পর। এই বইটি আমি অধম শব্দে শব্দে পড়েছি। এক একটি শব্দের দ্বারা যেন হৃদয়ে আনন্দ ও চোখে আলো নির্গত হচ্ছিল। অনুকরণ বিষয়টি এত পূর্ণাঙ্গ, বিস্তারিত ও দলীলভিত্তিক লেখা হয়েছে যে, এরকম কোন লেখা আমি আর দেখিনি। সূক্ষ্ম চিন্তা করে ও অনেক দূর থেকেও যা অনুধাবন করা কষ্টকর এমন দিকটিও তিনি উন্মোচন করেছেন। অনেক দূরবর্তী সন্দেহ-সংশয়কেও লেখক সমূলে উৎপাটনের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পুস্তকটিকে উপকারী ও মকবূল হিসেবে গণ্য করুন এবং উত্তম কথা বা كلم طيب এর মধ্যে শামিল করুন। এই বিষয়ের শানে اليه يصعد الكلم الطيب এর মর্যাদা দান করুন। এ বিষয়ে উদ্ধৃত হয়েছে: هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد

এজন্য পাঠকদের প্রতি অনুরোধ হচ্ছে যে, যদি আপনারা অনুকরণ সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত প্রামাণ্য বক্তব্য জানতে চান তাহলে التشبه فى الاسلام বা 'ইসলামের অনুকরণ' বইটি পড়ে দেখতে পারেন। এখানে আমি অধম সংক্ষিপ্তভাবে এ সমস্যা নিয়ে একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করছি। এ নিবন্ধের বেশিরভাগ অংশ اقتضاء الصراط المستقيم এবং التشبه فى الاسلام পুস্তকদ্বয় থেকে নেয়া হয়েছে। আর হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-এর বিভিন্ন ওয়ায ও বয়ান থেকেও এ সংক্ষিপ্ত লেখায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যেন সম্মানিত পাঠকদের জন্য উপলব্ধি ও নির্দেশনার জন্য সহায়ক হয়। এ বিষয়ে আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করছি।

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

হাদীস হচ্ছে ঃ

بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ

ইসলাম সূচনাকালে অপরিচিত ছিল অর্থাৎ বন্ধু সহযোগীবিহীন ও আশ্রয়হীন অবস্থায় ছিল। তারপর খিলাফতে রাশেদার যুগে এসে ইসলামের চমক, বিজয় ও বরকত সূর্যের আলোর ন্যায় সব দিকে ছড়িয়ে যায়। রোম সাম্রাজ্যের ও পারস্য সাম্রাজ্যের বাদশাহ কায়সার ও কিস্‌রার গদি ও রাজত্বকে ইসলাম উল্টিয়ে দেয়। ইসলাম সুস্থ

১. অধ্যক্ষ, দারুল উলূম দেওবন্দ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দিন।

সমাজ ব্যবস্থা ও আল্লাহর দাসত্বের সভ্যতা দিয়ে কায়সার ও কিস্‌রার মেকী ও প্রতারণামূলক সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতাকে তার অনুসারীদের সরেযমীনে পদদলিত করেছে। সে খেলা পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

হযরত নবী (সা)-এর দশ বছর ব্যাপী জিহাদ এবং হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর দশ বছর ব্যাপী জিহাদ ও বিজয়ের ধারাবাহিকতায় আল্লাহর সাহায্যে দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের প্রভাবের বরকতে ও নেতৃত্ব পৃথিবীতে বিজয়ী ছিল। ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতা দুনিয়ার সকল সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার উপর বিজয়ী হয়েছিল। তৎকালীন পৃথিবীর জাতিসমূহ ইসলামের সভ্যতা সামাজিকতাকে নিজেদের জন্য সম্মানের বিষয় মনে করত। খিলাফতে আব্বাসিয়ার যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছিল। শিল্প-সংস্কৃতির লিপিকথা উন্নতির শীর্ষে উপনীত হয়েছিল। তৎকালীন ইউরোপের অধিবাসীরা ছিল মূর্খ ও বর্বর। তারা মুসলমানদের থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখেছে ও প্রযুক্তি-শিল্পকলা, কৃষ্টি-সভ্যতার সবক নিয়েছে।

পার্থিব জগতের চরম উন্নতিতে মুসলমানরা পৌঁছল। তারপর যখন ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হলো এবং মীর জাফর এবং মীর সাদেকদের মত মুনাফিকরা মন্ত্রী হলো।

گربه میروسگ وزیردموش را دیواں کنند
اینچنیں ارکان دولت ملك راویراں کنند ـ

"যদি বিড়ালকে নেতা বানানো হয়, কুকুরকে মন্ত্রী বানানো হয় এবং ইঁদুরকে বিচারের মাসনাদে বসানো হয়, (তাহলে) এমন সব কর্তা-ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের সর্বনাশই করে ছাড়বে।"

ফলাফল ও পরিণামে ইসলামী রাষ্ট্রের সূর্য উপনিবেশ তাদের হাতে অস্তমিত হলো। ইসলামের হাতে পদদলিত জাতিসমূহ নেতৃত্বে আসনে বসল। মুসলমানগণ অসৎকার্য ও ভাগ্যের নির্মাম পরিহাসে শাসকের অবস্থা থেকে শাসিতের উপস্থায় উপনীত হলো। আর শাসিতরা শাসক হল।

কিছুদিন মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের অপমান লাঞ্ছনা ও পরিবর্তিত অবস্থার চেতনা ছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে ধীরেধীরে মুসলমানগণ তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে কবূল করে নিতে আরম্ভ করল। মুসলিম দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এমনি পরিবর্তনের রং লাগল যে, মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য করার মত কিছুই বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবশিষ্ট রইল না।

হাদীসের মর্ম ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا ইসলাম প্রাথমিক যুগের ন্যায় আবার অপরিচিত বন্ধুহীন আশ্রয়হীন হয়ে পড়ল।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

এটা এই কারণে হয়নি যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন খুঁত বা অপূর্ণতা ছিল আর নতুন সমাজ ব্যবস্থায় কল্যাণ, পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রগতি রয়েছে, বরং নতুন সমাজ ব্যবস্থায় প্রবৃত্তির ভোগ-লালসা ও অহমিকায় ভরপুর ছিল। কুপ্রবৃত্তি এ ধরনের ভোগ-বিলাসিতা ও কাম উত্তেজনার ব্যবস্থাকে চরম প্রিয়রূপে গ্রহণ করে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সহজ সরল প্রথা, বিনয়, অল্পেতুষ্টি, আল্লাহর দাসত্ব, সংযমী আচরণ এসবকে তারা পছন্দ করে না।

হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) এমন আমীর ও শাসন ছিলেন যাঁদের ভয়ে তৎকালীন পৃথিবীর দুই বৃহৎ রাজশক্তিধারী পারস্য সম্রাট কায়সার ও রোম সম্রাট কিস্‌রা থরথর করে কাঁপত। অন্যদিকে তাঁরা দু'জন ছিলেন আধ্যাত্মিক মুরব্বি। কম্বল পরিধান করতেন, মসজিদে ইমামতি করতেন, যাঁদেরকে দেখে লোকেরা তাদের জীবন আচরণকে সংস্কার ও সংশোধন করতেন।

মহান আল্লাহ্ আলিম হাকীম-এর তাক্‌দীর ও ফায়সালা অনুযায়ী ফিরাউন, নমরূদ ও আ'দ জাতির ন্যায় ইউরোপের লোকদেরকে কিছুদিনের জন্য পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। যাদের মাধ্যমে প্রবৃত্তি ও ভোগবাদী বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থার সূচনা হয়। লুক্কায়িত প্রবৃত্তিপূজা বিকশিত হয়ে উঠে। বস্তুত ক্ষমতা, রাষ্ট্র ও সরকার যে বিষয়কে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় সাধারণ মানুষের প্রকৃতি স্বভাব তা মেনে নেয় ও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন যে সমাজে কুপ্রবৃত্তির মুক্ত চর্চার সুযোগ পাওয়া যায় এবং সরকার ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তা হাসিল করার ক্ষেত্রেও কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না, সেখানে নিঃসন্দেহে এমন সমাজই গড়ে উঠবে যা আল্লাহর সৃষ্টির জন্য মহা বিপর্যয় ও ফিতনার সৃষ্টি করবে।

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মুসলমানরাও আজকে সে পথেই যাচ্ছে। যে জাতি মুসলমানদের পূর্ব পুরুষদের থেকে পশ্চাদপদ ছিল, মুসলমানদেরকে ট্যাক্স দিত, পিছনে পিছনে দৌড়াত, আজকের মুসলমানগণ তাদের পূর্ব পুরুষদের আদর্শ-ঐতিহ্যকে পরিহার করে তাদের ভ্রান্ত পথে, গযবের পথে ধাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ তারা غير المغضوب عليهم এবং الضالين। বা ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনুকরণ অনুসরনের ধ্বংসের পথে চলছে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, প্রাচ্যের আলো কেন পশ্চাত্যের অনুকরণের প্রতি আকৃষ্ট হলো?

আমার মুসলমান ভাইসব! এই দুনিয়া ধ্বংসশীল।

تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ - (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪০)

উত্থান-পতন এই হচ্ছে দুনিয়ার প্রকৃতি। উন্নত সভ্য যে সব জাতি আম্বিয়ায়ে কিরামের মুকাবিলায় من اشد منا قوة আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে? এর শ্লোগান দিয়েছে এবং উন্নত জীবন ও প্রগতিশীল সমাজরূপে সমসাময়িক পৃথিবীতে অগ্রসরমান ছিল।

যে কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

عَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا لَمْ يَخْلَقُ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ـ (সূরা ফাজ্‌র ঃ ৮)

এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের চাদর, কম্বল, পাগড়ী, রুমাল, তহ্‌বন্দ, পায়জামাকে তামাশা-বিদ্রুপ করে, পরিণামে সবাই বরবাদ হয়ে গেছে।

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ـ وَهَلْ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

(সূরা মারিয়াম : ৯৮)

তাদের নাম-নিশানাও মুছে গেছে। কাউকে আল্লাহ তা'আলা সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন, আবার কাউকে যমীনে পুঁতে দিয়েছেন। কারও উপরে আসমান থেকে পাথর নিক্ষেপ করেছেন অথবা বিকট শব্দ দিয়ে হালাক করে দিয়েছেন।

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدٌ ـ (সূরা ক্বাফ ঃ ১৪)

এখানে আমি সংক্ষেপে মুসলমান ভাইদের খেদমতে অনুকরণ সমস্যার স্বরূপ নিয়ে কিছু কথা উপস্থাপন করতে চাই। আশা করি বিষয়টি নিয়ে মুসলমানগণ চিন্তা ভাবনা করবেন ঃ

ان اريد الا الاصلاح ما اسطعت وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب ـ

অনুকরণের স্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীনে যা কিছু আছে চাই জীবজন্তু হোক অথবা বস্তু বা উদ্ভিদ হোক, সবকিছু একই উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং একই স্থানে সমবেত হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি বস্তুই আকৃতি ও প্রকৃতিতে পার্থক্য করে ভিন্ন ভিন্ন করে বানিয়েছেন। যেন পরস্পরের আলাদা বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হয়, যার মাধ্যমে পরস্পরের পরিচিতি হতে পারে। বস্তুত আলাদা পার্থক্যের কারণ শুধু বাহ্যিক অবয়ব কাঠামো আকৃতি, রং রূপ। এই বাহ্যিক পার্থক্য রয়েছে মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যেও; সিংহ, গাধা, ঘাস, জাফরান, সুগন্ধি, ঘর, পায়খানা, জেলখানা, হাসপাতাল সব কিছুর মধ্যে। প্রকাশ্য আকৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতেই এসব হয়েছে। যদি এসবের কোন একটি ইউনিট তার আলাদা আকৃতি প্রকৃতি বর্জন করে ভিন্ন ইউনিটের আকার প্রকৃতি গ্রহণ করে, তাহলে তা আর পূর্বের শ্রেণীভুক্ত থাকবে না, বরং তা শেষের শ্রেণীভুক্ত হবে। তেমনিভাবে যখন পুরুষ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতা পরিহার করে মেয়েলি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে,

মেয়েলোকের মত পোশাক পরে, মেয়েলিভাবে কথা বলে এমনকি মেয়েদের সব ব্যবহার আচরণ শুরু করতে থাকে, তখন তাকে পুরুষ না বলে, হিজড়া বলা হবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে পুরুষ হিসেবে তার কোন পরিবর্তন আসেনি, শুধু পোশাক ও ফ্যাশনে সূরতে পরিবর্তন এসেছে। এ থেকে জানা গেল বস্তুগত দুনিয়ায় যদি প্রত্যেক শ্রেণী তার স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য হেফাযত না করে, বরং পরিবর্তন ও সংমিশ্রণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, তখন সে শ্রেণীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

জাতি ও সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা

এভাবে জাতি ও সম্প্রদায়ের বিভিন্নতাকে পৃথিবীর বিচিত্র বস্তুর ভিন্নতার সাথে তুলনা করে উপলব্ধি করুন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি অভ্যন্তরীণ ও নৈতিক ভিন্নতার প্রেক্ষিতে তারা অন্যান্য জাতি ও সমাজ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি নিয়ে পৃথক আছে। মুসলমান জাতি, হিন্দুজাতি, খ্রিস্টান জাতি ও ইয়াহূদী সম্প্রদায় একই পিতার সন্তান হওয়ার পরেও তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়েছে। জাতীয়তা ও ধর্মের ভিন্নতার কারণেই তাদের পার্থক্য রয়েছে শুধু তা-ই নয়, বরং তাহযীব, তামাদ্দুন (সভ্যতা, কৃষ্টি) এবং সামাজিক ভিন্নতা পোশাকের ধরন কিংবা খাওয়া পরার পদ্ধতিতে তারা পরস্পরে ভিন্ন। এক আল্লাহর ইবাদতকারী হিসেবে মুসলমানদের আকার-আকৃতি অবশ্যই ভিন্ন হবে। ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতির ও প্রকৃতির কারণেই একজন একত্ববাদী মুসলিম মূর্তি পুজারী মুশরিক থেকে আলাদা এবং একজন খ্রিস্টান পারসী (অগ্নিপূজারী) থেকে ভিন্ন।

বিভিন্ন জাতির ভিন্নতার কারণ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ছাড়া আর কি হতে পারে? বিশেষ আকার-আকৃতির সংরক্ষণ না করা হলে জাতীয় বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখা যায় না। জাতীয়, ধর্মীয়, আর্দশিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকলে সেই জাতিই টিকে থাকে। আর যখন কোন সম্প্রদায় বা জাতি তার নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র এবং আকার-আকৃতি পরিত্যাগ করে ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে ভিন্ন জাতির অনুকরণ করে নিজেদেরকে তাদের সাথে মিশ্রিত করে ফেলে, তাহলে সেই জাতি অবশ্যই হালাক হয়ে যাবে। ধরাপৃষ্ঠে তারা নিজেদের অস্তিত্ব কোনভাবেই টিকিয়ে রাখতে পারবে না।

অনুকরণের পরিচিতি ও সংজ্ঞা

এসব বাস্তবতা পরিষ্কার হবার পর অনুকরণের পরিচয় শুনুন, তাহলে এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অনুমান করা যাবে।

১. নিজের অস্তিত্ব, আকৃতি ও প্রকৃতি বর্জন করে ভিন্ন জাতির অস্তিত্ব, আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যাওয়াকে অনুকরণ (তাশাব্বুহ্) বলে। অথবা

২. নিজ অস্তিত্বকে অন্যের ব্যক্তিত্বের সাথে বিলীন করে দেখাকে অনুকরণ (তাশাব্বুহ) বলে। অথবা

৩. নিজের আকৃতি-প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে অন্যের আকৃতি-প্রকৃতিকে গ্রহণ করাকে অনুকরণ বলে। অথবা

৪. নিজের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে ছেড়ে দিয়ে অন্যের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা কবূল করে নেয়াকে অনুকরণ বলে। অথবা

৫. নিজের ও সমাজের আকৃতি ও চরিত্রকে ছেড়ে দিয়ে অন্যদের আকৃতি ও চরিত্রকে আপন করে নেয়াকে অনুকরণ বলে।

এজন্যই শরী'আত হুকুম দিচ্ছে যে, মুসলমানদেরকে বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ্য সংস্কৃতি থেকে পৃথক হতে হবে। পোশাক, আকৃতি ও মৌলিকতা সব দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। শারীরিকভাবে কোন নির্দশন অবশ্যই ধারণ করতে হবে, যেমন– দাঁড়ি, খতনা এবং প্রকাশ্য নিদর্শন হচ্ছে পোশাক। এই দু'টি সনাক্ত চিহ্ন ছাড়া পরিচিতি হতে পারে না। তেমনিভাবে শুধু এ দাঁড়িও যথেষ্ট নয়, কেননা বালকদের দাঁড়ি হয় না। তখন তাদেরকে কিভাবে সনাক্ত করা হবে। শুধু তা-ই নয় অমুসিলমদের মধ্যেও কোন কোন সম্প্রদায় দাঁড়ি রাখে। এজন্য পোশাক ছাড়া সনাক্তকরণ করা সম্ভব হয় না। এজন্য পোশাক ও দাঁড়ি মুসলমানের পরিচয়ের জন্য জরুরী।

অনুকরণ নিষেধের হুকুমের কারণ নাউযুবিল্লাহ গোঁড়ামী ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির নয় বরং আত্মমর্যাদাবোধ ও নিরাপত্তাই এর কারণ। যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী জাতীয়তাকে অন্যদের সাথে সংমিশ্রণ ও অনুকরণের হালাকি থেকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। যে জাতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আদর্শের হেফাযত করে না, সে জাতি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে দাবি করার অধিকার রাখে না।

কাফিরদের অনুকরণের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশ

১. আকীদার ক্ষেত্রে ও ইবাদতের মধ্যে কাফিরদের অনুকরণ কুফরী।

২. ধর্মীয় প্রথার অনুকরণ হারাম। যেমন খ্রিস্টানদের ন্যায় বুকে ক্রস লটকানো এবং হিন্দুদের মত পৈতা পরা অথবা কপালে তিলক লাগানো। এ ধরনের অনুকরণ নিঃসন্দেহে হারাম, যাতে কুফরীর আশংকা আছে। কেননা প্রকাশ্য ঘোষণায় কুফরী সংস্কৃতি গ্রহণ করা আন্তরিক সমর্থনের নিদর্শন।

এই দ্বিতীয় প্রকারের অনুকরণ যদিও প্রথমটি থেকে কিছুটা খাটো, তথাপি পেশাব ও পায়খানার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও কেউ যেমন পেশাব পান করা পছন্দ করবে না, তেমনিভাবে ইবাদত ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান উৎসবপর্বে কাফিরদের অনুকরণের নিষেধাজ্ঞা কুরআনের শিক্ষা ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ইমাম ইবন তাইমিয়া (র) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব اقتضاء الصراط المستقيم-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন।

৩. সামাজিক ও অভ্যাস এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুকরণ মাকরূহে তাহ্‌রিমী। উদাহরণ স্বরূপ, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নিজস্ব পোশাক যা তারা ব্যবহার করে থাকে, যা তাদের জন্যই সম্পৃক্ত আর এসবের ব্যবহারকারীকে সেই সম্প্রদায়ের

সদস্য হিসেবে মনে করা হয়, যেমন খ্রিস্টানদের টুপি (হ্যাট) হিন্দুদের ধূতি, যোগীদের খড়ম এসব কিছু নাজায়িয ও নিষিদ্ধ এবং এসব ব্যবহার করাকে বিজাতীয় অনুকরণ হিসেবে শামিল করা হয়। বিশেষ করে যখন অহমিকা প্রকাশ করে অথবা ইংরেজদের মত নিজেকে বানানোর জন্য এসব পরিধান করা হয়, তখনও আরও বেশি গুনাহ্ হবে। যোগীদের বেশভূষা গ্রহণ করার ন্যায় ইংরেজদের বেশভূষা গ্রহণ করলেও একই ধরনের হুকুম প্রযোজ্য হবে।

এভাবে কাফিরদের ভাষা-পরিভাষা কথাশৈলী অনুকরণ করার মধ্যে যদি এই মনোভাব থাকে যে, এভাবে আমরা ইংরেজদের অনুকরণ করে তাদের সমাজের সাথে মিশে যাব, তাহলে তা অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। আর যদি ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্য ইংরেজদের মত হওয়া না হয়, বরং উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষা হয়– কাফিরদের সাথে যোগাযোগ ব্যবসা বাণিজ্য, পত্র যোগাযোগ ইত্যাদির জন্য হয়, তা হলে তা দূষণীয় নয়।

৪. নতুন আবিষ্কার, ব্যবস্থাপনা, দ্রব্যসামগ্রী, যুদ্ধাস্ত্র এসব ক্ষেত্রে অন্য জাতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়িয আছে। যেমন কামান, বন্দুক উড়োজাহাজ, মোটরগাড়ী, মেশিনগান ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে অনুকরণ নয়। ইসলামী শরী'আত আবিষ্কারের পদ্ধতি নির্দেশ করেনি। আবিষ্কার, শিল্প প্রযুক্তি, লিপিকলা এসব মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয়তার উপর ছেড়ে দিয়েছে। তবে এসবের ব্যবহারে বিধি নির্দেশ রয়েছে। কোন শিল্প, লিপিচিত্র, জায়িয, কোন্‌টি কতটুকু জায়িয, কি পদ্ধতিতে তা ব্যবহার করা হবে, তা শরী'আতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকতে হবে, উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা হবে না। একজন চিকিৎসক জুতা বানানোর পদ্ধতি শিক্ষা দেন না, তবে তিনি এই শিক্ষা দেন যে, এভাবে জুতা পরে চললে মগযের ক্ষতি হতে পারে অথবা পা যখম হতে পারে। তেমনিভাবে ইসলাম আবিষ্কার শিক্ষা দেয় না, তবে দ্বীন শিক্ষা দেয় যেন আবিষ্কার এমন না হয় যার দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হতে পারে। এসব হচ্ছে ঐসব আবিষ্কারের হুকুম, যেগুলোর বিকল্প মুসলমানদের কাছে নেই। যদি মুসলমানদের কাছে অনুরূপ আবিষ্কার বা সামগ্রী থাকে, সেক্ষেত্রে এই অনুকরণ মাকরূহ হবে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে ফার্সী তীর ধনুক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা আরবী ধনুক ও ফার্সী ধনুক কার্যকর ক্ষেত্রে একই মানের ছিল। শুধু কাঠামোগত পার্থক্য ছিল। ইসলামে গোঁড়ামী নেই, মর্যাদাবোধ আছে। এজন্য যে সামগ্রী মুসলমান-কাফির উভয়ের কাছে রয়েছে এবং তার মধ্যে বাহ্যিক কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া কোন পার্থক্য নেই, সে সব ক্ষেত্রে কাফিরদের অনুসরণ নিষেধ। এছাড়াও এটা অপরাধ ও মর্যাদার পরিপন্থী। কেননা এতে বিনা কারণে কিংবা অযৌক্তিক প্রয়োজনে অমুসলিম সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী ও অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ নেই। তারা নিজেদের ঘর সম্পর্কে

বেখবর হয়ে আছে; বরং নিজেদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে অন্যদের সমাজ ও প্রথার অনুসরণ ও আনুগত্য শুরু করেছে। মুসলমানদের উপমা মাওলানা রূমী এভাবে দিয়েছেন ঃ

یك سبد پرنان ترابرفرق سر * توهمی جوئی لب نان در بدر -

"রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি/টুক্‌রি তোমার মাথার তালুতে রয়েছে অথচ তুমি রুটির (ফেলে দেবার যোগ) কিনারার তালাশে দ্বারে দ্বারে ঘুরছ!"

تابزانوئے میان قعرآب * وزعطش وجوع گشتی خراب -

"তুমি হাঁটু পরিমাণ গভীর পানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছো তা সত্ত্বেও তুমি ক্ষুৎ পিপাসায় জীবন বিপন্ন করছ?"

তবে হ্যাঁ, যে সব নতুন আবিষ্কার এবং নতন অস্ত্র বা সামগ্রী মুসলমানদের হাতে নেই, সে সবকিছু (আবিষ্কার) মুসলমানগণ তাদের জরুরী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার ও ভোগ করতে পারবে, তা জায়েয। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, এসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাফিরদের মত নিয়্যত ও মনোভাব হতে পারবে না। শুধুমাত্র নিজস্ব প্রয়োজনে এসব নূতন আবিষ্কার ও সামগ্রী ব্যবহার করার অনুমতি ইসলামী শরী'আতে আছে। কাফিরদের অনুকরণের উদ্দেশ্যে হলে এসব নতুন আবিষ্কারের সামগ্রী ব্যবহারকে শরী'আত অনুমোদন করে না।

মদ্য পান করার পদ্ধতিতে দুধ পরিবেশন ও পান করাতেও শরী'আত অনুমতি দেয় না। দুধ খেতে মদ খাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করার মানে হচ্ছে সাকীর হৃদয়ে মদের প্রতি আসক্তি রয়েছে যা সে হৃদয়ে লুক্কায়িত রেখেছ। তেমনিভাবে কোন বৈধ দ্রব্যের ব্যবহার যদি কাফিরদের পদ্ধতিতে করা হয়, তা হলে বুঝতে হবে তার অন্তরে কাফিরদের প্রথা ও পদ্ধতির প্রতি আসক্তি ও অনুরাগ রয়েছে।

যা হোক, যেভাবে কাফিরদের মতামত অনুকরণ কাম্য নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলারও প্রত্যাশা হচ্ছে যে, তাঁর প্রিয় বান্দাগণ তাঁর দুশমনের অনুকরণ করবে না। তাদের অনুসরণের কোন কাজ করবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَ لاَ تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (সূরা হূদ ঃ ১১৩)

কাফিরদের অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

দ্বীন ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন আদর্শ। অতীতের সকল মতবাদ, বিধান ও জাতীয় আদর্শকে রহিত করে ইসলাম এসেছে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এই অনুমতি দেয় না যে, তারা রহিত মতবাদের অনুসারীদের অনুকরণ করবে। শুধু তা-ই নয়, অন্যদের অনুকরণ আত্মমর্যাদাবোধেরও পরিপন্থী।

যেভাবে প্রতিটি জাতির ও প্রতিটি মতবাদের মৌলিক কাঠামো পৃথক, তেমনিভাবে এর আকৃতি-প্রকৃতির একটি ভিন্নরূপ রয়েছে। পৃথিবীতে প্রকাশ্য আকার ও আকৃতি

প্রকৃতি, বেশভূষা পৃথক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যম। এসবের ভিত্তিতেই জাতি ও সম্প্রদায় পারস্পরিকভাবে সামাজিকতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আলাদা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিগণিত হয়। যখন কোন সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ গ্রহণ করে, আকার-আকৃতি ধারণ করে, তখন তাদের নিজস্ব জাতীয়তা ও আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, নিজ জাতীয় আদর্শ এবং ব্যক্তিত্বকে অন্য জাতীয় আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের নিকট বিসর্জন দেয়া আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ। এর আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ইসলাম কোন কিছুর অধীন ও অনুসারী নয়। তেমনিভাবে ইসলামের সামাজিক বিধান, সংস্কৃতি ও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, এক্ষেত্রে সে কারও অধীন বা অনুগামী নয়।

কোন সরকারের জন্য এটি বৈধ নয় যে, সে তার সরকারী সেনাবাহিনীকে দুশমনের সৈন্যদের ইউনিফরম (উর্দি) পরিধান করাকে অথবা শত্রুর ঝাণ্ডা নিজ বাহিনীর সাথে বহন করবে; বরং কোন সৈনিক এমনটি করলে তাকে হত্যা করার উপযুক্ত বলে মনে করা হবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর সেনাবাহিনী মুসলমানদের জন্যও এই অনুমতি হতে পারে না যে, তারা শয়তানের বাহিনীর আকৃতি ধারণ করবে। যা দেখে দর্শকদের সন্দেহ হবে। অথবা কোন সরকারের কোন বিদ্রোহী বাহিনী যদি কোন বিশেষ পোষাক বা নিদর্শন ধারণ করে, তাহলে সেই সরকার নিজ সেনাবাহিনীর জন্য বিদ্রোহীদের অনুকরণের অনুমতি দিবে না।

অবাক হবার মত বিষয় হচ্ছে যে, কোন বৃটিশ জেনারেল জার্মানী বা রুশ ইউনিফরম ব্যবহারকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিবে। কেননা জার্মানী ও রুশ বৃটিশের শত্রু, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা)-এর কি এই ঘোষণা দেয়ার অধিকার নেই যে, আল্লাহর দুশমনদের বেশভূষা অনুকরণ করা অপরাধ? مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যারা আল্লাহর দুশমনদের অনুকরণ করবে, তাদের পোশাক পরবে এবং তাদের উর্দি পরিধান করবে, নিঃসন্দেহে তারাও আল্লাহর দুশমন হিসেবেই গণ্য হবে।

"ইসলাম হচ্ছে নূর আলো- আর কুফর হচ্ছে অন্ধকার।

ইসলাম হচ্ছে হক – আর কুফর হচ্ছে বাতিল।

ইসলাম সুন্দর অনুপম –কুফর অসুন্দর কুৎসিত।

ইসলাম হচ্ছে দিনের আলো–কুফর হচ্ছে রাতের অন্ধকার।

ইসলাম হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদা–কুফর হচ্ছে অপমান ও লাঞ্ছনা।"

এজন্যই ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অন্ধকার, অপমান ও বাতিলের পোশাক পরতে ও সম আকৃতি ধারণ করতে অনুমতি দেয় না। যেন তারা তাদের সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে যায়।

ইসলামের হাকীকত তথা মৌলিকত্ব কুফরের হাকীকত থেকে আলাদা। এভাবে ইসলাম চায়, তার অনুসারীরা আকৃতি-প্রকৃতি, পোশাক-বেশভূষায় শত্রুদের থেকে আলাদা থাকুক।

সারকথা

শরী'আতে অন্যের অনুকরণের নিষেধাজ্ঞা কোন গোঁড়ামী বা সংকীর্ণতার ভিত্তিতে হয়নি, বরং আত্মমর্যাদাবোধ, নিরাপত্তা, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের ভিত্তিতে হয়েছে। কোন সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আলাদা সম্প্রদায় বলা যাবে না যতক্ষণ না তারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধারণে আলাদা না হবে।

ইসলামী উম্মাহ্কে কুফর, ধর্মদ্রোহিতা, নাস্তিকতা থেকে নিরাপদ থাকার কোন উপায় নেই যতক্ষণ না ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বসমূহকে নিরাপদ রাখা না যাবে এবং কাফিরদের অনুকরণ থেকে রক্ষা করা না যাবে। কেননা অনুকরণের অর্থ হচ্ছে, নিজ অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে অন্যের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন করে দেয়া।

قَالَ تَعَالَى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফিরদের মত হয়ো না।" (আলে ইমরান ঃ ১৫৬)

মু'মিন আল্লাহর বন্ধু, কাফির আল্লাহর তা'আলার দুশমন। অতএব কাফিদের থেকে আলাদা ও পৃথক থাকা ও পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক। সরকারের অনুগতদের জন্য এটা মানায় না যে, তারা বিদ্রোহীদের অনুকরণে একই রং ধারণ করবে এবং একই পোশাক পরিধান করবে।

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْمُوْسٰى ـ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সেই সমস্ত লোকদের মত হবে না যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছিল।" (সূরা আহযাব ঃ ৬৯)

وَ قَالَ تَعَالٰى : اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ ـ

"মুসলমানদের এ সময় কি হয়নি যে, আল্লাহর যিক্র ও তাদের উপর নাযিলকৃত হকের সামনে তাদের হৃদয় ভীত হয়ে যাবে? এবং তারা সেই লোকদের মত হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের মত হবে না। যাদের উপর দীর্ঘ যুগ অতীত হয়েছে। তারপর তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই পাপিষ্ঠ।" (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

অর্থাৎ আশংকা হচ্ছে তোমরা যদি ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনুকরণ কর, তাহলে তোমাদের হৃদয়ও কঠিন হয়ে যাবে এবং সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা চলে যাবে।

قَالَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَى النَّبِىِّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ اَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ لَاتَدْخُلُوْا مَدَاخِلَ اَعْدَائِى وَلَا يَلْبَسُوْا مَلَابِسَ أَعْدَائِىْ وَلَا يَرْكَبُوْا مَرَاكِبَ اَعْدَائِىْ وَلَا يَطْعَمُوْا مَطَاعِمَ اَعْدَائِىْ فَيَكُوْنُوْا اَعْدَائِى كَمَاهُمْ اَعْدَائِىْ ـ(كتاب الزواجر)

"মালিক ইবন দীনার (র.) বলেন ঃ পূর্বের একজন নবীর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা অহী প্রেরণ করে বলেছিলেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে বলে দাও যে, তোমরা আমার শত্রুদের গমনাস্থলে গমন করবে না। আমার দুশমনেরা যেরূপ পোশাক পরে, তোমরা তা পরবে না। আমার দুশমনেরা সে সাওয়ারীতে আরোহণ করে, তোমরা তাতে আরোহণ করবে না। যেখানে আমার শত্রুরা খাদ্য গ্রহণ করে, তোমরা সেখানে খাদ্য গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে তাদের থেকে পৃথক থাক। অন্যথায় তোমরাও তাদের ন্যায় আমার শত্রু হয়ে যাবে।[১]

অহীর শেষ বাক্য فَيَكُوْنُوْا اَعْدَائِىْ كَمَاهُمْ اَعْدَائِىْ এরূপ পবিত্র আল-কুরআনেও মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে উঠাবসা করতে নিষেধ করার পর বলেছেন اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ তাহলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ـ

"যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা তাদের মধ্যে পরিগণিত হবে।"

অন্য দিকে হাদীসে আছে ঃ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ যারা কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে তারা তাদের মধ্যেই শামিল হবে।

অনুকরণের ভয়াবহতা ও ফলাফল

অন্যদের আকৃতি ও বেশভূষা গ্রহণ করাতে ভয়াবহ ক্ষতি রয়েছে ঃ

১. প্রথম পরিণাম ফল হচ্ছে ঃ ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পৃথক কোন সত্তা অবশিষ্ট থাকবে না। হক আদর্শ বাতিল মতবাদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে। সত্যকথা হচ্ছে ঃ প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টানদের অনুকরণ মানে হচ্ছে, নাউযুবিল্লাহ্ নাসারা মতবাদের দরযা ও বারান্দায় প্রবেশ।

২. অন্যদের অনুকরণ করা আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী। পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় নিদর্শন ও পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার মাধ্যমে বুঝা যাবে এই ব্যক্তি অমুক

১. কিতাবুল যাওয়াযির, হাজার মাক্কী, হাইসামী, ১ খ, পৃ. ১১।

সম্প্রদায়ের। এজন্য এই পদ্ধতি ছাড়া আর সহজ কি পদ্ধতি হতে পারে যে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন পোশাক পরিধান করা হবে না, বরং মুসলিম জাতি নিজেদের পোশাক বেশভূষা অনুসরণ করবে। বস্তুত এটি ইসলামী মর্যাদাবোধের জন্য অপরিহার্য যে, আমরা নিজেদের বেশভূষার অনুসরণ করব এবং অন্যদের মুকাবিলায় আমাদের বিশেষ পরিচিতি হবে।

৩. কাফিরদের সমাজ সভ্যতা ও পোশাক গ্রহণ করা প্রকারান্তরে তাদের নেতৃত্ব ও আচরণকে মেনে নেয়া, শুধু তা-ই নয়, বরং নিজেদের হীনমন্যতা ও তাদের অধীন হবার স্বীকৃতি ও ঘোষণা, যার অনুমতি ইসলাম দেয় না। অন্যের বেশভূষা গ্রহণ করা মানেই হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রজা শাসকের আনুগত্য করতে বাধ্য হয়ে থাকে, তাকে খুশি করার জন্য সে শাসকের মত পোশাক পরে। যেখানে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও আলাদা স্বাধীন আদর্শ, সেখানে তাদের অনুসরণ আনুগত্য কেন করা হবে ?

৪. কাফিরদের অনুকরণের আরও খারাপ দিক হচ্ছে ঃ ধীরে ধীরে কাফিরদের প্রতি অন্তর আকৃষ্ট হতে থাকবে, তাদের মত হওয়ার জন্য চাহিদা পয়দা হবে, যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلاَ تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ -

"যারা যুলম করেছে তোমরা তাদের দিকে ঝুঁকোনো যেন তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণে তোমাদেরকে আগুনে না পায়। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ তোমাদের অভিভাবক-বন্ধু নেই। তাঁর কাছে ছাড়া তোমরা আর কোথায়ও সাহায্য-সহযোগিতা পাবে না।" (সূরা হূদ ঃ ১১৩)

অমুসলমানদের পোশাক ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা তাদেরকে ভালবাসার নিদর্শন, যা শরী'আত কোন অবস্থাই অনুমোদন করে না। আল্লাহ তা'আলা ইরাশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদের মধ্যে হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে হিদায়াত করেন না।" (সূরা মায়িদা ঃ ৫১)

এটা কি যুলম নয় যে, ঈমান-ইসলামের দাবি করা হবে, আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বতের ঘোষণা করা হবে, আর আকার আকৃতি বেশভূষায় আল্লাহর দুশমনদের হবে?

কোন বাদশাহ্ অথবা কোন সরকার এটা বরদাশত করবে না যে, সরকারের আনুগত্যের ঘোষণা দিয়ে সরকারের শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব রাখা হবে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক হবে এবং তাদের সাথেও ব্যবসা করা হবে। এসব কাজ আইনত অপরাধ।

আহ্কামুল হাকিমীন তাঁর দুশমন এবং তাঁর দূত উযীরদের অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের অস্বীকারকারী ও বিরোধিতাকারীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও তাদের সাথে মাখামাখি, বেশভূষা ও আকৃতিতে পোশাকের অনুকরণকে যদি নিষেধ করা হয়, তাহলে নাক কুঞ্চিত করা হবে কেন?

৫. এরপর আস্তে আস্তে ইসলামী পোশাক এবং ইসলামী সভ্যতাকে উপহাস করার সুযোগ পাবে। ইসলামী পোশাককে অবহেলা করবে এবং পরিধানকারীদেরকেও তুচ্ছ মনে করবে। তারা যদি ইসলামী পোশাকে তুচ্ছই না মনে করবে, তাহলে তারা কেন ইংরেজি পোষাক গ্রহণ করছে?

৬. ইসলামী বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিবে। মুসলমানদের চেহারা-সূরত কাফিরদের মত দেখে মনে করা হবে যে, এরা ইয়াহূদী অথবা নাসারা বা হিন্দু। যদি কখনো কোন লাশ পাওয়া যায়, সূরত দেখলে দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ে যেতে হবে যে, এর জানাযা পড়া হবে-কি-না এবং তাকে কোন করবস্থানে দাফন করা হবে?

৭. যখন ইসলামী পরিচিতি বর্জন করে অন্যদের বেশভূষা গ্রহণ করা হয়, তখন নিজ সমাজে তার কোন মর্যাদা থাকে না নিজ সমাজে যার ইজ্জত থাকে না, তখন অন্যদের কি ঠেকা পড়েছে যে, তারা তাকে সম্মান করবে। নিজের সমাজে যার ইজ্জত থাকে, অন্য সমাজের কাছেও তার সম্মান থাকে।

৮. অন্য জাতির পোশাক গ্রহণ করা নিজ সমাজের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রমাণ।

৯. পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, ইসলামের দাবি করা হচ্ছে, অথচ পোশাক, খাদ্য সামাজিক সভ্যতা, ভাষা, সাংস্কৃতিক জীবনধারা সবকিছুই ইসলামের দুশমনদের মত। এই অবস্থায় ইসলামের দাবির কি প্রয়োজন আছে? যারা ইসলামের শত্রুদের অনুকরণকে নিজেদের জন্য ইজ্জত-সম্মানের ও গর্বের বিষয় মনে করে, ইসলামে এ জাতীয় মুসলমানের কোন প্রয়োজন নেই।

একথা বুঝের অপেক্ষা যে, কাফিরদের বেশভূষা গ্রহণ করার কি প্রয়োজন আর লাভই বা কি? বিনা প্রয়োজনে কাফিরদের পোশাক গ্রহণ করার ইচ্ছা এমনটি হতে পারে যে, আমরাও কাফির হতে চাই। (নাউযুবিল্লাহ!) আকৃতিতে হলেও কাফির হয়ে যাব অথবা অন্যভাবে বলা যায়,

আমরা তথাকথিত প্রগতিশীল হবার জন্য আমাদের শত্রুদের পোশাক, আকার-আকৃতি গ্রহণ করতে চাচ্ছি। নাসারাগণ ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে নির্দেশ রয়েছে।

اِنَّ الْكَافِرِيْنَ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ـ

হিন্দুস্থানের সীমানা বণ্টনের সময় নাসারাদের দুশমনি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদেরকে যতবেশি অঞ্চল দেয়া যায় বৃটিশ সে চেষ্টাই করেছে এবং দেয়াও হয়েছে আর মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করেছে।

বৃটেন বাহির থেকে চার লাখ ইয়াহূদী আমদানী করে ফিলিস্তিনে বসিয়ে ফিলিস্তিনকে খণ্ডিত করল। অথচ ভারতে যেখানে চার লাখ ও আট লাখ মুসলমান ছিল, সেখানে ফিলিস্তিনের মত বৃটিশের সে এলাকাকে ভাগ করা উচিত ছিল। বর্তমানে (১৯৬০ সালে) ফিলিস্তীনে ইয়াহূদীদের সংখ্যা ও মুসলমানদের সংখ্যা আট লাখ, অন্যদিকে উত্তর প্রদেশেই মুসলমানের সংখ্যা আশি লাখ। যে পদ্ধতিতে ফিলিস্তীনকে বিভক্ত করা হলো, একই নিয়মে উত্তর প্রদেশেও আলাদা রাষ্ট্র হওয়া উচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এখানে খ্রিস্টানদের দুশমনী সূর্যের ন্যায় পরিষ্কার। তারপরেও কেন মুসলমান তাদের সামাজিকতাকে গ্রহণ করছে? আসলে লোকেরা মনে করে থাকে, ইংরেজদের পোশাক, বেশভূষা শাসক ও মর্যাদাবানদের প্রতীক যার মাধ্যমে তারা ইংরেজদের মত আকৃতি ধারণ করে তাদের মত মান-মর্যাদা পাবে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, সম্মান-মর্যাদা অর্জন করা হয় এজন্য যে, অন্যদের মুকাবিলায় তা প্রয়োগ করে প্রত্যাশা পূরণ করা হবে। নিজ সমাজে দাপট প্রদর্শন করার জন্য ইজ্জত ও মর্যাদা হাসিল করা হয় না। দাবি করা হয় নিজ সম্প্রদায়ের সমবেদনার কিন্তু বাস্তবে নিজ সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি দেখানো হচ্ছে চরম ঘৃণা ও অবজ্ঞা। পক্ষান্তরে ভিন্ন জাতির প্রতি ভালবাসাও সহানুভূতি রয়েছে।

গিরগিটের মত ঘন ঘন রং পরিবর্তনের মধ্যে কোন ধরনের ইজ্জত কি থাকে ? যে তারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ইউরোপকে দেখছে এবং যে পোশাকের ফ্যাশনে ইউরোপকে গ্রহণ করেছে; এইসব পাশ্চাত্য প্রেমিকও সেই ফ্যাশন ও পোশাক গ্রহণ করছে ? যে কারো প্রেমে পড়ে, সে প্রিয়তমার নিকট অপদস্থ হবেই। এখন ভেবে দেখা উচিত আমরা কি আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রেমিক হবো, না-কি ভোগবিলাসী ইউরোপের প্রেমে পড়ব? মনে রাখতে হবে যে, প্রেমের ভিত্তিই নীতি স্বীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

উন্নয়নের রাজপথ

এ বিষয়ে দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, ইসলামের আলো পবিত্র মক্কার আকাশ থেকে গোটা যমীনে সম্প্রসারিত হয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানদের জীবনে পরিবর্তন আসল। তাদের দ্বীনি ও পার্থিব উন্নতি অর্জিত হল। আসমানী শরী'আত প্রসারের নিমিত্ত তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্বসহ প্রতাপশালী রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। আর এই অর্জনের কারণ এটা ছিলনা যে, তারা রাষ্ট্রীয় বিষয়কে খুব গুরুত্বের সাথে আয়ত্ত

করেছিল অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-প্রযুক্তি শিক্ষণে তারা অধ্যবসায়ী ছিল। অথবা সুদী অর্থনীতি চালু করেছিল অথবা সাম্রাজ্য ও অর্থনৈতিক শক্তি হয়েছিল; বরং তাদের শক্তি, উন্নতি ও বিজয়ের উৎস ছিল মহানবী (সা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ আসমানী বিধানের আলোর মশালের তাঁরা ছিল ধারক বাহক। এটি ছিল তাঁদের প্রধান হাতিয়ার, এটিই ছিল তাঁদের সেনাবাহিনী। তাদের বিজয় ও সৌভাগ্যের ঝাণ্ডা এ ছাড়া ভিন্ন কিছু ছিল না। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তারা প্রতাপশালী বিশাল সাম্রাজ্য কায়েম করল যার পদতলে রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতির মান-মর্যাদা-ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল।

এই সত্যটি এত স্পষ্ট যে, এর দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। ইয়াহূদী ও নাসারা ঐতিহাসিকরাও একথা সাক্ষী দিচ্ছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) পবিত্র মক্কা মুকাররমায় প্রেরিত হয়েছেন। তিনি একাকী মূর্খ বর্বর আরবদেরকে তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছেন। আসমানী কিতাবের তালীম দিয়ে তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তাদের কাছে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে ইনসাফ ও শাসনের এমন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা পৃথিবীর নির্মাতা হিসেবে অল্প সময়ের মধ্যেই যমীনে বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হয়ে গেলেন। অথচ তাঁদের নিকট অর্থ-সম্পদ ছিল না। সামরিক শক্তিও ছিল না। তারা ভিন্ন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আয়ত্ত করেনি আর তার সুদকেও হালাল ঘোষণা করেনি। তাদের এসব মহৎ অর্জন ছিল ইসলামী শরী'আতের অনুসরণ অনুকরণেরই বরকতে।

বিশ্বনবী (সা)-এর ইন্তিকালের পরে সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁর খলীফা হলেন। তিনিও তাঁর খিলাফতের যুগে শরী'আতের বিধানের পুরোপুরি অনুসরণ অনুকরণ করেছেন। তাঁর যামানায় যেসব গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তিনি তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কসম খেয়ে ঘোষণা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে যাকাত হিসেবে দেয়া একটি রশি দিতেও যদি তারা অস্বীকার করে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ ঘোষণা করব। তিনি মুরতাদ ও নবুওয়তের দাবিদারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করে তাদেরকে মূলোৎপাটন করেছেন।

এভাবে পরবর্তী যুগে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের যে জৌলুস ও শান শওকত ছিল, তা শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের বরকতেই ছিল। তৎকালীন পৃথিবীর বিশাল সাম্রাজ্যগুলোও তাঁকে ভয় পেত।

চিন্তা করে দেখুন, উম্মাতের জন্য জীবন উৎসর্গকারী নবীয়ে উম্মীর অনুসরণের বরকতে সাহাবায়ে কিরাম হযরত সুলায়মান (আ) ও হযরত যুলকারনাইন (আ)-এর ন্যায় সামাজ্যের অধিকারী হয়েছেন। যার মাধ্যমে রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসন ভেঙ্গে পড়েছিল। তাদের সামরিক বাহিনী ও তাদের সমাজ ও সভ্যতাকে

সাহাবায়ে কিরাম পদদলিত করেছেন। কাজেই সাহাবায়ে কিরামের পথ গ্রহণ করলে উন্নতি হবে। ইমাম মালিক (র) বলেছেন ঃ

لايصلح اخر هذه الامة الابماصلح به اولها

"এই উম্মাতের শেষ যুগের ব্যক্তিদের সফলতা ও যোগ্যতা সেই বিষয়ের মাধ্যমেই আসবে, প্রথম যুগের ব্যক্তিরা যার দ্বারা সফলতা ও যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।"

ইসলামী শরী'আতের শাসন পরিচালনার জন্য এমন নীতিমালা চালু করেছিলেন যা পৃথিবীর মানুষ ইতিপূর্বে দেখেও নাই এবং শুনেও নাই। সেই নীতিমালায় অনুসরণে উন্নতি আসবে। অন্যদের অনুকরণে উন্নতি আসতে পারে না। ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনুকরণের মাঝে উন্নতি নেই। শুধু পোশাক অপমান ও হীনতা প্রতিহত করতে পারে না। উন্নতি ও উন্নয়ন নববী মডেলেই সম্ভব। যে মডেলের অনুকরণে খুলাফায়ে রাশেদীন, খুলাফায়ে বনূ উমাইয়া এবং খুলাফায়ে আব্বাসীয়ার যুগে উন্নতি হয়েছিল। সে যুগের উন্নতি কাফিরদের অনুকরণে হয়নি, বরং নববী অনুকরণের ভিত্তিতেই হয়েছিল।

আমাদের অধঃপতনের কারণ আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুকরণকে পরিহার করে অন্যদের অনুকরণ করা। কেউ মনে করে থাকে যে, ইসলামী পোশাক ইংরেজদের দৃষ্টিতে অবহেলার ও অবমূল্যায়নের বিষয়। এই ধারণা বিশেষ ক্ষেত্রে হতে পারে। বস্তুত মর্যাদার মূল্যায়নের মাপকাঠি নির্ভর করে যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের উপর, পোশাকের উপর নয়। লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় অনেক হিন্দু নেতা ইংরেজ পোশাক পরে যোগদান করেছিল কিন্তু গান্ধী গিয়েছিলেন লেংটি পরে। ইংরেজ সরকার লেংটি পরা ফকীর গান্ধীকে যতটুকু মর্যাদা দিয়েছিলেন ইংরেজদের পোশাক পরা নেতাদেরকে তা দেননি।

দিল্লীতেও বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও নেতাদের বৈঠকে যারা ইসলামী লেবাস পরে আসতেন তাদের মর্যাদা ও সম্মান কোর্ট-প্যান্টওয়ালাদের থেকে বেশি ছিল।

অনুধাবন করার চেষ্টা করুন, মুসলমানগণ যতই কাফিরদের সমাজ ও সভ্যতার রঙ্গে নিজেদেরকে রঙ্গীন করার প্রচেষ্টা করুক না কেন, ইয়াহূদী ও নাসারাগণ মুসলমানদের উপর খুশি হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানগণ ইসলামের অনুসারী থাকবে। এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلاَ النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ -

"হে রাসূল! ইয়াহূদী ও নাসারারা কখনো আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না যাবৎ আপনি তাদের মতবাদের অনুসরণ করুন।" (সূরা বাকারা ঃ ১২০)

অতএব, হে মুসলমানগণ! যদি উন্নতি প্রত্যাশা করেন, তাহলে সে পথই অনুসরণ করুন, যেপথে প্রাথমিক যুগে ইসলামের উন্নতি হয়েছিল। চারদিকে ইসলামের বিজয়

নিশান পৃথিবীতে উড়েছিল (বিজয় ডংকা বেজেছিল)। ইতিহাস এ বিষয়ে জ্বলন্ত সাক্ষী যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উন্নতি করেছিল, বর্তমানে আমেরিকা বৃটেন একত্রে মিলেও সে উন্নতি করতে পারেনি।

পাশ্চাত্যের সম্প্রদায়সমূহ জাহিলী আরবদের চেয়েও অধিক বর্বর ছিল। আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে চর্চা ও উন্নতি হয়েছিল, তা থেকে পাশ্চাত্যের লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। তারা নিজ ভাষায় এসব বিষয় অনুবাদ করেছে এবং এর মাধ্যমে তারা উন্নতি করে যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তা দুনিয়াবাসীর সামনে রয়েছে। আজকে ইসলামের অনুসারীদের জন্য জরুরী হচ্ছে এই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়কে মাতৃভাষায় অনুবাদ করা, যেন সাধারণ মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে পারে। তা হলে কলেজে গিয়ে ১৪ বছরব্যাপী বিদেশী ভাষা শিক্ষা করার জন্য ব্যয় করার প্রয়োজন হবে না। তেমনিভাবে কষ্টের উপার্জন থেকে ২০-২২ হাজার টাকা বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য নযরানা দেয়ারও প্রয়োজন হবে না।

ইংরেজি পোশাকের অর্থনৈতিক ফলাফল

আগেকার সময়ে নিজেদের জামা-কাপড় বাসা-বাড়িতেই সেলাই করা হত। বিশেষ করে নারীদের কাপড় ঘরেই হত। দর্জির নিকট মহিলাদের কাপড় সেলাই দূষণীয় ছিল। যখন ফ্যাশনের দরজা উন্মুক্ত হলো, তখন বাসা-বাড়ির সব কাপড়ই দর্জির দোকানে যেতে লাগল। ফলে আয় বাড়ল না, তবে ব্যয় বেড়ে গেল। এখন কর্জ কর অথবা অবৈধভাব উপার্জন কর। ইংরেজদের মত দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য ইংরেজদের মত অর্থ প্রয়োজন। সমস্যা হচ্ছে সব সময় মাথায় এই চিন্তা-চেতনাই থাকে যেভাবেই হোক ইংরেজদের মত জীবন যাপন করতে হবে।

ইসলামের বদনামকারীদের নিকট প্রশ্ন রাখতে চাই যে, তোমরা কিভাবে ইসলামী পোশাককে বাদ দিয়ে ইংরেজদের পোশাককে প্রাধান্য দিয়েছ? ইসলামী পোশাকে কি কোন শারীরিক ক্ষতি আছে? এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা হোক ইসলামী পোশাক ও ইংরেজি পোশাকের মধ্যে কোনটিতে ক্ষতির দিক আছে। অথবা যদি ইসলামী পোশাকে হীনতা ও অমর্যাদা প্রকাশ পায়, তাহলে ইসলামের দাবি করারই বা প্রয়োজন কি? কেননা পশ্চিমারা ত মুসলমান ও ইসলামকে তুচ্ছ ও হীন মনে করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ -

ইসলামের জন্য এই ধরনের মুসলমানের প্রয়োজন নেই যা গিরগিটের মত রং বদলায়। নতুন নতুন ফ্যাশনে আকৃষ্ট হয়ে প্রেমাসক্ত হয়। যারা স্বাধীন চিন্তা ও স্বকীয়তা

বিবর্জিত, যাদের নিজেদের প্রতি নির্ভরশীলতা নেই, নিজস্ব আদর্শ ও ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা নেই, তারা আর যাই করুক, তাদের পক্ষে কোন সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

সারকথা

যতদিন পর্যন্ত ইসলামের খলীফাগণ নিষ্ঠার সাথে শরী'আতের অনুসারী ছিলেন ততদিন তাঁরা সম্মানিত ছিলেন, শুধু তা-ই নয়, বরং বিরোধীদের দৃষ্টিতেও তাদের সম্মান-মর্যাদা ছিল। দুশমনের অন্তরে তাঁদের ভয় জাগ্রত ছিল। তাঁদের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের সাহায্য-সহায়তা বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ، وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সহায়তা করবেন এবং তোমাদের কদম মযবূত করে দিবেন।"

"আর তোমরা যদি সত্যিকার মু'মিন হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৭)

তারপর যখন ক্রমান্বয়ে শাসকদের মধ্যে ইসলামের অনুশাসন অনুশীলনের ঘাটতি হতে শুরু করল এবং ভোগ-বিলাসিতায় ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যাপক হলো, তখন ক্রমান্বয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের বুনিয়াদও কমজোর হতে শুরু করল, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমাও ছোট হতে শুরু করল।

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ -

"আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।" (সূরা রা'দ ঃ ১১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে তাঁর তত্ত্বাবধান ও মেহেরবানী থেকে বঞ্চিত করেন না, যতক্ষণ না সে নিজের আচরণ ও পথ-মত আল্লাহ তা'আলা থেকে পরিবর্তন করে।

অনুকরণের ক্ষতি সম্পর্কে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সতর্কতা

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের সময় যখন ইসলামের বিজয়ের সীমানা সম্প্রসারিত হল, পারস্য ও রোম সম্রাটের গদী উল্টে গেল, তখন হযরত উমর ফারূক (রা) চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনারবদের সাথে সংমিশ্রণের ফলে ইসলামী বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তার মধ্যে কোন পরিবর্তন এসে যায় কি-না। এজন্য তিনি মুসলমানদেরকে তাকীদ করেছেন যেন তারা অমুসলমানদের অনুকরণ থেকে বিরত থাকে। তাদের পোশাক বেশভূষা গ্রহণ না করে। পক্ষান্তরে অমুসলমানদেরকেও সতর্ক করেছেন যে, তারা যেন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ভিতরে থাকে। মুসলমানদের বেশভূষা গ্রহণ না

করে। মুসলমানদের মত তহবন্দ-পাগড়ী না পরে। তা হলে পরস্পরের সংমিশ্রণ ও শনাক্ত বিষয়ে সমস্যা হবে না, আর এভাবে অনুকরণ ও মিশে যাওয়ার প্রবণতার দরজা বন্ধ থাকবে।

মুসলমানদের প্রতি হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ফরমান

روى البخارى فى صحيحه عن عمر رضى الله عنه انه كتب الى المسلمين المقيمين ببلاد فارس اياكم وزى اهل الشرك

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি পারস্যের মুসলমানদেকে উদ্দেশ্য লেখা পত্রে উল্লেখ করেছেন, তোমরা মুশরিকদের পোশাক, বেশভূষার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে (তা অনুসরণ করবে না)। (ইক্তিযা....... গ্রন্থের পৃ. ৬০)

অন্য আরেকটি রিওয়ায়াতেও তিনি বলেছেন ঃ

أما بعد فاتزروا وارتدوا وا شعلوا وعليكم بلباس أبيكم اسماعيل واياكم والتنعم وزى العجم وتمعددوا واخشوشنوا واخلو لقوا الحديث

"হে মুসলমানগণ! লুঙ্গী (তহ্বন্দ) ও চাদরের ব্যবহার বজায় রাখ এবং জুতা পর। তোমাদের আদি পিতা হযরত ইসমাঈল (আ) এর পোশাক অবশ্যই ধারণ করবে (তহ্বন্দ-চাদর) ভোগ-বিলাসিতা ও অনারবদের পোশাক বেশভূষা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখ... মোটা ও পুরানো কাপড় পর, যা বিনয়ী লোকদের পোশাক।" (ফাতহুল বারী)

মুসনাদে আহমাদে আছে আবূ উসমান নাহ্দী বলেন ঃ আমরা যখন আযারবাইজানে ছিলাম তখন হযরত উমর ফারূক (রা)-এর পক্ষ হতে আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান উতবা ইবন ফারকাদ -এর বরাবরে একটি ফরমান পৌছল–

ياعتبة بن فرقد اياكم والتنعم وزى اهل الشرك ولبوس الحرير -

"হে উতবা ইবন ফারকাদ। তোমরা সকলে সতর্কতার সাথে ভোগ-বিলাসিতা ও কাফিরদের বেশভূষা পরিহার করবে এবং রেশমী পোশাক পরিধান করবে না।" (ইকতিযা সিরাতুল মুস্তাকীম, পৃ. ৬০)

কাফিরদের প্রতি হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নির্দেশ

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সেই ফরমান যা তিনি সিরিয়ার খ্রিস্টানদের জন্য প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিস্বরূপ পুরো সাম্রাজ্যে জারি করেছিলেন, যে ফরমানের শর্তানুযায়ী সিরিয়ার নাসারাগণ জান-মাল ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা লাভ করেছিল।

ان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا ان ارادوا الجلوس ولانتشبه بهم فى شئ من ملابسهم فى قلنسوة ولاعمامة ولانعلين ولافرق شعر ولانتكلم بكلامهم ولانكتنى بكناهم ولاتركب السروج ولانتقلد السيوف ولانتخذ شيئا مِنْ السلاح ولانحمله ولا ننقش خوايتمنا العربية ولانبيع الخمور وان نجز مقادم رؤسنا وان نلزم زينا حيث كنا ان نشد الزنانير على اوساطنا وان لانظهر الصليب على كنا لسنا وان لا نظهر صلبنا ولا كتبنا فى شئ من طرق المسلمين ولا اسواقهم ولانضرب بنوتيسنا فى كنائسنا الاضربا خفيفا ولانرفع اصواتنا مع صوتانا ولا نظهر النيران معهم فى شئ من طرق المسلمين -

"আমরা সিরিয়ার খ্রিস্টানগণ নিজেদের জীবন, অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীন উমর ফারূকের নিকট নিরাপত্তার প্রত্যাশা করি। আমরা নিজেদের পক্ষ হতে এসব বিষয়ের জন্য শর্ত হিসেবে নিজেদের জন্য করণীয় হিসেবে এসব ঘোষণা করছি যে, (১) আমরা মুসলমানদেরকে ইযযত-সম্মান করব। (২) মুসলমান যদি আমাদের মজলিসে বসতে চায় আমরা তাদের জন্য বসার সুযোগ করে দেব। (৩) আমরা কোন বিষয়ে মুসলমানদের অনুকরণ করব না। যেমন, পোশাক, টুপি, পাগড়ী, জুতা ও আকৃতির ক্ষেত্রে। (৪) আমাদের কথাবার্তার ধরনও মুসলমানদের মত হবে না। (৫) আমরা মুসলমানদের মত নাম-উপনাম রাখব না। (৬) ঘোড়ার উপর আরোহণ গদী (যিন) ব্যবহার করব না। (৭) আমরা তলোয়ার সাথে করে ঝুলায়ে রেখে চলব না। (৮) কোন অস্ত্র তৈরি করব না এবং অস্ত্রধারণ করব না। (৯) আমরা আমাদের মুদ্রায় আরবী চিত্র অংকন করব না। (১০) আমরা মদের কারবার করব না। (১১) মাথার সামনের অংশে চুল কেটে রাখব (লম্বা চুল রাখব না)। (১২) আমরা যেখানেই থাকি নিজ আকৃতিতে থাকব। (১৩) আমরা গলায় পৈতা লটকিয়ে রাখব। (১৪) আমাদের গীর্জায় ক্রস উঁচু করে রাখব না। (১৫) মুসলমানদের বাজারে ও পথে প্রকাশ্যভাবে আমাদের ধর্মের প্রচার করব না। (১৬) আমরা গীর্জার ঘণ্টা আস্তে বাজাব। (১৭) আমরা মৃতদের কফিন বহনের সময় জোরে শ্লোগান দেব না। (১৮) আমরা শবযাত্রার আগুন নিয়ে যাব না। এটি অগ্নি পূজকদের জন্য, যারা অগ্নিপূজা করত। এই রিওয়ায়াতটি নির্ভরযোগ্য ও উত্তম। (সিরাতুল মুস্তাকীম, পৃ. ৫৮)

আবদুর রহমান ইবন গানাম আশ'আরী বলেন, হযরত ফারূক আযম (রা) সিরিয়ার নাসারাদের সাথে যে সব শর্তে নিরাপত্তা চুক্তি করেছিলেন, আমি নিজে তা লিখেছি। (তাতে আরও কিছু শর্তাবলী নিম্নরূপ ছিল) ঃ

ان لانحدث فى مدينتنا ولافى ماحولها ديرا ولا كنيسة ولاصومعة راهب ولانجددماخرب منها ولانحى ماكان خططا للمسلمين

وان لانمنع. كنائسنا ان ينزلها احد من المسلمين فى ليل اونهاروان نوسع ابوابها للمارة وابن السبيل وان ننزل من رأينا من المسلمين ثلاثة ايام نطعمهم ولا نووى فى كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً ولانكتم غشا للمسلمين ولانعلم اولادنا القران ولانظهر شركًا ولا ندعوا اليه احداً ولا نمنع احدا من ذوى قرابتنا الدخول فى والاسلام ان ارادوا ـ

(১৯) আমরা আমাদের জনপদে নতুন কোন গীর্জা বানাব না। (২০) গীর্জা বিনষ্ট হয়ে গেলে তা নতুন করে সংস্কার করব না। (২১) মুসলমানদের ভূমি-সীমার মধ্যে আমরা আবাদ করব না। (২২) দিবারাত্রের যে কোন সময়ে হোক কোন মুসলমানকে গীর্জায় প্রবেশে বাধা দেব না। (২৩) আমরা পথিক ও পর্যটকদের জন্য গীর্জায় স্থান করে দেব। (২৪) তিন দিন পর্যন্ত মুসলমানদের মেহমানদারী করব। (২৫) আমাদের কোন গীর্জায় অথবা কোন ঘরে কোন গোয়েন্দাকে স্থান দেব না। (২৬) মুসলমানদের সাথে আমরা প্রতারণামূলকভাবে কোন কিছুকে গোপন করব না। (২৭) আমরা আমাদের শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দেব না। (২৮) আর শিরক প্রথাকে আমরা প্রকাশ্যে করব না। (২৯) এবং কাউকে আমরা শিরক কাজে আহ্বান জানাব না। (৩০) আমাদের কোন আত্মীয়কে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেব না।

আবদুর রহমান ইবন গানাম আশ'আরী বলেন ঃ আমি যখন এতটুকু লিখে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সামনে দেখার জন্য রাখলাম, তখন তিনি এই লিখার সাথে আরও সংযোজনের জন্য বললেন। ঃ

ولانضرب أحداً من المسلمين شرطنالكم ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه الامان فان نحن خالفنا فى شئ مما شرطناه لكم ووظننا على انفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم مايحل من اهل المعاندة والشقاق ـ

(৩১) আমরা কোন মুসলমানকে মারব না। অর্থাৎ আমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেব না। আমরা এইসব শর্তের বিনিময়ে আমাদের ধর্মের লোকদের জন্য নিরাপত্তা লাভ করেছি। তারপর আমরা যদি এ শর্তাবলীর মধ্যে কোন কিছু অমান্য করি, তাহলে আমাদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি বাতিল বলে গণ্য হবে। তখন মুসলমানগণ তাদের দুশমনের সাথে যে ব্যবহার করে, তা আমাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।[১] (সূরা তাওবার তাফসীর)

একটি বিভ্রান্তির জবাব

বিভ্রান্তি হচ্ছে ঃ যদি কোন ব্যক্তি মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইংরেজি পোশাক অথবা হিন্দুয়ানী পোশাকে ডুবে থাকে, তা হলে তার জন্য তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসে (আকীদায়) কোন পার্থক্য হবে কি-না? অথবা এই পোশাক পরিধান করে সে কি কাফির হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ আপনি যদি কিছু সময়ের জন্য পুরুষের পোশাক পরিত্যাগ করে দিনে ঘরে গিয়ে বেগম সাহেবের সেলোয়ার-কামিস, লাল রেশমী ও জরীর জামা বানারসি দোপাট্টা হাতে চুড়ি পায়ে খাড়ু এবং মালা পরিধান করুন। এবার বের হয়ে অফিসে গিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসুন। এবার কি আপনি বেগম সাহেবা হয়ে গেলেন ? আর অভ্যন্তরীণভাবে আপনার পুরুষত্বের মধ্যে কি কোন পরিবর্তন আসবে? অফিসে আপনার চেয়ারে বসতে কি আপনি বিব্রতবোধ করবেন ? অনুমান করা যায়, বিধি-বিধান হিসেবে আপনি বিব্রতবোধ করবেন। যেখানে আপনি মনে করছেন বাহ্যিক অনুকরণে তেমন কিছু আসে যায় না আর যখন ইংরেজী পোশাকে মুসলমান কাফির হয় না, তখন আপনি কি বেগম সাহেবার পোশাক পরে বেগম সাহেবা হয়ে যাবেন ? শুধু মেয়েলি পোশাক ব্যবহার করে তার পুরুষত্বের মধ্যে কি পরিবর্তন হতে পারে? এভাবে বলা যায়, কেউ যদি হিজড়ার কাপড় পরিধান করে, তাহলে কি সে প্রকৃতপক্ষে হিজড়া হয়ে যাবে? স্ত্রীলোকের পোশাক পরে তাৎক্ষণিকভাবে কোন পুরুষ মহিলা হয়ে যাবে না। তবে আল্লাহ না করুন! কিছুদিন হিজড়া ও মেয়েলি পোশাক পরিধান করার পর দেখা যাবে আমল ও আখ্‌লাকে কিছুটা মেয়েলি হিজড়াভাব এসে যাবে। কথাবার্তা ও চালচলন ধরন মেয়েলি ও হিজড়া মার্কা হয়ে যাবে। কেননা বাইরের প্রভাব অভ্যন্তরে পড়বে। সকল বুদ্ধিমান একমত যে, যেভাবে ভিতরের প্রভাব বাহিরের পড়ে তেমনিভাবে বাহিরের প্রভাবও ভিতরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ভাল কাজে অন্তর আলোকিত হয় এবং মন্দ কাজে হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এখন চিন্তা করে দেখুন, যদিও ইংরেজি ও হিন্দুয়ানী পোশাকে তাৎক্ষণিভাবে আকীদার ক্ষতি না হলেও একথার নিশ্চয়তা কোথায় যে, আগামীকাল অভ্যন্তরীণ

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২ খ, পৃ. ৩৪৭।

আকীদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে না। মনে রাখবেন, যতদিন আমাদের আকীদা ভিতর থেকে নিরাপদ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের ইংরেজি ও হিন্দুয়ানী পোশাকের দ্বারা নাসারা ও মুশরিকদের অনুসরণের অপরাধ হবে। এ বিষয়ে মহানবী (সা)-এর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

আল্লাহ না করুন! আল্লাহ না করুন!

যেদিন আপনাদের প্রকাশ্য আবরণ অভ্যন্তরে পৌঁছবে এবং ইসলামী বিশ্বাসেও ক্ষতিও কমতি এসে যাবে, তখন বুঝবেন যে, আপনারা শুধু নাসারা ও মুশরিকদের অনুকরণকারী নন্, বরং নাসারা ও মুশরিক হয়ে গেছেন। তাদের জন্য যা হুকুম, এদের জন্যও তাই হবে। যদিও মুখে ইসলামের দাবী করে। এ ধরনের ইসলামকে লৌকিক ইসলাম বলা হয়, শারঈ ইসলাম বলা যায় না। শারঈ ইসলাম ত হচ্ছে শরী'আতের বিধানের ভিত্তিতে যা হবে।

আইন অনুযায়ী পাকিস্তানী বলা হয় তাকে, যে পাকিস্তানের সরকারের আইন মান্য করে। যে সরকারের দুশমনের উর্দি ব্যবহার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। যে ব্যক্তি পাকিস্তানের আইনের ও শাসনের সমালোচনা করে এবং ভারতের উর্দি পরিধান করে বাজারে ঘুরাফেরা করে, যদিও সে জাতীয়তায় পাকিস্তানী কিন্তু সরকারি আইন অনুযায়ী সে সরকারের শত্রুদের মধ্যে শামিল হবে।

আমাদের উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের জবাব পাওয়া গেছে যে, কেউ যদি বলে মেয়েলি পোশাক পরিধান করলে এর খারাপ দিক হচ্ছে ঃ পুরুষ ও মহিলা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী (অতএব এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর রূপ ধারণ করা দূষণীয়)। উত্তর হচ্ছে ঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে মু'মিন ও কাফির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, তারা পরস্পরের অনুকরণ করার সুযোগ নেই। যেমন সরকারের দৃষ্টিতে অনুগত নাগরিক ও বিদ্রোহী আলাদা শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃত এবং তাদের বিধানও ভিন্ন ভিন্ন। যদিও তারা একই পিতার সন্তান হোক বা একই পরিবারের দুই ব্যক্তি হোক। একইভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে মু'মিন ও কাফির আলাদা শ্রেণী, তাদের প্রত্যেকের বিধি-বিধানও আলাদা। هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ এভাবে সব সভ্য সরকারের আইন হচ্ছে সরকারের দুশমন ও বিদ্রোহীকে মন্ত্রীর পদ দেয়া হয় না। একইভাবে ইসলামের কথা হলো, ইসলামের দুশমনকে ইসলামী সরকারের আমীর বা উযীর বানানো যেতে পারে না।

اندکے پیش توگفتم غم دل ترسیدم
که دل ازروه شوی ورنه سخن بسیار است -

"আপনার সকাশে সামান্য ত্রুটির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অন্তঃকরণে জড়সড় হয়ে পড়েছি; বিষণ্ন হৃদয়ে কালাতিপাত করছি; নতুবা আরও অনেক কিছু বলার ছিল।"

ইসলামী পোশাকের পরিচিতি

قَالَ تعالى : وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ -

"তাক্ওয়ার পোশাক, এটাই উত্তম" (সূরা আ'রাফ)

"এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, হয়ত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২১)

কোন কাজকে ইসলামী বলার জন্য দু'টি শর্ত জরুরী। এক, রাসূলুল্লাহ (সা) যে কাজ করেছেন। দ্বিতীয় হলো রাসূলুল্লাহ (সা) যার অনুমতি দিয়েছেন এবং নিষেধ করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) যে বিষয়ে নিষেধ করেছেন তা ইসলামী হবে না। আর যে বিষয়ে তিনি অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি করেছেন, তাকে ইসলামী বলা হয়। যেমন ঃ যবের রুটি খাওয়া তাঁর বাস্তব সুন্নাত। এর উপর আমল করা উত্তম। আর ময়দার রুটি, বিরিয়ানী, মোরগের সুপ জায়েয। কেননা মজাদার ও ভাল কিছুর জন্য শরী'আতে অনুমতি আছে। কুকুর, শূকর, মদ খাওয়া ইসলামে হারাম। কেননা শরী'আতে এসবের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এরূপ পোশাকের ব্যাপারেও অনুমান করুন। যে পোশাক রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে ব্যবহার করেছেন যেমন কোর্তা, লুঙ্গী, চাদর, জুব্বা এবং পাগড়ী ইসলামী পোশাক। আর যেসব পোশাক মহানবী (সা) নিজে ব্যবহার করেননি যেমন ঃ পায়জামা, সেমিজ, শাহী জুতা, শেরওয়ানী, সদরিয়া (কোর্ট)। তবে এসব পোশাকের বিষয়ে তাঁর শরী'আতে অনুমতি পাওয়া যায়, নিষেধ নেই। অন্যদিকে রেশমি পোশাক, উজ্জ্বল লাল রং এবং টাখনুর নিচে কাপড় পরার নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। এজন্য রেশমি ও জাফরানী পোশাক ইসলামে নিষিদ্ধ হিসেবে বলা যায়।

পবিত্র কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে আল্লাহর দুশমন কাফিরদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা প্রমাণিত। এজন্য কাফিরদের মত পোশাক পরিধান করা দেখে দর্শকদের ভুল হয় এই ব্যক্তি ইয়াহূদী, নাসারা না-কি অগ্নিপূজক বা হিন্দু। এ ধরনের পোশাক নিঃসন্দেহে ইসলামী পোশাক নয়। গান্ধীর ধূতি, ইংরেজদের টাই-কোর্ট ও গাউন ফ্যাশন সব কিছুর ক্ষেত্রে বিধি প্রযোজ্য। এখানে তথাকথিত প্রগতিশীলদের অভিযোগ লক্ষণীয়, তারা উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকে যে, যদি কোর্ট-প্যান্ট অইসলামী পোশাক হয়, তাহলেও আলিমদের লম্বা জামা, শেরওয়ানী, সেমিজ, শাহী জুতাও (পাম্পসু) অইসলামী পোশাক হবে। কেননা মহানবী (সা)-এবং সাহাবায়ে কিরাম এ ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন এর কোন প্রমাণ ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থে নেই।

উত্তর ঃ যেসব কিছুর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কথা ও কাজের মাধ্যমে অনুমতি দিয়েছেন, তাকে শারঈ ও ইসলামী বলা যাবে। আর যেসব কাজ তিনি নিষেধ করেছেন, তাকে অইসলামী ও শরী'আত বিরোধী বলা হয়। যদিও মহানবী (সা)-এ ধরনের কোর্তা, শেরওয়ানী, জুতা পরিধান করেননি এবং এ ধরনের খাবার পোলাও, জর্দা, কোফ্‌তা, শামি কাবাব গ্রহণ করেননি, তবে মজাদার ভাল কিছু গ্রহণ করার অনুমতি তিনি দিয়েছেন। কিন্তু শর্ত হল তা শরী'আতের সীমার মধ্যে হতে হবে। এই ধরনের ভাল মজাদার ও বিলাসিতার উপকরণ খিলাফত রাশেদার যুগে প্রচলন হয়েছে। যতটুকু আরাম ও ভোগের সামগ্রী শরী'আতের সীমার মধ্যে ছিল, তার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম আপত্তি করেননি। তবে কিছু মর্যাদাবান ব্যক্তি ভোগ-বিলাসিতাকে পরিহার করে চলতেন। পাতলা কাপড় ব্যবহার এবং স্বর্ণ ও রূপার মুদ্রা সঞ্চয় করতে তাঁরা নিষেধ করতেন।

موسیا اداب دانا دیگرند
سوخته جانان روانان دیگرند

"বিজ্ঞানদের রুচি বা ত্যাগ তিতিক্ষার প্রকৃতি এক রকম; পার্থিব জগতের প্রতি একেবারে নিরাসক্তদের রুচি অন্যরকম (বাস্তবে উভয়েই বৈধ ও কল্যাণসীমার ভেতরেই থাকেন)।"

সারকথা

যে সব পোশাক, খাদ্য-পানীয়, বেশভূষা ও সামাজিকতা শরী'আতের সীমারেখার মধ্যে হবে, তা ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে যেসব পোশাক, খাদ্য-পানীয়, বেশভূষা ইসলামী শরী'আতের আওতার বাইরে হবে, তা অনইসলামী বলা হবে।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ـ

"এটাই আল্লাহর সীমারেখা, যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করল, নিশ্চিত সে নিজের উপর অবিচার করল।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

এখানে অধম লেখক সীরাতুল মুস্তাফার তৃতীয় খণ্ডের এ পর্ব শেষ করছি।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

দালাইলে নবুওয়াত ও রিসালাতের দীললসমূহ অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর মু'জিযাসমূহ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বান্দাদের হিদায়েতের জন্য মানুষের মধ্যে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যাতে পবিত্র মহান ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে তাঁর বিধানাবলী বান্দাদের নিকট পৌঁছে। اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর ভুলে যাওয়া ওয়াদাকে স্মরণ করে দেয়ার জন্য এবং নিজের প্রমাণ নিদর্শনকে পূর্ণাঙ্গ করার নিমিত্তে যে কথা আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

"যেন হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াত ও তাবলীগের পর কোন জীবের আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোন ওযর আপত্তি করার অবকাশ না থাকে।" (সূরা নিসা ঃ ১৬৫)

নবী-রাসূলগণ যেহেতু মানুষই হয়ে থাকেন এজন্য তাঁদের প্রকাশ্য রূপ ত অন্য মানুষে থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এজন্যই আল্লাহর তা'আলা তাঁদেরকে মু'জিযা দান করেছেন, যা তাঁদের সত্য ও হক হবার পক্ষে দলীল-প্রমাণ স্বরূপ সাব্যস্ত হয়। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন ঃ

فَذٰلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ -

"এই লাঠি এবং সাদা হাত তোমার মহাপ্রভুর পক্ষ হতে মু'জিযা ও তোমার নবুওয়াতের নিদর্শন এবং প্রমাণ।" (সূরা কাসাস ঃ ৩২)

প্রত্যেক দাওয়াতের জন্যই প্রমাণ প্রয়োজন আর দলীল হতে হবে দাওয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যিনি নবী হিসেবে ঘোষণা দিবেন তাঁর বক্তব্য হবে আমি মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত, তাঁর দূত বা প্রতিনিধি, তাঁর বিধান এবং হিদায়াত নিয়ে আমি এসেছি। একথা সত্যায়িত করার জন্য গায়েবী পদ্ধতিতে এমন ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ জরুরী, যা কোন জীব বা সৃষ্টির পক্ষে করা অসম্ভব। যখন মানুষ নবী কর্তৃক এমন বিষয় সংঘটিত হতে দেখবে যা স্বাভাবিকভাবে কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়, তখন তারা এটিকে মহান আল্লাহ তা'আলার অলৌকিক কীর্তি ও ক্ষমতার প্রকাশ বলে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে আল্লাহ পাকের দূত হিসেবে বিশ্বাস করবে।

মানুষ ধারণা করবে যে, এই কাজ রাসূলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁর ইচ্ছায় তা হয়না কোন কৌশলী প্রযুক্তি দ্বারাও তা সম্ভব নয়, বরং তা মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় প্রকাশ পেয়েছে। কেননা এ ধরনের কৃতিত্ব দেখানো মানুষের ক্ষমতা, তদবীর এবং প্রযুক্তির বাইরে। এতে বুঝা গেল যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত। তাঁর অনুসরণে বান্দা আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। তাঁর দামন বা আঁচল ধরে

মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা হাসিল করতে পারবে। হিংসাও সংকীর্ণতামুক্ত হৃদয় মু'জিযা দেখে নবীকে সত্যায়িত করতে দ্বিধা করবে না। হৃদয় তাকে নবীর প্রতি বিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করে। তার হৃদয়ে নবীকে মিথ্যা ও অস্বীকার করার সুযোগ থাকে না। রিসালাতের দাওয়াত এক গুরুত্বপূর্ণ মহান বিষয়। অতএব একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রমাণও সে ধরনের বিশাল ও মহান হতে হয়। এজন্য মু'জিযা, যা আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও দোর্দণ্ড প্রতাপের নমুনা হিসেবে হয়ে থাকে, সকল নবীর হাতেই মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। নবীদের ব্যক্তিত্ব ও বিজয়ের সামনে কারও পদযুগল চলে না। প্রবৃত্তির স্বাধীনতার পতাকা হাত থেকে খসে পড়ে। যৌক্তিক প্রমাণাদির পরেও দুশমনের ঝগড়া ও বিতর্কের পথ পুরোপুরি বন্ধ হয় না। কিন্তু মু'জিযা ও স্পষ্ট আয়াত প্রত্যক্ষ করার পরে শুধু পঙ্কিলত সংকীর্ণতা ও দুর্ভাগ্য ব্যতীত কুফর ও অস্বীকার করার কোন যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। মু'জিযা সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ) আর সর্বশেষ নবী অর্থাৎ খাতমুন্নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা), যাঁর দ্বারা নবুওয়্যাতের পরিসমাপ্তি হয়েছে, তাঁর নবুওয়াতে দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে, চারিত্রিক সুকুমার বৃত্তি পরিপূর্ণ হয়েছে। যখন এ লক্ষ্য অর্জিত হলো দ্বীন ও নৈতিক চরিত্র পরিপূর্ণতা লাভ করল, তখন তাঁর পরে আর কোন নবীর প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রইল না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুলাফায়ে কিরাম এবং দ্বীনের উলামায়ে কিরাম ইসলামের সক্রিয় সহযোগী ও রক্ষণাবেক্ষণকারীর দায়িত্বে রয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের ভূমিকা ইসলামের তত্ত্বাবধান ও প্রচারের জন্য যথেষ্ট। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।"

খাতিমুল আম্বিয়া নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর যে কেউ নবুওয়াতের দাবি করলে তা ভণ্ডামি ও আকার্যকর হবে। প্রকৃতপক্ষে নবীয়ে উম্মি (সা) (তাঁর জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক) কোন মু'জিযা ও নিদর্শনের প্রয়োজন নেই। তাঁর চেহারা-আকৃতি প্রকৃতি, চরিত্র, চালচলন, কথাবার্তা, কার্যাবলী সব কিছুই ছিল তাঁর মু'জিযা। তিনি ছিলেন সততার নিদর্শন। লোকেরা তাঁর চেহারা দেখেই বলে দিত যে, এই চেহারা কোন মিথ্যুকের হতে পারে না।

دردل هرامتی کزحق مزه است * روے واوازپمیر معجزاست

مرد حقانی کی پیشانی کانور * کب چهتا رهتاهے پیش ذی شعور

"উম্মত হবার যোগ্য প্রতিটি এমন মানুষ যার মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত সত্য গ্রহণ করার যোগ্যতা রয়েছে, প্রিয় নবীর চেহারা দর্শন, বাক্য শ্রবণই তার ক্ষেত্রে মু'জিয়ার অনুরূপ কাজ করবে।" অর্থাৎ তাদের ঈমানের সৌভাগ্য হবে।"

ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র চরিত্র, সুন্দর কর্ম, অবস্থাবলী, কার্যাবলী, স্বভাব-প্রকৃতি, তাঁর শৃংখলা, ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক কৌশল, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, এসব কিছুর প্রতি যদি দৃষ্টি নিবন্ধ করা যায়, তা হলে দেখা যাবে তিনি কিভাবে সফলতার সাথে বিচিত্র স্বভাব, বিপরীতধর্মী প্রকৃতিকে আল্লাহর বিধানের আওতায় এনে সুবিন্যস্ত করেছেন। শুধু তা-ই নয়। মহানবী (সা) আল্লাহর সৃষ্টিকে (বিশেষ করে মানুষকে) যে শরী'আতের বিধান প্রদান করেছেন তার বাস্তবতা ও সূক্ষ্মতা, শিক্ষা, দৃষ্টিকোণ, গভীরতা, নিপুণতার বাস্তবায়ন ও দৃষ্টান্ত সম্পর্কে উম্মাতের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম, আইন বিশারদ ও গবেষকগণ গোটা যিন্দেগীব্যাপী অধ্যয়ন ও গবেষণা করে দিশেহারা এবং অবাক হয়েছেন। এসব বিষয়ে যদি গভীর পর্যবেক্ষণ করা হয়, তবে সুস্থ বিবেকে এ বিষয়ে সামান্য সংশয় থাকবে না যে, এসব বিষয়ের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া গায়েবী সহায়তা ব্যতীত শুধু কোন মানবীয় শক্তি বা কোন কৌশল ও প্রচেষ্টা দ্বারা সম্ভব ছিল না। এ ধরনের নৈতিক মর্যাদা এবং পূর্ণাঙ্গ শরী'আতের উপস্থাপন কোন মিথ্যা ও ধোঁকাবাজ মানুষের পক্ষে কল্পনাও করা যায় না। সকলের জানা আছে, মহানবী (সা) নিরক্ষর ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষামুক্ত ছিলেন। তিনি কারো কাছ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা করেননি তিনি কোন গ্রন্থও অধ্যয়ন করেননি। তিনি শিক্ষা অর্জনের জন্য সফরও করেননি, এবং সব সময় তিনি অশিক্ষিত আরবদের মাঝেই ছিলেন। তিনি ইয়াতীম ও দরিদ্র ছিলেন। এ অবস্থায় লেখাপড়া ব্যতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা তাঁর যবানে জারি হয়ে যাওয়া এবং এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা তাঁর কণ্ঠে ব্যাখ্যা হওয়া, এর উদাহরণ প্রাচীন ও আধুনিক কারো মধ্যেই নেই। মহাপ্রভূর অহী ব্যতীত তা অর্জন করা কোন অবস্থায়ই সম্ভব নয়। শুধু মানুষের নিজস্ব সামর্থ্য এবং অধ্যবসায় এসব বিষয় অর্জন করতে অক্ষম ও অসমর্থ।

এজন্যই এসবের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, তিনি ছিলেন অতুলনীয় ও অনন্য নৈতিক চরিত্র ও সৎ প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব। যা এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি ছিলেন মহান রাব্বুল আলামীনের প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তা'আলা যার উপর গযব নাযিল করেন তাকে বদ আখ্‌লাক ও বদ আমল বানিয়ে দেন। আরব ও অনারবে সহায়-সম্বলহীন তাঁর খাদিমগণ যেভাবে সাফল্য ও বিজয় অর্জন করেছেন এটাও প্রমাণ পেশ করে যে, রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ ও সাহায্য-সহযোগিতা মহানবী (সা)-এর সাথে ছিল।

ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ এসব প্রকাশ্য বিষয় সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপরেও আমরা প্রকাশ্য বিষয়ে ছাড়াও আরও কিছু সূক্ষ্ম নিদর্শন অর্থাৎ কিছু মু'জিযা উল্লেখ করতে চাই। তাহলে একজন নগণ্য বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের মধ্যও তার সত্যতা সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। তারপর ইমাম গাযালী (র) সংক্ষিপ্তভাবে নবী করীম (সা)-এর কিছু সংখ্যাক মু'জিযার ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।[১]

১. ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন, ২ খ, পৃ. ৩৪২.

মু'জিযার সংখ্যা

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযার সংখ্যা এক হাজারে পৌঁছেছিল। ইমাম নববী (র) বলেন ঃ এক হাজার দু'শত ছিল। কতিপয় আলিম তাঁর মু'জিযা তিন হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের ইমামগণ মহানবী (সা)-এর মু'জিযার উপর আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন ঃ ইমাম বায়হাকী, দালাইলু ন্নবুওয়াত এবং ইমাম আবূ নঈম-এর গ্রন্থ।[১] আল্লামা জালালউদ্দীন সূয়ুতী (র) 'খাসায়েসুল কুবরা' নামে মু'জিযার উপর আলাদা একটি কিতাব লিখেছেন, তাতে তিনি একহাজার মু'জিযার কথা উল্লেখ করেছেন।

সত্য কথা হচ্ছে, হযরত নবী (সা)-এর মু'জিযার সংখ্যা অসংখ্য অগণিত। কেননা তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ, প্রতিটি অবস্থা ছিল কল্যাণকর ও অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং শিক্ষায় ভরপুর। এ কারণে তা হতো স্বভাব-প্রকৃতির জন্য ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাও যা ছিল তাঁর মু'জিযা। খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ প্রাচীনকালের ৬৭টি মু'জিযা লিখেছেন। তারা হযরত মাসীহ্ (আ) আসমানে যাওয়া পর্যন্ত ২৭টি মু'জিযা হিসাব করেছেন। তারপর তাঁর হাওয়ারীদের মধ্যে ২০টি মু'জিযা গণনা করা হয়। তবে তাদের কাছে এসব মু'জিযা বর্ণনার কোন নির্ভরযোগ্য—পরম্পরা সূত্র নেই। তেমনিভাবে নেই বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা ও মান সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য বা প্রমাণ। পক্ষান্তরে হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিযার বিবরণ নির্ভরযোগ্য সরাসরি যুক্তপরম্পরা অনুযায়ী সংখ্যার দিকে থেকে হাজারের অধিক মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে শত শত বর্ণনা পরম্পরাযুক্ত ও প্রসিদ্ধ। সমস্ত নবী (আ)-এর তুলনায় তাঁর মু'জিযা ও মান ভিন্নতর মাত্রার এবং আধিক্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা দখল করে আছে।

মু'জিযার শ্রেণী বিভাগ

মহানবী (সা)-এর নবুওয়াত ও রিসালাত যেহেতু ছিল সমস্ত পৃথিবীর জন্য, এজন্য কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন চাহিদা পূরণে সক্ষম মু'জিযা ও নিদর্শন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন। যার মাধ্যমে পৃথিবীর সব কিছু নবুওয়াতের দলীল ও প্রমাণ স্বরূপ হবে। জগতের কোন শ্রেণী তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান থেকে বাহিরে থাকবে না। আর এ কারণেই মু'জিযা নবুওয়াতের দলীল ও প্রমাণ স্বরূপ হয়ে থাকে। যখন তাঁর মু'জিযা জগতের সব শ্রেণী থেকে হয়ে থাকে, তখন জগতের সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীই তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষী হবে।

এসব মু'জিযার মাধ্যমে তাঁর মান ও মর্যাদা আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলদের উপর দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর একক মু'জিযা সকল নবী (সা)-এর মু'জিযা থেকে অধিক। তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেসব মু'জিযা দান করেছেন তা দু' শ্রেণীর।

এক, বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা, আরেকটি হলো—অনুভূতিভিত্তিক মু'জিযা। বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা হচ্ছে যা বুঝতে আকলের বা বুদ্ধির দরকার হয়। এ ধরনের মু'জিযা বুঝার জন্য দার্শনিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মানুষের প্রয়োজন। অনুভূতিভিত্তিক মু'জিযা স্বভাব-প্রকৃতি বিরোধী বিষয়াবলী। এগুলো অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। এ ধরনের মু'জিযা চাহিদা প্রত্যাশী লোকেরা সাধারণত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্বোধ ও মেধাহীন হয়ে থাকে বুদ্ধির নিরীখে কিছু বুঝা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা ঃ হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর আকৃতি ও জীবন-চরিত্র এবং তাঁর অনন্য চারিত্রিক মাধুর্য, সন্দুর অনুপম কর্মসমূহ, তাঁর বাস্তব কর্মের পূর্ণতা ও জ্ঞানের পূর্ণতার মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল ছিল। যারা তাঁর আকৃতি ও জীবন-চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁদের নিকট ভালভাবে এ কথায় বিশ্বাস জন্মে যেত যে, তিনি এমন পবিত্র ও বরকতময় ব্যক্তি যাঁর চরিত্রে ও কার্যাবলীতে জ্ঞানের পূর্ণতা ও কর্মের কামলিয়াত সমবেত। এ ধরনের নমুনা না কেউ কোন দিন দেখেছে, না শুনেছে। অতএব তিনি অবশ্যই মহান প্রভুর প্রিয় ব্যক্তিত্ব হবেন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা জগতে অনন্য বৈশিষ্ট্যের এক অনুপম ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়ে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। এই ধরনের পূর্ণতা কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়।

انتخاب دفتر تکوین عالم ذات او
برتراز ابات جمله انبیاء ایات او-

"জগত সৃষ্টির আদিতেই তাঁর (নবীর) সত্তাকে এমন অসাধারণ সৃষ্টিরূপে নির্বাচিত করে রাখা হয়েছিল যে, তামাম নবী-রাসূলদের সমূহ নিদর্শন-মু'জিযার চেয়েও শ্রেষ্ঠতম তাঁর নিদর্শনসমূহ।"

مشرق صبح وجود ما سوامشکواۃ او
مستنیراز طلعت ادھر قریب وھر بعید

"ভোরের দিগন্তে উজ্জ্বল আলো, অপরাপর সবকিছুই তাঁর আলোকচ্ছটার কাছে ঋণী; তাঁর উদয়ের আলোর দ্বারা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই আলোকিত।"

(মাওলানা সাইয়্যেদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র)

দ্বিতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

হক তা'আলা হযরত নবী (সা)-কে পূর্ণাঙ্গ এবং অসম্ভব সৃষ্টি গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআনুল কারীম দান করেছেন। পবিত্র কুরআন হলো নবুওয়াতের স্থায়ী মু'জিযা। কুরআনে

হাকীমে রয়েছে তাত্ত্বিক বিভাগ, প্রায়োগিক বিজ্ঞান, নৈতিক বিজ্ঞান এবং লোকাল কৌশল, রাষ্ট্রীয় নীতিমালা (রাজনীতি), বাহ্যিক পবিত্রতা, লুকানো পবিত্রতাসহ সব কিছুর বিদ্যা, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ও কেন্দ্রবিন্দু।

উল্লেখযোগ্য যে, এ ধরনের অসম্ভব ও অনন্য গ্রন্থ একজন নিরক্ষর ব্যক্তির ভাষায় ব্যক্ত হওয়া, যিনি কোনদিন কোন শিক্ষক বা কোন মক্তব অথবা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, কোন আলিম ও বিজ্ঞানীর সোহবতেও ছিলেন না, বিদ্যালয়ের দরজায়ও যাননি। তাই এই কুরআন রাব্বানী অহী ও আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা, রহমানী ইলহাম এবং গায়েবী আসমানী নির্দেশনা ব্যতীত আর কি হতে পারে। কুরআনুল কারীম হচ্ছে মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা। কুরআনের দিকে যাওয়া পরম্পরা সূত্রের কোন বিচ্ছিন্নতা ও বিরতি নেই, বরং এমন ব্যাপক পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত যার নযীর পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে নেই। কুরআন এমন নির্ভুল জ্ঞানের গ্রন্থ এবং নিশ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। বড় জ্ঞানী বুদ্ধিজীবীরা প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম যে, কুরআনের জ্ঞান, বিজ্ঞান অবিকৃত রূপ, ভাষার প্রাঞ্জলতা, বর্ণনার সাবলীলতা, নিখুঁত অভিজ্ঞতায় ভরপুর এমন দ্বিতীয় আরেকটি গ্রন্থ পৃথিবীতে আর আছে কি-না। এক্ষেত্রে কুরআন ভবিষ্যতেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ হিসেবে থাকবে ইনশা'আল্লাহ্। কেউ-এর মুকাবিলা করতে পারবে না। এরপর আমরা আর কি বলতে পারি যা কুরআন আজ থেকে চৌদ্দশত বছর থেকে ঘোষণা করে আসছে ঃ "যার সাহস হয় সে আমার জবাব লিখে দিবে।" কিন্তু আজ পর্যন্ত কারো সামর্থ্য হয়নি কুরআনের একটি ছোট সূরার মত রচনা পেশ করা। মহানবী (সা)-এর যমানা থেকে শুরু করে সব যুগেই আরবী সাহিত্যের বড় বড় পণ্ডিত ভাষাবিদ যারা দ্বীনের বিরোধী ছিল, তারা কেউই-এর জবাব দিতে পারেনি।

মাওলানা সাইয়্যেদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) তাঁর রচিত না'তে বলেন ঃ

خاص كردش حق باعجاز كتاب مستطاب

حجت وفرقان ومعجز محكم وفصل خطاب -

"মহান আল্লাহ্ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক গ্রন্থ দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানীত করেছেন যা কিনা প্রমাণ্য, পার্থক্যকারী, অলৌকিক, মজবুত ও অখণ্ডণীয়।"

نجم بخمش دربراعت مست بررز آفتاب

حرف حرف اوشفاهست هدى بهر رشيد -

"যে গ্রন্থখানা নক্ষত্ররাজির মতো অসংখ্য কল্যাণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার, এমনকি তা সূর্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ; যার প্রতিটি বর্ণে বর্ণে রয়েছে মুক্তি এবং হিদায়েত প্রার্থীর জন্যে রয়েছে পথ-নির্দেশ।"

কুরআনুল করীমে দাওয়াত এবং প্রমাণ দু'টিই রয়েছে

হাফেয ফযলুল্লাহ তুরবশতী (র) তাঁর আকীদা পুস্তক المعتمد فى المعتقد ।[১] গ্রন্থে বলেন ঃ হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হকের দাওয়াতের জন্য আর্দিষ্ট হন তখন তাঁদের দাওয়াতের পক্ষে দলীল ও প্রমাণ হিসেবে মু'জিযা প্রাপ্ত হন। বস্তুত তাঁদের দাওয়াত ও প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকত কিন্তু আমাদের নবী (সা)-কে শুধু এক্ষেত্রে কুরআন মজীদই দেয়া হয়েছে। যেখানে দাওয়াত ও প্রমাণ দু'টোই একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। কুরআনুল করীমের অর্থ বক্তব্যের দিক থেকে দাওয়াত আর শব্দ, বাক্য ও উপস্থাপনার অভিনব পদ্ধতির দিক থেকে দাওয়াতের নিদর্শন। কুরআনের নিদর্শন তার মূল উপাদান যার অভ্যন্তরে দাওয়াতও রয়েছে। কুরআনুল কারীমের মর্যাদার এটি একটি আন্তরিক দিক যে, কুরআনে দাওয়াত ও নিদর্শন দু'টিই সমবেত এবং কিয়ামত পর্যন্ত এদু'টি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য এটুকুই।

তৃতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

হাফেয তুরবশ্তী (র) বলেন ঃ মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনের অবস্থাও তাঁর নবুওয়াতের দলীল। তাঁর জীবনের অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ছিলেন ইয়াতীম। তাঁর নিকট এমন কোন ক্ষমতা ছিল না যা দিয়ে তিনি মানুষকে অনুগত করতে পারতেন। তিনিই এতটা সম্পদশালীও ছিলেন না যার কারণে কুরাইশগণকে লোভ-লালসায় সেদিকে আকৃষ্ট করতেন। তিনি কোন রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধানও ছিলেন না উত্তরাধিকারীও ছিলেন না যার কারণে লোকেরা প্রাপ্তির আশায় তাঁর আনুগত্য করবে। বরং তিনি ছিলেন সহায়-সম্বল বন্ধুবিহীন। তাঁর দাওয়াতে কেউ একত্রিত হতো না। এমন কি এ বিষয়ে তাঁর নিকটাত্মীয়রাও তাঁর বিরোধী ও দুশমন ছিল। তিনি তাওহীদের আহ্বানকারীরূপে এসেছেন। তখন আরব বদ্বীপের সকলে শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। সন্ত্রাস, ব্যভিচার, খুনাখুনি ইত্যাদি সে জাতির স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। যখন নবী (সা)-এর দাওয়াত বিজয়ী হলো, তখন তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁরা সকলে একই অন্তর, একই কণ্ঠ এবং এক প্রাণ হয়ে দ্বীনে হকের উপর একমত হয়ে গেলেন। তাঁদের লোভ-লালসা, প্রবৃত্তি সব মন্দ স্বভাব একত্রিত হয়ে চারিত্রিক সৌন্দর্য উত্তমরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সত্য দ্বীনের অনুসরণে তাঁদের আগ্রহ এতটা প্রবল ছিলে যে, দ্বীনের জন্য যে কোন দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ-কুরবানী, পরিবার ও সন্তানের বিচ্ছন্নতা সব কিছু গ্রহণ করতে তাঁরা তৈরি হয়ে গেলেন। তাঁরা জীবন ও সম্পদকে পানির মত আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত করলেন যার

১. পুস্তিকাটি মূলত ফার্সীতে।

মধ্যে পার্থিব স্বার্থ চিন্তার কোন অবকাশ ছিল না। এভাবে আল্লাহ তা'আলা এই জাতিকে যোগ্যতর বানিয়েছিলেন। সবচেয়ে বিশাল দুই সাম্রাজ্যেকে একই সময়ে তাঁদের করতলগত করে দিলেন। রোম সম্রাট কায়সার ও পারস্য সম্রাট কিসরার ধনভাণ্ডার মসজিদে নব্বীর বারান্দায় ঢেলে দিলেন। জনৈক কবি কত চমৎকারই না বলেছেন ঃ

"সূর্যের প্রমাণের ক্ষেত্রে কেবল সূর্যকেই পেশ করা যায়; (কারণ তার চেয়ে বড় প্রমাণ পেশ করার মতো আর তো কিছুই নেই।) তারপরও যদি কেউ আরও বড় প্রমাণ প্রার্থনা করে তাহলে তাকে চন্দ্র দেখিয়ে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کردیا ۔
دل کو روشن کردیا انکھوں کوبینا کردیا ۔
خودنہ تھے جوراہ پراوروں کے ھادی ھوگئے ۔
کیا نظرتھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا ۔

"ভাগ্য চোখের অশ্রুকে করে দিয়েছে সাগর,
অন্তরকে আলোকিত করে দিয়েছে, চোখকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছে।
যে নিজের পথ চিনত না সেই হলো পথপ্রদর্শক,
কেমন দৃষ্টি ছিল যা সেই মৃতকে জীবন্ত করে দিল।"

মানুষ যখন উক্ত অবস্থা ও বিপ্লবের পর্যালোচনা করবে, গভীর চিন্তা করবে, তখন দৃঢ়বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি হবে যে, এ ধরনের খ্যাতিমান কার্যাবলী কোন বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনা প্রসূত প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব হতে পারে না। মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ধাপ এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। এ খোদায়ী কারিশমাঁ ও আসমানী সহযোগিতা ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ আলীম, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান-এর হুকুম ও তাক্দীর ব্যতীত কোন বান্দার পক্ষে এ ধরনের অর্জন ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন দখল থাকতে পারেনা। পবিত্র কুরআনে ও এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে ঃ

وَلَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۔

"হে নবী! আপনি যদি এ জাতির মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য যমীনের সব ধন-সম্পদও ব্যয় করতেন তবুও আপনি তাদের মধ্যে ভালাবাসা ও সহানুভূতি তৈরি করতে সক্ষম হতেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে পরস্পরে ভালবাসা সৃষ্টি করে ছিয়েছেন।" (সূরা আন্ফাল ঃ ১৩)

৪র্থ বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

হযরত নবী (সা) তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলিমদের সামনে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমার আবির্ভাব ও বিজয়ের ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জিলে খবর

দিয়েছিলেন। আর বিগত সকল নবীকেই আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছিলেন যে, শেষ যামানার এক নবী সর্বশেষ নবী হিসেবে আগমন করবেন যার নবুওয়াত সমস্ত জগতবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে। অতএব হে আসমানী কিতাবের ধারক-বাহকগণ! তোমরা আমার উপর ঈমান আন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই দাওয়াত ও নিদর্শন উপস্থাপনের পর থেকে আহলে কিতাব ঈমান আনয়ন করেছে এবং এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, নিশ্চয়ই তিনি সেই নবী যাঁর সংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছিল।

তবে অনেক আহ্লে কিতাব হিংসার বশবর্তী হয়ে ঈমান আনেনি, অথচ তারা মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এই সুসংবাদ প্রচার করত ও বলত, মক্কার আধিবাসীদের মধ্য হতে শীঘ্রই শেষনবীর আবির্ভাব হবে। তাদের ভয় ছিল, শেষ যামানার নবী (সা)-এর আনুগত্য করলে তাদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। এজন্য তারা ঈমান আনে নি। কিন্তু তাদের কুরআনের এই আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কোন সুযোগ ছিল না যে, কুরআনে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখ আছে, শুধু তা-ই নয়, কুরআন এই দাবিও করেছে যে, তার সাহাবায়ে কিরামের আলোচনাও তাওরাত ও ইঞ্জিলে আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِىْ الْاِنْجِيْلِ -

আহ্লে কিতাবের আলিমদের এই কথা বলার সুযোগ ছিল না (নাউযুবিল্লাহ) যে, কুরআন যে নবী (সা)-এর কথা তাওরাত ও ইঞ্জিলে আলোচিত হয়েছে বলে সংবাদ দিয়েছে তা মিথ্যা। নবীর আলোচনা ও তাঁর সাহাবাদের আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জিলে নেই। যে সময় কুরআন নাযিল হচ্ছিল সেই সময় তাওরাত ও ইঞ্জিলে নবীয়ে উম্মী (সা) -এর উল্লেখ ছিল আর হাজার হাজার ইয়াহূদী ও নাসারা আলেম বর্তমান ছিল। যদি কুরআনের বক্তব্য অসত্য হতো—তা হলে ত তারা তা ফাঁস করে দিত, ফলে ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্যে যারা ইসলামে দাখিল হয়েছিল তা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যেত এবং নতুন করে কেউ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ইয়াহূদী ও নাসারাদের ধর্ম ত্যাগ করত না।

৫ম বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

যে সময়ে হযরত নবী (সা) পৃথিবীতে আগমন করেন সে সময় তামাম দুনিয়া গুমরাহীতে ডুবে ছিল। গুমরাহীর বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সে সময় পৃথিবীতে ৬টি ধর্মমত চালু ছিল।

১. অগ্নিপূজার ধর্ম ঃ ইরান ও পারস্যের এলাকা থেকে শুরু করে খোরাসান এবং তুর্কিস্তান পর্যন্ত এ ধর্ম ছিল। পারস্য সম্রাট কিস্‌রা এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল। অগ্নিপূজক বা মাজূসীরা দুই খোদার দাবিদার ছিল (ইয়াযদান্ ও আহরমান) তারা অগ্নিপূজা করত, মৃত জীব খেত, কন্যা ও বোনকে বিয়ে করত, ফুফু ও খালার তো প্রশ্নই উঠে না।

২. ঈসায়ী ধর্ম ঃ এই ধর্ম সিরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য এলাকায় ছিল। রোম সম্রাট কায়সার যেহেতু ধর্মীয় দিকে থেকে খ্রিস্টান ছিল, এইজন্য ঈসায়ী ধর্ম রোম সাম্রাজ্যের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিপালিত হচ্ছিল। তারা 'তিন খোদা' 'পুত্র বানানো' এবং মাসীহকে খোদায়ী আরোপ করা এসবের দাবিদার ছিল।

৩. ইয়াহূদী ধর্ম ঃ যারা তাওরাত মানত, তাদের মধ্যে চরম বৈপরীত্য ছিল। আর তাদের অহমিকার পর্যায় এমন ছিল যে, নবীদেরকে এবং আলিমদেরকে হত্যা করা তারা নিয়মে পরিণত করে ফেলেছিল। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে বলেন ঃ

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ -

"তারা অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করত এবং যারা ইন্‌সাফের নির্দেশ দিত (ওলামা) তাদেরকেও হত্যা করত।"[১]

ইয়াহূদীরা বেশির ভাগ খায়বার ও মদীনার আশেপাশের এলাকায় বসবাস করত। সুদ খাওয়া, নবীদের কিতাব বিকৃত করা, দ্বীনকে বিক্রি করা, ঘুষ খেয়ে বিধির পরিবর্তন এসব তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

৪. মুশরিক বা পৌত্তলিক ঃ যারা মূর্তিপূজা করত। আরব ও হিন্দুস্থানে এ ধর্মের প্রচলন ছিল।

৫. সাবেয়ীন ধর্ম ঃ যারা আধ্যাত্মিকতার কথা স্বীকার করত, গ্রহ-তারার পূজা করত। এই ধর্ম ইরাক এবং হার্‌রান এলাকায় বেশি ছিল। নমরূদের যামানায় বেশির ভাগ মানুষ এই ধর্মের অনুসারী ছিল। যাদের হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِئِيْنَ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ -

(সূরা হাজ্জ ঃ ১৭)

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভবের সময়ে প্রচলিত ৫টি ধর্মের কথা উল্লেখ আছে।

৬. দাহ্‌রিয়া ধর্ম ঃ উপরের আয়াতে যে পাঁচটি ধর্মের আলোচনা আছে, এগুলো বিখ্যাত ধর্ম ছিল। এছাড়াও দাহ্‌রিয়া নামে একটি সম্প্রদায়ে ছিল যার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَقَالُوْا مَاهِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ -

(সূরা জাসিয়াহ ঃ ২৪)

১. সূরা আলে ইমরান ঃ ২১।

অন্য স্থানেও দাহ্রিয়াদের আলোচনা কুরআনে আছে। এদের সম্পর্কে লেখকের একটি পুস্তক اثبات صانع عالم وابطال دهريت وما ديت। পাঠকগণ তা দেখতে পারেন।

পৃথিবীতে দীন ইসলামের আগমন

হযরত নবী (সা) যখন সত্য দীন নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন উক্ত ধর্মমতগুলো চালু ছিল। রাষ্ট্র সরকার ও রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় এসব ধর্মের চর্চা চলছিল। ইসলাম ছিল প্রচলিত এসব ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর যিনি এই ইসলাম নিয়ে আগমন করলেন তিনি ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে একজন অনাথ সম্পদবিহীন ও একজন নিরক্ষর মানুষ। তিনি বিভিন্ন ধর্মকে প্রতিহত করে প্রমাণ নিয়ে দ্বীন ইসলামকে দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করলেন। তাঁর উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণ দেখে জগতবাসী অবাক হয়ে গেল। অনেক বড় বড় পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী ইয়াহূদী-নাসারার সাথে নবী (সা)-এর বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু তারা শত চেষ্টা করেও মহানবী (সা) কর্তৃক উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণকে সামান্যতম দুর্বল করতে সক্ষম হয়নি। অথচ তিনি ছিলেন নিরক্ষর ব্যক্তিত্ব, যিনি লেখাপড়া জানতেন না। পবিত্র কুরআনুল করীম এবং হাদীসসমূহ বাতিল ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণে ভরপুর। আর এগুলো এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, নিশ্চয়ই তিনি মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত ও আল্লাহ্ কর্তৃক অহীপ্রাপ্ত ছিলেন। কেননা তিনি নিরক্ষর হবার পরেও অকাট্য দলীল ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা হককে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পৃথিবীর সকল ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বাতিল করে দেখানো তাঁরপক্ষে আল্লাহর নির্দেশ ও আল্লাহর মেহেরবানীর সহযোগিতা ব্যতীত অসম্ভব ও অবাস্তব ছিল। তের বছর অব্যাহতভাবে দাওয়াত ও তাবলীগ চালানোর পর যখন হক প্রকাশ্য রূপ নিল এবং সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ তিনি মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করলেন। হিজরতের একবছর পর আল্লাহর হুকুমে জিহাদ ও যুদ্ধের সূচনা করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও সাহায্য অনুযায়ী সফলতা ও বিজয় লাভ করলেন। আর যুদ্ধক্ষেত্রে ও অভিযানে গায়েবী বিষয়ক কারিশমাঁ দেখে বুঝা গেল; সম্পদ-সম্বল ও উপায়-উপকরণবিহীন বিস্ময়কর কার্যাবলী সম্পদ ও উপকরণের মালিকদেরকে মুকাবিলা করে ব্যর্থ করে দিয়েছে এসব ফকীর-মিসকীনেরা।

তাদের এই অপমান ও পরাজয় আসমানী সহযোগীতাবিহীন মুসলমনাদের পক্ষে অসম্ভব ও অবাস্তব ছিল। পরিশেষে তারা যখন অপারগ হয়ে গেল, তখন হকের সামনে মাথা নত করে দিল এবং দলে দলে দ্বীনের মধ্যে দাখিল হয়ে গেল।

৬ষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

হযরত নবী (সা)-এর গায়েবের সংবাদ দেয়া ও পরবর্তী সময়ে সে সংবাদ সামান্যতমও ব্যতিক্রম না হওয়া এবং ভুল না হওয়া (তাঁর মু'জিযা ছিল)। তিনি

অতীতের আম্বিয়ায়ে কিরামের ঘটনাবলী ও পূর্বের কথা এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তিনি তা প্রত্যক্ষ করেছেন ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, বরং তিনি যেন কানেও শুনেছেন। মুনাফিক ও বিরোধীদের মনের গোপন কথা আগাম খুলে বর্ণনা করা—যা হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, এসব বিষয়ে একথার প্রকাশ্য প্রমাণ যে, তিনি অহীর ধারক-বাহক ছিলেন। এই জন্য তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে করা সম্ভব ছিল না; বরং তার ভবিষ্যতবাণী বুদ্ধি, অনুমান ও ইঙ্গিত এবং নির্দেশক কোন কিছু দিয়েই খোদায়ী অহী ও মহান সর্বভৌম প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কোন অবস্থাতেই সম্ভব ছিল না।

৭ম বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

হযরত নবী (সা)-এর দু'আ কবূল হওয়া এটিও তাঁর সত্য নবী হবার সরাসরি প্রমাণ। তিনি আল্লাহর দরবারে যত দু'আ করেছেন তা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবূল হয়েছে।

অনুভূত মু'জিযাসমূহ

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নৈতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক নিদর্শন ব্যতীতও—যা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, অনেক প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ নিদর্শন দান করেছেন। যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুভব করা যায়। যেমন ঃ মক্কার কাফিরদের চাহিদা অনুযায়ী তিনি হাতের আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দু'টুকরা করে দেন। তাঁর আঙ্গুলের মাধ্যমে পানির ঝরণা প্রবাহিত হয় যা দিয়ে প্রায় দেড় হাজার সাহাবী পানির প্রয়োজন পূরণ করেছেন। সকলে অযূ করেছেন পশুদেরকেও পান করিয়েছেন, তারপরে প্রয়োজনমাফিক পাত্রে মশকে পানি ভর্তি করে রেখেছেন। সামান্য খাদ্য দিয়ে বিশাল বাহিনীর সদস্যদের পরিতৃপ্তি লাভ করে। তিনি গাছকে আহবান জানালে গাছ উপস্থিত হয় এবং বৃক্ষ ও পাথর তাঁকে সালাম করে। বিষাক্ত রান্নাকরা বকরীর গোশত তাঁকে সম্বোধন করে একথা বলে ঃ আপনি খাবেন না, দুশমনেরা আমার মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছে। তাঁর হাতের পাথর তাসবীহ পড়তো, এসবই তাঁর মু'জিযা ছিল। পর্যবক্ষেকগণ উপলব্ধি করতে পারবেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত বান্দা এবং তাঁর রহস্যের ধারক, প্রতিনিধি সর্বোপরি আল্লাহর দূত। যিনি আল্লাহর বিধানাবলী ও হিদায়েত নিয়ে আগমন করেছেন। এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরত ও অনন্য কারিশমাঁ তাঁর হাত দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আর এসব কিছু মহান স্রষ্টার প্রতিনিধিত্বের মান ও অন্য বৈশিষ্টের নিদর্শনা। মানুষের ক্ষমতা এ ধরনের কারিশমাঁ প্রকাশ করতে অক্ষম ও ব্যর্থ, আর এমন সব আশ্চার্যজনক দুর্লভ এবং অসম্ভব বিষয় প্রকাশ হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভবও নয়, বাস্তবও নয়। এভাবে জানা গেল যে, এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। তিনি এমন অদৃশ্য সত্তা কর্তৃক

সাহায্যপ্রাপ্ত, যে সত্তার ক্ষমতার হাতে প্রকৃতির যুগ-জগত ও আকাশ সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ। তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রিয় বান্দা আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দু'টুকরা করে দেন। যখন তিনি প্রত্যাশা করেন আঙ্গুলের দ্বারা বাহ্যিক উপকরণবিহীন ঝরণা জারি করে দেন। এভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞানী উপকরণ নির্ভরশীল ব্যক্তিদের এ কথা জানা হবে কোন সত্তা এমনও আছেন যিনি কোন নিয়মনীতি ও উপকরণের অধীন নন।

নবুওয়াতের দাবিদার এই মহান ব্যক্তির হাত দিয়ে গায়েবী কারিশমাঁ প্রকাশ হচ্ছে। তিনি সর্বশক্তিমান সত্যপ্রভুর দূত। আকাশের অস্তিত্ব, যুগ ও জগতের সৃষ্টি যাঁর হাতে তিনি সার্বভৌম মালিক। তাঁর পক্ষে নবীর মাধ্যমে এসব কারিশমাঁ প্রকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ সৃষ্টির নিকট এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া যে, যেমনিভাবে নবী (সা)-এর কণ্ঠ ভাষা ও ভাষ্য, সর্বজ্ঞানী আল্লাহর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দর্পণ, তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হাত সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতি হাতের দর্পণ, যার মাধ্যমে গায়েবী কুদরতের দুর্লভ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারিশমাঁ প্রকাশ হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা সে কথাই বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -

"যারা তোমার হাতে শপথ করে মূলত তারা আল্লাহর সাথে শপথ করে"। (সূরা ফাতহ্ ঃ ১০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

"তুমি যখন বালি ছুঁড়ে মেরেছিলে তখন আসলে তুমি তা ছুঁড়ে মারনি, বরং আল্লাহ্ই তা ছুঁড়ে মেরেছিলেন।" (সূরা আনফাল ঃ ১৭)

একজন মানুষের হাতে এ ধরনের আশ্চর্যজনক আলৌকক ঘটনা সংঘটিত হওয়া, যা একজন মানুষের ক্ষমতার আওতার বাইরে, তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই ব্যক্তির হাতের পিছনে গোপনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতের ছোঁয়া রয়েছে। আর এই নবীর হাত দিয়ে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা বাস্তবে আল্লাহ তা'আলারই কাজ, নবীর কাজ নয়।

امارميت اذرميت گفت حق * كارحق بركار هاوار وسبق

"মহান আল্লাহ্ তাঁর শানে ইরশাদ করেছেন ঃ তিনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন (কাকিরদের চোখে ধুলো) তা (প্রকৃতপক্ষে) আপনি নিক্ষেপ করেননি; তাঁর সমূহ কর্মকাণ্ড মহান আল্লাহর পূর্ব ইচ্ছে ও প্রদত্ত শক্তিতেই সংঘটিত হয়ে থাকে।"

گر بپرانيم تيرآن نے زماست * مان كمان وتيرانداز ش خداست

"যে সময়টিতে আমরা ধণুকে তীর পুরে তা নিক্ষেপ করে থাকি; সে সয়টিতে আসলে আমাদের কামানের গোলা ও তীর ইত্যাদি মহান আল্লাহরই কুদরাতীভাবে অথবা ফিরিশতাদের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকেন।

যখন এসব মর্যাদার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে সমাজে একথা ভালভাবে জানা যাবে যে নবী (সা) আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা ও তাঁর প্রতিনিধি এবং আল্লাহর দূত, তখন লোকেরা তাঁকে আনুগত্য করার হক্দার মনে করবে এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য হবে বলে অনুধাবন করবে।

সারকথা

মু'জিযা প্রদানের হিক্মত হচ্ছে ঃ জনসাধারণ তাঁর নবুওয়াতের প্রতি আস্থাশীল হবে যে, তিনি সত্যনবী নবী (সা)-এর জন্য তার মু'জিযাসমূহ তাঁর দূত ও প্রতিনিধিত্ব পদবীর জন্য সূত্র ও উপকরণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর অগণিত মু'জিযা ছিল, আমরা এখানে তাঁর ঐসব মু'জিযা আলোচনা করছি যা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সূত্রের পরম্পরায় সবগুলো হয়ত সংখ্যাতিরিক্ত সীমায় পৌছেনি, কিন্তু সামগ্রিক সূত্রে বহুল সূত্রের সীমায় পৌঁছেছে, যেগুলোর ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, হযরত আলী (রা)-এর বীরত্বের বর্ণনাসূত্র এবং হাতিম তাই-এর দানশীলতার বর্ণনা যদিও সংখ্যাতিরিক্ত বর্ণনা হিসেবে আসেনি, তবে সামগ্রিক বর্ণনায় এককভাবে এ দু'টি হাদীসের বর্ণনা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যেখানে সন্দেহ-সংশয়ের সুযোগ নেই। এজন্যই হয়ত আলী (রা)-এর বীরত্ব ও হাতিম তাই-এর বদান্যতা পৃথিবীতে প্রবাদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।

ইয়াহূদীদের নিকট হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযার লাঠি এবং সাদা হাত-এর মু'জিযা নবুওয়াতের প্রমাণ, তেমনিভাবে নাসারাদের নিকট হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযা মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ ও অন্ধকে সুস্থ করা -এর নবুওয়াতের প্রমাণ। তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মু'জিযাও তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ ও দলীল। হযরত নবী (সা)-এর মু'জিযাকে নাসারাদের অস্বীকার করা আর ইয়াহূদীদের হযরত ঈসা (আ) মু'জিযাকে অস্বীকার করা একই পর্যায়ের।

নবীর মু'জিযার ব্যাখ্যা

এখানে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযার কিছু ব্যাখ্যা পেশ করতে চাই। ইতিপূর্বে সামগ্রিকভাবে মু'জিযার আলোচনা করা হয়েছে।

মু'জিযার সংজ্ঞা

মু'জিযা হচ্ছে এমন বিষয় যা প্রকৃতির নিয়মনীতির বাইরে হয়, যা নবুওয়াতের দাবিদারগণের হাতে প্রকাশ পায়। সমগ্র পৃথিবী ও জগতবাসী তার মুকাবিলা অথবা তদ্রুপ করতে অক্ষম ও ব্যর্থ হয়। আর এভাবেই তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারীদের নিকট বিষয়টি ফুটে উঠে যে, এ ব্যক্তি স্রষ্টার প্রিয়পাত্র যার জন্য স্রষ্টা নবীর

দুশমনদেরকে অক্ষম, পরাভূত ও নিরুত্তর করার জন্য কুদ্‌রতের কারিশমাঁ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন, যেন মানুষের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, গায়েবী সাহায্য তাঁর পশ্চাতে রয়েছে। আর এই ব্যক্তি কোন যাদুকর বা জ্যোতিষী নন যে, কেউ তাঁর মুকাবিলা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কারো যদি সংশোধন, কল্যাণ আর সফলতা অর্জন করার লক্ষ্য থাকে, তা হলে এই মহান ব্যক্তিত্বের উপর ঈমান এনে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। যেই সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ তা'আলা নিজের খলীফা, প্রতিনিধি, দূত ও নির্ভরযোগ্য করে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর ও বিরোধীতা করার পরিণাম ধ্বংস ও অকল্যাণ ছাড়া আর কি হতে পারে?

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ـ

"অপেক্ষা কর, দেখতে পাবে মিথ্যাবাদীদের পরিণতি কেমন হয়।" (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৩৬)

ইল্‌মী মু'জিযা ও আমলী মু'জিযা

মু'জিযা দু'প্রকার। এক, আমলী মু'জিযা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, ইলমী মু'জিযা। আমলী মু'জিযা হচ্ছে, নবী কর্তৃক এমন কাজ বা এমন কথা প্রকাশ পাওয়া, যে ধরনের করতে সকলে অক্ষম।

পক্ষান্তরে ইল্‌মী মু'জিযা হচ্ছে নবী কর্তৃক এমন জ্ঞান ও বিদ্যা প্রকাশ পাওয়া যার মুকাবিলা করা বা তদ্রুপ কিছু করতে সমগ্র দুনিয়া অসম্ভব ও অক্ষম।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী (সা)-কে দু'ধরনের মু'জিযাই ব্যাপক পরিমাণে দান করেছেন, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না।

কুরআনুল হাকীম শ্রেষ্ঠ মু'জিযা

হযরত নবী (সা)-এর মু'জিযার মধ্যে সবচেয়ে বড় মু'জিযা হচ্ছে, কুরআনুল করীম যা ইল্‌মী বা একাডেমিক মু'জিযা। এই মু'জিযাটি নবী (সা)-এর জন্য সমস্ত নবীদের মু'জিযা থেকে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী। সবাই স্বীকার করেন কাজ থেকে বিদ্যার মূল্য অনেক বেশি। এজন্যই প্রতিটি বিষয়ের প্রশিক্ষককে সম্মান করা হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই শ্রমিক থেকে অফিসারের বেতন বেশি হয়ে থাকে। এই মর্যাদা বিদ্যার ও জ্ঞানের-অথচ শ্রমিকের পরিশ্রমই বেশি। কুরআনুল করীম হযরত নবী (সা)-এর ইল্‌মী মু'জিযা, আর এ মু'জিযাটি তাঁর সর্বোত্তম মু'জিযা। অপর কোন নবীকে অনুরূপ মু'জিযা দেয়া হয়নি। প্রত্যেক নবীর মু'জিযা ছিল সময়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং তা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কুরআনুল করীম এমন মু'জিযা যা অস্তমিত বা হারিয়ে যাবার পথ নেই। কুরআন নাযিল হয়েছে ১৩৮৩ বছর হয়েছে* কিন্তু এখনো তা কোনরূপ পরিবর্তন, বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন থেকে মুক্ত রয়েছে। ইন্‌শা'আল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের মু'জিযা এ অবস্থাতেই বর্তমান থাকবে যে অবস্থায় তা নাযিল হয়েছিল।

---

* মূল পুস্তকটি রচনাকারীন সময়।

কুরআন মু'জিযা হওয়ার বিভিন্ন কারণ

উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন গ্রন্থে কুরআনুল করীমের মু'জিযার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে কুরআনুল করীমের মু'জিযার কয়েকটি দিক তুলে ধরব যা সরাসরি ও স্পষ্ট।

প্রথম কারণ ঃ হযরত মূসা (আ)-এর যমানায় যাদুবিদ্যার ব্যাপক চর্চা ছিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লাঠি ও সাদা হাতের মু'জিযা দান করেছেন। হযরত ঈসা (আ)-এর যমানায় চিকিৎসাবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রোগী সুস্থ করা এবং মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা দান করেছেন। আর আমাদের নবী (সা)-এর যুগে ভাষা-সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্রের চর্চা ছিল। এ প্রেক্ষাপটে আরবগণ অনারবদেরকে মূক বা আজম বলে আখ্যায়িত করত। এখনও সেই আজম শব্দ চালু আছে। সুতরাং সবচেয়ে বড় মু'জিযা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুরআন দান করেছেন। কুরআনের শব্দ ও বাক্যের অলংকার, প্রাঞ্জল্য, সাবলীলতা ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা, শ্রোতা-বক্তাকে অক্ষম ও পরাজিত করে দেয়। এটিই মু'জিযার সংজ্ঞা। কুরআনের সাথে মুকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পৃথিবীর মানুষ সক্ষম নয়। মু'জিযা কিন্তু নবীরও ক্ষমতার বাইরের বিষয়। কুরআনুল করীম হযরত নবী (সা)-এর বক্তব্য নয় বরং মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী। যেমনি কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে অন্য সকল মানুষ অক্ষম, তেমনিভাবে নবী (সা)-এর ব্যক্তিগত ক্ষমতারও বাইরে। তাঁর বাণীকে হাদীস বলা হয়। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আরবের ভাষাবিদ ও নান্দনিক উপস্থাপকদের নিকট তিনি এভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ - "তোমরা যদি কুরআনকে আল্লাহর বাণী হবার ক্ষেত্রে সন্দেহ কর তাহলে সকলে মিলে-এর মত একটি ছোট সূরা রচনা করে দেখাও!"

কুরআন পৃথক পৃথকভাবে কাফিরদের সকলকেই মুকাবিলা করার জন্য দাওয়াত দিয়েছে। কিন্তু আরবের উন্নত ভাষাবিদগণ সকলেই কুরআনের মত করে কিছু রচনা করতে অক্ষম হলো। অথচ কুরআন ত আরবদের নিজস্ব ভাষা ও অক্ষরে রচিত হয়েছে। কুরআন তাদের ব্যবহৃত আরবী ভাষাতেই ছিল। শুধু তা-ই নয়, মহানবী (সা) নিজে ছিলেন নিরক্ষর। তিনি কারো নিকট লেখাপড়া শিখেননি। তিনি কোন শিক্ষিত লোকের সান্নিধ্যেও ছিলেন না। তারপরেও যখন আল-কুরআনের মত অকল্পনীয় ধরনের অলংকারসমৃদ্ধ এক তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপূর বাণী তাঁর পবিত্র কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো, তখন তা এ কথার অকাট্য দলীল যে, তা আল্লাহর কালাম ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। এটি কোন মানুষের কথা নয়। এই বাণীর সাথে নবী (সা)-এর স্পর্শ শুধু এতটুকু যে, হযরত জিবরাঈল আমীন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অহী হিসেবে যে বাণী বহন

করে তাঁর নিকট নিয়ে এসেছেন, তিনি কমবেশি না করে হুবহু মানুষের কাছে আল্লাহর অহী এই কুরআন পৌঁছে দিয়েছেন, যেন মানুষ তা থেকে হিদায়েত পেতে পারে। কাযী আয়ায (র) তাঁর গ্রন্থ 'আশ-শিফা'তে উল্লেখ করেছেন ঃ আল-কুরআনে অলংকার হিসেবে সাত হাজারেরও অধিক মু'জিযা রয়েছে। আর এজন্য- اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرْ -এর মত একটি ছোট সূরাতে ১০টি শব্দ রয়েছে। সমস্ত কুরআনুল করীমে প্রায় সত্তর হাজার শব্দ রয়েছে। যদি ধরে নেয়া হয় প্রতি আয়াতে ১০টি শব্দ আছে এ হিসেবে ৭ হাজারের অধিক আয়াত হতে পারে এবং কুরআনের মু'জিযা ৭ হাজারের অধিক হবে।

একটি প্রশ্নের জবাব ঃ কোন কোন আহম্মক লোক বলে থাকে, দুনিয়াতে আরও কিছু গ্রন্থ আছে যেগুলোর মত অন্য কোন গ্রন্থ নেই, যেমন ঃ ফেরদৌসীর শাহনামা এবং শেখ সা'দীর গুঁলিস্তা।

জবাব ঃ এ প্রশ্নের ধরনে বুঝা যায়, এসব লোকের মু'জিযার হাকীকত এবং কুরআনের মু'জিযা সম্পর্কে ধারণা নেই। কুরআনুল করীমের মু'জিযা বা অক্ষম কারী পদ্ধতি ছিল এই যে, আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাত্ত কণ্ঠে আরবের কাফির তথা অস্বীকারকারীদেরকে বজ্রকণ্ঠে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, "কুরআনুল করীম আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং কুরআন আমার মু'জিযা। এ বিষয়ে যদি তোমার সংশয় সন্দেহ কর তাহলে কুরআনের মুকাবিলায় সুন্দর উন্নত শব্দে ও চমকপ্রদ বাক্য-বিদ্যা সম্বলিত বাণী রচনা করে উপস্থাপন কর।" ২৩ বছর ব্যাপী অব্যাহতভাবে তিনি তাদের নিকট এই আহ্বান ও চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। অথচ তাদের একজন ব্যক্তিও কুরআনের মত একটি আয়াত বা কাব্যও রচনা করে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। আর সমস্ত পৃথিবীর মানুষও কুরআনের মুকাবিলা ও প্রতিযোগিতা থেকে অক্ষম ও ব্যর্থ হয়েছে। যারা এ ধরনের বক্তব্য ও প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, তাদেরকে বলতে হবে এ পদ্ধতিতে মুকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দাওয়াত বা চ্যালেঞ্জ পৃথিবীর কোন গ্রন্থের বেলায় কোথাও কখনো দেয়া হয়েছিল কি-না? আর এই ধরনের আহ্বানই বা কে কোথায় দিয়েছে ? অক্ষমতাই বা কোথায় প্রকাশিত হয়েছে ? শুধুমাত্র কোন রচনার তুলনা না থাকলেই তাকে মু'জিযা বলা যায় না। নিজকে ভাষাগত সৌন্দর্য অথবা পূর্ণতা ও পরিপক্কতার কারণে কোন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি বা কোন রচনা বা গ্রন্থকে উপমাহীন বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, এই রচনা অথবা এর রচয়িতা মু'জিযা।

কখনো মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা ও তথ্যের অভাবে কোন কিছুকে তুলনাহীন মনে করে থাকে যদিও বাস্তবে-এর সমতুল্য বস্তুর অস্তিত্ব থাকে। শাহনামার মুকাবিলায় মির্জা মুহাম্মদ তুরানী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যা ফেরদৌসীর শাহ্নামার চেয়ে উত্তম। সে গ্রন্থে কৃবি ফেরদৌসীর শাহনামার দুর্বল দিকের সমালোচনা করা হয়েছে।

কোন জিনিসের মু'জিযা হওয়ার জন্য তার অলৌকিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমী হওয়া জরুরী। তাতে বস্তুগত ও বাহ্যিক উপায় উপকরণের কোন প্রভাব

থাকে না। যাদু এবং মু'জিযার মধ্যে এটাই পার্থক্য যে, যাদু শিক্ষা। প্রশিক্ষণ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করা যায় কিন্তু মু'জিযা এমন কোন বিষয় নয় যা শিক্ষা প্রশিক্ষণ নিয়ে অর্জন করা যাবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শেখ সা'দী এবং কবি ফেরদৌসী দীর্ঘদিনের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, অধ্যয়ন-অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে এবং বহু বছর বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে উস্তাদদের সেবা করে বিদ্যা অর্জন করেছেন। তারপর বছরের বছর পরিশ্রম করে অনেক চেষ্টার পর তাঁর রচনা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এটা কোন বিস্ময়েরও কিছু নয়, আর একে মু'জিযাও বলা যায় না।

সব যুগেই প্রত্যেক ভাষায় বড় বড় পণ্ডিত-সাহিত্যিক বিগত হয়েছেন। যেমন ঃ আরবী ভাষায় বদীউজ্জামান হামাদানী এবং হারিরী, তাই বলে তাদের রচনা মু'জিযা ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ ফার্সী ভাষায় শেখ সা'দী, কবি ফেরদৌসী, ইংরেজি সাহিত্যে মিল্টন, সংস্কৃত ভাষায় কালীদাস এবং উর্দূ ভাষায় মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ, আলতাফ হোসাইন হালীসহ অনেকে।

তাঁদের রচনা যদি তাঁদের সমসাময়িকদের রচনা থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে, তবে তা বছরের পর বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফসল, মু'জিযা নয়। এ প্রেক্ষিতে কোন কোন বুদ্ধিমান ফযীর রচিত গ্রন্থ তাফসীরে বেনুক্তা-কে উল্লেখ করে থাকেন। এ গ্রন্থের ব্যাপারেও বলা হয় যে, এটি অনন্য ও তুলনাহীন, আজ পর্যন্ত-এর প্রতিপক্ষ কেউ হতে পারেনি। এ কথার জবাব খোদ ফয়যীর ভাষায়ই শুনুন।

العلوم كلها صداع الاعلم كلام الله وكلام الله لاعد لمحامده ولاحد لمكارمه ولاحصر لرسومه ولااحصاه لعلومه وما علم علوم كلام الله كلها احد الا الله ورسوله واولوالعلم ما علموا الاعدادا ـ

"আল-কুরআনের বিদ্যা ব্যতীত সব বিদ্যা হচ্ছে মাথা ব্যাথার কারণ। কুরআনের বাণীর গুণাগুণ অগণিত। তাঁর সৌন্দর্যের কোন সীমা, পরিসীমা নেই। কুরআনের জ্ঞান অফুরন্ত, যাকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কুরআনের পুরো জ্ঞান ও বিদ্যা আর কারও জানা নেই। সকল জ্ঞানী ও পণ্ডিতের সব জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি একত্রিত করলে কুরআনের সীমাহীন বিদ্যার সামান্য অংশই হবে।"

এই হচ্ছে আল্লাহর কালাম সম্পর্কে খোদ ফয়যীর স্বীকৃতি ও ঘোষণা। তারপরে কুরআনের সমকক্ষতার পক্ষে তাঁর রচনা ও তাঁকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা বোকামী, ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতায় ছাড়া কিছুই হতে পারে না। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, শেখ সা'দী, কবি ফেরদৌসী এবং ফয়যী প্রমুখের সাহিত্য আল-কুরআনের সাথে চ্যালেঞ্জ করার মত হত, তাহলে তো নবীয়ে উম্মি (সা)–তাঁর জন্য আমার পিতামাতা

উৎসর্গিত হোক-এর অনেক গোলামের গোলামও এদের মত অনেক রচনা এসবের মুকাবিলায় রচনা করে পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করতেন।

আল-কুরআনের মু'জিযা হওয়ার দ্বিতীয় কারণ

আল-কুরআনের মু'জিযা হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঃ এই কুরআন হিদায়েতের জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ। অতএব যে ব্যক্তির কুরআনুল করীমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করবে, এ গ্রন্থে সে পাবে আকীদা-বিশ্বাস, নেক আমল, সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সামাজিকতা, শাসন পদ্ধতি, রাজনীতি, রূহানী উন্নতি, আল্লাহর পরিচিতি বা মারিফাতের, আত্মশুদ্ধি, শাসন বা নির্দেশনা, ইনসাফ ও সামাজিক ন্যায়বিচার, আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও আল্লাহর প্রতি সেই সমস্ত নীতিমালা এবং উপায়- উপকরণ; যার মাধ্যমে লোকেরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে এবং তার হৃদয় ও কণ্ঠে বিনাদ্বিধায় সাক্ষ্য দিবে যে, নিঃসঙ্গেহে আল-কুরআন আল্লাহর কালাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত কিতাব। দুনিয়ার সকল আলিম, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা একত্রিত হয়েও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যার এমন ভাণ্ডার উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না। অথচ নিরক্ষর জাতির একজন নিরক্ষর সদস্য পৃথিবীর সামনে এমন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ পেশ করেছেন যা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ ও সফলতার নিশ্চয়তা দেয়, স্রষ্টার অধিকার, মানুষের অধিকার, ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়। পৃথিবীর সমস্ত বাতিল ধর্মমত যথা ঃ ইয়াহূদীবাদ, খ্রিস্টবাদ, পৌত্তলিকতা, অগ্নিপূজা ও সাবয়ীত্ব ইত্যাদিকে অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে খণ্ডন করেছে। কোন ধর্মেরই কুরআন উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণকে অস্বীকার করার সামর্থ্য নেই। এ আলোচনা থেকে কি নিশ্চিতভাবে মনে হয় না যে, আল-কুরআন অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত গ্রন্থ?

আল-কুরআন মু'জিযা হওয়ার তৃতীয় কারণ

আল-কুরআনের প্রতিপক্ষকে অক্ষম করার তথা মু'জিযা হওয়ার তৃতীয় কারণ হচ্ছে। আল-কুরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যার নাম-নিশানও ইতিপূর্বে কখনো ছিল না। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা হুবহু বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন ঃ হিজরতের পূর্বে পারস্যদের মুকাবিলায় রোমানদের বিজয়ের খবর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ -

দুই ঃ বদর যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয়ের খবর ঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ -

আর ইসলামের বিজয়ের সংবাদ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ -

ইনশা'আল্লাহ পরবর্তী আলোচনায়ও আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা আসবে। যা হোক, কুরআনুল করীম ভবিষ্যত বিষয়ে যত সংবাদ দিয়াছিল এবং যেভাবে দিয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তেমনিভাবে আল-কুরআনে বিগত আম্বিয়ায়ে কিরামের কাহিনী ও পুরানো জাতির ঘটনাবলী সামগ্রিক অবস্থা সমবেতভাবে আলোচিত হওয়া, যেমন সয়্যিদেনা হযরত ইব্‌রাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত ঈসা (আ) সহ অন্যান্য নবীদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর যুলকারনাইন ও গুহাবাসীদের কাহিনী (আস্‌হাবে কাহাফ)সহ আরও অনেক ঘটনাবলী যেসব ঘটনা আহ্‌লে কিতাবদের আলিমদেরও পুরোপুরি জানা ছিল না। নিরক্ষর নবী (সা) যখন এসব কাহিনী তাদের সামনে পেশ করেছেন তখন তারা কেউ তা অস্বীকার করতে পারেনি।

পাঠকগণ ও জ্ঞানের উৎসাহী ব্যক্তিগণ যদি বিস্তারিতভাবে কুরআনের ইজাজ বা প্রতিপক্ষকে অক্ষম করার নিয়ম-পদ্ধতি জানতে চান, তা হলে বিখ্যাত লেখক কাযী আবূ বকর বাকেল্লানী (র) কর্তৃক রচিত 'ইজাযুল্ কুরআন' (اعجاز القران) নামক গ্রন্থ এবং কাযী আয়াযের 'শিফা' গ্রন্থে ইজাজ অধ্যায় অধ্যয়ন করতে পারেন। উর্দূভাষায় এই অধম লেখকও 'ইজাজুল কুরআন' নামে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছি, তাও দেখতে পারেন।

নবী (সা)-এর হাদীস আরেকটি মু'জিযা

পবিত্র কুরআনুল করীমের পর নবী (সা)-এর শিক্ষার দ্বিতীয় মু'জিযা হচ্ছে তাঁর হাদীস। অন্যভাবে হাদীসকে শরী'আত ও মিল্লাত নামেও ব্যাখ্যা করা হয়। হাদীসের পূর্ণতা ও ব্যাপকতা দেখে একজন নগণ্য বুদ্ধির ব্যক্তিরও এই বিশ্বাস পয়দা হবে যে, এ ধরনের উঁচু বুদ্ধিবৃত্তিক কথা, প্রকৃতি ও স্বভাব সুলভ বিধান এবং আইন-এর উৎস মহান আল্লাহ্ আলিমুল হাকীম ব্যতীত সম্ভব হতে পারে না। এককভাবে কোন মানুষ নিজস্ব মেধা দিয়ে হাদীসের মত বক্তব্য দিতে পারে না। বিশেষ করে যেখানে নবী (সা) নিরক্ষর ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি লেখা পড়া জানতেন না। তাঁর ভাষা ও কণ্ঠ থেকে এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ ও বিবেককে জাগানো বক্তব্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঝরণা কিভাবে জারী হতে পারে ? বরং নিরক্ষর নবীর পবিত্র ভাষা ও কণ্ঠ থেকে যে বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্য দিয়ে তিনি পর্দার অন্তরালের অদৃশ্য কথাকেই প্রকাশ করেছেন। হযরত মূসা (আ) বৃক্ষ থেকে যে বক্তব্য শুনেছেন প্রকৃতপক্ষে তা বৃক্ষের নিজস্ব বক্তব্য ছিল না, বরং তা মহান রাব্বুল আলামীনের বক্তব্য ছিল। বৃক্ষটি ছিল টেলিফোনের মত মাধ্যম, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার গায়েবী বক্তব্য হযরত মূসা (আ) পর্যন্ত পৌঁছছিল এভাবে এই নিরক্ষর নবী (সা)-কে (তাঁর জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক) বুঝতে হবে। তাঁর পবিত্র ভাষার মুখপাত্র হিসেবে যা বের হত তা ছিল প্রকৃতপক্ষে অহীয়ে রাব্বানী, আওয়াজে ইলাহী। নাউযুবিল্লাহ, তা তাঁর মনগড়া কথা ছিল না।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

گفته او گفته الله بود * گرچه ازحلقوم عبد الله بود -

"তাঁর কথা/বাণী প্রকৃত আল্লাহরই বাণী হয়ে থাকে; যদিও তা তাঁর বান্দার (নবীর) মুখ-নিসৃত হয়ে থাকুক।"

আর এজন্যই ইসলামী শরী'আত যেসব বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়, তা কুসংস্কার ও অমূলক ভিত্তিহীন কথা থেকে সম্পূর্ণভাবে পূত-পবিত্র। শুধু তা-ই নয়, বরং তা পরম্পরা সূত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী যথার্থ প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যার উপর দৃঢ় প্রত্যয় করা যায় যে, তা বাস্তব ও সত্য।

ইসলামী শরী'আত উন্নত চরিত্রের যেসব বিধান দিয়েছে, প্রাচীন আসমানী গ্রন্থে ও পরবর্তী গ্রন্থেও তার নজির পাওয়া যায় না। আর ইসলামী শরী'আত ইবাদত, সামাজিক লেনদেন ও কার্যাবলী এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যা নির্দেশ দিয়েছে, তা বেশুমার কল্যাণ ও হিকমতে পরিপূর্ণ-হাদীসে মানুষের অধিকার ও আল্লাহর অধিকারের যে ব্যাখ্যা এবং ইহকাল ও পরকালের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত জটিল সমস্যার যে সমাধান শরী'আত পেশ করেছে, তা মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি বিবেক দ্বারা সম্ভব ছিল না। এ ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি হচ্ছে তাওরাত, ইঞ্জিল সহ প্রাচীন ও আধুনিক কোন গ্রন্থই ইসলামী শিক্ষা ও বিধানের মুকাবিলা করতে পারবে না।

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ নবী, জ্ঞানী, শাসক-রাজা, উলামা বিগত হয়েছেন কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সকল কথা-কাজ, তৎপরতা-নীরবতা যেভাবে বর্ণিত প্রকাশিত সতর্কতার সাথে সংরক্ষিত হয়েছে-এর নজির তাঁদের কারো ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তাঁর জীবন বৃত্তান্ত সংরক্ষণের সাথে জড়িতরা তাঁর প্রতিটি কাজকর্ম, কথাবার্তা, বর্ণনার ধারাবাহিকতা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তো করেছেনই, উপরন্ত যারা এসব কাজ করেছেন তাঁদের জীবন ও কর্মও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এজন্য 'আসমাউর রিজাল শাস্ত্র' বা ব্যক্তি তথ্য বিজ্ঞান নামে এবং পরম্পরা বিজ্ঞান ও হাদীসের পদ্ধতি বিজ্ঞান বা উসূলে হাদীস নামের শাস্ত্রও রচিত হয়েছে। এসব বিষয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ঃ মহানবী (সা)-এর হাদীসকে নিশ্চিতভাবে ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা। এভাবে তাঁর প্রতিটি কাজকর্ম, বাণী ও অবস্থা দীর্ঘ বর্ণনার পরম পরম্পরের দ্বারা সংরক্ষিত দেখে পাঠকদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হবে যেন তা চাক্ষুস দর্শনের সমতুল্য। ছয়টি শীর্ষ হাদীস গ্রন্থসহ অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করলে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যাবে যে, কি ধরনের অনুপম ও বিস্ময়কর নৈপুণ্য ও দক্ষতার সাথে এসব গ্রন্থে মহানবী (সা)-এর হাদীসের ভাণ্ডার সংগৃহীত হয়েছে। বিখ্যাত মুহাদ্দেসীন বা হাদীস বিশারদগণ (আল্লাহ তা'আলার তাঁদের কবরকে তাঁর রহমতের নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন) নবী (সা) এর হাদীস নির্বাচন ও সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণের জন্য কি ধরনের পরিশ্রম করে [illegible] প্রণয়ন করেছেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ও ইবন মাজাহ সহ অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থাবলী বিশ্বাসীদের সামনে বর্তমান আছে। কোন ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির সামর্থ্য নেই যে, এসব গ্রন্থের হাদীসের একটি শব্দও কমবেশি করতে পারে।

তারপর এসব হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিটি হাদীসের বর্ণনার মান ও বর্ণনাকারীর অবস্থা ও মর্যাদা সম্পর্কে মূল্যায়ন করে মন্তব্য করা হয়েছে। যেমন ঃ এই হাদীসটি সহীহ্ অথবা হাসান বা গরীব, (দুর্বল), মুনকার (অপরিচিত) ইত্যাদি।

তারপর লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নবী (সা)-এর বাণী ও কার্যাবলী যা হাদীস নামে পরিচিত, হাদীসের রিওয়ায়েতকারীদের প্রথম স্তরে ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)। আল-হামদুলিল্লাহ! তাঁদের অবস্থা ত এই ছিল যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একজন ব্যক্তিও এমন ছিলেন না তাঁর মধ্যে মিথ্যা লেশমাত্রও থাকতে পারে। সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা (বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক) একলক্ষ চব্বিশ হাজার ছিল। এ বৃহৎ সংখ্যার একটি জামাতের মধ্যে একজন সদস্যের ব্যাপারেও আজ পর্যন্ত একথা প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। উম্মী নবী (সা) (তাঁর জন্য আমার পিতা মাতা কুরবান হোক)-এর মু'জিযা ছিল যে, তিনি এমন সুসজ্জিত একটি বাহিনী তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যাঁদের একজন লোকও মিথ্যা কথা বলতেন না। তাঁদের পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের রাবীগণও সাধারণত জীবনে মিথ্যা বলা ও অসাবধানতা থেকে নিরাপদ ছিলেন। তাঁদের প্রবল বিশ্বাস ছিল নবী (সা)-এর বরাত দিয়ে নিজের কোন কথা বর্ণনা করা মহাপাপ (কবীরা গুনাহ)।

বর্তমানে দুনিয়ার কোন হযরত মসীহ্ (যিশু)-এর অনুসারী হিসেবে দাবিদারগণ কি বলতে পারবেন তাঁদের বর্ণনার সনদ বা পরম্পরা সূত্র কি ? কোন সূত্রে এবং কাদের মাধ্যমে তাঁরা ইঞ্জিল এবং হাওয়ারীদের পত্র বা প্রবন্ধগুলো পেয়েছেন? বর্ণনাকারী লোকদের পরিচয়ই বা কি? তাঁদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কয়জন এবং তাঁরা কারা ও কতটুকু তাঁদের নির্ভযোগ্যতার মান। অথবা কারা নির্ভরযোগ্য নন? বস্তুত খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পাদ্রীগণ একটি কথাও যুক্ত পরম্পরা সূত্রে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন না। পক্ষান্তরে আমাদের মুহাদ্দিসীনে কিরামের অবস্থা হচ্ছে, সূত্রবিহীন একটি শব্দও তাঁরা নবী (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলেন নি। হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো সেই পরিচ্ছন্ন যুগে সতর্ক, সচেতন ও নির্ভরযোগ্য লোকদের মাধ্যমে সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। তাঁদের রচনা ও সম্পাদনায় সে যুগেই মানুষ পড়তে, শিখতে ও চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছে। আজও সে গ্রন্থগুলো অবিকৃত অবস্থায় পরম্পরা সূত্র অনুযায়ী পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষিত লোকেরা তা অধ্যয়ন করছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, মহান পবিত্র বরকতময় ব্যক্তিত্বের বাণী, গুণাবলী ও কার্যাবলী সংরক্ষণের

জন্য এসব ব্যবস্থাপনা ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে শুধুমাত্র মানুষের চেষ্টা ও প্রচেষ্টায় তাঁর হাদীস সংরক্ষণের জন্য এতবড় ব্যবস্থাপনা– আল্লাহর শপথ! আল্লাহর সহযোগিতা ও রহমত ব্যতীত সম্ভব ছিলনা, বরং তা খোদায়ী কারিশমাঁ, যা পর্দার অন্তরালে নবীয়ে উম্মী (সা)-এর হাদীস সংরক্ষরণের জন্য উদিত হয়েছিল। ইল্‌মে হাদীস বা হাদীস বিজ্ঞান এবং এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো ও বিদ্যাসমূহর প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে, গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এমন মর্যাদার ইতিহাস দ্বিতীয়টি আর নেই। বস্তুত যে ব্যক্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির হিদায়েত ও নেতৃত্বের জন্য নির্ধারিত, তাঁর জীবন ও কর্ম, বাণী ও কার্যাবলী এ ধরনের মর্যাদার অবস্থায়ই সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মকে কোন সন্দেহ ও সংশয়ে পতিত হতে হবে না। যারা উম্মী নবী (সা)-এর উপর পবিত্র জীবনকে সরাসরি দেখতে চান, তারা হাদীসের তাঁকে দেখতে পারবেন।

উপরে যে আলোচনা করা হলো, তা কিন্তু নবী (সা)-এর ইজাজ তথা তাঁর হাদীসের মু'জিযার আলোচনা ছিল। যার সাথে হাদীসে রিওয়ায়েতের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ হাদীসের শব্দাবলীর নজিরবিহীন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বিষয়েই ছিল।

কেউ যদি নবী (সা)-এর হাদীসের মু'জিযাকে রিওয়ায়েত ও ফিকহ হিসেবে দেখতে চান তা হলে তাকে মুজতাহিদ ইমামবৃন্দ এবং ফকীহদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে হবে। যেখানে আপনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, ইসলামী শরী'আতের বিধান কতটা গভীর ও সূক্ষ্ম এবং এসব বিধান থেকে প্রয়োজনীয় উপবিধিসমূহ বের করার ক্ষেত্রে উম্মাতের উলামায়ে কিরাম এবং মিল্লাতের ফকীহগণ কি পরিমাণ পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। জীবনের কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায় সহ মেধা-মনন ব্যয় করে শরী'আতের বিধানের পর্যালোচনায় জীবন শেষ করেছেন। তাঁরা যেন এ ঘোষণা দিয়ে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন ঃ

نہ حسنش غایتے دارنہ سعدی راسخن پایان
بمیر دتشنہ مستسقی ودریا همچنیں باقی -

"তাঁর সৌন্দর্যের কোন কুল-কিনারা নেই, শা'দীর বক্তব্য ভাষণেরও কোন সীমা শেষ নেই; (এটি যেমন কিনা) পিপাসায় কাতর ব্যক্তি পিপাসা নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল অথচ সমুদ্র যেমন পানি– ভর্তি ছিল তেমনই রয়ে গেল।"

হযরত নবী (সা)-এর জন্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম একটি মু'জিযা স্বরূপ ছিলেন। অন্যদিকে ফকীহ্‌গণও নবীয়ে উম্মী (সা)-এর আরেকটি মু'জিযা ছিলেন। পার্থক্য এতটুকু ছিল যে, প্রথম মু'জিযা রিওয়ায়েত নামে ছিল আর দ্বিতীয় মু'জিযা দিরায়াত বা বর্ণনা বিষয়ক প্রজ্ঞা ছিল।

মুসলিম উম্মার উলামায়ে কিরাম নবী (সা)-এর তৃতীয় মু'জিযা

সামগ্রিকভাব এ উম্মাতের উলামায়ে কিরাম ও সালেহীন নবী (সা)-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের মু'জিযা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মাতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত বানিয়েছেন এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের উত্তরাধিকারী করেছেন।[১] এ উলামায়ে কিরামকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন অতুলনীয় মেধা, মুখস্থ বিদ্যা ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন যে, প্রাচীন ও আধুনিক ব্যক্তিদের মধ্যে এর সমকক্ষ পাওয়া যায় না। মুহাদ্দিসীনদের ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি কিরামান-কাতেবীনদের নমুনা ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ও ফকীহ্দেরকে ইজতিহাদ তথা গবেষণার শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন। প্রজ্ঞা, অনুভূতি ও পয়েন্ট শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা ও গভীর পর্যবেক্ষণে ঘনিষ্ঠ ফিরিশ্তাদের নমূনা করে বানিয়েছেন। তেমনিভাবে আওলিয়ায়ে কিরাম আরেফীনকে প্রেম-ভালবাসার দৌলত দিয়ে আরশে আযীম ও বায়তুল মা'মূরের দিনরাত্রি তাওয়াফকারী ফিরিশতাকে নমুনা বানিয়েছেন। কোন জাতির মধ্যে ইসলামের উলামায়ে কিরামের মত দক্ষ, যোগ্য মেধাবী পণ্ডিত ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাঁদের সমমর্যাদা ও তাঁদের রচনার সম পর্যায়ের কোন কীর্তি নযরে পড়বে না।

পশ্চিমা জাতি শিল্পপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভিনব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইঞ্জিল ও তাওরাতের কোন রচনা বুখারী বা মুসলিমের মত নযরে আসে না। যাতে তাওরাত ও ইঞ্জীল আদ্যপ্রান্ত স্মরণে আসে এবং না ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান ও ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (র)-এর মত রিজাল শাস্ত্রবিদ ও হাফেয জন্ম নিয়েছে। যে জাতি তাদের নবীগণের গ্রন্থসমূহ স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে পরিবর্তন সাধন করেছে। এমন সম্প্রদায়ের মাঝে আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (র)-এর ন্যায় হাফিযে হাদীস জন্ম নেয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয় এবং না ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিঈর মত মুজতাহিদ ফকীহ দৃষ্টিগোচর হয়– যাঁরা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, বিশ্বাস ও ইবাদত, মু'আমিলাত ও মু'আশিরাত (সামাজিক আদান-প্রদান ও লেনদেন বিধিমালা, রাজনীতি, ও রাষ্ট্র পরিচালনার মত সকল বিষয়কে তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলোকে বিন্যস্ত করতে পারেন এবং না আবুল হাসান আশ'আরী, আবূ মানসূর মাতুরিদী ও ইমাম গাযালী ও ইমাম রাযী, এদের মত কোন যুক্তিবিদ্যার পণ্ডিত তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তর্ক ও বিতর্কের মজলিসে যখন বের হতে হয় তখন ইসলামী আকীদার যথার্থতা তুলে ধরার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল এবং বর্ণনাভিত্তিক প্রমাণসহ উপস্থাপনের জন্য একটি বাহিনী আলিমদের সাথে আছে। বাতিলের গর্দানে তাঁদের যুক্তির তীক্ষ্ণ তীর বিদ্ধ হচ্ছে। এভাবে ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানগণ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এবং কাফিররা অপমানিত ও পরাজিত হয়েছে। এই খেলা দুনিয়াবাসী প্রত্যেক্ষ করেছে এক

১. দেখুন, যারকানী ঃ শারহে মাত্তয়াহিবে লাদুন্নিয়া

সময়। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি জুনায়দ, শিবলী, বায়যিদ সহ অন্যান্যদের মত বুযর্গ, আবেদ, যাহিদ ও আল্লাহওয়ালা এবং আল্লাহর অলী প্রেমিক কোন জাতির মধ্যে পয়দা হয়নি।

তেমনিভাবে খলীল ইবন আহমাদ ও সিবওয়াইহ্ এর মত ব্যাকরণ বিষয়ক পণ্ডিত, ইমাম কুসাই, আবদুল কাহের জুরজানী, সা'দ উদ্দীন তাফতাযানীর মত অলংকার শাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র এ জাতির মধ্যেই পয়দা হয়েছে, অন্যকোন জাতির মধ্যে এমন পাওয়া যাবে না। আর তাওরাত ও ইঞ্জিলের পুরো কোন হাফেযও পাওয়া যাবে না। তাদের মধ্যে মুসলিম সমাজের উলামায়ে কেরামের মত কোন শ্রেণীও পাওয়া যায় না। ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ এবং নাসারা পাদ্রীগণ, হিব্রু বা সুরইয়ানী ভাষায় অথবা ইংরেজি ভাষায় রচিত এমন কোন গ্রন্থ কি দেখাতে পারবেন যা লিসানুল আরব অথবা কামূস, তাজুল উরূস এর মত রচনা হবে? জামাল উদ্দীন ইবন হাজিব এবং জামীর মত গ্রন্থকারদের কথা আর না-ই বললাম। মীযান-মুনশা'আব, সরফে মীর, নাহ্ মীর, এ ধরনের প্রাথমিক স্তরের কোন গ্রন্থও ইয়াহূদী পণ্ডিত পাদ্রীগণ রচনা করেছেন কি-না দেখান। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলা হল, এ থেকে অন্যান্য বিষয় হলো অনুমান করা যাবে।

ইয়াহূদী ও নাসারাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা ও চাহিদা এই যে, ইসলামের আলেম উলামা এবং মূসা (আ)-এর শরী'আত ও ঈসায়ী শরী'আতে আলেম ও পণ্ডিতদের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখুন! শুধুমাত্র শিল্প প্রযুক্তির উন্নতির দিক তাকালে হবে না– কেননা এসব উন্নতি নৈতিক-চারিত্রিক উন্নতি নয়, বরং এসব কারিগরি বিদ্যা। এসবে ধীরে ধীরে উন্নতি হবেই। উল্লেখ্য যে, ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বাস্তব জীবন ও নৈতিকতার উন্নতি মহানবী (সা)-এর শরী'আতের অনুসরণের বরকতে হয়েছে। এটা কি ইসলামের মু'জিযা নয় যে, ইসলামী শরী'আতের অনুসরণের বরকতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে অনন্য উলামায়ে কেরাম ও পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছে, যা অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

৪র্থ মু'জিযা ঃ গায়েবী আওয়াজ, না অনেক গণক জ্যোতিষের কাছেও মরুভূমি এবং পাহাড়ের চূড়া শুনা গেছে যে, এই নবী, তিনি সত্য নবী, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করলে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ ধরনের মু'জিযার বিবরণ বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন 'খাসাইসুল কুবরা' (লেখক ইমাম সুয়ুতী পৃ.১০১-১১০)।

৫ম মু'জিযা ঃ ৫ম মু'জিযা এই যে, বৃক্ষ-পাথর থেকে ঘোষণা আসা যে তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষ্য যেমন ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ। হে আল্লাহর রাসূল! তোমাকে সালাম। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) গাছকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে গাছ উপস্থিত হয়। আবার যখন ফিরে যেতে হুকুম দিলেন তখন গাছগুলো চলে যায়।

নবী করীম (সা) সম্পর্কে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের ভবিষ্যদ্বাণী

সামষ্টিক দলীল হিসেবে তাঁর নবুওয়াতের অন্যতম দলীল হচ্ছে অতীতের নবীগণ আপন উম্মাতের নিকট শেষনবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন যে, শেষ যামানার এক পূর্ণাঙ্গ নবী আরবদেশে প্রেরিত হবেন।

আর এজন্য আহলে কিতাবগণ (ইয়াহূদী ও নাসারা) সেই নবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। এজন্য অনেক নিষ্ঠাবান আহলে কিতাব আলেম নবী (সা)-এর নবুওয়াতের দাওয়াত শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেমন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) আর অনেক আহলে কিতাবের আলেম নবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে থেকেই তাঁর আগমন সুসংবাদ প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা নবী (সা)-এর আগমনের সাক্ষ্যও প্রদান করতেন। লোকদেরকে তারা বলে বেড়াতেন যে, শেষ যামানার নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। অথচ তাদেরই অনেকে প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে নবী (সা)-এর প্রতি আনুগত্য না করে তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগেছিল এবং তাঁর সাথে দুশমনি করতে শুরু করেছিল।

সে কথাই আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

"আমি যে সকল লোককে কিতাব অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল দিয়েছি তারা জানে যে, তিনি সেই নবী যার সুসংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে দেয়া হয়েছে। আর আহলে কিতাবগণ তাঁর আকার আকৃতি দেখে তাঁকে তাদের সন্তানদের ন্যায় চেনে। আর নিশ্চয়ই তাদের একদল সত্যকে গোপন করে অথচ তারা তা জানে যে তা সত্য।" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৬)

যদি নবী (সা)-এর নবুওয়াতের সুসংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে না-ই আলোচিত হত তাহলেও ইয়াহূদী এবং নাসারাদের আলেমগণ একত্রিত হয়ে এর গতিরোধ করত। যেসব মজলিসে এ বিষয়ে তিলাওয়াত করা হত ঃ

اَلنَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ -

তারা ত তখন প্রকাশ্যভাবে প্রতিরোধ করে বলত যে, কুরআনের এ বক্তব্য মিথ্যা। শুধু তা-ই নয় তারা সকল ইয়াহূদী এবং নাসারাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করত। আর মক্কার মুশরিক যারা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রধান দুশমন, তাদেরকেও এ বিষয়ে অবহিত করত। যারা ইয়াহূদী ও নাসারা থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকেও এ বিষয়ের দ্বারা ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালত। অথচ তিনি ইয়াহূদীদের শিক্ষালায়ে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, আমি সেই নবী যার ঘোষণা তাওরাত ও ইঞ্জীল

দেয়া হয়েছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা নবী (সা)-এর এসব সুসংবাদ বিষয়ে নিশ্চিত ও পূর্ণআস্থাশীল ছিলেন।

ইতিহাস গ্রন্থ ও নবী জীবনী পুস্তক থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানা যায় যে, উল্লেখিত বিষয়টি অধিকাংশ ইয়াহূদী ও নাসারা পণ্ডিতের অতীতের আসমানী কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্ম ও নবী হিসেবে আবির্ভাবের সময় জানা ছিল।

১. অতএব তৎকালীন ইয়ামেনের শাসক সাইফ যী ইয়াযন আবদুল মুত্তালিবকে নবী (সা) এর জন্মের কিছুকাল পূর্বে জানিয়েছিলেন যে, আপনার বংশে শেষ যামানার নবী পয়দা হবেন।

২. তাঁর বার বছর বয়সে তাঁকে নিয়ে আপন চাচা আবূ তালিব সিরিয়া সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে এক নাসারা আলেম বুহায়রা পাদ্রী বালক মুহাম্মদ (সা)-কে দেখে আবূ তালিবকে বলেছিলেন, তোমার ভাতিজাকে সতর্কতার সাথে রাখবে, সে শেষ যামানার নবী হবে। আমি আসমানী কিতাবে শেষ যামানার নবীর যত নিদর্শন দেখেছি, তার সবগুলোই তাঁর মধ্যে বর্তমান রয়েছে। ইয়াহূদীরা তাঁর জীবনের জন্য হুমকী স্বরূপ দুশমন হবে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৩. দ্বিতীয়বার তিনি ২৫ বছর বয়সে সিরিয়ায় সফর করেন। সে সময়ও পাদ্রী নাস্তুরা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করে সফরসঙ্গীদেরকে বলেছিলেন, এ ব্যক্তি শেষ যামানার নবী হবেন। আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে শেষনবীর যে সব আলামত লিখিত আছে, তার সবগুলোই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব ঘটনাও এ গ্রন্থের প্রথমদিকে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৪. নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন হযরত খাদীজা (রা) নবী (সা) কে তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবন নওফাল-এর নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও বলেছিলেন যে, এতো শেষ যামানার নবী, যার সুসংবাদ হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) দিয়েছিলেন। এ ঘটনাটির আলোচনাও বইয়ের প্রথমে গিয়েছে।

৫. হযরত সালমান ফারসী (রা) প্রথম জীবনে অগ্নিপূজক ছিলেন। তারপর তিনি সেধর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইয়াহূদী হয়েও তিনি হৃদয়ের প্রশান্তি খুঁজে পাননি। তাই তিনি ইয়াহূদী ধর্মে বর্জন করে ঈসায়ী হয়ে যান। ঈসায়ী আলেমগণ শেষ যামানার নবী সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা তিনি ভালভাবে স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন। হযরত নবী (সা) যখন মদীনা শরীফে হিজরত করে আগমন করেন তখন নবী (সা)-এর খবর জানতে পেয়ে হযরত সালমান ফারসী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি হযরত নবী (সা)-এর পবিত্র নূরানী চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, ইনিই শেষ যামানার নবী যাঁর ব্যাপারে আমি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আসছিলাম। এ ঘটনাটিও পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৬. তৎকালীন হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীও পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলিয়ে দেখে নবী (সা)-কে শেষনবী হিসেবে গ্রহণ করেছেন ও মুসলমান হয়েছেন। এ ঘটনাটিরও ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

৭. ৭ম হিজরীতে নবী (সা) যখন রোম সম্রাট হিরাকল কায়সারের নিকট ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে পত্র লিখেছিলে, তখন কায়সার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থা জানতে চেয়ে যখন অবগত হলেন তখন তিনিও স্বীকার করলেন যে, ইনিই শেষ যামানার নবী, যে সম্পর্কে অতীতের আসমানী কিতাবে সংবাদ দেয়া হয়েছিল। যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এ কাহিনীও পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী

প্রথমে আমরা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুসংবাদগুলো উল্লেখ করব। এটাকে ভাল মনে করা হচ্ছে যে, আমরা প্রথমে সত্য সন্ধানী পাঠককে সতর্ক করার জন্য কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেতে চাই যাতে তারা আহলে কিতাবদের দ্বারা প্রতারিত না হয়।

প্রথম বিষয়

ইয়াহূদী ও নাসারাদের এটি অন্ধবিশ্বাস যে, কোন নবীর নবুওয়াত প্রমাণ করার জন্য শর্ত হল পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী থাকতে হবে এবং আগত নবীর আলামতসমূহও লোকদেরকে অবহিত করা হবে। নবুওয়াতের দাবিদার, যে নবীর মধ্যে এসব আলামত পাওয়া পাওয়া যাবে, তাকে সত্য নবী মনে করা হবে। অন্যথায় তাঁকে মিথ্যা নবী মনে করা হবে। আর ইয়াহূদী ও নাসারাদের আলেমগণ তাঁদের নিজস্বভাবে নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে বলেন যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল এ বিষয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা সুসংবাদ নেই। ইসলামের উলামায়ে কিরাম যেসব ভবিষ্যদ্বাণী নবী (সা)-এর জন্য পেশ করে থাকেন তা হযরত নবী (সা)-এর জন্য প্রযোজ্য নয়।

১. ইসলামের পণ্ডিতদের বক্তব্য হচ্ছে প্রথমত, মাপকাঠির এই মনগড়া সূত্রই ভুল, কেননা নবুওয়াত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাবেক নবীর পরবর্তী নবীর ব্যাপারে খবর দেয়া জরুরী বিষয় নয়। যদি পরবর্তী নবীর নবুওয়াত পূর্বের নবীর খবরের উপর নির্ভরশীল হত তা হলেও আবার পূর্ববর্তী নবীর নবুওয়াত পরবর্তী নবীর সত্যায়নের ওপর নির্ভরশীল হতো। এভাবে নির্ভরশীলতার এক অবারিত ধারাবাহিকতা অনিবার্য হয়ে পড়তো।

২. হযরত হিযকিল ও হযরত দানিয়াল এবং হযরত আশ্‌ইয়াসহ অন্য কয়েকজনের নবী হওয়ার বিষয়টি আহ্‌লে কিতাবদের নিকট স্বীকৃত বিষয়। তাদের কারো সংবাদই পূর্বের আসমানী কিতাবে ছিল না। এ থেকে বুঝা গেল, নবুওয়াত নির্ভর করে মু'জিযা ও নবুওয়তের নিদর্শনের উপর। অবশ্য পূর্বের নবী পরবর্তী নবী সম্পর্কে সংবাদ প্রদান

পরবর্তী নবীর জন্য সম্মানজনক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে এক্ষেত্রে হযরত নবী (সা)-এর ব্যাপারে সাবেক আম্বিয়ায়ে কেরামের সুসংবাদ ইনশাল্লাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান থাকায় বিষয়টি খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

৩. নাসারা আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, সাবেক আম্বিয়ায়ে কেরাম হযরত ঈসা মাসীহ (আ)-এর আগমন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কিন্তু ইয়াহূদী পণ্ডিতদের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সবাই তা অস্বীকার করেন। আর খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ হযরত মসীহের ব্যাপারে সাবেক নবীদের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেন। ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ তাকেও ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং তা হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয় বলে মনে করেন। অতএব ইয়াহূদীরা যেমন হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করে, তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীকেও অস্বীকার করা হয়।

৪. আর সাবেক নবী পরবর্তী নবী সম্পর্কীয় সংবাদে এটা জরুরী নয় যে, আগত নবীর গুণাবলী, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলী এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবেন যে, তাঁকে দেখেই সাধারণ মানুষ ও বিশেষ শ্রেণী সকলেরই তাঁর উপর আস্থা এসে যাবে। বস্তুত বিষয়টি যদি এতই সহজ ও সরাসরি হওয়ার অবকাশ থাকে তাহলেও মু'জিযা ও নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী এবং প্রমাণ-দলীলের কোন প্রয়োজন ছিল না।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ বনী ইসরাঈলের অনেক নবী যেমন ঃ আশইয়া, আরমিয়া, দানিয়াল, হিযকিল ও হযরত ঈসা (আ) অনেক ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছেন। বখতে নসর, ফুরেশ, আলেক্জান্ডারসহ অনেক কিছু সংঘটিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তেমনিভাবে রোম, মিসর, কাবূল সহ অন্যান্য শহর ও জনপদে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। স্বাভাবিক বিবেক এ বিষয়টি অসম্ভব মনে করে যে, যেখানে আম্বিয়ায়ে কেরাম এ ধরনের ছোটখাট বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। সেখানে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন না। কেননা মহানবী (সা)-এর আগমন ও নবুওয়াত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। এ থেকে বুঝা যায়, আম্বিয়ায়ে কেরাম অবশ্যই বিশ্বনবী (সা)-এর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে আহলে কিতাবগণ তাদের কিতাব থেকে তা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তারপরেও তাদের কিতাবে যতটুকু বর্তমান রয়েছে তাতেও তারা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্বনবীর জন্য প্রযোজ্য নয় বলে দাবি করতে চেষ্টা করছে।

তৃতীয় বিষয় ঃ নাসারাদের দাবি হল, হযরত ঈসা (আ) শেষ নবী ছিলেন। তাঁর পরে আর কোন নবী আসা অসম্ভব। আর মুসলমানদের বক্তব্য হচ্ছে, নাসারাদের এ দাবি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন।

১. হযরত ঈসা (আ) নিজে কখনো বলেন নি যে, আমি শেষনবী, আমার পরে কোন নবী আসবে না। ইঞ্জিলে কোথায়ও নেই যে, হযরত ঈসা (আ) শেষনবী।

২. আর হযরত ঈসা (আ) এ কথাও বলেননি যে, আমার আসমানে চলে যাবার পর কোন সত্যনবী আসবেন না; বরং তিনি তারপর একজন মহান রাসূল আসার অর্থাৎ 'ফারকালীত' -এর সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁর উপর ঈমান আনার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। এজন্য আহলে কিতাবের পণ্ডিতগণ ফারকালীতের আগমনের অপেক্ষায় ছিল, কেননা তাঁর প্রতিশ্রুতি ইঞ্জিলে রয়েছে। এ পেক্ষাপটে মুন্টানাস নিজকে প্রকৃত ফারকালীত দাবি করেছে এবং অনেক লোক তার অনুসরণও করেছে।

৩. শুধু তাই নয়, নাসারাগণ হাওয়ারী ও পুলুসকে নবী বলে মনে করে অথচ তাঁদের সকলেই ঈসা (আ)-এর পরে বর্তমান ছিল।

৪. ইঞ্জিলের কিতাবুল আ'মাল অধ্যায়ের একাদশ অনুচ্ছেদে লেখা আছে ঃ

২৭ ঃ সে সময় কয়েকজন নবী জেরুজালেম থেকে এন্তাকিয়া আগমন করবে।

২৮ ঃ তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'আগবস' সে দাঁড়িয়ে আত্মার নির্দেশনায় ব্যক্ত করল যে, সমস্ত পৃথিবীতে আকাল আসবে আর তা কালুদিস (রোম সম্রাট বা কায়সারের) যুগে সংঘটিত হবে।

এখানে ইঞ্জিলের বক্তব্য থেকে কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, জেরুজালেম থেকে এন্তাকিয়ায় কয়েকজন নবী আগমন করবেন, যাদের একজনের নাম আগবাস, আরবী কপিতে আগাবুস ছিল। বিষয়টি দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, এ ঘটনা হযরত ঈসা (আ)-এর পরেই হয়েছিল। অতএব যখন হযরত ঈসা (আ)-এর পরে নবী হওয়া প্রতিষ্ঠিত হল, তখন আর হযরত ঈসা (আ) শেষনবী হতে পারেন না।

৫. আর মথির ইঞ্জিলের সপ্তম অধ্যায়ের ১৫ নং অনুচ্ছেদে হযরত মাসীহের শিক্ষা ও নির্দেশনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, "তোমরা ভণ্ড নবীদের থেকে সাবধান থাকবে।" এ প্রসঙ্গে বক্তব্য দীর্ঘ হয়েছে। যেখানে হযরত মাসীহ্ সতর্ক করেছেন যে, আমার পরে অনেকে নবুওয়াতের মিথ্যাদাবি করবে এবং তারা আমার নামেও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করবে, অর্থাৎ তারা এভাবে বলবে যে, আমি প্রতিশ্রুত মাসীহ্। (যেমন ঃ কাদিয়ানের এক ভণ্ড বলেছে, আমি প্রতিশ্রুত মাসীহ্)। তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কেননা তারা ভেতরে হিংসা রাখে। হযরত মাসীহ (আ) সতর্ক করেছিলেন যে, আমার পরে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদের ধোঁকায় পড়বে না। তিনি কিন্তু এভাবে বলেননি যে, আমার পরে কোন নবী আসবে না, বরং তিনি নবুওয়াতের দাবিদারদেরকে পরীক্ষা করে সত্য-মিথ্যা বাছাই করতে বলেছেন। তারপর ইউহানার পত্র অধ্যায়ের ৪র্থ অনুচ্ছেদে আছে "হে প্রিয়, তুমি প্রতিটি রূহ্কে বিশ্বাস করবে না বরং রূহ্কে পরীক্ষা করবে, সে-কি খোদার পক্ষ থেকে না-কি অন্য কিছু, কেননা অনেক মিথ্যা নবী পৃথিবীতে এসে দাঁড়িয়েছে......।" মোটকথা এই যে, নাসারাদের মূল শিক্ষা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হল যে, হযরত ঈসা (আ) শেষনবী ছিলেন না।

৪র্থ বিষয় ঃ নাসারাগণ বলে থাকে, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাতা দাসী ছিলেন। অতএব বংশ মর্যাদায় ও আভিজাত্যে বনী ইসমাঈল বনী ইসরাঈলের সমকক্ষ হতে পারে না।

তাদের এ ধরনের আপত্তির জবাব হচ্ছে ঃ

প্রথমত ঃ ইয়াহূদীদের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে, হযরত হাজেরা মিসরের বাদশাহ কোন এক ফেরাউনের কন্যা ছিলেন, দাসী বা চাকরাণী ছিলেন না। তাওরাতের নির্ভরযোগ্য মুফাস্সির শালুমালু ইসহাক জন্ম কিতাবের ১৬ অধ্যায়ের প্রথম আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন..........

"অর্থাৎ যখন মিসর অধিপতি সারা -এর কারণে প্রকাশিত কারামত প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমার মেয়ে অন্য ঘরে রাণী হয়ে থাকার চেয়ে তাঁর গৃহে (হযরত সারার) দাসী হয়ে থাকা উত্তম।"[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল, হযরত হাজেরা প্রকৃতপক্ষে দাসী বা চাকরাণী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মিসরের ফিরাউনের কন্যা যাকে বাদশাহ্ হযরত সারার খেদমতে দান করেছিলেন। যখন বাদশাহ্ হযরত সারার কেরামতি দেখেন তখন তার বিশ্বাস জন্মে যে, হযরত সারা ও তাঁর স্বামী হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। এজন্য বাদশাহ্ হযরত সারার খুব সম্মান ও ইযযত করেছেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নিজ কন্যা হযরত সারাকে দান করেন। এভাবে তৎকালীন সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী ২য় স্ত্রী প্রথম স্ত্রীর খেদমত করার সুযোগ পাবে।

দ্বিতীয় জবাব ঃ তিনি যদি দাসীও থেকে থাকেন এতে অবাক হবার কিছু নেই। হযরত ইউসুফ (আ)-কেও ত গোলাম হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। বিশেষ করে যেখানে তাওরাতে দু'টি প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ আছে, একটি ইসমাঈলী প্রতিশ্রুতি ও আরেকটি হল ইসহাকী প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ তা'আলা দু'জনের জন্যই বরকত প্রদানের কথা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে জানিয়েছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বিজয় সন্তানদের মধ্যে বরকত এবং মর্যাদাবান উম্মাতের প্রতিশ্রুতি তাওরাতের ভাগ্য (তাভীন) অধ্যায়ের এবং ৩য় অধ্যায়ে কর্মসমূহে (আমাল) স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, "বনী ইসমাঈলে একজন আজীমুশ্শান নবী আবির্ভূত হবেন।" তারপরেও আল্লাহ তা'আলার বরকতের ওয়াদাকে উল্লেখ না করে গোপন করা এবং কাল্পনিক ত্রুটিকে প্রচার করে বেড়ানো বিবেকের দৃষ্টিতে ও ঐতিহাসিক বর্ণনায় অপরাধ।

১. আরদুল কুরআন, সুলায়মান নদভী, ২ খ. পৃ.৪১ এবং কাসাসুল কুরআন, হিফযুর রহমান, ১ খ, পৃ.৯০।

নাসারাদের উচিত রুমবুলুস দারুমস এবং অগস্টাস-এর ছেলেদের কথা মনে করে লজ্জিত হওয়া, অন্যদিকে যিহুদা ও জন ওরইয়ার অবস্থা যাকে হযরত মসীহের দাদা হিসেবে তারা উল্লেখ করে থাকে তার অবস্থা সম্পর্কে সামান্য খেয়াল করলেও তারা লজ্জায় মাথা তুলতে পারবে না। নাউযুবিল্লাহ! ইয়াহূদী ও নাসারা পণ্ডিতগণের অবস্থা অবাক হবার মত যে, তারা হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম, যার সম্পর্কে হযরত মাসীহের বংশ পরম্পরায় দাদা পরদাদা বা পূর্ব পুরুষ হন তাদের প্রতি শিরক, মূর্তিপূজা মদ্যপান এবং যেনা-ব্যভিচারের মত অপবাদও আরোপ করে থাকে। আর এ বিষয়কে অপমান ও অপবাদ হিসেবেও মনে করে না। পক্ষান্তরে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাতার হযরত হাজেরার খাদেমা হওয়াকে অপমানকর হিসেবে মনে করে। এখানে আমরা পূর্ববর্তী নবীদের হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী থেকে তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত কিছু ভবিষ্যদ্বাণী নমুনা স্বরূপ উপস্থাপন করতে চাই। (পাঠকগণ যদি এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হন তাহলে ফার্সী ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'ইযালাতুল্ আওহাম' এবং আরবী ভাষায় 'ইযহারুল হক' লেখক মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানাভী, যিনি মক্কা মুয়াযযামার সুলুতিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁর গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন।)

সংক্ষিপ্ত সার

হযরত হাজেরা মিসরের শাসকের কন্যা ছিলেন। বাদশাহ হযরত সারার বুযর্গী দেখে তাঁর খেদমত করার জন্য তাঁকে পেশ করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে নিয়ম ছিল যে, আমীরদের যদি কন্যা উপহার দেয়া হত, তারা সেবিকা হত। এজন্য সহীহ বুখারীতে হাদীসের শব্দ এভাবে এসেছে ঃ তাঁকে হাজেরার খেদমতে দেয়া হল। নাসারাগণ কর্তৃক সেবিকাকে সরাসরি দাসী বলে অনুবাদ করে দেয়া স্পষ্ট বে-ইনসাফী।"

প্রথম সুসংবাদ (তাওরাত সফর ইস্তিসনা ঃ অধ্যায় ১৮ শ্লোক বা আয়াত ১৮)

১৮ ঃ "মহাপবিত্র প্রভু আমাকে বলেছেন ঃ তারা যা বলেছে উত্তম বলেছে। আমি তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্যে থেকে তোমার মত নবী প্রেরণ করব এবং আমার কালাম তার মুখ দিয়ে প্রকাশ করব। আমি তাকে যা বলব সে-তাই প্রকাশ করবে।" ১৯ ঃ "আর সে ব্যক্তি এমন হবে যে, আমার কথা যা সে আমার নামে ব্যক্ত করবে তা মান্য করবে না, আমি তার হিসাব নেব।"

২০ ঃ "যে নবী এ ধরনের ধৃষ্টতা দেখাবে যে, আমি তাকে যা বলিনি সে আমার নামে তা বলবে, এমনটি করলে তাঁকে হত্যা করতে হবে।"

২১ ঃ "যদি তুমি মনে কর যে, আমি কিভাবে জানব যে এ কথা আল্লাহর কথা নয়, তাহলে তুমি জেন রাখ, যখন নবী আল্লাহর নামে কিছু বলে তা সে যা বলেছে তা যদি বাস্তবে না হয় তা হলে বুঝতে হবে তা আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য নয়।"

ইসলামের অনুসারীগণ মনে করে থাকেন যে, উল্লিখিত সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বেলায় প্রযোজ্য। আর ইয়াহূদীরা মনে করে থাকে যে, এসব বক্তব্য ইউশার বেলায় প্রযোজ্য, আর নাসারাগণ মনে করে থাকে যে, এগুলো হযরত ঈসা (আ)-এর জন্য প্রযোজ্য। সত্য হচ্ছে, এসব বক্তব্য শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা এ সুসংবাদ ত ঐ নবীর জন্য হবে যিনি হযরত মূসা (আ)-এর সমকক্ষ পর্যায়ের হবেন এবং বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হবেন না, বরং বনী ইসরাঈলের ভাই অর্থাৎ বনী ইসমাঈলের মধ্যে থেকে হবেন। আর সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীতে আগত নবীর গুণাবলীর কথাও আলোচিত হয়েছে। এজন্য মুসলমানগণ মনে করেন, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা) ছাড়া আর কেউ নন।

প্রথম যুক্তি হল ঃ এ সুসংবাদে উল্লেখ আছে যে, আমি বনী ইসরাঈলের ভাইদের মধ্য হতে তোমার সমকক্ষ একজন নবী প্রেরণ করব। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সে নবী বনী ইসরাঈল থেকে হবে না। এ বিষয়ে ঘোষণা এক-দুই ব্যক্তির জন্য ছিল না, বরং বনী ইসরাঈলের সব শাখা ও সম্প্রদায়ের জন্য ছিল। এ ঘোষণা সমগ্র বনী ইসরাঈলের জন্য সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সমস্ত বনী ইসরাঈলের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার ন্যায় এক নবী প্রেরণ করব। এ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, সে নবী বনী ইসরাঈল থেকে হবে না। যদি নবী ইসরাঈল থেকে হবেন তা হলে এভাবে বলা হত যে, তোমাদের মধ্য হতে একজন নবী হবে।

এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

"আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪)

লক্ষণীয় বিষয় হল, এখানে এভাবে বলা হয়নি যে, তোমাদের মধ্য হতে সে নবী আবির্ভূত হবেন। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

وَجَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ

বস্তুত হযরত মূসা (আ) সমস্ত বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেছেন এবং কোন বিশেষ শর্তকে সম্পৃক্ত না করে এভাবে বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে সে প্রতিশ্রুত নবী আসবেন। একথা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল, প্রতিশ্রুত নবী বনী ইসরাঈদের ভ্রাতৃপ্রতিম বংশ বনী ইসমাঈলে হবেন। কেননা বনী ইসমাঈল বনী ইসরাঈলের ভাই। নাসারাগণ বলে থাকে, 'বনী ইসরাঈলের ভাইদের মধ্য থেকে বলে বনী ইসরাঈলই বুঝানো হয়েছে, নাসারাদের একথা, ভাষা, যুক্তি,

বিজ্ঞান সব কিছুরই পরিপন্থি। যেমন ঃ যখন বলা হয় 'যায়দের ভাই' তখন যায়েদ নিজে কি ভাইদের মধ্যে শামিল থাকবে? না, যায়দ ভাইদের মধ্যে শামিল নয়, বরং যায়দ আলাদা। ব্যাকরণ অনুযায়ী যায়দের ভাই যায়দ থেকে আলাদা। পৃথিবীতে কোথাও এই প্রচলন নেই যে, কেউ নিজে নিজেকে ভাই বলে বা নিজের ওপর ভাই শব্দের ব্যবহার করে। তাই বনী ইসরাঈলের ভাই বলে বনী ইসরাঈল অর্থ করা মুর্খতা ও বোকামী ছাড়া কিছু হতে পারে না। আরও উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যেমন ঃ বলা হয়-যায়দ বনী তামীমের ভাই, হূদ সম্প্রদায় আ'দ সম্প্রদায়ের ভাই, সালেহ সম্প্রদায় সামূদ সম্প্রদায়ের ভাই। তবে এভাবে বলা হয় না যে, আ'দ সম্প্রদায় আ'দের ভাই, সামূদ সম্প্রদায় সামূদের ভাই, বনূ হাশিম বনূ হাশিমের ভাই। তেমনিভাবে বনী ইসরাঈল বনী ইসলাঈলের ভাই এভাবে বলা অশুদ্ধ ও মূর্খতা এবং বোকামী। এজন্য বনী ইসরাঈলদের ভাইদের মধ্যে বলতে বনী ইসরাঈলকে বুঝানো বা তাদের বংশধর ও প্রজন্মকে বুঝানো পুরোপুরি বোকামী। আর বাইবেলের জন্ম পুস্তকের ১৬ অধ্যায়ের ১৩ অনুচ্ছেদে বনী ইসরাঈলের মুকাবেলায় হযরত ইসমাঈল (আ) এবং তাঁর সন্তানদের প্রসঙ্গে এভাবে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

১৩ ঃ "তিনি তাঁর সকল ভাইদের সামনে জীবন যাপন করবেন।" আর তাওরাতের জন্ম সফরের ২৫ অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ

"হযরত ইসমাঈল (আ) তার সকল ভাইদের বর্তমানে মৃত্যুবরণ করেছেন।"

এখানে দুই বক্তব্যেরই বনী ইসমাইলের ভাইয়েরা বলতে বনী আয়স ও বনী ইসরাঈলকে বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে সকলে একমত। অন্যদিকে ইয়াহূদী ও নাসারাগণ এ বিষয়েও একমত যে, শুধুমাত্র বনী আয়স-এর মধ্যে কেউ নবী হননি। এ বিষয়ে তাদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যেসব সন্তান কাতূরার গর্ভ থেকে হয়েছে, তাদের মধ্যে কাউকে নবুওয়াত ও বরকত -এর কোন ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা করেননি। আর হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বরকতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

আহলে কিতাবদের একটি বিকৃতির উল্লেখ

আহলে কিতাবের পণ্ডিতগণ এ সুসংবাদে একটি শব্দ সংযোজন করেছেন। তা হল "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে তোমার ভাইদের মধ্য হতে তোমার সমকক্ষ বা তোমার মত একজন নবী প্রতিষ্ঠা করবেন।" (দেখুন এ অধ্যায়ের ১৫ অনুচ্ছেদ)। (এ শব্দ বৃদ্ধির কারণ হল) যেন এ সুসংবাদ হযরত নবী করীম (সা)-এর সত্যায়ন বলে গণ্য না হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'তোমাদের মধ্যে' শব্দটি পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হয়েছে। এ বিকৃতির প্রমাণ হল ঃ তাওরাতের সফর অধ্যায়ে ১৮ অনুচ্ছেদে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধন করে যা বলেছেন– তাতে কথাটি এভাবে আছে যে, "আমি তাদের ভাইদের মধ্য হতে তোমার মত একজন নবী নাযিল করব।"

এখানে 'তোমাদের মধ্যে' শব্দটি নেই। তেমনিভাবে কর্ম অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদের ২২ নং বাক্যেও এ বিষয়ের আলোচনা আছে। সেখানে 'তোমাদের মধ্য' শব্দটি নেই। আর হযরত মাসীহের হাওয়ারীগণ যেখানে এ বিষয়টি আলোচনায় এনেছেন, তারাও কিন্তু কোথায়ও এবাক্য অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে' কখনো উল্লেখ করেননি। এতে বুঝা যায়, বিষয়টি পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে।

যদি ধরে নেয়া যায় যে, এ শব্দটি সংযোজিত নয়, তবুও এর অর্থ ত এরূপ হতে হবে যে, তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত-গুযার লোকদের মধ্যে হতে আর তার অর্থ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশ থেকে হবে।

সারকথা ঃ হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের ১২টি বংশের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তাদের ভাইদের মধ্য হতে একজন নবীকে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করবেন। একথা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত নবী বনী ইসরাঈল থেকে হবে না। যদি বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুত নবী হবার ইচ্ছা থাকত তাহলে এভাবে ঘোষণা হত যে, তাদের মধ্যে অথবা তাদের প্রজন্ম থেকে নবীর আগমন হবে। এমন ক্ষেত্রে ভাইদের মধ্য থেকে শব্দের প্রয়োজন ছিল না। ভাইদের মধ্য থেকে হবে বলে বলিষ্ঠ ঘোষণা এ কথাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, প্রতিশ্রুত নবী তাদের পরবর্তী বংশধারা ও রক্তধারায় হবে না।

হযরত ইউশা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) দু'জনই বনী ইসরাঈলী ছিলেন। তাঁরা বনী ইসরাঈলের ভাইদের অর্থাৎ বনী ইসমাঈলের মধ্যে থেকে ছিলেন না। এজন্য তাঁরা দু'জন সুসংবাদ ও প্রতিশ্রুত নবীর বাস্তব রূপ হতে পারেন না। সেই প্রতিশ্রুত নবীর বাস্তবরূপ শুধুমাত্র সেই নবীই হতে পারেন যিনি বনী ইসমাঈলের হবেন। বনী ইসরাঈলের নবীগণ এই সুসংবাদের লক্ষ্য হতে পারেন না।

দ্বিতীয় কথা ঃ এ সুসংবাদে উল্লেখ আছে, "তোমাদের মত একজন নবী প্রেরণ করব।" আর হযরত ইউশা (আ) হযরত মূসা (আ) এর মত ছিলেন না। এবং হযরত ঈসা (আ)ও হযরত মূসা (আ) এর মত ছিলেন না। বরং তারা দু'জনই ছিলেন বনী ইসরাঈলী। তাওরাতের সফর অধ্যায়ের ৩৪ পাঠে আছে ঃ "বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মূসা (আ)-এর মত আর কেউ ছিল না আর হবেও না।"

শুধু তা-ই নয়, হযরত ইউশা (আ) হযরত মূসা (আ)-এর শিষ্য ছিলেন। মুরব্বি ও অনুসারীকে সমকক্ষ মনে করা হয় না। অন্যদিকে হযরত ইউশা হযরত মূসা (আ)-এর সমসাময়িক ছিলেন। আর সুসংবাদে রয়েছে, আমি একজন নবী প্রেরণ করব এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, সেই নবী ভিন্ন এক সময়ে আবির্ভূত হবেন। হযরত ইউশা হযরত মূসা (আ)-এর যমানায়ই নবী হয়েছিলেন। অতএব তিনি সুসংবাদের বাস্তব রূপ কিভাবে হতে পারেন?

এতে প্রমাণিত হল হযরত ঈসা (আ)ও হযরত মূসা (আ)-এর মত ছিলেন না। নাসারাদের নিকট ত হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর পুত্র অথবা তিনি নিজেই খোদা আর হযরত মূসা (আ) হলেন আল্লাহর বান্দা, তিনি আল্লাহর পুত্রও নন্ অথবা আল্লাহও নন। এজন্য হযরত মূসা (আ)-এর মত হযরত ঈসা (আ) (অন্তত) তাদের ধারণা অনুযায়ী সমকক্ষ হতে পারেন না।

পক্ষান্তরে নাসারাদের বিশ্বাস হচ্ছে হযরত ঈসা (আ) শূলীতে নিহত হয়ে নিজ উম্মাতের অপরাধ মোচনের দায়িত্ব নিয়েছেন আর হযরত মূসা (আ) না শূলিতে নিহত হয়েছেন আর না তিনি উম্মাতের অপরাধের দায়ভার গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে হযরত ঈসা (আ)-এর শরী'আতে তিনি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি, যিনার শাস্তি, বিচার ব্যবস্থা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা, গোসল, পবিত্রতা, এসব বিধি-বিধানের ব্যাপারে নীরব রয়েছেন। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ)-এর শরী'আতে এসব বিষয়ের আলোচনা আছে। এজন্য হযরত মূসা (আ)-এর শরী'আতের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরী'আতের মিল রয়েছে। হযরত মূসা (আ) যেমনিভাবে আলাদা শরী'আতের প্রবর্তক ছিলেন, তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)ও আলাদা শরী'আতের প্রবর্তন করেছেন। আমাদের নবীর শরী'আতে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ, দণ্ডবিধি, শৃংখলাবোধ, সতর্কতাবিধি, জিহাদ, মৃত্যুদণ্ড, হারাম-হালালের বিধিসহ সব ধরনের এবং সব বিধি বিধান ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকাশ্য-সূক্ষ্ম সব বিধান ও ব্যবস্থা রয়েছে।

হযরত মূসা (আ) যেভাবে তাঁর উম্মাত তথা বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের খপ্পর থেকে মুক্ত করে ইযযত ও মর্যাদাবান করেছেন, তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরব জাতি তথা তাঁর উম্মাতকে রোম ও পারস্যের অধীনতা থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর বাণী শিক্ষা দিয়েছেন। কায়সার ও কিসরার ধনভাণ্ডারের মালিকানা মুসলমানদেরকে অর্পণ করেছেন। আর যেভাবে হযরত মূসা (আ) ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহ করে পারিবারিক জীবন গড়েছিলেন, তেমনিভাবে আমাদের নবী (সা) পূর্ববর্তী নবীদের নিয়মধারা অনুযায়ী দাম্পত্য জীবন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। এ সাদৃশ্য বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً -

"আমি তোমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, তোমাদের জন্য সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে। যেমনিভাবে আমি ফিরাউনের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম।" (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১৫)

আরও দেখার বিষয় হচ্ছে ঃ হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইউশা (আ) কিন্তু কখনো সমকক্ষ বা সাদৃশ্যের দাবি করেননি। আর যদি বলা হয় সমকক্ষ হবার অর্থ হল যে, প্রতিশ্রুত নবী বনী ইসরাঈলে হবে, তখন বলা যায়, তা হলে হযরত ঈসা (আ)

এবং হযরত ইউশা (আ)-এর বিশেষত্ব কি ? হযরত মূসা (আ)-এর পর বনী ইসরাঈলে হাজার হাজার নবী আগমন করেছেন। তাহলে প্রত্যেক নবীই ত প্রতিশ্রুত নবীর বাস্তব নমুনা হতে পারেন। আর হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইউশা (আ)-এর জন্য যদি কোন পর্যায়ে সমকক্ষতা সাব্যস্ত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে আমাদের নবী (সা)-এর মধ্যে হযরত মূসা (রা)-এর সাথে মিল আছে এরকম মিল সেখানে পাওয়া যাবে না।

তৃতীয় ঃ উক্ত সুসংবাদে এতটুকু কথাও উল্লেখ আছে যে, "আমি তাঁর মুখে আমার বাণী (নিক্ষেপ) প্রেরণ করব।" অর্থাৎ সেই নবীর নিকট তাওরাত ও যবূরের মত লিখিত কিতাব নাযিল হবে না, বরং আল্লাহর ফিরিশতা মারফত অহী নাযিল হবে এবং তিনি নিরক্ষর নবী হবেন। ফিরিশতা থেকে শ্রবণ করে আল্লাহ তা'আলার কালাম মুখস্ত করবেন। নিজের মুখে পড়ে তিনি উম্মাতকে অহী শুনাবেন। এসব কথার বাস্তব উদাহরণ আমাদের নবী (সা) (তাঁর জন্য আমাদের পিতামাতা কুরবান হোক) ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

"তিনি নিজের থেকে কোন কথা বলেন না, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত ওহীই তিনি বর্ণনা করেন।" (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩-৪)

চতুর্থ ঃ সে সুসংবাদে এ বিষয়টিও ভালভাবে রয়েছে যে, যারা উক্ত প্রতিশ্রুত নবীকে অমান্য করবে, তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখানে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা পরকালের শাস্তির অর্থে বুঝানো হয়নি, কেননা যে কোন নবীকে অমান্য করলেই পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এজন্য দুনিয়ার শাস্তি প্রতিশ্রুত নবীর অমান্যকারীর ক্ষেত্রে সে নবীর বিশেষ মর্যাদা হিসেবে দেখা হয়। বরং দুনিয়ার শাস্তির ক্ষেত্রে জিহাদ, কিতাল (যুদ্ধ) দণ্ডবিধি, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অর্থে বুঝানো হয়েছে। আর এ বিষয়টি হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইউশা (আ)-এর বেলায় প্রযোজ্য ছিল না, বরং শেষনবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বেলায় এসব বিষয়ে ও শর্তাবলী পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তব ছিল।

পঞ্চম ঃ এ সুসংবাদে একথাও ছিল যে, যদি সে নবী (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহর অহীর ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নেন তা হলে তাকে হত্যা করা হবে। আমাদের নবী করীম (সা) নবুওয়াতের ঘোষণা দেয়ার পরও তাঁকে হত্যা করার হয়নি। তবে দুশমনেরা তাঁর বিরুদ্ধে সব ধরনের ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা চালিয়েও সফল হতে পারেনি। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ -

"হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহ তা'আলার নি'আমতসমূহকে স্মরণ কর, যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল যে, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা তোমাকে বহিষ্কার করে দিবে। তারা ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহ তা'আলা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, বস্তুত আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ কৌশলী।" (সূরা আনফাল ঃ ৩০)

আর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ "তুমি সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ থাকবে।" যখন কোন ধরনের দুর্ঘটনা হত, তখনই নবী (সা)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। তাই যদি নবী (সা) প্রতিশ্রুত নবী না হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি নিহত হতেন। তবে নাসারাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়েছেন। তাই একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, যদি হযরত ঈসা (আ)-কে সেই প্রতিশ্রুত নবী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয় তা হলে (নাউযুবিল্লাহ) তাঁকে মিথ্যাবাদী হিসেবে ধরতে হবে। আর এ প্রসঙ্গটির প্রতি আল-কুরআনে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلاً اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

"যদি আমি তোমাকে দৃঢ়পদ না রাখতাম তাহলে আশংকা ছিল যে, তুমি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়তে। তখন আমি তোমাকে জীবন ও মৃত্যুর দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করাতাম। তখন তুমি আমার শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য কোন সাহায্যকারী খুঁজে পেতে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৪-৭৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ـ

"যদি সে (মুহাম্মদ সা) আমার উপর সামান্যতম মিথ্যা আরোপ করত তাহলে আমি তাকে ডান হাতে পাকড়াও করতাম, তারপর তার গর্দানের প্রধান শিরাটি কেটে ফেলতাম।" (আল হাক্কা ঃ ৪৪)

তাওরাতের বিংশতম পাঠে উল্লেখিত হয়েছে যে, "যদি সে নবী আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে তা হলে যে নিহত হবে।" তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন সাধারণভাবে একজন নবী নিহত না হওয়া সত্য নবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ বা যুক্তি নয়। কেননা অনেক সত্য নবী যারা শহীদ হয়েছেন এতে তাঁদের ব্যাপারে বিরূপ ধারণা হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"আর তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত।" (সূরা বাকারা)

বিশেষ করে নাসারাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হযরত ঈসা (আ)-এর নবুওয়াত সত্যতা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। বরং প্রতিশ্রুত নবী নিহত না হওয়া শুধুমাত্র তাঁর জন্য সত্য নবী হবার প্রমাণ। তাওরাতের এ বাক্য থেকে তা-ই বুঝা যায়।

"যে নবী এ ধরনের অপরাধ করবেন........ তাঁকে হত্যা করা হবে।" দু'টি কথারই সর্বনাম দিয়ে প্রতিশ্রুত নবীকেই বুঝানো হয়েছে। যদি সাধারণভাবে হক নবীর জন্য একটি প্রযোজ্য হত তা হলেও (নাউযুবিল্লাহ) হযরত যাকারিয়া (আ) হযরত ইয়াহইয়া (আ) কে মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করতে হয়। এমনকি নাসারাদের আকীদা অনুযায়ী যেহেতু হযরত ঈসা (আ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়েছেন তা হলেও তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। এসব আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, আসলে এ সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিশ্রুত নবীর জন্য প্রযোজ্য ছিল, যার জন্য সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। যদি সাধারণভাবে নবীদের জন্য তা প্রযোজ্য বলে ধরা হয় তাহলে ইয়াহূদী ও অইয়াহূদী যারা হযরত ঈসা (আ)-কে নবী বলে বিশ্বাস করে না, তারা এটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারবে।

ষষ্ঠ ঃ সুসংবাদে একথাও ছিল যে, প্রতিশ্রুত নবীর বক্তব্য তথা ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিফলিত হবে। আল-হামদুল্লিাহ! মহানবী (সা)-এর সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে, সামান্যতম ব্যতিক্রম হয়নি। আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে একথা ঘোষণা করছি কিয়ামত পর্যন্ত এ সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবীর কোন ভবিষ্যদ্বাণীর কোন ভুল কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। আর এসব গুণ আমাদের নবী (সা)-এর মধ্যে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত ছিল যে, তাঁর দুশমন ও হিংসুকেরাও তাঁকে আলামীন তথা বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী পদবীতে ভূষিত করা ছাড়া উপায় ছিল না।

কেউ স্বীকার করুন বা না করুন, এ গুনাহ্গার বান্দা নবীয়ে উম্মীকে (তাঁর জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক) সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী হিসেবে উদিত সূর্য ও দিবালোকের চেয়ে অধিক বিশ্বাস করি। আর মহান আল্লাহ তা'আলা যাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর নাম শপথ করে তাঁকে সাক্ষী করে সমস্ত ফিরিশতাদেরকে সাক্ষী করে হৃদয়ের প্রশান্ত চিত্তে, নিষ্ঠা ও আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহভাবে তিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী। মানব জাতির মধ্যে তিনি সবচেয়ে অধিক সত্যবাদী ও সত্যপন্থী।

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلٰى ذٰلِكَ اٰمِيْنَ

সপ্তম ঃ তাওরাত কিতাবের কার্যাবলী অধ্যায়ের ৩য় খণ্ডের ৭ম পাঠ অধ্যয়ন করলে পরিষ্কারভাবে মনে হয়, প্রতিশ্রুত ও প্রত্যাশিত নবী হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ঈলিয়া (আ) নন, বরং সব নবী থেকে ব্যতিক্রমী নবী। তাওরাতের কথাটি এরূপ?

"এখন হে ভাইয়েরা, আমি জানি তোমরা বোকামী করেছ, যেমন তোমাদের নেতারাও করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল নবীর মুখে পূর্বে থেকে যে খবর দিয়েছিলেন যে, মাসীহকে দুঃখকষ্ট করতে হবে।"

১৯ ঃ "তারপর তোমরা তাওবা কর ও মনোযোগী হও যেন তোমার পাপ মুছে যায়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করবেন।"

২০ ঃ "আর মাসীহকে তারপর প্রেরণ করা হবে যার ঘোষণা তোমাদের মধ্যে পূর্বেই হয়েছে।"

২১ ঃ "অবশ্যই আসমান এজন্য বাকী থাকবে যে, নবীদের কণ্ঠে যে সব বিষয়ে প্রথম থেকে উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলো যতদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকবে।"

২২ ঃ "তারপর হযরত মূসা বাবা-দাদাদেরকে বললেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রভু, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য হতে একজন নবী প্রেরণ করবেন, সে যা বলবে তা তোমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে।"

২৩ঃ "যারা সেই নবীকে মান্য করবে, সে যা বলবে তা তোমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে।"

২৪ ঃ "যারা সেই নবীকে মান্য করবে না তারা ধ্বংস হয়ে যাবে",

২৫ ঃ "বরং সামওয়াল থেকে শুরু করে পরবর্তী সব নবী তাদের উভয়ের খরব দিয়েছে।"

২৬ ঃ "তোমরা নবীদের প্রজন্ম ও সে যুগে আল্লাহ্ তা'আলা বাপ-দাদাদের সাথে ওয়াদা করেন যখন আব্রাহামের সাথে বলেছেন, তোমার পরবর্তী প্রজন্ম থেকে সমস্ত দুনিয়া বরকত পাবে।"

উক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, হযরত মাসীহ্ (আ)-এর সুসংবাদ এবং কষ্টের কথা যা ইয়াহূদীদের পক্ষ হতে তিনি ভোগ করেছিলেন এবং আকাশ থেকে তাঁর অবতরণের কথাও উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে হযরত মূসা (আ) তাঁর উম্মত বনী ইসরাঈলকে সংবাদ জানিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভাইদের অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করবেন এবং হযরত মূসা (আ) ব্যতীত সব নবীই সেই প্রতিশ্রুত নবী আগমনের খবর জানিয়েছেন। যখন প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত নবী প্রকাশিত হবেন ততদিন পর্যন্ত এ আকাশ-যমীন অবশ্যই স্থায়ী থাকবে। আর সে যুগে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করবে যা তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে করেছিলেন যে, তোমার মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বরকত লাভ করবে।

পরিশেষে বলা যায়, হযরত ঈসা মাসীহ্ (আ)-এর সুসংবাদ হযরত মূসা (আ) হযরত ইব্রাহীম (আ)-সহ সমস্ত নবী (আ) প্রদান করেছেন ও যার প্রতীক্ষা এ ধরনের বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, "নিশ্চয়ই আসমান-যমীনের সবকিছু সে সময় পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম থেকেই সব নবীর মাধ্যমে যে মহান নবীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি আপন অবস্থায় আগমন করবেন।"

এ বিষয়ে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল যে, প্রতিশ্রুত ও প্রত্যাশিত সে নবী ঐ সমস্ত নবী থেকে ভিন্ন এক সত্তা যারা হযরত ঈসা (আ) থেকে হযরত মূসা (আ) পর্যন্ত

আগমন করেছিলেন। এজন্য এর ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্য হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর যামানার কেউ হতে পারে না। তাই হযরত ইউশা ও হযরত মাসীহ্ ইবন মরিয়মকে -এর সুসংবাদের পাত্র ঠিক করা কিভাবে যৌক্তিক হতে পারে ?

অষ্টম ঃ ইউহান্না ইঞ্জিলে প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "যখন ইয়াহূদীগণ জেরুজালেম থেকে গণক ও যাদুকরদেরকে প্রেরণ করল, যে তোমরা তাদেরকে প্রশ্ন করবে তুমি কে ? আর তিনি স্বীকার করে বলেছেন যে, তিনি মাসীহ্ নন্, তখন তারা তাকে প্রশ্ন করল, তুমি তাহলে কি ইলিয়া ? সে বলল ঃ না আমি তা নই। তারা বলল, তাহলে কি তুমি সেই নবী ? সে জবাব দিল না।" এসব কথা থেকেও সাফ বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত মাসীহ ও হযরত ইলিয়া (আ) ব্যতীতও তারা একজন নবীর প্রতীক্ষায় ছিল। তাঁর পরিচিতি ও প্রতিশ্রুতি এত ব্যাপক ছিল যে, হযরত মাসীহ্ (আ) ও হযরত ইলিয়া (আ) এর নামের মত তাঁর নাম উল্লেখেরও তেমন প্রয়োজন ছিল না, বরং তারা বলে ছিল 'সেই নবী' এতটুকু যথেষ্ট ছিল।

যদি হযরত মাসীহ (আ) এ সুসংবাদের মূল ব্যক্তিত্ব হতেন তাহলে তিনি কার প্রতীক্ষা করেছিলেন। তিনি যে নবীর প্রতীক্ষা করেছিলেন তিনি আমাদের নবী (সা) ছিলেন। এজন্য আহ্লে কিতাব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্য 'সেই নবী' শব্দ ব্যবহার করত। আর সব সময় মুসলমানগণ হযরত বলে নবী (আ)-কে বুঝিয়ে থাকেন।

নবম ঃ ইউহানার ইঞ্জিলের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৪০ নং পাঠ থেকেও বুঝা যায় যে প্রতিশ্রুত নবী হযরত ঈসা (আ) থেকে আলাদা একজন নবী। ইঞ্জিলে বলা হয়েছে ঃ

৪০ ঃ তখন তাদের উত্তম লোকেরা তা শুনে বলল ঃ আসলে এ হচ্ছে 'সেই নবী' আর অন্যরা বলল ঃ এ হল মাসীহ্। প্রতিশ্রুত নবীকে হযরত মাসীহ-এর মুকাবিলায় উল্লেখ করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, সে প্রতিশ্রুত নবী হযরত ঈসা (আ) থেকে ভিন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। অতএব 'সেই নবী' হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত নবী আর কোন নবী হতে পারেন? হযরত নবী (সা)-এর যামানার ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনেক আলেম এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত সত্য নবী যাঁর সংবাদ হযরত মূসা (আ) দিয়েছিলেন আর তিনিই সে সুসংবাদের বাস্তব ব্যক্তিত্ব। তাদের মধ্যে থেকে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মুখায়রিক ইয়াহূদী ও যাগাতীর ঈসায়ী তাদের অন্যতম ছিলেন। আবার অনেকে এসব বিষয়ে স্বীকার করলেও মুসলমান হয়নি যেমন ঃ রোম সম্রাট হিরাক্‌ল, আবদুল্লাহ ইবন মরিয়া ইয়াহূদী তারা স্বীকার করেছে তিনিই সেই সত্য নবী যার প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ) দিয়েছিলেন কিন্তু এরা ইসলাম গ্রহণ করেনি।

দ্বিতীয় সুসংবাদ ঃ (তাওরাতের জন্ম পুস্তক ১৭ থেকে ২০ পাঠ)

"ইসমাঈলের মাধ্যমে আমি তোমার সন্তানদের মধ্যে বরকত দেব ও তাদেরকে ব্যাপক করব। তাঁদের মধ্যে বারজন নেতা পয়দা হবে আর আমি তাদেরকে নিয়ে বিশাল জাতি গঠন করব।"

আর এ অধ্যায়ের ৮ম পাঠে বলা হয়েছে ঃ

"আর আমি তোমাকে এবং তোমার পরে তোমার বংশকে কিন্‌'আনের সমস্ত রাজত্ব দান করব।"

১৬ নং পাঠে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তা'আলার ফিরিশতাগণ হযরত হাজেরাকে বলল ঃ "তুমি গর্ভবতী, তুমি একটি ছেলে প্রসব করবে। ছেলের নাম রাখবে ইসমাঈল। সে দুঃসাহসী হবে। তার হাত সকলের উপরে থাকবে। অন্যদের হাত তার নিচে থাকবে। সে তার সকল ভাইয়ের সংগে জীবন যাপন করবে।"

আর ২৫ ঃ পাঠে বলা হয়েছে ঃ-

"তাঁর ছেলে ইসহাককে আল্লাহ তা'আলা বরকত দিয়েছেন।"

সারকথা হল, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসহাক (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাঁদেরকে তিনি বরকত দান করবেন, বস্তুত তা-ই হয়েছে। হযরত ইসহাক (আ)-এর সন্তানগণ বরকত পেয়েছেন। কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত নবুওয়াত ও রিসালাত তাঁদের বংশের মধ্যে চলেছে। হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশে নবী ও রাসূল হয়েছিল। তারপর যখন দ্বিতীয় ওয়াদা পূরণে সময় এল, তখন নবুওয়াত ও রিসালাতের বিষয়টি বনী ইসরাঈল থেকে পরিবর্তিত হয়ে বনী ইসমাঈলে স্থানান্তরিত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ অনুযায়ী মক্কার পাহাড়ের চূড়া থেকে সিনাই পর্যন্ত সৌভাগ্যের বিজলী চমকায়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

তাওরাতের জন্ম পুস্তকের ২১ অধ্যায় থেকে জানা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে হিজাযে পবিত্র মক্কা উপত্যকায় রেখে ফিরে যান। হযরত সারার ইন্তিকালের পর হযরত ইবরাহীম (আ) পবিত্র মক্কা উপত্যকায় আগমন করেন। সে সময় হযরত ইসমাঈল (আ) যুবকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনে মিলে কা'বা ঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
.اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ـ

"সে সময়কে স্মরণ কর, যখন হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) বায়তুল্লাহর দেয়াল তুলছিলেন। তাঁরা এ দু'আ করছিলেন হে রব! আমাদের এ কাজ তুমি কবূল কর, নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শোন এবং জান। আর হে রব! তুমি

আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একদল লোককে তোমার অনুগত (মুসলমান) বানাও।" (সূরা বাকারা ঃ ১২৭-১২৮)

পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, এখানে কার সন্তান বলা হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে তো বুঝা যায় যে, এ সন্তান বলতে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা পবিত্র মক্কা উপত্যাকা ও কা'বার আশেপাশে বসতি করেছেন। এই সন্তানদের জন্য প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا এভাবে দু'আ করেছেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় দু'আতে বলেছেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً (اى فى هذه الذرية هَاجرة واسمعيل) مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

"হে রব! তাদের মধ্যে (অর্থাৎ হাজেরা ও ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্যে) এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর যে তোমার কিতাব তিলাওয়াত করবে। লোকদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দিবে এবং (কুফর ও শিরক্ থেকে) তাদেরকে মুক্ত করবে। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী।" (সূরা বাকারা ঃ ১২৯)

আল্লাহ তা'আলা যেভাবে আল-কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর উল্লেখ করেছেন তেমনিভাবে দু'আর জবাবও উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِىْ الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ -

"আল্লাহ তা'আলা নিরক্ষর লোকদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলার আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, তাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দেয়। তাঁরা ইতিপূর্বে প্রকাশ্যভাবে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল।" (সূরা জুমু'আ ঃ ২)

সারকথা ঃ পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে হযরত নবী (সা)-এর থেকে অধিক বরকতওয়ালা কেন্'আনের যমীনে কোন সন্তান কি ছিল? নবী করীম (সা) থেকে বড় ও উঁচু হাতের মালিক কি কেউ ছিল? যাকে ও যার হাতে যমীনের ভাণ্ডারের চাবী প্রদান করা যেতে পারে? আর বারজন নেতা বলতে বারজন খলীফা বুঝানো হয়েছে। নবী (সা) বলেন ঃ

يدور رحى الاسلام الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش -

"ইসলামের চাকা বারজন খলীফার হাতে ঘুরবে আর তারা সকলেই হবে কুরায়শ।"

মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুনিপূণ কৌশল হিসেবে হযরত ইসহাক (আ) এর বংশধরদের দেয়া বরকত থেকে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেননা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশেই হযরত বিশ্বনবী (সা) জন্মগ্রহণ করবেন ও করেছেন।

যদি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রথমে প্রতিফলিত হত তা হলে তো নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা বন্ধ হয়ে যেত, কেননা শেষনবী ও রাসূলের পরে তো আর কেউ নবী-রাসূল হতে পারে না। আর এ জন্য হযরত ইসহাক (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় নবী হয়েছেন। বনী ইসমাঈলদের জন্য এ নি'আমতের কথা এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ) এর জন্য এভাবে দু'আ করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً -

"হে আমাদের রব! তাদের মধ্যে প্রেরণ কর এক মহান রাসূল।" তিনি কিন্তু এভাবে বলেননি' رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رُسُلاً "হে আমাদের রব! আপনি তাদের মধ্যে আরও অনেক নবী প্রেরণ করুন।" এতে ভালভাবে বুঝা গেল, হযরত ইবরাহীম (আ) বনী ইসমাঈলে এমন একজন নবী প্রেরণের জন্য দু'আ করেছিলেন যাঁর পরে আর কোন নবীর প্রয়োজন না হয়। তিনি একক শব্দ 'রাসূল' ব্যবহার করেছেন বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে 'রুসুল' বলেননি।

وعن أبى العالية فى قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعنى امة محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له قد استجيب لك وهو كائن فى اخر الزمان وكذا قال السُّدى وقتادة - ابن كثير -

"আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত ইবরাহীম (আ) এ দু'আ করেন رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বলা হয়েছে, তোমার দু'আ কবূল হয়েছে আর সে নবী আসবে শেষ যামানায়। কাতাদাহ্ ও সুদ্দী থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। (ইবন কাসীর, ১ খ. পৃ. ৩৩১)

كائن فى اخر الزمان সে শেষ যামানায় হবে বলে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি আমার পিতা ইব্‌রাহীম (আ) এর দু'আ ঃ اَنَا دَعْوَةُ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ আর এজন্যই হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর এ দু'আ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মাতের জন্য বিশাল মর্যাদা ও অনুগ্রহ স্বরূপ। তাই আমরা اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ পড়ার পর كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ পড়া কৃতজ্ঞতা হিসেবে জরুরী করে নিয়েছি। অথবা বিষয়টি এভাবে বলা যায়, আমরা দুরূদের সময় নবী ও

রাসূলের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নির্দিষ্ট করে তাঁর সে দু'আরই প্রতিউত্তর দিচ্ছি।

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّالْحِقْنِيْ بِالصَّالِيْنَ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِيْ الْاٰخِرِيْنَ ـ (সূরা শু'আরা ঃ ৮৪)

আর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিক্‌মতও দান করেছিলেন এবং সালেহীনের মধ্যেও শামিল করেছেন। সর্বশেষে শেষ যামানার উম্মাত তাঁর জন্য যে দু'আ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ শব্দাবলী দ্বারা জারী রেখেছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহত থাকবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানদেরকে বরকত দেয়ার ওয়াদা ছিল এ জন্য كَمَا بَارَكْتَ শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। হয়ত বারজন নেতা বলে খলীফাদেরকে বুঝানো হয়েছে ও খতমে নবুওয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পর নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা বন্ধ হয়ে যাবে এবং খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের ধারা অব্যাহত থাকবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের জন্য খিলাফত ব্যবস্থা চালু রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ ـ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যোগ্যতর কর্ম করেছে, আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে যমীনের খিলাফত দান করবেন।" (সূরা নূর ঃ ৫৫)

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ بَعْدِيْ ثَلَاثُوْنَ عَامًا

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كَلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لَانَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ ـ

"হযরত নবী (সা) বলেন ঃ নবুওয়তের খিলাফত আমার পরে ৩০ বছর থাকবে।" রাসূলুল্লাহ (সা) আরও ফরমান ঃ "বনী ইসরাঈলের শাসন ব্যবস্থা নবীগণ করতেন। যখন কোন নবী গত হতেন তখন আরেকজন নবী তাঁর গদীনশীন হতেন, কিন্তু আমার পরে কোন নবী হবে না তবে খলীফাগণ থাকবে।" (বুখারী)।

তৃতীয় সুসংবাদ তাওরাতের সফর ইস্তিসনা ৩৩ অধ্যায় আয়াত ২ ঃ

جَآءَ الرَّبُّ مِنْ سِيْنَآءَ وَاَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَاعِيرَ وَتَلَاءلاءَ مِنْ جِبَالَ فَارَانَ وَاَتٰى مِنْ رَبْوَاتِ الْقُدْسِ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ نَارُ شَرِيْعَةٍ ـ

কোন কোন তাওরাতের কপিতে এরূপও আছে ঃ

جَآءَ الرَّبُّ مِنْ سِيْنَآءَ وَاشْرَقَ لَنَا مِنْ سَاعِيْرَ وَاشْتَعْلَنُ مِنْ جِبَالٍ فَارَانَ

আর অনুবাদে এভাবে আছে ঃ

"তিনি বললেন ঃ (হযরত মূসা আ) আল্লাহ তা'আলা সিনাই ও সাঈর থেকে উদিত হলেন তারপর মক্কার উপত্যকায় প্রকাশিত হলেন। দশ হাজার পবিত্র সত্তার সাথে আগমন করলেন, তাঁর ডান হাতে শরী'আতের মশাল ছিল।"

এ আয়াতে তিনটি সুসংবাদ উল্লেখিত হল ঃ (১) তূর পাহাড়ে হযরত মূসা (আ) এর উপর তাওরাত নাযিল হওয়া বুঝানো হয়েছে। (২) সাঈর একটি পাহাড়ের নাম। যা নাসেরা নামক স্থানের হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থানে অবস্থিত। এতে হযরত ঈসা (আ) এর উপর নবুওয়াত ও ইঞ্জিল নাযিল হবার কথা বলা হয়েছে। (৩) ফারান বলে মক্কার পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে। এর মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াত ও কুরআন নাযিলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হেরা গুহা ফারান পাহাড়ে অবস্থিত। সেখানে সবার প্রথমে اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ থেকে শুরু করে প্রথম ৫টি আয়াত নাযিল হয়েছিল। তাওরাতের জন্ম অংশে ২১ অধ্যায়ের ২০ নং পর্বে হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রসঙ্গ এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

২০ ঃ "আল্লাহ তা'আলা ঐ ছেলের সাথে ছিলেন, সে বড় হয়েছে, বিরানভূমিতে থেকেছে এবং সে তীরন্দাজ হয়ে গড়ে উঠেছে।"

২১ ঃ "সে ফারানের উপত্যকায় থেকেছে।" হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বসতি পবিত্র মক্কায় হবার বিষয়টি ঐক্যমতে স্বীকৃত। এতে জানা গেল তাওরাতের আয়াতে যে নবুওয়াতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা ফারান পাহাড় থেকে প্রকাশিত হবে এবং দৃশ্যত পাহাড়কে আলোকিত করে দিবে। এখন পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নবুওয়াত ব্যতীত আর কোন নবুওয়াত ছিল যা ফারান পাহাড় থেকে সূচনা হয়ে দুনিয়াকে হিদায়েতের আলোকে আলোকিত করেছে। ফারান পাহাড়ের নবুওয়াত নিশ্চয়ই সাঈর ও সিনাঈ পর্বতের নবুওয়াত থেকে অধিক দীপ্তিমান ছিল। শরী'আতের মশাল বলতে কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনে জিহাদের বিধান, দণ্ডবিধি ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। দশ হাজার পবিত্র সত্তা বলতে ফেরেশ্তাদের বাহিনী বুঝিয়েছে অথবা মক্কা বিজয়ের সময়ে দশ হাজার সাহাবায়ে কিরামের অভিযাত্রী

বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে। আর নাসারাদের মত অনুযায়ী হযরত মাসীহের সাথে বারজন হাওয়ারী ছিলেন। তারা সকলে জান বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যায়। আর একজন ইয়াহুদা নামক হাওয়ারী ত্রিশ দিরহাম ঘুষ নিয়ে প্রভুকে ধরিয়ে দেয়।

এ সংবাদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা ও বক্তব্যের সুন্দর উপস্থাপনাতে চিন্তার খোরাক আছে। প্রথমত, বলা হয়েছে ঃ جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِيْنَاءَ "প্রভূ সিনাঈ থেকে আগমন করেছেন", এর পর বলা হয়েছে ঃ وَاَشْرَقَ مِنْ سَاعِيْرَ "তারপর সাঈরে উদিত হলেন", শেষে বলা হয়েছে ঃ وَاسْتَعْلَنَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ "ফারান পাহাড়ে আলোকিত হলেন"। এতে বুঝা যায়, তাওরাতের নাযিল হওয়া ছিল প্রভাতের উদয় আর ইঞ্জিলের নাযিল হল সূর্যের উদয় এবং সবশেষে পবিত্র আল-কুরআনের আগমন হল দ্বিপ্রহরের সূর্যের ন্যায়। এভাবে কুফরের অন্ধকার রাতের আঁধার কেটে ঈমান ও হেদায়েতের সুবহে সাদিকের সূচনা হয়েছিল হযরত মূসা (আ)-এর যামানায়। আর ফিরাউন, কারূন ও হামানের মত কাফির নেতাদেরকে আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হতে হয়েছিল।

যখন হযরত মাসীহ ইবন মরিয়ম (আ)-এর আবির্ভাব হল, তখন হিদায়েতের সূর্যও পূর্বাকাশে উদিত হল। আর যখন হযরত নবীয়ে আকরাম (সা) প্রকাশিত হলেন তখন হিদায়েতের সূর্য মধ্য দিবসে এসে পৌঁছে। পৃথিবীর এমন কোন যমীনের অংশ বাকী ছিল না যেখানে এ সূর্যের আলো পৌঁছেনি। পবিত্র কুরআনুল করীমে এ বিষয়ে সুসংবাদ দিয়েছে ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِسِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنَ ـ তীন ও যায়তুন যেহেতু মুকাদ্দাস যমীনে উৎপন্ন হয়, যেখানে হযরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ জন্য হযরত ঈসা (আ)-এর রিসালাতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর 'বালাদে আমীন' (শান্তিনগর) বলে পবিত্র মক্কাকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে নবুওয়াত ও রিসালাতের সূর্য উদিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মক্কার পরিচয় বলতে গিয়ে 'আল-আমীন' নিরাপদ শব্দ ব্যবহার করেছেন যাতে এর প্রতি ইশারা রয়েছে যে, বিশ্বনবী হযরত নবী মুহাম্মদ (সা) মহাপ্রভুর রহমতের ভাণ্ডারকে আমানত স্বরূপ এ নিরাপদ শহরে সোপর্দ করা হয়েছে। তেপান্ন বছর এ আমানতে ইলাহীকে এ পবিত্র নগরী হেফাযত করেছে। যখন পরিবেশর পরিস্থিতি নাজুক হয়ে গেল, তখন এ শান্তিনগরী বাধ্য হয়ে এ পবিত্র আমানত পবিত্র মদীনায় সোপর্দ করে দেয়।

সারকথা ঃ এখানে তিনজন নবীর সুসংবাদ উপস্থাপন করা হলো। সর্বশেষে খাতিমুল আম্বিয়া (সা)-এর সুসংবাদের আলোচনা হয়েছে। খতমে নবুওয়াত বুঝানোর জন্যই এভাবে উপস্থাপন করা হলো। বিরোধীরা বলে থাকে, ফারান পাহাড় সিনাঈ এলাকার একটি নাম, যেহেতু ঐ এলাকায় হযরত মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হন নি, অতএব এ সুসংবাদ তাঁর বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে না। তাদের এ আপত্তির

জবাব হল ঃ তাওরাতে জন্ম অধ্যায়ের একুশ অনুচ্ছেদের ১৩ আয়াত থেকে ২১ আয়াত পর্যন্ত লেখা আছে। "হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল এবং হযরত সারা পরস্পর নারায হবার কারণে মুকাদ্দাস এলাকা ছেড়ে ফারান পাহাড়ের সমতলে বসতি স্থাপন করেন।" এতে বুঝা যায়, ফারান সে এলাকাই হবে যেখানে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানগণ বসতি স্থাপন করেছিল। আর নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত যে, তারা বর্তমানের পবিত্র মক্কার উপত্যাকার হেজায ভূমিতেই বসতি স্থাপন করেছিলেন (যেখানে বর্তমান কা'বা ও বায়তুল্লাহ স্থাপিত) এখানে তাঁর বংশধরগণ বসবাস করেছেন। এতে আরও বুঝা যাচ্ছে যে, ফারান হল পবিত্র মক্কার এলাকার একটি পাহাড়, যেখানে হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আ) বসতি স্থাপন করেছিলেন। সামেরী তাওরাতের আরবী অনুবাদ যা জার্মানীর পণ্ডিত কর্তৃক ১৮৫১ গাংগন নামক স্থানে মুদ্রণ করেছে, তাতে হযরত ইসমাঈল (আ) বসতিস্থল হিসেবে যা লিখা হয়েছে তা হল ঃ

وَسَكَنَ فى برية فاران (اى الحجاز) واخذت له امرأة من ارض مصر (كون الدنيا) -

হযরত দাঊদ (আ) সামুয়েল নবীর ইন্তিকালের পর ফারান পাহাড়ের পাদদেশে আগমন করেছিলেন। সেখানে তিনি একটি যবূর সংকলন করেছিলেন, তাতে দুঃখ ভরে তিনি বলেছেন, আমি কায়দারের অবস্থানস্থলে অবস্থান করেছি। (দেখুন : সামুয়েল নবী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৫, যবূর)।

এতে সাফ বুঝা যায় কায়দার ফারানে থাকত। উল্লেখযোগ্য, কায়দার হচ্ছে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ২য় ছেলে। আশরিয়া গ্রন্থ থেকে জানা যায়, কায়দার ও তার সন্তানেরা পশ্চিমা দেশে বসবাস করতেন। বতলিমূস (লেখক) তাঁর আবাসস্থল হিসেবে মধ্যবর্তী এলাকা শনাক্ত করেছেন। এ সবের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, হিজাযের এলাকা ও ফারান একই স্থান হবে। বিশ্ব নবী (সা)-এর প্রকাশ পবিত্র মক্কায় হয়েছে যা হিজাযের মশহূর শহর। (আল-বাশারাতুল আহমদিয়া) আতশী শরী'আত বলতে যা বুঝায়, তাহল শরী'আতের বিধান, জিহাদ, মৃত্যুদণ্ড, দণ্ডবিধি, লঘুদণ্ড। আর বিশ্ব নবী (সা)-এর নবুওয়াত ছিল বৈষয়িক ও রাজত্ব সম্পৃক্ত করে। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ) এর নবুওয়াত বৈষয়িক ও রাজত্ব বিষয়ক ছিল না।

৪র্থ সুসংবাদ ঃ তাওরাত সফর ইস্তিসনা : ৩২ অধ্যায়, পাঠ নং ২১।

তারা আমাকে তাদের বোকামীপূর্ণ কথা দিয়ে রাগান্বিত করেছে, সে সব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাকে মর্যাদাবান করেছিলেন। অতএব আমিও তাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান তাদেরকে বেকুফদের থেকে আলাদা করব।"

এখানে সুসংবাদে বে-আকল বলে আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা হযরত নবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মূর্খতা ও গুমরাহিতে লিপ্ত ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিধি-বিধান থেকে বেখবর তৎকালীন আরব সমাজ মূর্তিপূজা ব্যতীত অন্য ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বে-খবর ছিল। ইয়াহূদী ও নাসারা তাদেরকে খুব হীন চোখে দেখত। তারা তাদেরকে মূর্খ ও নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করত। কিন্তু এক সময় যখন ইয়াহূদী ও নাসারারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মূল শিক্ষা ভুলে গিয়ে তাওহীদের স্থলে শিরকে লিপ্ত হল, তখন আল্লাহ তা'আলা আত্মমর্যাদার জোশে এসে উম্মি নবী (সা)-কে তাদের মধ্যে প্রেরণ করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ بْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ـ

"ইয়াহূদীগণ হযরত উযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে আর নাসারারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে"। (সূরা তাওবা ঃ ৩০)

আল্লাহ তা'আলা এ সময় ওয়াদা অনুযায়ী মূর্খ ও নিরক্ষর লোকদের নিকট হযরত নবী (সা)-কে প্রেরণ করেন। যাদের হাতে আল্লাহ তা'আলা আপন দীনকে সম্মানিত করেছেন এবং ইয়াহূদী ও অন্যান্যদেরকে (যারা দীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে) তাদের হাতে নিহত করেছেন। মিসর ও সিরিয়া তাদের দখলে এসেছে।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِىْ الْاُمِيِّيْنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنَ ـ

"আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করে তিনি মহান বাদশাহ, পবিত্র সত্তা, মহা পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞানী। তিনি জ্ঞানসত্তা যিনি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত (হুবহু অনুশীলন) করেন। তিনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, তাদেরকে কিতাব ও হিক্মত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে পুরোপুরি পথভ্রষ্টতায় ছিল। (সূরা জুমু'আ ঃ ১-২)

'নিরক্ষর' বলতে আরবের মূর্খ সম্প্রদায়কে বুঝায়। আর হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইউশা (আ)-এর সম্প্রদায় মূর্খ ও জ্ঞানহীন ছিল না। বনী ইসরাঈলকে তাদের সাথে তুলনা করে মর্যাদাবান করা হয়নি; বরং এ সুসংবাদ আরবদের ব্যতীত অন্যদের বেলায় সত্য ও বাস্তব হতে পারে না। তারপর বেকুফ সম্প্রদায় বলতে ইউনানীও (গ্রীক) সঠিক হতে পারে না– যেমনটি বলা হয়েছে কোমীয় পুস্তকে। গ্রীকদের বেলায় তা

এজন্য প্রযোজ্য হতে পারে না– কেননা তারা সে সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহলে তারা কিভাবে অবুঝ সম্প্রদায়ের বাস্তব নমুনা হতে পারে? গ্রীকের পণ্ডিত সক্রেটিস-প্লেটো, বিস্টালসহ পণ্ডিতগণ হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের কয়েক শতাব্দী পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে অভিজ্ঞ আলেম ও পণ্ডিত ছিলেন।

৫ম সুসংবাদ ঃ তাওরাত ঃ সফর পাদায়েশ অধ্যায় জন্ম, ৪৯ পাঠ

১. হযরত ইয়াকূব (আ) আপন ছেলেদেরকে ডাকলেন ও বললেন, তোমরা সমবেত হও আমি তোমাদেরকে আগামী দিনের সংঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ জানাব।

২. হে ইয়াকূবের সন্তানেরা! তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে আর শোন নিজ পিতা ইসরাঈলের কথা মান্য করবে। তারপর দ্বিতীয় পাঠে ইয়াহুদা থেকে শাসন কেন্দ্র আলাদা করবে না এবং শাসক তার পায়ের তলায় আসবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শায়লা আগমন করবে। তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা তার নিকট এমন হবে। উক্ত আয়াতে জানানো হয়েছে যে, শেষ যামানায় শায়লা প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকবে।

মুসলমানগণ বলে থাকেন শায়লা হযরত নবী (সা)-এর উপাধি। অন্যদিকে নাসারারা শায়লা হযরত ঈসা (আ)-এর উপাধি বলে মনে করে। নাসারাদের এ দাবি যৌক্তিক নয়। কেননা বক্তব্যের বর্ণনাধারা অনুযায়ী শায়লাকে ইয়াহুদা থেকে আলাদা ব্যক্তিত্ব মানতে হবে। কেননা বলা হয়েছে যে, শায়লার আবির্ভাবের সাথে ইয়াহুদার রাজত্বের অবসান হবে। যদি শায়লা ইয়াহুদার অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলে কিভাবে তার আবির্ভাবে ইয়াহুদার রাজত্ব ও কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যায়? বরং সে ইয়াহুদা হলেও ইয়াহুদা রাজত্ব অব্যাহত থাকে।

বাইবেল ও মথির ইঞ্জিল কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় সামান্য দৃষ্টিপাত করলেই এ কথা ভালভাবে জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আ)-এর বংশধারা ইয়াহুদা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, বরং তিনি হযরত দাঊদ (আ)-এর বংশধর আর হযরত দাঊদ (আ) সেই ইয়াহূদার বংশধর এ ব্যাপারে সবাই একমত। এজন্য শায়লার বাস্তব নযীর সে নবীই হতে পারেন যিনি ইয়াহুদা বংশ থেকে আলাদা বংশের লোক এবং তিনি শেষ যামানায় প্রকাশিত হবেন বলেও প্রথম পাঠের আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে, তোমাদেরকে আমি আগামী দিনে যা সংঘটিত হবে তার খবর জানাব।

উক্ত দু'টি বিষয় হযরত নবী (সা) এর বেলায় প্রযোজ্য ও বাস্তব হতে পারে। তিনি ইয়াহুদার বংশধর ছিলেন না, বরং তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি শেষ নবী হবার কারণে তাঁর আগমনও হয়েছিল শেষ যামানায়। তাঁর আবির্ভাবের পরে ইয়াহূদী বংশের নিকট যতটুকু রাজত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল, তা অবসান হতে শুরু করে। বনূ নযীর ও খায়বারের ইয়াহূদীদের দূর্গ তাঁর সময়ই বিজিত হয়েছিল। আর এ বাক্য

"সম্প্রদায় তার নিকটে সবাই সমবেত হবে।" সাধারণভাবে নবী হিসেবে আবির্ভূত হবার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"হে নবী তুমি বলে দাও, হে লোকেরা আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত হয়েছি।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৮)

হযরত ঈসা (আ) হযরত নবী (সা) থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি শুধু বনী ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَائِيلَ

"তাঁকে রাসূল করা হয়েছে বনী ইসরাঈলের নিকটে।"

এছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোক হযরত নবী (সা)-এর নিকট সমবেত হয়েছে এবং তাঁর দীনে দাখিল হবার জন্য দলে দলে এসেছে। এ ধরনের অবস্থা হযরত ঈসা (আ)-এর বেলায় হয়নি।

১১ নং পাঠে আছে ঃ

"তিনি নিজ গাধা আঙ্গুর গাছের সাথে বাঁধবেন।"

'মাদারিজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যখন হযরত নবী (সা) খায়বার বিজয় করলেন সেখানে তিনি একটি কালো রং-এর গাধা দেখতে পেলেন। তিনি গাধার সাথে কথা বললেন। তিনি গাধাকে প্রশ্ন করলেনঃ তোমার নাম কি? সে জবাব দিল আমার নাম ইয়াজিদ ইবন শিহাব। মহান আল্লাহ তা'আলা আমার দাদীর বংশে ৬০ টি এমন গাধা জন্ম দিয়েছেন যাদের উপর নবী ব্যতীত কেউ আরোহণ করেনি। আমি আশা করি আপনি আমার উপর আরোহণ করবেন। আমি ছাড়া আমার দাদীর বংশের আর কেউ জীবিত নেই। আর আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যেও আপনি ব্যতীত আর কেউ বাকি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) তার উপর আরোহণ করলেন। এ গাধাটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তিকালের পরে তাঁর বিরহ যাতনায় একটি কুয়ায় পড়ে মারা যায়।

(এভাবে একাদশ পাঠে আছেঃ) "তিনি আপন কাপড় ও পোশাক আঙ্গুরের পানি দিয়ে ধুয়ে নিবেন।" এ বাক্যে হিব্রু ভাষা থেকে অনুবাদের সময় কিছু পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ছিলঃ "তিনি তার কাপড় ও পোশাক আঙুরের পানি থেকে ধুয়ে নিবেন।"

অর্থাৎ সে শেষ যামানার নবীর শরী'আতে মদ হারাম ঘোষণা করা হবে। যেভাবে অন্যান্য নাপাকী থেকে কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করার হুকুম দেয়া হয়, তেমনিভাবে মদ থেকেও কাপড় পরিষ্কার রাখার নির্দেশ দেয়া হবে।

হয়ত এমনও হতে পারে এখানে আল্লাহ তা'আলার গভীর ভালবাসার মর্ম বুঝানো হয়েছে। আর হযরত নবী করীম (সা)-এর মর্যাদাও এ থেকেও অনেক উর্ধ্বে। তিনি যেন অহংকার ব্যতীতই প্রাচীন ও আগত সকলের শ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর উম্মাতের মধ্যে হাজার হাজার শুধু নয়, বরং লাখো লাখো এমন ব্যক্তিও গত হয়েছেন, যাদের আল্লাহর ভালবাসার ক্ষেত্রে ভিন্ন উম্মাতের মধ্যে সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(১২ নং পাঠে আছে ঃ) "তাঁর চক্ষুদ্বয় হবে লাল আর দাঁত হবে দুধের চেয়েও সাদা।" এ আয়াতে সে প্রতিশ্রুত হযরত নবী (সা)-এর হুলিয়া মুবারক-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর চোখ লালচে এবং দাঁত সাদা হবে। এ বিষয়ে যারকানী 'শারহে মাওয়াহিব' গ্রন্থে লিখেছেন, যখন হযরত নবী (সা) ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ার বসরায় আগমন করেছিলেন যেখানে তিনি ছায়াবিশিষ্ট একটি গাছের ছায়ায় অবস্থান করেছিলেন। যেখানে নাস্‌তূরা পাদ্রীর আস্তানা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথের গোলাম মায়সারাকে পাদ্রী প্রশ্ন করেছিল যে, তাঁর চোখে কি লালিমা থাকে? মায়সারা জবাবে তাঁকে জানান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চোখে সব সময়ই লালিমা থাকে। তখন নাসতূরা বললঃ ইনি শেষ যামানার নবী। হায় আমি যদি তাঁর নবুওয়াতের প্রকাশকাল পেতাম!

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) তাঁর 'তারীখে মিসর' (মিসরের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখেছেনঃ যখন হযরত হাতিব (রা) হযরত নবী কারীম (সা)-এর পত্র নিয়ে মিসরের রাজা মাকূকাসের দরবারে যান তখন মিসরের রাজা বললেনঃ শেষ যামানার নবীর অন্যতম নির্দশন হচ্ছে, সব সময় তাঁর চোখে লালিমা থাকবে। তখন হযরত হাতিব (রা) বললেন হ্যাঁ, নবী (সা)-এর চোখের লালিমা কখনো হারিয়ে যায় না। মাসায়েল গ্রন্থে আছে– اشكل العينين অর্থাৎ এমন চোখ সাদার মধ্যে যেখানে লালিমা রেখা থাকে। কোন বর্ণনায় 'আদ্‌আজু' শব্দ আছে। যার অর্থ হল চোখের মধ্যে কালো হওয়া। যা হোক, দু'টি বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য নেই। সৌন্দর্য ও অনুপমের জন্য কালো ও লালিমার প্রয়োজন আছে। শুধুমাত্র কালো অথবা শুধুমাত্র লালিমায় সুন্দর হয় না।

কবি কি সুন্দর বলেছেন ঃ

"দৃষ্টি কেড়ে নিত তাঁর চক্ষু যুগল
কালো-সাদার বাগানে লালিমার ফুল,
শ্রেষ্ঠতম জনের সাদা-কালো নীলিমা
অনুপম আঁখি নীরে গোলাকে ভরা।
আলো উবুল স্রোতাধারা যেন টগবগ করছে,
আঁধার রাতেও জ্বলজ্বল ঝরে ফুটন্ত জ্বলছে।
হৃদয়ে যাদু দিয়ে টেনে নিয়ে যায়,
গভীর অরণ্যে অমানিশায়ও তাঁকে চেনা যায়।
মুখোমুখি দেখে অবাক করা মুখ,
পিছনেও একটুও কম নেই।"

৬ষ্ঠ সুসংবাদ ঃ যবূরে হযরত দাউদ (আ) এর ভাষায় ঃ ৪৫তম অধ্যায়

আমার হৃদয়ে সুন্দর অনেক বিষয় উদিত হয় তার মধ্যে আমি বাদশাহর জন্য যা তৈরি করি তা বর্ণনা করি। আমার ভাষা বিজ্ঞ লেখকের কলম। (২) সৌন্দর্যে তিনি বনী আদমের মধ্যে সেরা। তোমার ঠোঁটে অনুগ্রহ লেগে দেয়া হয়েছে, এ জন্য প্রভু তোমার জন্য চিরদিনের জন্য মুবারক করেছেন।

(৩) হে পাহলোয়ান! তোমার তলোয়ার যা তোমার ভূষণ আর সম্মানের বাহন হিসেবে নিজ পাঁজরে ঝুলায়েছে। (৪) আর নিজ সম্মানের উপর আরোহণ করে তোমার সততা ও তোমার ভদ্রতার মাধ্যমে সৌভাগ্যের প্রাপ্তির জন্য এগিয়ে যাও। আর তোমার ডান হাত অনুদানের কাজ শিখাবে। (৫) তোমার তীর শক্তিশালী, তোমার পিছনে লোকেরা লুটিয়ে পড়ে। তা সে বাদশাহর দুশমনের হৃদয়ে আঘাত করে। (৬) হে চিরন্তন প্রভু! তোমার রাজত্বের দণ্ডপথ নির্দেশনার কাঠি। (৭) তুমি সততার বন্ধু, মন্দের শত্রু, এজন্য তোমার খোদা তোমাকে তোমার সাথীদের থেকে অধিক পছন্দ করেন। (৮) তোমার সততা পোশাক থেকে চন্দন ও গোলাপের সুগন্ধি বের হয়ে তুমি হাতির দাঁতের মাঝেও ভাল আছ। (৯) শাহযাদীগণ তোমাকে ইজ্জত করে। রাণী সোনার গহনা পরে তোমার ডানে দাঁড়িয়ে থাকে।

(আর দ্বাদশ আয়াতে আছে ঃ) আর সূর– এর কন্যা হাদিয়া নিয়ে আসবে। জাতির ধনী লোকেরা তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে।

(তারপর ১৬ নং আয়াতে আছে ঃ) (১৬) তোমার সন্তান পিতা ও পূর্বপুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হবে। তখন তারা গোটা যমীনের নেতৃত্ব পাবে। (১৭) আমি সমস্ত পূর্বপুরুষকে তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দেব আর সকল মানুষ যুগযুগ ধরে তোমার প্রশংসা করবে। সকল আহলে কিতাবের নিকট বিষয়টি স্বীকৃত।

যবূরে হযরত দাউদ (আ) শানদার অতি মর্যাদাবান একজন নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি ভক্তি ও ভালবাসার সাথে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর কিছু গুণ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ প্রতিশ্রুত নবী যখন প্রকাশিত হবেন, তখন তাঁর মধ্যে এসব গুণ থাকবে ঃ

(১) তিনি রাজা ও সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশালী হবেন। (২) তিনি খুবই সুন্দর হবেন। (৩) তাঁর ভাষা হবে সাবলীল, প্রাঞ্জল ও নান্দনিক। (৪) যুগের বরকতময় ব্যক্তি হবেন। (৫) তিনি খুবই শক্তিশালী হবেন। (৬) পাগড়ি পরবেন। (৭) সত্যবাদী ও হক পন্থী হবেন। (৮) ভাগ্যবান হবেন। (৯) তাঁর ডান হাত দিয়ে বিস্ময়কর অভিনব বিষয়ের কারিশমাঁ প্রকাশিত হবে। (১০) তীরন্দাজ হবেন। (১১) আল্লাহর সৃষ্টি তাঁর অনুগত হবে। লোকেরা তাঁর অনুসারী হবে। (১২) কিয়ামত পর্যন্ত চিরদিন তার বিধান কার্যকর ও চালু থাকবে। (১৩) তাঁর শাসনের দণ্ড মযবূত থাকবে। (১৪) তিনি সত্যের বন্ধু মন্দের শত্রু হবেন। (১৫) তাঁর কাপড় থেকে সুগন্ধি বের হবে। (১৬) তাঁর ঘরে

শাহযাদীদের আগমন হবে। (১৭) হাদিয়া ও উপহার আসতে থাকবে। (১৮) পিতার অবর্তমানে সন্তানদের নেতৃত্ব ও শাসন কায়েম হবে। (১৯) সকল অনুসারীর মধ্যে যুগ ও শতাব্দী ধরে বংশ পরম্পরায় তাঁর স্মৃতি ও আলোচনা অব্যাহত থাকবে। (২০) যুগ থেকে যুগ লোকেরা তাঁর প্রশংসা করবে।

ইসলামের অনুসারীদের নিকট এসব সুসংবাদের বাস্তব নমুনা হযরত মুহাম্মদ (সা) এর বেলায়ই প্রযোজ্য। আর ইয়াহূদীরা মনে করে যে, হযরত দাঊদ (আ)-এর পর এখনো এ গুণের সমাহার কোন নবীর মধ্যে হয়নি। নাসারাদের মতামত হচ্ছে, এসব গুণ হযরত ঈসা (আ)-এর বেলায় প্রযোজ্য। আর মুসলমানগণ মনে করেন যে, এ সুসংবাদ -এর বাস্তব নমুনা হলো হযরত নবী (সা), কেননা সুসংবাদে যে সব গুণের কথা আলোচিত হয়েছে তা শুধুমাত্র নবী করীম (সা)-এর বেলায়ই বাস্তব ও সত্য।

যেমন রাজত্বের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দিবালোকের মত স্পষ্ট বরং দ্বিপ্রহরের সূর্য থেকেও অধিক আলোকিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রের রাজত্বই দান করেছেন। তিনি আল্লাহর বিধানকে রাজত্বের পদ্ধতিতে কার্যকর করেছেন। নাসারাদের ধারণা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) ও ইয়াহূদীদের হাতে বাধ্য ও পরাজিত ছিলেন। হযরত নবী (সা) ইয়াহূদী কর্তৃক বাধ্য হবার প্রশ্নও উঠে না, বরং তিনি তাদেরকে তাদের দূর্গ থেকে বিতাড়িত করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, নবী করীম (সা) দীন-দুনিয়ার বাদশাহ ছিলেন। তিনি সমস্ত নবী, রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কোন নবী রাসূলকে কুরআনের মত মু'জিযা আর পূর্ণাঙ্গ বিধানাবলী সম্বলিত দীন ও শরী'আত দেয়া হয়নি। যার মধ্যে পার্থিব ও পরকালীন সফলতা, মুক্তি ও উন্নতির নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌছার জন্য তিনি এমন সরল রাজপথ তৈরি করেছেন, যে পথে নিরাপদে যাতায়াত করা সম্ভব। তাঁর উপস্থাপিত জীবনের এ পথে সভ্যতা-সংস্কৃতি, নৈতিকতা, রাজনীতি-কূটনীতি ও নাগরিক ব্যবস্থা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা ও বিধান রয়েছে। বাস্তব পূর্ণতার এক বিশাল ব্যবস্থাই এখানে বর্তমান। সমস্ত অনুপম নান্দনিক ও পূর্ণাঙ্গ রূপের এ ব্যবস্থা ও বিধানাদী শুধুমাত্র ইসলামেই রয়েছে যা মহানবী (সা) আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত হয়েছেন।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র দীন।" (সূরা আলে ইমরান)

এটি হল সে পূর্ণাঙ্গ দীন যার আবির্ভাবে সকল দীন-ধর্মের প্রদীপ নিভে যায়।

رات محفل میں ہراک مہ پارہ گرم لاف تھا ـ
صبح کوخورشید جونکلا تومطلع صاف تھا ـ

"যখন তিনি (নবী (সা)) নিজ হাত দ্বারা তলোয়ারের ন্যায় ইঙ্গিত করলেন শঙ্কিত মনে; অলৌকিকভাবে তা নিক্ষিপ্ত হল চাঁদের মধ্যভাগে এবং তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।"

এ জন্য বলা যায়, যে নবীর উপর নাযিলকৃত কিতাব সকল আসমানী কিতাব ও সহীফা থেকে সর্বোত্তম, তাঁর শরী'আতের বিধানও হবে সকল শরী'আতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ। তাঁর মু'জিযাও আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে সকলের মু'জিযা থেকে সর্বোচ্চ স্থানের মর্যাদার।

তাঁর উম্মাতও একইভাবে অন্যান্য সব উম্মাত থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-নৈতিকতা, রাজনৈতিক, চরিত্র ও নান্দনিকতা সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। আর সে নবী দীন দুনিয়ার বাদশাহ হবেন, আদি-অন্ত সকল মানুষের নেতা হবেন, এ ব্যাপারে দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

২. তাঁর সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্য এত অনুপম ও নান্দনিক ছিল যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক সুন্দর কোন মানুষ দেখিনি। যেন চাঁদ তাঁর চেহারা মুবারকে বিস্ফোরিত হত। যখন তিনি মুচকি হাসতেন তখন দাঁত মুবারকের চমক দেয়ালে বিকীরিত হত।

সাহাবী কবি হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) বলেন ঃ

وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطُّ عَيْنِىْ * وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ -

خُلِقْتَ مُبَرَّدً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ * كَاَنَّكَ قَدْ خَلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

"প্রিয়তম আমার চোখ দেখেনি কভু তোমা থেকে অধিক সুন্দর আর কোন নারী প্রসব করেনি, তোমার থেকে সুন্দর, তুমি মুক্ত পবিত্র সকল খুঁত থেকে, যেন তুমি জন্মেছ নিজ কামনা মতে।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, মিসরের রমণীগণ হযরত ইউসুফ (আ)-কে দেখে নিজ হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল, আর যদি তারা আমাদের হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা) কে দেখত, তাহলে তারা কলিজা টুকরা টুকরা করে ফেলত।

اے زلیخا اس کونسبت اپنے یوسف سے نہ دے

اسپہ سرکٹتے ھیں دائم اور اس پرانگلیاں -

মহানবী (সা) এর অনুপম সৌন্দর্য ও রূপ জগত বিখ্যাত ছিল। রূপ-সৌন্দর্যের সাথে তাঁর শান-শওকত, ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যও ছিল। তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতে লোকেরা সক্ষম হত না।

৩. তাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা, নান্দনিক শব্দ প্রয়োগ, অনুপম উপস্থাপনা সর্বজন স্বীকৃত ছিল। তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত তথ্য ও তাঁর পবিত্র শব্দ ও কথা

তৎকালীন অবস্থাসহ পরম্পরাযুক্ত সূত্র অনুযায়ী বর্ণিত ও সংরক্ষিত আছে। যার ভিত্তিতে তাঁর বক্তব্যের অলংকার ও যথার্থ ও সুন্দর উপস্থাপনার অনুমান করা যায়।

৪. তাঁর বরকতের বিষয়টি যা সুসংবাদের ও ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ হয়েছে তা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মুসলমানের নামাযে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ-প্রাচ্য পাশ্চাত্যে সব স্থানে প্রতিফলিত হচ্ছে।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

"হে আল্লাহ! বরকত দাও মুহাম্মদ (সা)-এর উপর, তাঁর বংশধরদের উপর, যেমনিভাবে বরকত দিয়েছিলে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি মহান ও প্রশংসাযোগ্য।"

বরকতের সম্পৃক্ততার জন্য এর থেকে অধিক কিছুর কি আর প্রয়োজন আছে? আর এই দু'আ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তরে করা হয়।

৫. শক্তি ও বীরত্বের অবস্থাও তাঁর এমন ছিল যে, তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পাহলোয়ান রোকানা তাঁর সাথে শক্তি ও বীরত্বে মল্লযুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। একদিন ময়দানে রুকানার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেখা হয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা) -কে জানালঃ তুমি যদি আমাকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করতে পার তাহলে আমি তোমাকে সত্য নবী মনে করব। রাসূল (সা) প্রথম বারেই তাকে ধরাশায়ী করলেন। সে দ্বিতীয়বার লড়তে চাইল এবারও নবী (সা) তাকে পরাজিত করলেন। রুকানা পরাজিত হয়ে অবাক হল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর আর আমার আনুগত্য কর, তবে আরও অবাক করা বিষয় দেখাব। সে বলল, এ থেকেও অবাক করা বিষয় কি হতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সা) দূরের একটি গাছকে ডাকলেন। গাছ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তিনি গাছকে ফিরে যেতে বললেন। গাছ তা শুনে নিজ স্থানে চলে গেল।

৬. তাঁর সাথে তলোয়ার থাকা এবং জিহাদে তৎপর থাকাও পরিচিত বিষয়। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ) না ছিলেন তলোয়ারের সাথে আর না ছিলেন জিহাদে। খ্রিস্টানদের কথা অনুসারে তিনি এতটাই দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন যে, তিনি ইয়াহূদীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করতেও সক্ষম ছিলেন না।

৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন। যে কথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

"তিনি (আল্লাহ তা'আলা) তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও হক দীনসহ প্রেরণ করেছেন। যেন তিনি সমস্ত দীনের উপর এ দীনকে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা তাওবা ঃ ৩৩)

একবার নাসর ইবন হারিস কুরায়শদেরকে বলল :

قد كان محمد فيكم غلاما حدثًا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظم امانة حتى اذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاكم بما جاءكم قلتم انه ساحرلا والله ما هو بساحر ـ

"মুহাম্মদ (সা) তোমাদের মধ্যেই বড় হয়েছে তিনি সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, সবচেয়ে অধিক সত্যবাদী, সবচেয়ে আমানতদার। যখন তিনি তোমাদের দিকে অগ্রসরমান হলেন এবং তোমাদের নিকট সত্য দীন নিয়ে এলেন তখন তোমরা তাঁকে যাদুকর, গণক বলতে শুরু করলে। আল্লাহর শপথ তিনি যাদুকর নন।"

রূম সম্রাট হিরাক্‌ল যখন আবূ সুফিয়ানকে মহানবী (সা) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যে, তোমরা তাকে মিথ্যা কথার জন্য অভিযুক্ত করেছ কিনা? তখন আবূ সুফিয়ান জবাবে বলেছিল, আমরা কখনো তাঁকে মিথ্যা বলতে দেখিনি।

৮. সৌভাগ্যবান হবার বিষয়টিও বাস্তব, কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে সৌভাগ্য ও কল্যাণ দান করেছেন আজ পর্যন্ত তা আর কাউকে দান করা হয়নি।

৯. ডান হাতে বিস্ময়কর কর্ম ও আশ্চর্যকর কারিশমা প্রকাশ হবার কথা থেকে তাঁর হাতে চাঁদ দু'টুকরা করার মু'জিযার প্রতি ইশারা রয়েছে।

বদরের যুদ্ধে ও হুনায়নের যুদ্ধে একমুঠো মাটি নিয়ে মুশরিকদেরকে অন্ধ করে দেয়াও ছিল তাঁর ডান হাতের বিস্ময়কর কর্মের বাস্তব নমুনা।

১০. তীরন্দায হওয়া, হযরত ইসমাঈল (আ) -এর বংশের জন্য ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়। কাজেই হাদীসে আছে ঃ

ارموا بنى اسمعيل فان اباكم كان راميًا ـ

"হে বনী ইসমাঈল! তীরন্দাযী কর, কেননা তোমাদের পিতা তীরন্দায ছিলেন।"

আরেকটি হাদীসে আছে ঃ

من تعلم الرمى ثم تركه فليس منا ـ

"যে তীর চালনা শিক্ষা করার পর তা ছেড়ে দিয়েছে, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই।"

১১. তাঁর পিছনে লোকদের সমবেত হওয়া অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি তাঁর অনুগত হওয়া। এ বিষয়টি দিবালোকের মত পরিষ্কার। কেননা অল্প কিছুদিনের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا -

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসল তখন আপনি দলে দলে লোকদেরকে আল্লাহর দীনে দাখিল হতে দেখলেন। অতএব আপনি আপনার রবের তাসবীহ্ ও প্রশংসা করতে থাকুন এবং ইস্তিগফার পড়তে থাকুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অধিক তাওবা কবূলকারী।" (সূরা নাস্র)

১২-১৩. তাঁর শরী'আত যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে। এ বিষয়ে কুরআনের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرٰى وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ -

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি আর আমিই এর সংরক্ষক।"

দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর বিগত হয়েছে, আল-হামদু লিল্লাহ আল-কুরআনের সামান্যতম কোন কিছু শব্দ বা বর্ণেরও কোন পরিবর্তন হয়নি। ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত আল কুরআন অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। ইয়াহুদী ও নাসারাদের ও তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলের অবস্থা কি করেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তাঁর শাসনের সরল লাঠি এবং সততার লাঠি তো সব সময় তাঁর হক প্রতিষ্ঠার ও বাতিলকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল।

১৪. মহানবী (সা) সত্যের বন্ধু ও মন্দের দুশমন ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ -

"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের দরদী। তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী মু'মিনদের জন্য দয়ালু ও সহানুভূতিশীল।" (সূরা তাওবা ঃ১২৮)

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ -

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন, এবং তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করুন।" (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

রাসূল (সা) -এর উম্মাতদের গুণাবলী এভাবে বলা হয়েছে ঃ

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ - اَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ - يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَايَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ -

"তারা কাফিরদের সাথে কাঠোর এবং নিজেদের প্রতি সহানুভূতিশীল।"[৩] "মুমিনদের সাথে বিনয়ী আর কাফিরদের সাথে শক্ত।" (সূরা ফাতহ্ ঃ ২৯)

"তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। কোন সমালোচকের সমালোচনার পরোয়া করে না।" (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

হয়ত মন্দ বলতে আবূ জাহলকে বুঝানো হয়েছে, কেননা সেই ছিল অনিষ্টের হোতা। তেমনিভাবে সত্যায়নের দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) -কে বুঝানো হয়েছে যিনি সত্য ও সততার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। আর নিশ্চয়ই হযরত আবূ বকর (রা) হযরত নবী (সা) -এর একান্ত বন্ধু হবার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

১৫. তাঁর কাপড় থেকে খুশবু বের হত। এমনকি এক মহিলা রাসূল (সা)-এর ঘাম এজন্য জমা করেছিলেন যেন নতুন বউ সাজাতে কাপড়ে তা ব্যবহার করতে পারেন।

১৬. ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে অনেক শাহযাদা রাজপুত্র মুসলমানদের খাদিমে পরিণত হয়েছিল। পারস্য সম্রাট কিসরার শাহযাদী হযরত হুসায়ন (রা)-এর গৃহে ছিলেন।

১৭. হাবশার রাজা নাজাশী, বাহরাইনের রাজা এবং ওমানের বাদশাহসহ অনেক বড় বড় রাজা-বাদশাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা) -এর উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়েছিলেন। শাসক আমীর-ওমারাগণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে মূল্যবান হাদিয়া পৌঁছাতে পেরে গর্ববোধ করতেন। কিবতি রাজা মাকূকাস রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর খিদমতে তিনটি দাসী, একটি হাবশী গোলাম, একটি সাদা খচ্চর, একটি সাদা গাধা ও একটি ঘোড়া সহ মূল্যবান কাপড় হাদীয়া হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

১৮. রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পরে কুরায়শদের খিলাফত চালু ছিল। তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত হাসান (রা) খলীফা হয়েছিলেন। হযরত হাসান (রা)-এর বংশধরদের মধ্যে শত শত খলীফা ও শাসক হয়েছে। হেজায, ইয়ামন, মিসর, সিরিয়া ও অন্যান্য দেশ ও জনপদে তাঁরা শাসন ও রাজত্ব করেছেন। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ইমাম হুসায়ন (রা)-এর বংশে ইমাম মাহ্দী (আ) এসে সমস্ত দুনিয়ায় খিলাফত পরিচালনা করবেন।

১৯-২০. মহানবী (সা) -এর সুনাম ও খ্যাতি কিয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে। প্রত্যেক দিন ৫ বার আযানে মুসলমানগণ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ঘোষণার সাথে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰهِ ঘোষণা করে থাকেন। কোন সমাবেশ, মাহফিল, ওয়ায দু'আর অনুষ্ঠান এমন নেই যেখানে নবী (সা) -এর স্মরণ ও আলোচনা করা হয় না। মুহাম্মদ ও আহমাদ নাম সমার্থক। আর আসমানী কিতাবের সুসংবাদে আহ্মাদ শব্দটি স্পষ্ট ভাষায় ছিল কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে শব্দটিকে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব গুণ হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত আর কারো ব্যাপারে বাস্তব ও সত্য হতে পারে না।

খ্রিস্টানদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এসব সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মাসীহ ইবন মারইয়াম এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এ জন্য তারা ৫৩ নং পাঠ যা সহীফায়ে ইয়াসইয়া (আ) -এর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। হযরত ঈসা মাসীহ (আ) -এর বেলায় সুসংবাদ বলে মনে করে থাকে। আর তা হচ্ছে ঃ

"আমাদের পয়গামে কে বিশ্বাস দিলেন এবং খোদার হাত কার উপর প্রকাশিত হল? তার ঢাকঢোলে কোন আকর্ষণ ছিল না, কোন আবেদনও ছিল না যে, আমরা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করব কি বা তার কোন দৃষ্টান্তও ছিল না যে, আমরা সেদিকে ঝুঁকে পড়ব। তিনি মানুষের মধ্যে নগণ্য ও হীন অবস্থায় ছিলেন?"

অন্য পাঠে আছে ঃ "তিনি আমাদের পাপের উৎস প্রতিহত করেছেন। আমাদের মন্দ কাজকে দূর করেছেন।" নাউযুবিল্লাহ্, যখন নাসারারা হযরত ঈসা (আ) -এর ব্যাপারে এরূপ বিশ্বাস করে, তখন যবূরে বর্ণিত এর বিপরীত গুণের প্রতিফলন তিনি কিভাবে হতে পারেন? আমাদের বিশ্বাস সহীফায়ে ইয়াসইয়া এর ৫৩ নং আয়াত পরিষ্কারভাবে নতুন সংযুক্তি তথ্য বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের ধারণা ও বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) কখনোই এরকম হতে পারেন না। হযরত ঈসা (আ) ছিলেন পূতপবিত্র চরিত্রের অধিকারী। দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মানিত মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। একই সাথে বলা যায়-এসব সুসংবাদের উপলক্ষ হযরত ঈসা (আ) ছিলেন না। কেননা পাগড়ী পড়া, তীরন্দায মুজাহিদ এসব পরিচিতি তাঁর ছিল না এবং তাঁর শরী'আত ও স্থায়ী ও চিরস্থায়ী ধরনের ছিল না। তিনি সকলের জন্য সাধারণভাবে আবির্ভূত হননি। তাঁর গৃহে কোন শাহযাদী আসেনি যে তার পত্নী বা দাসী হতে পারে। বস্তুত তিনি বিবাহই করেননি এবং তাঁর কোন পিতা ও পিতামহ ছিলেন না।

৭ম সুসংবাদ ঃ যাবূরের ১৫৪৯ অনুচ্ছেদে হযরত দাঊদ (আ)

১. খোদার শোকর কর, প্রশংসা কর লোক সমাবেশে তাঁর স্তুতি গাও।

২. ইসরাঈল স্রষ্টার উপর খুশী ছিল আর বনী ইসরাঈল নিজেদের বাদশাহর মাধ্যমে খুশি হবে।

এসব সুসংবাদে প্রতিশ্রুত নবীকে বাদশাহ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে যোগ্য ও পবিত্র ব্যক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত নবী রাজা হবেন। তাঁর শাসনের তরবারি আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ও আল্লাহর গযবের ক্ষেত্রে কাফিরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। তিনি তাঁর সাথী ও সমর্থকদের নিয়ে কাফিরদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ পরিচালনা করবেন।

এসব কিছুর পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর অনুসারীদের গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে আর যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি হযরত মুহাম্মদ (সা) -এর উম্মাতের বেলায় প্রযোজ্য। তাঁরা এমন যারা বিছানায়ও আল্লাহর যিকির করেন। যে কথা আল্লাহ তা'আলা

বলেছেন ঃ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ "তারা দাঁড়িয়ে, বসে ও বিছানায় গিয়েও আল্লাহর যিকির করে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)

আর এই উম্মাত সবক্ষেত্রে সব পর্বে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা বা তাক্‌বীর করে থাকে। যেমন ঃ জিহাদের ময়দানে, প্রতিদিন আযানে, ঈদুল ফিতরে, ঈদুল আযহা, ঈদ পরবর্তী তিন দিনে, হজ্জের দিনগুলোতে, এবং মিনায় অবস্থানকালে, মুযদালিফায়, আরাফাতে। এসব স্থানে আল্লাহ্ আকবার তাক্‌বীরের প্রবল ঘোষণা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইয়াহূদী ও নাসরারা তাকবীর করে না বরং ইয়াহূদী বা শিংগায় আওয়াজ দেয় নাসারারা ঘন্টা বাজায়। আল্লাহ আকবার শ্লোগান শুধুমাত্র হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) -এর উম্মাতের সংস্কৃতি। মুহাজির ও আনসারদের দু'দিক তীক্ষ্ণ তরবারির মাধ্যমে রূম-সিরিয়া সহ অন্যান্য রাজ্য বিজয় করেছেন। আর তাঁরা বড় বড় অনেক রাজা ও আমীরকে বন্দী করেছেন। আলোকিত সুসংবাদের বাস্তব নমুনা নাসারাদের নিকট হযরত সুলায়মান (আ) হতে পারেন না। কেননা আহ্‌লে কিতাবদের বিশ্বাস (নাউযুবিল্লাহ) তিনি শেষ বয়সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন ও মূর্তিপূজা শুরু করেছিলেন। অন্যদিকে হযরত ঈসা (আ)-এর বেলায়ও এ সুসংবাদ প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা তাদের বিশ্বাস হল হযরত ঈসা (আ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়েছেন এবং বেশির ভাগ হাওয়ারীকে বন্দী করা হয়। তাঁরা অন্য বাদশাহ ও আমীরদেরকে কিভাবে গ্রেপ্তার করবে? সুসংবাদে আছে, প্রতিশ্রুত ব্যক্তি বাদশাহ হবেন। আর একথা পরিষ্কার যে, হযরত ঈসা (আ) বাদশাহ ছিলেন না। নৈতিক রাজত্ব তো সকল নবীর বেলায়ই প্রযোজ্য, এখানে ঈসা (আ) -এর বিশেষ কোন মর্যাদা ছিল না।

আরেকটি বিষয় হল কাফিরদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে বন্দী করা আর এসব কিছুই ইবাদতের মধ্যে শামিল। এ ক্ষেত্রে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

কেননা হযরত মূসা (আ) -এর পরে হযরত ইউশা ইবন নূন (আ) জিহাদ করেছেন এবং এভাবে হযরত সুলায়মান (আ) -এর জিহাদ করা ইয়াহূদী ও নাসারা সকলের নিকটই স্বীকৃত বিষয়। এ জন্য পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব নমুনা হযরত ঈসা (আ) হতে পারেন না। যবূরে এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলেছে যে, আগত নবী বাদশাহ হবেন। নিজের সাথীদেরকে নিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন। স্বৈরাচার শাসকদেরকে হত্যা করবেন, বন্দী করবেন এবং তাঁর সাথীগণ তাকবীর বা আল্লাহু আকবর শ্লোগান দিবেন।

আর যবূরের ভবিষ্যদ্বাণীর সকল বিষয়ই মহানবী (সা) -এর হাতেই প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়েছে।

৮ম সুসংবাদ ঃ যবূর ঃ৭২ অধ্যায় প্রথম পর্ব

(১) হে খোদা বাদশাহকে ইনসাফ দান কর আর বাদশাহর সন্তানকে সততা প্রদান কর। (২) সে তোমার বান্দাদের মধ্যে সততার হুকুম দিবে এবং তোমার গরীব বান্দাদের সাথে ইনসাফ করবে। (৩) পাহাড় মানুষের জন্য নিরাপদ হবে, টিলায়ও সততা পৌঁছবে। (৪) সে জাতি দরিদ্রদের সাথে ইনসাফ করবে, অভাবীদেরকে রক্ষা করবে, যালিমদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিবে। (৫) যতদিন চাঁদ ও সূর্য অবশিষ্ট থাকবে তোমাকে লোকেরা সমীহ করবে। (৬) তুমি বৃষ্টি ও মেঘের ন্যায় যমীনকে সিক্ত করবে, লতাপাতা উর্বর করবে। (৭) যতদিন চাঁদ অবশিষ্ট থাকবে, তুমি সততার সাথে থাকবে ও নিরাপত্তা দিবে। (৮) সমুদ্রের সীমা ছাড়িয়ে নদ-নদী পেরিয়ে যমীনে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। (৯) মরুভূমির অধিবাসীরা তাঁর সামনে আনুগত্য প্রকাশ করবে আর তাঁর শত্রুরা ভূলণ্ঠিত হবে। (১০) দ্বীপের রাজারা এবং সাবার রাজা তাঁর জন্য হাদীয়া পেশ করবে। (১১) সকল রাজা তাঁকে মান্য করবে, সকল সম্প্রদায় তাঁর অনুগত হবে। (১২) দরিদ্র ও আর্তের সেবা ও সহযোগিতা করবে। (১৩) গরীব দুঃখী মানুষকে রক্ষা করবে। তারা তাদের জানমালের নিরাপত্তা দিবে, গযব ও যুলম থেকে রক্ষা করবে। তাদের কাছে রক্তের মূল্য গুরুত্ব পাবে। (১৫) তিনি বিজয়ী হতে থাকবেন। সাবা রাজ্যের সোনা তাঁকে প্রদান করা হবে। তার প্রতি শুভ কামনা ও সাধুবাদ প্রতিদিন ব্যাপক হারে চর্চা হবে। (১৬) যমীনের উৎপাদনের সীমা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছবে। ফল ও ফসল লেবাননের গাছের ন্যায় সারিসারি হবে আর শহরের লোকেরা শস্য-শ্যামল ঘাসের ন্যায় সজীব ও তারুণ্যে পূর্ণ হবে। (১৭) সূর্য যতদিন অবশিষ্ট থাকবে, তার সুনামও ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। গোটা জাতি তার প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা জানাবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যবূরে এমন নবীর আবির্ভাবের সংবাদ দেয়া হয়েছে যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে নবুওয়াত-রিসালাত প্রাপ্তির সাথে সাথে রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতাও প্রাপ্ত হবেন। তাঁর রাজত্বের সীমা এত ব্যাপক হবে যে, গভীর মহাসাগরও তার আওতায় আসবে। তাঁর ইনসাফ ও সততার সাথে তাঁর সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি গরীব, অসহায়, অভাবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেন। আলিমদেরকে পরাজিত করে দিবেন, দুশমনেরা তাঁকে ভয় পাবে। পৃথিবীর রাজাগণ তাঁকে হাদিয়া প্রদান করবে। সকল গোত্র সম্প্রদায় তাঁর আনুগত্য করবে। চারদিক থেকে প্রতিদিন তাঁর প্রতি শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ জানানো হবে। অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ন থাকবে। যতদিন সূর্য আছে, তাঁর নামও পরিচিত থাকবে।

বিবেকবান ব্যক্তিগণ! সাধারণভাবে চিন্তা করে দেখুন, উল্লেখিত বিষয় সাধারণভাবে চিন্তা করে দেখুন, উল্লেখিত গুণাবলী হযরত ঈসা মাসীহ (আ) -এর মধ্যে ছিল না, বরং

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যেই এসব গুণ পুরোপুরি বর্তমান ছিল। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ) ও হযরত যুল-কারনাইন (আ)-এর ন্যায় বিশাল রাজত্ব দান করেছিলেন এর মাধ্যমে তিনি মানুষের সমাজে ইনসাফ ও সততার ভিত্তিতে সুশাসন কায়েম করেছিলেন। পৃথিবীর মানুষ তাঁর স্বচ্ছতা ও ন্যায় বিচারের শাসন ভিন্ন কোন নমুনা প্রত্যক্ষ করেনি। যালিমদের থেকে মযলূমদের বদলা নেয়া হয়েছে আর যমীনকে যুলম ও গযবমুক্ত করা হয়েছে। মহা-সাগর, মরুভূমি, বন-জঙ্গল সব এলাকায় তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুশমনেরা তাঁকে ভয় পেত, বড় বড় রাজারা তাঁর সামনে মাথা নত করে উপহার সামগ্রী তাঁর দরবারে প্রেরণ করেছে। তিনি ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ও যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তাঁর শাসনের স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের ধারাবাহিকতাকে চরম উন্নীত করে হযরত সিদ্দীকে আকবর আবূ বকর (রা) এবং ফারূকে আযম (রা) বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছেন। যত দিন চাঁদ-সূর্য আছে, পৃথিবী বাকী থাকবে, তাঁর নাম নামাযে, দুরূদেও মিহরাবে উচ্চারিত হতে থাকবে। শুধু তাই-ই নয়, খুতবাতে তাঁর নামের সাথে হযরত খুলাফায়ে রাশেদীনের নামও সম্মানের সাথে উচ্চারিত হতে থাকবে– যারা পৃথিবীতে ইনসাফ ও সততার ঝাণ্ডা বুলন্দ করে গেছেন।

ইয়াহূদী পণ্ডিতদের প্রতি প্রশ্ন, তোমরা সততার সাথে এ কথার জবাব দাও যে, ইনসাফ ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসন পরিচালনায় যে ভবিষ্যদ্বাণী যবূরে করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যাতীত আর কে, কোথা ও কবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? উল্লেখিত গুণাবলী ও পরিচয় হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর হাওয়ারীদের বেলায় বাস্তবায়িত হবার কোন চিত্র দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব জ্ঞানী ও গুণীজনের প্রতি আবেদন, নিবেদন যবূরের ১১২ থেকে ১১৩ অনুচ্ছেদ এবং উল্লেখিত ৭২ অনুচ্ছেদ ও পরিশিষ্টে উল্লেখিত গুণ হযরত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য মাওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানবী (র) -এর ফার্সী ভাষায় রচিত্র গ্রন্থ ‘ইযালাতুল্ আওহাম’ (ازالة الاوهام) পৃষ্ঠা ৪৭০ থেকে ৪৭৫ দেখা যেতে পারে।

৯ম, সুসংবাদ ঃ সহীফায়ে মালকী (আ) ৩য় অধ্যায় ১ম পাঠ

দেখ আমি আমার রাসূলকে প্রেরণ করব এবং সে আমার পূর্বে আমার পথকে সংস্কার করবে----

“সে অবশ্যই আসবে। মহা প্রভু বলেন, তাঁর আগমনের দিনকে কেউ রহিত করতে পারবে না। তিনি অবশ্যই প্রকাশিত তাঁর সামনে কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে যে খোদার তোমরা তালাশ কর, হ্যাঁ খাতনার রাসূল আসবে তোমরা খুশী হবে।”

এই সুসংবাদে এমন রাসূলের কথাই বলা হয়েছে যিনি খতনার প্রচলন করবেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর আগমনের পূর্বে ইয়াহূদী ও নাসারাগণ খাতনাকারী রাসূলের প্রতীক্ষায় ছিল। রূম সম্রাট কায়সারও সে খাতনাকারী রাসূলের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল যা সহীহ্ বুখারীর হাদীসে হিরাকল থেকে জানা যায়। তবে আধুনিক কপিতে খাতনার রাসূল -এর স্থলে প্রতিশ্রুত রাসূল শব্দ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুত বলতে খাতনাকে বুঝানো হয়। যেমন জন্ম সফর (আদি পুস্তক) -এর ৭ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ "আর আমার প্রতিশ্রুতি যা আমার সাথে তোমাদের সাথে হয়েছে তা হল, তোমার পরে তোমার বংশে এমন একজন হবে যাকে তোমরা স্মরণ রাখবে। তার সকল সন্তান (বংশধর) খাতনা করবে। তোমরা খাতনা কর। আর এটি হল তোমাদের সাথে আমার প্রতিশ্রুতির প্রতীক।"

১০ম সুসংবাদ ঃ সহীফা হাবকুক (আ) ৩য় অধ্যায় ৩য় পাঠ

তায়মানের প্রভু হতে, আর তিনি মহাপবিত্র ফারান পাহাড় থেকে এসেছেন। তাঁর মর্যাদার আলোকে আকাশ চমকে উঠেছে আর যমীনে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, প্রত্যেক শত্রু-মিত্রের মুখে তাঁর নাম' মুহাম্মাদ-আহমাদ'। প্রাচীন আরবী একটি কপিতে এভাবে আছে। অর্থাৎ তামাম যমীন আহমাদ (সা)-এর প্রশংসায় ভরে গেছে। কিন্তু হিংসুকেরা এ বাক্যটিকে যবূরে বর্তমান রাখেনি। পরবর্তী সংস্করণে তারা এ কথাটি বাদ দিয়েছে। বস্তুত সমস্ত দুনিয়া তাঁর হিদায়তে আলোকিত হয়েছে।

১১শ সুসংবাদ : সহীফা ইয়াস্ইয়া (আ) ২১ অধ্যায়, ৬, ৭ আয়াত

মহা প্রভু আমাকে বলেছেন ঃ "পৃথিবীতে যা দেখবে বর্ণনা করবে। তিনি দু'জন আরোহীকে আগমন করতে দেখেছেন। একজন গাধার উপর আরোহী, আর একজন উটের উপর আরোহী।

এই সুসংবাদে ইয়াসইয়া (আ) দু'জন নবীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এক ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ইশারা করে গাধার উপর আরোহী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা হযরত ঈসা মাসীহ (আ) গাধার উপর আরোহণ করে ইয়ারশলম বা বায়তুল মুকাদ্দাসে আগমন করেছিলেন।

দুই ঃ হযরত নবী করীম (সা)-এর প্রতি ইশারা করে উটের আরোহী বলে উল্লেখ করেছেন যা আরবের বিখ্যাত বাহন। অতএব মহানবী (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি উটে আরোহী ছিলেন। তারপর নবম আয়াতে বাবেল শহরের পতনের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বাবেলের পতন হয়েছে, হযরত মাসীহ বা হাওয়ারীদের সময় বাবেল শহরের পতন হয়নি।

১২শ সুসংবাদ ২১ অধ্যায়, আয়াত ১৬ ও ১৭ এতে আরবের ইল্হামি বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ খোদা তা'আলা আমাকে এভাবে বলেছেন ঃ (১৬) এক বছরের মধ্যে

কেদারদের সমস্ত প্রভাব ভূলুণ্ঠিত হবে। (১৭) তীরন্দায লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে অন্যদিকে কেদারদের বাহাদুরগণের পতন হবে। ইসরাঈলের খোদা এভাবেই বলেছেন।

তাই দেখা যায় যে, হিজরতের এক বছরের মধ্যে বদরের যুদ্ধে কেদার অর্থাৎ কুরায়শদের সমস্ত প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাদের নেতারা সকলে নিহত হয় এবং সত্তরজন বন্দী হয়, অনেকে আহত হয়। বনী কেদার যে বনূ ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়টি তাওরাত ও অন্যান্য ইতিহাস থেকে প্রমাণিত ও নাসরাদের পণ্ডিতদের স্বীকৃত। ২৪ অধ্যায়ের **২৩ নং ১৩শ সুসংবাদ আয়াতে** বলা হয়েছে ঃ "চাঁদ ম্লান হয়ে গেছে, সূর্য লজ্জিত যে, যখন খোদায়ী বাহিনী সীবুন পাহাড় ও ইয়ারশলমে তাদের মর্যাদাবান দলের পূর্বে প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে রাজত্ব করবে।"

আর হযরত নবী (সা) অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার সাথে রাজত্ব করেছেন। চাঁদের রূপ পরিবর্তন মানে তার অবস্থার পরিবর্তন হওয়া আর তা দু'টুকরা হয়ে যাওয়া। যে কথা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِقْتَرَبَ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ـ

"কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে চাঁদ দু' টুকরা হয়ে গেছে।" (আল-কামার ঃ ১) 'সূর্যও লজ্জিত হয়েছে' খায়বার যুদ্ধের সময় সূর্যকে তার গতি স্তিমিত করতে হয়েছে।

১৪শ সুসংবাদ ঃ সহীফায়ে ইয়াসয়া (আ) ২৮ অধ্যায় ঃ ১৩ আয়াত ঃ এভাবে বলা হয়েছে ঃ

"খোদায়ী কালাম তাদের প্রতি এভাবে হবে যে, হুকুমের পর হুকুম আসবে এভাবে ধারাবাহিকভাবে বিধানের পর বিধান। কিছু বক্তব্যের পর আবার বক্তব্য।"

তাই লক্ষ্য করা যায় যে, পবিত্র আল-কুরআন ঠিক এভাবে কিছু অংশ কিছু অংশ করে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে। অন্যদিকে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে ইঞ্জিল আল্লাহর কিতাব নয়, বরং ইঞ্জিল হল হযরত ঈসা (আ)-এর সাহাবী বা হাওয়ারীদের বক্তব্য। উল্লেখিত সহীফার বক্তব্য থেকে জানা গেল, আলোচিত কিতাব অবশ্যই আল্লাহর কিতাব হতে হবে।

আমরা জানি হযরত ঈসা (আ)-কে যে ইঞ্জিল দেয়া হয়েছিল, তা একবারেই নাযিল হয়েছিল। কুরআনের মত পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়নি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ـ

"আমি কুরআনকে টুকরো টুকরো করে নাযিল করেছি যেন তুমি মানুষের সামনে থেমে থেমে পড়তে পার আর আমি কুরআনকে পর্যায়ক্রমে বারবার নাযিল করেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৬)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذٰلِكَ نُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً -

"আর কাফিরেরা বলে কুরআন একসাথে সবটুকু নাযিল হল না কেন? (আপনি জানিয়ে দিন,) আমি এভাবে নাযিল করেছি যেন আপনার হৃদয়ে কুরআন প্রতিষ্ঠিত থাকে আর এজন্যই আমি পর্যায়ক্রমে কুরআনের পাঠ অবতরণ করেছি।" (সূরা ফুরকান ঃ ৩২)

পঞ্চদশ সুসংবাদ সহীফায়ে ইয়াসাইয়া ৪২ অধ্যায়ের ১ম আয়াত

"তোমরা দেখ, আমার প্রিয় সম্মানিত বান্দা যাকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি। আমি তার উপর খুশি আমি তার উপর আমার রূহ্ রেখেছি। সে মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।"

এই সুসংবাদটিও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য প্রযোজ্য। কেননা তাঁর নামের মধ্যে আবদুল্লাহও একটি নাম ছিল। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ "যখন আবদুল্লাহ দাঁড়ালেন"। আরও অন্যান্য আয়াতেও কুরআনে মহানবী (সা)-কে আবদুল্লাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرَى بِعَبْدِهِ -

"আল্লাহ তা'আলা পবিত্র সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا

"সে সকল বিষয়, যা আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩)

পক্ষান্তরে নাসারাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দাহ্ নন্ বরং তিনি প্রভু বা খোদা, এজন্য তিনি এ সুসংবাদের বাস্তব নমুনা হতে পারেন না। মনোনীত সম্মানিত বিষয়টি হযরত মুস্তফা (সা)-এর বেলায় অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা মুস্তাফা রাসূল (সা)-এর অন্যতম বিখ্যাত নাম। 'আমি তাঁর উপর খুশি শব্দটিও হযরত রাসূল (সা)-এর 'মুরতাযা' নামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে নাসারাদের ধারণা অনুযায়ী 'আমি তাঁর উপর খুশি এ কথা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) শূলবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। অথচ নাসারাগণ মনে করে থাকেন, যে ব্যক্তি শূলবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়, সে অভিশপ্ত ব্যক্তি। যেমন গালীতের ৩য় পত্র থেকে ১৩শ পত্র থেকে জানা যায়। "মাসীহ আমাদের জন্য অভিশপ্ত হয়েছেন। এজন্য আমরা লটারী করে বিধানকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছি। কেননা লেখা আছে যে শূলবিদ্ধ হয়, সে অভিশপ্ত হয়। এ কথা থেকে জানা গেল,

নাউযুবিল্লাহ নাসারাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা মাসীহ (আ)-এর উপর সন্তুষ্ট নন।

মূলকথা ঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমাদ মুরতাযা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই আল্লাহর মনোনীত সম্মানিত বান্দা ও রাসূল, যার উপর আল্লাহ তা'আলা রাযী-খুশি আছেন। সীরাতের গ্রন্থে মহানবী (সা)-এর নামসমূহের মধ্যে মুরতাযা ও রাদিয়া লেখা হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর সাহাবায়ে কিরামের নামের সাথে রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের পরিচিতি ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর রাজি-খুশি হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার সাথে শপথ করেছে"। (সূরা ফাতহ ঃ ১৮)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ - ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِىْ التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ـ

"মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। যারা তাঁর সাথে আছেন তারা কাফিরদের সাথে কঠোর আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে রুকূ'রত ও সিজ্দারত অবস্থায় তাঁরা আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের চেহারায় তাক্ওয়া ও সিজ্দার প্রভা প্রকাশিত। তাদের পরিচয় ও মর্যাদার কথা তাওরাত ও ইঞ্জিলে আলোচিত হয়েছে"। (সূরা ফাতহ ঃ ২৯)

৪. রূহ অর্থ আল্লাহর অহী যার উপর হৃদয় ও আত্মার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا ـ

"এভাবে আমি তোমার নিকট আমার হুকুমের অহী প্রেরণ করেছি।"

আল-হাম্দুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা মৃত হৃদয় ও আত্মাকে জীবন্ত করার জন্য তাঁর উপর এমন এক রূহ্ অর্থাৎ কুরআন নাযিল করেছেন যার মধ্যে হাজারো মৃত হৃদয় জীবন ও যিন্দেগী লাভ করেছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"আমি এমন কুরআন নাযিল করেছি যেখানে মু'মিনদের জন্য সরাসরি চিকিৎসা ও রহমত রয়েছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)

৫. আদালত বা ন্যায়বিচার প্রসঙ্গ ঃ মহানবী (সা) নবী হিসেবে আগমন করে আল্লাহর নির্দেশে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَلاَتَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَاُمِرْتُ لاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ـ

"অতঃপর এইভাবে আহবান কর এবং-এর উপর দৃঢ় থাক যে বিষয়ে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তাদের কামনা-প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না। আর বল, আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর নাযিল করা কিতাবের উপর এবং আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তোমাদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য।" (সূরা শূরা ঃ ১৫)

ইনসাফ, প্রতিষ্ঠা প্রভাব ও মর্যাদার বিষয় এজন্য নাসারাদের দাবি অনুযায়ী এগুণও হযরত ঈসা (আ)-এর উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা তাদের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ)-এর এতটুকু শক্তি ও প্রভাব ছিল না যা দিয়ে তিনি তার নিহত হওয়া ও শূলবিদ্ধ হওয়াকে রোধ করতে পারতেন আর প্রভাব-প্রতাপ ত দূরের কথা।

৬.আবার উক্ত অধ্যায়ের দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আছে ঃ

"তিনি চিৎকার করে কথা বলবেন না। বুক উঁচু করে রাখবেন না, বাজারে তিনি আওয়াজ করবেন না।" এ আলোচনা ও কথাও হযরত নবী (সা)-এর ক্ষেত্রে হুবহু বাস্তব সত্য ও প্রতিফলিত। সহীহ বুখারীতে বাজারে ঘুরাফেরা করার অপছন্দ অনুচ্ছেদে আতা ইবন ইয়াসির (রা) থেকে রিওয়ায়াত আছে যে, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আ'স (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে প্রশ্ন করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে সব গুণ তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে, তা আমাকে শুনান। জবাবে তিনি অনেকগুলো গুণ উল্লেখ করলেন। সামষ্টিকভাবে সে গুণগুলো হল ঃ

ليس بفظ ولا غليظ ولاسخاب بالاسواق ـ

"তিনি কঠোর হৃদয়ের নন্, কর্কশভাষী নন এবং বাজারে তিনি উচ্চস্বরে হাঁকডাক করেন না (জোরে আওয়াজ করেন না)।"

৭. উল্লেখিত অধ্যায়ের ৩য় আয়াতে আছে ঃ তাঁর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হবে। অর্থাৎ তিনি নবী হিসেবে শাসক ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাতাও হবেন। অন্যদিকে হযরত ঈসা (আ) নামেমাত্র শাসকও ছিলেন না। তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি, অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থাও করেননি। অতএব-এর বাস্তব নমুনা আমাদের নবী (সা)-ই হতে পারেন। স্থায়ী ইনসাফের বিষয়টিও নবী (সা)-এর বেলায়ই প্রযোজ্য। কেননা তাঁর শরী'আত ও সুশাসন অব্যাহত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। ইন্শা'আল্লাহ এই ধারা অব্যাহত থাকবে। কোন জাতি এ ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মাতের

সমকক্ষ হতে পারবে না। অন্য কোন উম্মত তাদের নবীর শরী'আত পালনে ও বাস্তবায়নে নবী (সা)-এর উম্মাতের দশভাগের একভাগও সক্ষম হয়নি। তাঁর শরী'আত অব্যাহত থাকার বক্তব্য থেকে তিনি শেষনবী হওয়ার প্রতি ইশারা রয়েছে। যখন তাঁর শরী'আত কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে এজন্য আর অন্য কোন নবী প্রেরণের প্রয়োজন নেই। কেননা নতুন কোন নবী আসলে নতুন শরী'আত হবে এবং পূর্বের তাঁর শরী'আতের অব্যাহত ধারা ব্যাহত হবে।

৮. উক্ত অধ্যায়ের চতুর্থ আয়াতে আছে ঃ "তার কোন বিলুপ্তি হবেনা বরং অব্যাহতভাবে চালু থাকবে যতদিন যমীন আবাদ থাকবে। তাঁর হিদায়েত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে যমীন ধ্বংস হবেনা।"

নবী করীম (সা)-এর যখন ইন্তিকাল হল তখন দেখা গেল এ যমীনে তাঁর হিদায়েত পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

"আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমি তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে আমি পসন্দ করলাম।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সরাসরি বিজয় দিয়েছি।" (সূরা ফাতহ ঃ ১)

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ـ

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে পৌঁছল।"

আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্ষেত্রে সবকিছু কার্যকরী হয়েছে। এমনও হতে পারে হিদায়েতের পুরো বাস্তবায়নের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা হযরত সিদ্দীকে আকবরের খিলাফতের প্রতি ও ইঙ্গিত করা হয়েছে, কোন কোন আলেম তা-ই মনে করে থাকেন।

অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে হিদায়েতের সাথে সততা ও সাদাকাতের সম্পর্ক রয়েছে, আর সাদাকাতের সাথে সিদ্দীকের সম্পর্ক আছে। তেমনিভাবে আদল ও ইনসাফের সাথে মর্যাদার সম্পর্ক রয়েছে। হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর ইনতিকালের সময় হযরত সিদ্দীকে আকবর আবূ বকর (রা)-কে ইমাম বানিয়ে একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, আমার ইন্তিকালের পরে হযরত আবূ বকরেরই খলীফা হওয়া উচিত, তাহলে সাদাকাত ও হিদায়েত প্রতিষ্ঠিত হবে।

৯. ৬ষ্ঠ আয়াতে এভাবে আছে ঃ "তোমার হাত ধরে রাখব ও তোমার নিরাপত্তা দেব।" এই কথাটিও রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে না, কেননা আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে সম্বোধন করেছেন ও ওয়াদা করেছেনঃ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মানুষের হাত থেকে হিফাযত করবেন।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

বস্তুত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে নাসারাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) -এর জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১০. তারপর ৬ষ্ঠ আয়াতে যে নূরের কথা বলা হয়েছে যে, লোকদের জন্যও প্রতিশ্রুতির জন্য তোমাকে নূর দেয়া হবে এতে নূরে হিদায়েত ও নূরে শরী'আতই বুঝায়। কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا۔

"হে মানুষ! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে প্রমাণ এসেছে, এবং আমি নাযিল করেছি তোমাদের নিকট স্পষ্ট নূর।" (সূরা নিসা ঃ ১৭৪।)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁকে সাহায্য করেছে ও এই নূরের আনুগত্য করেছে যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে, এই লোকেরা সফলকাম।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭।)

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۔

"হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর দিকে আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ করে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৪৫)

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۔

"কাফিরেরা মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূরকে অবশ্যই পূর্ণতা দিবেন, যদিও মুশরিক বা তা অপছন্দ করে। (সূরা সাফ্ফ ঃ ৮)

১১. ৭নং আয়াতে "নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি অন্য কাউকে দান করব না" একথা হযরত নবী (সা)-এর বেলায় অক্ষরে অক্ষরে সঠিক– কেননা তিনি বলেন ঃ

أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء قبلى

"আমাকে আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব জিনিস প্রদান করা হয়েছে তা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি।"

যেমন খতমে নবূওয়াত ও রিসালাত, সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে দাওয়াতের দায়িত্ব, মাকামে মাহমূদ, মহান শাফা'আত, সপ্ত আকাশের মি'রাজ, এসব বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, শান-শওকত একমাত্র আমাদের নবী ব্যতীত অন্য কোন নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেসব বিষয় দান করেছেন তার মধ্যে আছে ঃ স্পষ্ট আয়াত, চারিত্রিক উৎকর্ষতার মর্যাদা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, যা অন্য কোন নবীকে এতটুকু দান করা হয়নি। বিশেষ করে আল-কুরআনের মত মু'জিযা, যার সামনে সকলকেই মাথানত করতে হয়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

"এসব আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন।" (সূরা হাদীদ ঃ ২১)

১২. ১১তম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "আরবের মরুভূমিতে ও জনপদে কেদার পার্বত্য এলাকায় তিনি তাঁর আওয়াজ বুলন্দ করবেন। সাথে একই গান গাইবে পাহাড়ের চূড়ায়ও তা পৌঁছবে। তিনি আল্লাহর মহিমা শান প্রকাশ করবেন।

কেদার হযরত ইসমাঈল (আ)-এর এক সন্তানের নাম, যিনি মহানবী (সা)-এর পূর্বপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। মরুভূমি ও পাহাড়ী এলাকা ও ফারান-এর বর্ণনা বলতে সেসব এলাকাকেই বুঝানো হয়েছে যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত হাজেরা (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে রেখে এসেছিলেন। যা জন্ম পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে (আয়াত ২১)। সে স্থানে এক সময় মক্কার জনপদ গড়ে উঠেছে। কেদার জনপদ বলতে মক্কা শহরকেই বুঝানো হয়েছে। এখানে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরগণ বসতি তৈরি করেছেন। অর্থাৎ এসব কথা দ্বারা রাসূল (সা)-এর জন্মস্থানের আলোচনাই করা হয়েছে যে, পবিত্র মক্কায় মহানবী (সা) জন্মগ্রহণ করবেন। আর তাঁর উম্মাত এই জনপদে পাহাড়ে-মরুভূমিতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর এবং লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা শ্লোগান মুখরিত করে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ঘোষণা করবে। সকলে সব সময় আল্লাহু আকবার শ্লোগান দেয়া এটা মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মাতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতেরা উচ্চস্বরে আযান ও তাকবীর দিয়ে নামায আদায় করে থাকেন। নাসারারা ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে ইবাদত করে থাকে। শুধু তা-ই নয়, বরং তারা এক আল্লাহর ঘোষণা না দিয়ে ত্রিত্ববাদ ও আকৃতির শ্লোগান দিয়ে থাকে। তাদের ধারণা ও বিশ্বাস হল হযরত মাসীহ খোদা হযরত মরিয়ম-এর পেটে আকৃতি ধারণ করে বান্দাদের মুক্তির জন্য শূলবিদ্ধ হয়েছেন।

অতএব সেখানে আল্লাহর তাক্‌বীর অনুপস্থিত। সুসংবাদে আরও আছে যে, প্রতিশ্রুত নবী কেদার ইবন ইসমাঈল এবং বংশধর হবেন। এজন্য সুসংবাদের প্রতিশ্রুত নবী বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তি হতে পারেন না। কেননা তারা সকলেই হযরত ইসরাঈলের সন্তান ছিলেন, কেউ কেদার ইবন ইসমাঈলের বংশধর নন। অন্যদিকে সালা মদীনা মুনাওয়ারার একটি পাহাড়ের নাম। সুসংবাদে উল্লেখিত উক্ত পাহাড়ের নাম উল্লেখ করে মহানবী (সা)-এর হিজরতস্থল পবিত্র মদীনাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রকৃত বিষয় আল্লাহই অধিক অবগত।

সারকথা

প্রতিশ্রুত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ প্রিয়পাত্র ও সম্মানিত বান্দা। তিনি উন্নত নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী, সারা জাহানের বাদশাহ ও হিদায়েতের পথপ্রদর্শকের পদে আসীন হবেন। প্রতিশ্রুত নবী বনী কেদার তথা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে হবেন। তিনি বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে হবেন না। কেননা কেদার হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ছেলে ছিলেন একথার উপর সকলেই একমত।

সুসংবাদের বাস্তব নমুনা হযরত ঈসা (আ) হতে পারেন না। কেননা তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত, বনী কেদারের মধ্যে তিনি শামিল ছিলেন না।

গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও হিদায়েতের দায়িত্ব তার আজও হয়নি। ইঞ্জিল কিতাবও শুধু বনী ইসরাঈলের বিভ্রান্ত লোকদের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, সমস্ত মানব জাতির জন্য সাধারণভাবে তিনি নবী হয়ে আসেন নি। তিনি কোন শাসন পরিচালনা করেন নি। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন নি। অতএব এসব সুসংবাদ হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে? এসব সুসংবাদে যে সব গুণ ও যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে, তা কেবল সবগুলো হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যেই পাওয়া যায়। অতএব তিনিই-এর বাস্তব নমুনা তাঁর জন্য এ সুসংবাদ।

১৬শ সুসংবাদ ঃ সহীফায়ে ইয়াসইয়া (আ), ৫২ অধ্যায়, ১৩ পাঠ

"দেখ, আমার বান্দা ভাগ্যবান হবে সম্মানিত মর্যাদাবান ও প্রশংসিত হবে।"

এই সুসংবাদে আমার বান্দা বলে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর প্রশংসিত গুণাবলী ও সৌভাগ্যকে বুঝানো হয়েছে। তিনি প্রশংসিত, এ গুণ তাঁর নামের সাথে যুক্ত। কেননা 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থই হল প্রশংসিত। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এত উচ্চমার্যাদা দান করেছেন, যে মর্যাদার কথা কেউ কোনদিন শুনেওনি, দেখেওনি। নাসারাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা চিন্তা করে দেখুন, হযরত ঈসা (আ) এসব উচ্চমর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন কিনা? নাসারাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুযায়ী যদি হযরত ঈসা (আ) উচ্চ মর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জন করতেন তা হলে তাঁকে শূলবিদ্ধ হয়ে অসম্মানজনক অবস্থায় পতিত হতে হত না। এ ধরনের অবস্থা কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন

ব্যক্তিত্বের জন্য উপযোগী হতে পারে না। ইসলাম হযরত ঈসা (আ)-এর বিষয়ে এ ধরনের অসম্মানজনক বিশ্বাস থেকে মুক্ত। ইসলামের আকীদা হল হযরত ঈসা (আ)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি আল্লাহর সম্মানিত বান্দা ও রাসূল। তাঁকে আল্লাহ দুশমনদের থেকে হিফাযত করে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।

১৭শ সুসংবাদ ঃ অধ্যায় ৬০, প্রথম অধ্যায়

প্রসঙ্গ মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারাহ

(১) উঠ আলোকিত হও! (হে মক্কার যমীন) তোমার আলো এসেছে এবং আল্লাহর মহিমা তোমার উপর উদিত হয়েছে। (২) দেখ যমীন অন্ধকারে ছেয়ে যাবে, মানুষের মধ্যেও অন্ধকার পড়বে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমার নিকট প্রকাশিত হবেন এবং তাঁর মহিমা প্রকাশিত হবে। (৩) লোকেরা তোমার রাজত্বে ও আলোতে তোমার পরশে চলবে।

তারপর মদীনার যমীনের বর্ণনা। (৪) চোখ উঠিয়ে চারদিকে দেখ, সকল মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার নিকট আসছে। তোমার ছেলেরা দূর থেকে আসবে এবং তোমার মেয়েদেরকে কোলে করে রাখা হবে। (৫) তখন তুমি এসব দেখে উজ্জ্বল হবে, তোমার হৃদয় উজ্জীবিত হবে, প্রশস্ত হবে। কেননা সাগরের তরী তোমার দিকে আসবে সমাজের সম্পদ তোমার কাছে আসবে। (৬) উটের সারি সোনা-রূপার মুদ্রা, সারা রাজ্যের সম্পদ, অফুরন্ত সম্পদ সব তোমার হাতে আসবে আর আল্লাহর প্রশংসা করে সুসংবাদ শুনাবে। (৭) কেদারের সকল জনতা তোমার নিকট জমা হবে। উট বকরী সবই তোমার দরবারে সমবেত করা হবে। তোমার মরযী অনুযায়ী তা যবেহ করার স্থানে পৌঁছবে। আর আমি আমার শানের ঘরকে মর্যাদা দেব। (৮) এই কে যার দিকে মেঘ উড়ে যাচ্ছে, কবুতরের ন্যায় বাসার দিকে উড়ছে। .... (৯-২২ পর্যন্ত)।

এই অধ্যায়ে প্রথম আয়াতে মক্কা মুকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। মক্কার আলো ও নূরে উদ্ভাসিত বলতে সুসংবাদে নূর ও আলো হিসেবে হযরত নবী (সা)-এর নবুওয়াত অথবা পবিত্র আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। পবিত্র আল-কুরআনে হযরত নবী (সা)-কে এবং কুরআনকে স্পষ্ট 'নূর' বলা হয়েছে।

২. শত শত বছর থেকে যমীনে কুফর ও শিরকের এবং গুমরাহীর যে অমানিশা ও যুলুম ছেয়ে গিয়েছিল হযরত নবী (সা)-এর নবুওয়াত ও কুরআনের নূরের মাধ্যমে তা দূরীভূত হয়েছিল।

৩. আমীর, ফকীর ও বাদশাহ্ সবাই সে নূরের উদয়ে আলো পেয়ে চলতে লাগল।

৪. ধীরে ধীরে সে নূর যমীনের চারদিকে সম্প্রসারিত হতে লাগল। বিভিন্ন সম্প্রদায় এ নূরের নিকটে সমবেত হতে লাগল। মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে এই নূর রোমের জনপদে, মরক্কোর ঘরে, প্রাচ্যের পারস্যে, কাশগড় (চীন), খাত্তান, হিন্দুস্তান ও সিন্ধুর লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছল।

৫. লাখো মুসলমান পায়ে হেঁটে ও বাহনে আরোহী হয়ে আমীর-গরীব সবশ্রেণীর লোক বায়তুল্লাহর হজ্জ করার জন্য পবিত্র মক্কায় সমবেত হতে লাগলেন। অসংখ্য উট ভেড়া-দুম্বার সারি সারি পাল মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে পৌঁছল। আর উট ও বকরীর পালের এমন দৃশ্য আরব ও মক্কার ন্যায় আর পৃথিবীর কোন এলাকায় দেখা যায় না।

৬. আল্লাহ যুল-জালাল-এর প্রশংসা স্তুতি ও পরিচয়কারী দলে দলে কা'বার চত্বরে সমবেত হতে লাগলেন।

৭. যমীনের শাসকগণ মুসলমান ও মক্কার অধিবাসীদের জন্য লাখ লাখ দিরহাম ও দিনার উপহার হিসেবে প্রেরণ করতে লাগলেন।

৮. মাদইয়ান হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একজন সন্তানের নাম ছিল যিনি হযরত কাতূরার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। তিনি মাদায়েনে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কেদার হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। এ বিষয়টি তাওরাত কিতাবের সৃষ্টি বা আদি পুস্তকে সরাসরি বর্ণিত হয়েছে। মাদায়েনবাসী ও সাবার লোকেরা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর, যারা পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তারা প্রতি বছর হজ্জ করার জন্য উট ও গাধায় আরোহণ করে বায়তুল্লাহর নিকট উপস্থিত হতেন। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক (لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ)-এর শ্লোগানে প্রান্তর-পাহাড় মুখরিত হয়ে গেল। কেদারের সমস্ত মেষ সেখানে জড়ো হতে লাগল। আর নাবীত বলে পূর্ব ও উত্তর আরবের গোত্রদেরকে বুঝানো হয় (নাবীত হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অন্যতম ছেলে ছিলেন)। অর্থ হলো ইয়ামেনের সাবার গোত্রসমূহ এবং কেদারের পশুর পাল অর্থাৎ কুরায়শের লোক নাবীতের মোটা শরীরের লোকেরা চার দিক থেকে আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও প্রশংসা করতে করতে তাঁর খিদমতে হাযির হবে।

৯. কবুতরের ন্যায় মানুষ উড়ে উড়ে কা'বার নিকট পৌঁছবে এবং তাওয়াফ করবে।

১০. সে সময় লেবাননের যে মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তা মক্কা মুকাররমার পক্ষে অর্জিত হবে। মক্কা শরীফ খাতিমুন্ নবী (সা)-এর জন্মস্থান হবে এবং এখানে তাঁর বসতি হবে আর তাঁর সাথী-সাহাবীগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের নমুনা হবে।

১১. কা'বা অভিমুখে যে আগ্রাসন ও হামলা অগ্রসর হবে, তা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন ঃ হাতী বাহিনীর বিখ্যাত ঘটনা।

১২. আল্লাহর পবিত্র স্থান অর্থাৎ খানা-কা'বা পরিপাটি ও সুসজ্জিত হবে। প্রত্যেক বছর কা'বাঘরে গিলাফ লাগানো হবে।

১৩. এই পবিত্র শহরের নাম হবে চীহুন। তা এজন্য যে, ইয়ারশলমের একটি পাহাড়ের নাম হল সায়হুন তেমনিভাবে সায়হুন পবিত্র মক্কারও নাম। যেমন শায়খ আবদুল হক দেহলবী (র) তাঁর 'মাদারিজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (৪র্থ খণ্ড ১ম অধ্যায়)

১৪. মহানবী (সা)-এর পরে যিনি তাঁর খলীফা ও শাসক হয়েছেন, তিনি শান্তির প্রতীক ছিলেন এবং তাঁর বিধি-বিধান পৃথিবীর জন্য, স্বচ্ছতা ও সততার মূর্ত প্রতীক হয়েছে।

১৫. পৃথিবী ইনসাফ ও সততা স্বচ্ছতা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বাস্তবায়ন এত ব্যাপক হয়েছিল যে, এমন কোন জনপদ অবশিষ্ট ছিল না যেখানে যুলুমের আওয়াজ বুলন্দ হত।

১৬. তিনি উম্মাতের জন্য এমন বিধান (শরী'আত) রেখে গেছেন যার নূর ও আলো চিরকাল দীপ্তমান থাকবে।

১৭. তাঁর নূর ও শান-শওকত চিরস্থায়ী হবে।

১৮. যা কোনদিন ঢলে পড়বে না, অস্তমিতও হবে না।

১৯. তাঁর সকল সাহাবী হিদায়াতপ্রাপ্ত হবেন।

২০. এক ছোট অংশ থেকে হাজারে এবং নগণ্য সম্প্রদায় থেকে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবে।

নিবেদন ঃ পাঠকগণ রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের (রা) সম্পর্কে যবূরের ইয়াসইয়া পুস্তকের ৫৪ অধ্যায় থেকে ৬৫ পর্যন্ত দেখতে পারেন। (ইযহারুল হক ঃ লেখক মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবী, ২য় খণ্ড, আরবী এবং ইযালাতুল আওহাম, পৃ. ৪৯৫-৫০৫ ফারসী)।

সুসংবাদ হযরত দানিয়াল (আ)-এর কিতাব

হযরত দানিয়াল কিতাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দীর্ঘ কাহিনীর উল্লেখ আছে। পাঠকদের জন্য আমরা তার সারাংশ উপস্থাপন করছি।

বখতে নসর যিনি ব্যবিলনের রাজা ছিলেন। একবার তিনি ভয়ানক একটি স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্ন দেখে ভুলে গেলেন। এতে তিনি আরও বেশি পেরেশান হলেন। রাজা হযরত দানিয়াল (আ)-কে তাঁর অবস্থা জানালেন। হযরত দানিয়াল (আ) অহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে তার স্বপ্ন ব্যক্ত করলেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করলেন।

৩১. রাজা স্বপ্নে দেখেন ঃ একটি সুন্দর মূর্তি যা সুন্দর হওয়ার সাথে ভয়ানকও বটে। মূর্তিটি রাজার সামনে দণ্ডায়মান ছিল।

৩২. মূর্তির মাথা নির্ভেজাল স্বর্ণের, বক্ষ ও বাহু রূপার, উরু ও নিতম্ব তামার, হাঁটু লোহার এবং পায়ের কিছু অংশ লোহা ও কিছু মাটি দ্বারা তৈরি। এ ধরনের ভয়ানক অলৌকিক মূর্তি রাজা প্রত্যক্ষ করতে ছিলেন।

৩৩. হঠাৎ করে একটি পাথর বের হল। পাথরটি কারো হাতের সহযোগিতা ছাড়াই নিজে নিজে বের হয়ে মূর্তির পায়ে লাগল যা লোহা ও মাটির ছিল এবং তাকে টুকরা টুকরা করে দিল।

৩৪. সোনা, রূপা, লোহা, তামা ও মাটি (যা দিয়ে মূর্তিটি গঠিত ছিল) সব কিছুকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া হল। তা ভূষি ও ছাই-এর মত হয়ে গেল ও বাতাসে উড়ে যেতে লাগল। এমনকি এর কোন অস্তিত্বই অবশিষ্ট রইল না। পাথরটি যে মূর্তিটিকে আঘাত করে এ অবস্থা করেছিল, ধীরে ধীরে সেটি একটি পাহাড়ে পরিণত হল। সমস্ত পৃথিবীতে সম্প্রসারিত হল। (স্বপ্ন শেষ)

রাজা এ স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু পরক্ষণে তার স্মৃতি থেকে তা হারিয়ে যায়। হযরত দানিয়াল (আ) অহীর মাধ্যমে তা অবহিত হন যে, রাজা এ ধরনের একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। অহীর মাধ্যমেই অবগত হয়ে তিনি রাজাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়েছিলেন। আর তা হল ঃ এ স্বপ্নের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি রাজত্বের কথা বলা হয়েছে। স্বর্ণের মাথা বলতে ব্যাবিলনের রাজত্ব বুঝানো হয়েছে। তোমার রাজত্ব স্বর্ণের ন্যায়। আর তোমার পরে আরও একটি রাজত্ব আসবে যা রূপার মত হবে এবং তোমার রাজত্ব থেকে নিম্নমানের হবে। তারপর তৃতীয় রাজত্ব আসবে যা তামার মত হবে। তারপর চতুর্থ রাজত্ব আসবে যা লোহার মত মযবূত হবে। তারপর পঞ্চম রাজত্ব শুরু হবে যার পায়ে কিছু লোহা ও কিছু মাটি হবে। অর্থাৎ সে রাজত্বে কিছু দুর্বলতা মিশ্রিত থাকবে। লোহা ও মাটি মিশ্রিত থাকবে। সেই রাজত্বে শক্তিশালী ও দুর্বলতার সম্মিলিত ও সংমিশ্রিত রূপ থাকবে। কখনো সে রাজত্বে শক্তি থাকবে, কখনো দুর্বল অবস্থায় চলবে। এই পঞ্চম রাজত্বের যুগে অদৃশ্য জগত থেকে একটি পাথর প্রকাশিত হবে যা কারো হাতের সহযোগিতা ব্যতীত নিজে নিজেই আল্লাহর পক্ষ হতে আসমান থেকে অবতীর্ণ হবে। তা শেষ রাজত্বের পাদদেশে পতিত হয়ে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেবে এবং ভূষি ও তুলার মত করে দিবে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এমনকি তার নাম-নিশানাও বাকি থাকবে না। ক্রমান্বয়ে সে পাথর পাহাড়ে পরিণত হবে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে সম্প্রসারিত হবে।

জেনে রাখুন, এখানে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ও তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত এবং তাঁর আসমানী রাজত্বকে একটি পাথরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর সেখানে আরও বলা হয়েছে ঃ এই পাথর শীঘ্রই পর্বতের আকৃতিতে পরিণত হবে। অর্থাৎ প্রথমদিকে তা ছোট রাজ্য থাকবে, তারপর সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে যাবে। তা-ই দেখা যায়, হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খেলাফতের যমানায় রোমের কায়সার ও পারস্যের কিসরার মর্যাদাও রাজত্ব খতম হয়ে যায়। আর এভাবে

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও দ্বীনে হক সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন সমস্ত দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করতে পারেন।"

এই আয়াতে যেই প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছিল তা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।
হাদীসের প্রতিশ্রুতি ঃ

هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده

(কিসরা´কায়সার ধ্বংস হবার পর আর কায়সার কিসরা হবে না) সত্যে পরিণত হয়েছিল।

আসমানী রাজত্ব ও পাথর যমীনে এসে বিশাল সাম্রাজ্যকে পিছে ফেলেছে। তিনি আসমান থেকে যে শরী'আতী বিধানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে।

আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

এখানে প্রাসংগিকভাবে হযরত আতেকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের একটি স্বপ্ন উল্লেখযোগ্য। যা সীরাতের বিখ্যাত গ্রন্থাবলীতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ স্বপ্নের বিবরণ অবগত হলে পাঠকগণের পক্ষে হযরত দানিয়ালের সুসংবাদের মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হবে। আবূ জাহল-এর নেতৃত্বের কুরায়শদের এক হাজার সৈন্যের বাহিনী সাতশত উট একশত ঘোড়া ও অন্যান্য যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম সহ যুদ্ধের জন্য বদর প্রান্তরের অভিমুখে রওয়ানা হয়। তাদের রওয়ানা হবার প্রাক্কালে হযরত আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব এ স্বপ্ন দেখেন ঃ

এক উটের আরোহী মক্কায় আগমন করলেন এবং আব্‌তাহ্ নামক স্থানে উট বসালেন তারপর বিকট আওয়াজে এ ঘোষণা করলেন ঃ

الا انفروا يا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث ـ

"হে গাদ্দার সম্প্রদায়! তোমরা তিন দিনের মধ্যে তোমাদের বধ্যভূমিতে পৌঁছে যাও।"

তারপর সে উট আরোহী মসজিদুল হারামে প্রবেশ করল। সে কা'বাঘরের ছাদে আরোহণ করেও একই ঘোষণা করল। তারপর সে আরোহী আবূ কুবায়শ পাহাড়ে আরোহণ করেও একই ঘোষণা দিল। তারপর উপর থেকে একটি পাথর নিচে নিক্ষেপ করল। পাথরটি নিচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। মক্কার মধ্যে এমন কোন ঘর অবশিষ্ট রইল না যেখানে পাথরের টুকরা বা কণা পৌঁছেনি। হযরত আতিকা তাঁর স্বপ্ন হযরত আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রকাশ করেন। হযরত আব্বাস (রা) তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর একান্ত বন্ধুদের নিকট এই স্বপ্ন বর্ণনা করেন এবং তাঁরা অনুমান করতে সক্ষম হন যে, শীঘ্রই সম্প্রদায়ের উপর কোন মুসীবত পতিত হবে। আর এ স্বপ্নের কথা জানাজানি হতে হতে আবূ জাহল পর্যন্ত পৌছে গেল। মসজিদুল হারামে হযরত আব্বাসের সাথে আবূ জাহলের সাক্ষাত হল। তখন আবূ জাহল হযরত আব্বাসকে বলল ঃ ' হে আবুল ফযল! এতদিন তো তোমাদের পুরুষেরা নবুওয়াতের

দাবিদার ছিল, এবার মহিলারাও নবুওয়াতের দাবি করতে শুরু করেছে। হযরত আব্বাস বললেন, বিষয় কি ? আবূ জাহল আতিকার স্বপ্নের কথা বলল। এভাবে এ স্বপ্নের চর্চা চলছিল ঠিক এমন সময় যমযম গাফ্ফারী আবূ সুফিয়ানের কাফেলার হুমকিতে পতিত হবার সংবাদ নিয়ে মক্কায় পৌছঁল। সে মক্কায় পৌঁছে গায়ের জামা ছিঁড়ে বাতাসে উড়াতে লাগল, নিজ উটের নাক কেটে চিৎকার করে ঘোষণা করল হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলার সংবাদ শোন। কালবিলম্ব না করে কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য রওয়ানা হও। এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে কুরায়শগণ অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সহ প্রস্তুতি নিয়ে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে বদর প্রান্তরে পৌঁছল এবং এই স্বপ্নের বাস্তবতা সরাসরি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করল।

এ ঘটনার প্রতি গভীর চিন্তা করে দেখুন। হাদীসে আছে, খন্দকের যুদ্ধে পরিখা বা খাল খননের সময় একটি বিরাট শক্ত পাথর বের হয়েছিল। হযরত নবী (সা) তিনবার কোদাল মেরে পাথরটিতে আঘাত করেছিলেন। তাতে পাথরটি টুকরা টুকরা হয়ে যায়। আর পাথরটি থেকে আলোর ঝলক বের হয়েছিল। সে আলোতে সিরিয়া, পারস্য ও ইয়ামেনের শহরগুলো পরিলক্ষিত হয়েছিল। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, এসব শহর ও রাজত্ব মুসলমানের হাতে কোন সময় বিজিত হবে।

১৯শ সুসংবাদ মথির ইঞ্জিল ঃ ৩য় অধ্যায়, ১ম পাঠ

"ইউহান্না ও ইয়াহূদার দু'জনার বক্তব্যেই এই আহবান ও ঘোষণা করতে থাকে, তাওবা কর, শীঘ্রই আসমানের বাদশাহ্ আগমন করবেন।"

এই ইঞ্জিলের ৪র্থ অধ্যায়ের থেকে ১৭তম অধ্যায় পর্যন্ত পাঠে আছে ঃ "সে সময় থেকে ইউসু ঘোষণা করতে শুরু করেছে যে, তাওবা কর কেননা আসমানের বাদশাহ শীঘ্রই আগমন করবেন।"

আসমানী বাদশাহ বলতে কোন আসমানী কিতাবকেই বুঝানো হয়েছে যে, আসমান থেকে এমন কিতাব নাযিল হবে যেখানে সব বিধি-বিধান উল্লেখ থাকবে। আর সুনিপূণ ভাবে ও মর্যাদার সাথে এসব বিধানের প্রচার ও প্রসার হবে। আল্লাহর অবাধ্য ও আইন অমান্যকারীদের জন্য দণ্ডবিধি কার্যকর হবে। বস্তুত এই শাসন ব্যবস্থা শুধু দুনিয়ার বৈষয়িক ব্যবস্থাই নয়। যেমন অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা, আবার তা শুধু আসমানী বা নৈতিক ব্যবস্থাই হবে না, বরং জাগতিক ও আসমানী রাজত্বের সংমিশ্রিত রূপ, যেখানে সম্মান-মর্যাদা, শান-শওকতের সাথে প্রতিটি বিধি-বিধান যৌক্তিকভাবে যমীনে কার্যকর করবে। আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করলে এখানে যেমন শাস্তির কঠোরতা আছে, তেমনিভাবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যবস্থাও এখানে আছে। এখানে উল্লেখিত দু'টি শাসনের দিকই মহানবী (সা)-এর যামানায় এবং খুলাফায়ে রাশেদার যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

আল্লাহর শাসন ও আসমানী শরী'আত এ যুগে নাযিল হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িতও হয়েছে। কায়সার ও কিসরার সিংহাসন উৎপাটন করা হয়েছে। আল্লাহর দুশমনের সাথে জিহাদও করা হয়েছে। চোর ও ছিনতাইকারীদের উপর দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ব্যভিচারকারীদেরকে যিনার শাস্তি স্বরূপ পাথর মারা হয়েছে। মদ পানকারীদেরকে কোরা (চাবুক) মারা হয়েছে। দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখুন, আসমানী বাদশাহী এটাকেই বলে। এ ধরনের শাসন ও রাজত্বকে যদি আসমানী শাসন বলা না যায়, তা হলে আপনারা দেখান আসমানী বাদশাহী আর কি হতে পারে?

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ـ

২০শ সুসংবাদ ঃ মথির ইঞ্জিল ঃ ২১ অধ্যায়, ৪২ পাঠ

ইয়াসু তাদেরকে বললেন ঃ "তোমরা কখনো কি নুশতোতে পড়নি যে, যেই পাথরটি রাজগীরেরা অপছন্দ করেছিল তা কোণায় শেষ প্রান্তে হবে।"

এটি খোদার পক্ষ হতে হয়েছে, আমাদের নিকট তা আশ্চর্যজনক। এজন্য আমি তোমাদেরকে বলছি; খোদার বাদশাহী তোমাদের থেকে নিয়ে খাওয়া হবে। অন্য এক সম্প্রদায়কে-এর ফল আহরণের জন্য দেয়া হবে। যে এ পাথরের উপর পড়বে, টুকরা হয়ে যাবে, যার উপর পতিত হবে গলে যাবে। রাজগীর বলতে বনী ইসরাঈলকে বুঝায় প্রান্তের বা কোণার পাথর বলতে আমাদের নবী কারীম খাতিমুন্নাবিয়ীন মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা বনী ইসরাঈলের দৃষ্টিতে তিনি অপ্রিয় পাথরের মত ছিলেন। বনী ইসরাঈলেরা সব দিক থেকে তাঁকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ও সাহায্যে তিনি সর্বশেষ প্রান্তের পাথর তথা শেষনবী হবার গৌরব অর্জন করেছেন। প্রান্তের পাথর বলতে বুঝিয়েছে স্থাপনার উপরের অংশের খালি স্থান (চাদের শূন্যস্থান) তা সে পাথরে পূর্ণ হবে। এভাবে নবুওয়াতের প্রাসাদের শূন্যস্থান হযরত নবী (সা)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে। এভাবেই নবুওয়াতের প্রাসাদ পরিপূর্ণ হয়েছে।

كما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله الاموضع من زاويته فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت اللبنة وأنا خاتم النبيين ـ

رواه البخارى فى كتاب الأنبياء وفى رواية انا سددت موضع اللبنة وختم بى البنيان وختم بى الرسل ـ

যেমনটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার ও পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে উদাহরণ হচ্ছে, একটি ঘর উত্তমভাবে পরিপাটি করে বানানো হয়েছে কিন্তু এক ইট পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট রইল। লোকেরা ঘরটি দেখছিল এবং বলছিল, একটি ইট কেন লাগানো হলো না ? আমি খাতিমুন্নাবী, আমিই শেষ ইট হয়ে শূন্যস্থানে স্থাপিত হয়েছি। আমার মাধ্যমে নবুওয়াতের ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আমার মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা সমাপ্ত হয়েছে।" (বুখারী)

এখানে পাথর পতিত হবার বিষয়টি হল; তাঁর উপর যা পড়বে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, আর যার উপর তিনি পতিত হবেন সে-ও টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। কেননা বদরের প্রান্তরে কুরায়শ বাহিনী তাঁর উপর চড়াও হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা) তাদের উপর চড়াও হয়েছিলেন। এবারও তারা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। আর এভাবে পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কিরাম ইরান-সিরিয়া, রূম-সম্প্রদায় ও জনপদে পতিত হয়েছিলেন এবং সকলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। ফল ও ফসল সংগ্রহকারী সম্প্রদায় হল বনী ইসমাঈল। যারা হযরত নবী (সা)-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফল ও ফসল অর্জন করেছেন, রাজ্য ও শাসনের অধিকারী হয়েছেন। এভাবে আসমানী বাদশাহীতে তিনি শরীক হয়েছিলেন।

এজন্য এসব সুসংবাদের বাস্তব নমুনা খাতিমুন্নাবিয়্যিন সায়্যিদুল আওয়ালীন ওয়া আখিরীন হযরত মুহাম্মদ (সা) ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। হযরত ঈসা (আ) যেহেতু হযরত দাঊদ (আ)-এর বংশধর ছিলেন, এজন্য তিনি বনী ইসরাঈলের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কিভাবে অপ্রিয় পাথরের সাথে তুলনীয় হতে পারেন। দ্বিতীয়ত তিনি শেষ নবীও হতে পারেন না যা ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে। আহলে কিতাবীরা হযরত ঈসা (আ) ছাড়াও আরেকজন নবীর জন্য অপেক্ষমান ছিল। ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে, যখন হযরত ইয়াহইয়া (আ) আগমন করেন তখন ইয়াহূদীরা তাঁকে প্রশ্ন করে, তুমি কি সেই প্রতিশ্রুত....!

তৃতীয়ত হযরত ঈসা মাসীহ (আ) নিজে কারো উপর চড়াও হন্‌নি আর যখন ইয়াহূদীরা তাঁর উপর চড়াও হয় তখন নাসারাদের বক্তব্য অনুযায়ী তিনিই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যান।

হযরত ঈসা (আ) কখনো এমনটি বলেননি যে, আমি শেষ নবী, আমার আসমানে চলে যাবার পর আর কোন সত্য নবী আসবেন না।

২১শ সুসংবাদ ঃ ইউহান্না, ১৪শ অধ্যায় পাঠ ১৫

১৫। যদি তোমরা আমাকে ভালবাস তা হলে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে। ১৬। আমি পিতার কাছে আবেদন করব যেন তিনি তোমাদের জন্য আরেকজন সাহায়তাকারী প্রদান করেন। ২৬। যিনি শান্তির ব্যবস্থাকারী ও পবিত্র আত্মা, যাতে পিতা আমার নামে

প্রেরণ করবেন, তিনি তোমাদেরকে সকল বিষয় শিখাবেন এবং আমি তোমাদেরকে যেসব কথা শিখায়েছি তা তিনি পুনরায় তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। ২৯। আমি তিনি আগমনের আগাম বার্তা এজন্য জানিয়ে দিচ্ছি যেন তোমরা তাঁর আগমন হলে ঈমান আন। ৩০। এরপর আমার আর কোন বক্তব্য নেই। কেননা বিশ্বনেতা আগমন করবেন। আমার নিকট তাঁর থেকে বেশি কিছু নেই।

এবং অধ্যায় ১৫, পাঠ ২৭ এ আছে। যখন সেই সাহায্যকারী আসবেন যাকে আমি পিতার পক্ষ হতে প্রেরণ করব, অর্থাৎ সত্য আত্মা আমার সাক্ষ্য প্রদান করবে।

এবং ১৬ অধ্যায় ঃ পাঠ ৭-এ আছে

৭। আমি তোমাদের সাথে সত্য কথা বলছি ঃ আমার বিদায় হয়ে চলে যাওয়া তোমাদের জন্য উপকারী, কেননা আমি যদি না যাই তা হলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আগমন করবেন না। আমি গিয়ে তাঁকে প্রেরণ করব। ৮। তিনি আগমন করে পাপ যুলুম কমাবেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। ১০। হিদায়াতের বিষয়ে আমি পিতার নিকট যাচ্ছি, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না। ১২। আমার আরও বক্তব্য আছে। যদি এখন বলি তোমরা তা বরদাশত করতে পারবে না। ১৩। কিন্তু যখন সেই পবিত্র আত্মা আগমন করবেন, তখন তিনি সত্যের সকল পথ প্রদর্শন করাবেন। তিনি নিজে থেকে কিছু বলবেন না বরং তাঁকে যা শুনান হবে তিনি তা-ই বলবেন। তিনি ভবিষ্যতের সংবাদও দিবেন। ১৪। তিনি আমার সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করবেন।

মথির ইঞ্জিল তৃতীয় অধ্যায় পাঠ-১-এ আছে ঃ "যিনি আমার পরে আসবেন তিনি আমার থেকে শক্তিশালী হবেন, আমি তার জুতা বহন করার উপযুক্তও নই।" (শেষ)

এই হচ্ছে হযরত ঈসা (আ)-এর বক্তব্য যিনি আকাশে গমনের পূর্বে হাওয়ারীদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, তোমরা ইয়াহূদী ও অন্যান্যদের ষড়যন্ত্র ও হত্যা প্রচেষ্টা দেখে মোটেও ভয় পেও না। আর আমার কষ্ট দেখে তোমরা পেরেশান ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে না। আমি শীঘ্রই এ দুনিয়া ছেড়ে এমন স্থানে চলে যাব যেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট নেই। অর্থাৎ আমি আকাশে আল্লাহর কাছে চলে যাব, সেখানে অনেক স্থান আছে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আবার যমীনে পতিত হব। তারপর তিনি আগত একজন ফারকালীতের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন। এক সময় আমি ব্যতীতও একজন ফারকালীত (রাসূল) প্রকাশিত হবেন। তিনি এসে আমার মর্যাদার কথা বর্ণনা করবেন। তিনি আমাকে অমান্যকারীদেরকে শক্ত শাস্তি দিবেন। অর্থাৎ ইয়াহূদী ও অন্যান্যদেরকে শাস্তি দিবেন। তিনি দীন-দুনিয়ার নেতা হবেন। তিনি এত উঁচু মর্যাদার ব্যক্তিত্ব হবেন যে, আমার নিকট তাঁর সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। পবিত্র কুরআনে এ সুসংবাদের কথা এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِى إِسْرَائِيْلَ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ ـ

"সে সময়কে স্মরণ কর, যখন ঈসা ইবন মরিয়ম বললেন ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আমি তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং সুসংবাদদাতা এক মহান রাসূলের যিনি আমার পরে আগমন করবেন আর তাঁর নাম হবে আহ্মাদ।" (সূরা সাফফ্ ঃ ৬)

মূল সুসংবাদে 'আহমাদ' শব্দ ছিল। এমন কি বার্নাবাসের বাইবেলে বর্তমানেও তা পাওয়া যায়। কিন্তু যখন ইঞ্জিলের অনুবাদ ইবরানী বা হিব্রু ভাষা থেকে গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়, তখন গ্রীকগণ তাদের অভ্যাস অনুযায়ী অনুবাদের ক্ষেত্রে নামেরও অনুবাদ করে ফেলে। তখন তারা 'আহমাদ' শব্দের অনুবাদ করেছে 'পীরাকালীতুস'। তারপর যখন গ্রীক থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হল, তখন পীর কলুতূসকে ফারকালীত শব্দ করা হয়। একযুগ পর্যন্ত এভাবেই তা ছিল। পরবর্তী সময়ে উর্দূ-ফার্সী অনুবাদেও 'ফারকালিত' শব্দ ছিল। একসময় এক রূহুল কুদুস বা 'পবিত্র আত্মা' বলে নতুন শব্দ যোগ করা হয়। খ্রিস্টানগণ 'রূহুল কুদুস' শব্দকে বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করত। তারপর ধীরে ধীরে শব্দটির বিলুপ্ত ঘটে। আবার কেউ ফারকালীত-এর স্থলে রূহুল হক বা রূহুল কুদুসও লিখেছে। আবার কেউ সাহায্যকারী, কেউ অন্য শব্দ ব্যবহার করে বাইবেলের মূল কপি থেকে শব্দটি বাদ দিয়ে দিয়েছে।

ফারকালীত শব্দের তাহ্কীক

'ফারকালীত' শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে আরবীকরণ করা হয়েছে। গ্রীক ভাষায় শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর সবগুলো অর্থই পবিত্র আহ্মাদ ও মুহাম্মদ শব্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে নাসারা পণ্ডিতগণ 'ফারকালীত' শব্দের কয়েকটি অর্থ করে থাকেন।

১. কেউ বলেছেন ঃ 'ফারকালীত' অর্থ হল সান্ত্বনা প্রদানকারী, আরবীতে যাকে معزى মু'আযযা বলা হয়।

২. কেউ বলেছেন, সাহায্যকারী।

৩. সুপারিশকারী যিনি উম্মাতের জন্য সুপারিশ করবেন।

৪. উকীল বা অভিভাবক।

৫. অধিক প্রশংসাকারী।

৬. প্রশংসিত, পরম সুন্দর, আরবীতে যাকে 'মুহাম্মাদ' বলা হয়।

৭. আবার কেউ বলেছেন 'ফারকালীত' হল জনগণের আশার স্থল।

৮. কোন কোন সংস্করণে রাসূল শব্দের অর্থও দেখা যায়।

৯। রূহুল হক।

১০. নির্ভরযোগ্য বলেও কেউ অর্থ করেছে।

যদি আসল গ্রীক বা ইউনানী ভাষায় ফারকালীতের অর্থ 'পারাকালীতুস' ধরা হয় তা হলে-এর অর্থ দাঁড়ায় সাহায্যকারী, অভিভাবক বা উকীল এবং মূলশব্দ যদি পীরকালীতুসও হয়, তবুও এসব শব্দ 'মুহাম্মদ, আহমাদ' হামদ-এর সমার্থক হয় অথবা নিকটবর্তী অর্থ হয়।

ইঞ্জিলের প্রাচীন সকল কপিতে আরবী, উর্দু ও ফার্সী কপিতেও 'ফারকালীত' শব্দটির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু বর্তমানে আধুনিক সংস্করণে উক্ত শব্দের স্থলে অনেকাংশে রূহুল হক ও সাহায্যকারী শব্দ পাওয়া যায়। অনেক বিকৃতি পরিবর্তনের পরে ফারকালীত শব্দ ও তার বিভিন্ন গুণাবলী যা বর্ণিত হয়েছে, তা পুরোপুরি হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা আহমাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও আখ্‌লাকের সাথেই অধিক মিল রয়েছে। ফারকালীতের যে ধরনের অর্থই করা হোক না কেন, সব দিক ও অর্থ থেকেই মহানবী (সা) ই তার বাস্তব নযীর হয়ে থাকেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল প্রতিনিধি, দূত, উকীল, এবং হক আত্মা, সত্য আত্মা, সঠিক বা পরম আত্মা। তিনি পাপাত্মা, মিথ্যাবাদী এসব খারাপ গুণ থেকে মুক্ত ছিলেন। তেমনিভাবে তিনি উম্মাতের সুপারিশকারী, সুসংবাদ প্রদানকারী, সতর্ককারীও বটে। তিনি হলেন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, তিনিই সবচেয়ে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনাকারী। এসব ভাল গুণ তাঁর নামের সাথে যুক্ত। কোন গুণ তাঁর ব্যক্তিগত নামের সাথে যুক্ত, আবার অনেক গুণাবলী তাঁর উপাধি ও উপনামের সাথে মিশে রয়েছে। যেমন তিনি মুহাম্মাদ, আহমাদ, মাহমূদ, উকীল, শাফী, সাহায্যকারী, রূহুল হক। হাম্‌দ শব্দটি তাঁর নামের সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়েছে যা আধিক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বস্তুত নবী (সা) আল্লাহ তা'আলার বাস্তব প্রশংসা। 'ফারকালীত' শব্দের সবচেয়ে বিশুদ্ধ অনুবাদ হল 'আহমাদ'। এজন্য পবিত্র আল-কুরআনে এ বিষয়ের সুসংবাদে তাঁকে 'আহমাদ' নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ -

পবিত্র আল-কুরআনে এ আয়াতটি যখন এবং যে সমাজে নাযিল হয়েছিল, সেখানে অনেক ইয়াহূদী ও নাসরা আলেম বা পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন। যদি-এ সুসংবাদ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে না থাকত তাহলে তারা কুরআনের এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করত এবং এটি মিথ্যা তথ্য বলে সমাজে শোরগোল উঠাত এবং যেসব ইয়াহূদী ও নাসারা আলেম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও এ আয়াতের ভিত্তিতে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যেতেন। কিন্তু নতুন মুসলমান যারা ইয়াহূদী ও নাসারা থেকে এসেছেন তাঁদের সাক্ষ্য

এবং উপস্থিত ইয়াহূদী ও নাসারা আলেমগণের এ বিষয়ে নীরবতা এ সত্যকে মেনে নেয়ার জন্য প্রমাণ স্বরূপ ছিল। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন বিষয়টি যদি সত্য হত তাহলে ইয়াহূদী ও নাসারাদের সমস্ত আলিম কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন না?

জবাব

নাসারা আলেমদের নিকট হযরত ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ ও আগমনের কথা তাওরাতে আছে। কিন্তু এসব ভবিষ্যদ্বাণী থাকার পরেও এবং হযরত ঈসা (আ)-এর অনেক মু'জিযা প্রত্যক্ষ করার পরেও ইয়াহূদী আলেমরা হযরত ঈসা মাসীহ (আ)-এর উপর ঈমান আনেনি, বরং তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে। সংকীর্ণতা, পার্থিব স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসায় জর্জরিত হয়ে তারা হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াত কবূল করেনি। শুধু তা-ই নয়, তারা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে যে, তাওরাতে হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নেই, তাঁর কোন উল্লেখও নেই। তেমনিভাবে নাসারাদের আলেমগণও স্বার্থপরতা ও হৃদয়ের সংকীর্ণতার কারণে তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেয়নি। অথচ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইনিই সেই নবী মাসীহ ইবন মরিয়ম (আ) যাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন হিরাকল ও মাকূকাস স্পষ্টভাষায় স্বীকার করেছে যে, তিনিই সেই নবী। যাঁর সুসংবাদ ইঞ্জিলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা তাদের ক্ষমতাও রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে যারা আশংকায় সত্যকে মেনে নিতে পারেননি, ইসলামে দাখিল হতে পারেননি। নাসারা আলেমদের মধ্যে যারা আন্তরিক ও সত্যের সন্ধানী ছিলেন, যেমন হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী, যাগাতর রুমি, ইবন নারতূর, অন্যান্য, তাঁরা সকলেই ঈমান আনয়ন করেছেন। আবার অনেক নাসারা আলেম ইয়াহূদী আলেমদের মত সাফ বলে দিয়েছে না, ইঞ্জিলে কোন সুসংবাদ নাই। নাসারা আলেমদের এসব মিথ্যা যেমনটি ছিল তেমনি ছিল ইয়াহূদী আলেমদের ও ছিল হযরত মাসীহ (আ)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ও তাঁর সম্পর্কে সুসংবাদকে অস্বীকার করা। নাসারা আলেমদের বক্তব্য হচ্ছে যে, এই সুসংবাদে ফারকালীতের আগমনের মধ্যে রূহুল কুদুসের-হাওয়ারীদের জন্য নাযিল হয়েছে। তারপর যখন হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে উত্তোলন করা হলো এবং হাওয়ারীগণ একস্থানে সমবেত ছিল, তখন রূহ তাদের উপর নাযিল হল। রূহের নাযিল হবার কিছুক্ষণ পর তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগল।

নাসারাদের এসব বিশ্বাস অন্ধধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। বরং এসব সুসংবাদ ত কোন বুযর্গ ও অসাধারণ ব্যক্তির জন্য হতে পারে। যাকে খোদার পক্ষ হতে ইলহাম করা হবে। সে-ত আল্লাহর পক্ষ হতে যা নির্দেশিত হবে তা-ই সে বলবে। সে নিজের পক্ষ হতে কিছু বলবে না। এই সুসংবাদে রূহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈল আমীনের নাযিল হবার সাথে কোন সম্পৃক্ততা নেই অথবা কোন ফিরেশতার সাথে এমন সুসংবাদের কোন সম্পর্ক নেই। ফারকালীতের আগমন বার্তায় একজন মহান রাসূলের আগমনের সংবাদ রয়েছে, যিনি সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী হবেন।

হযরত মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী (তাফসীরে হাক্কানীর লেখক) লিখেছেন ঃ কলকাতায় মুদ্রিত এক পাদ্রী পুস্তিকার 'ফারকালীত' সম্পর্কে লিখেছেন (১২৬৮ হি) 'ফারকালীত' শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে আরবীতে আমদানী করা হয়েছে। যদি মূল ইউনানী বা গ্রীক ভাষার 'ফারাকালীতুস' শব্দ ধরা হয়, তাহলে-এর অর্থ দাঁড়ায় সাহায্যকারী ও উকীল বা অভিভাবক। আর যদি মূল পীরকালীতুস হয় তাহলে-এর অর্থ 'মুহাম্মাদ- আহমাদ' শব্দের অর্থের কাছাকাছি হয়। এজন্যই মুসলমানগণ এই সুসংবাদের দলীল এ থেকে নিয়ে থাকে, তারা মূল পীরকালীতুস বুঝেছে। কেননা তখন-এর অর্থ 'মুহাম্মাদ-আহমাদ' শব্দের কাছাকাছি অর্থ হয়। এজন্য মুসলমানগণ দাবি করে থাকেন যে, হযরত ঈসা (আ) মুহাম্মাদ বা আহমাদের খবর দিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে মূলশব্দ ফারাকালীতুস। আমাদের বক্তব্য হল, আসলে মূলশব্দ পীরকালীতুসই। গ্রীক লিপিতে অনেক উদাহরণ আছে। এভাবে ভুলে ফারকালীতুস পড়া হয়েছে। (ইজ্‌হারে হক, -২ খ, পৃ. ১৫৫)

ইউনানী বা গ্রীক ভাষায় 'পীরকালীতুস' শব্দ হবার বড় প্রমাণ হচ্ছে। সেন্ট জুরুম যখন ল্যাটিন ভাষায় ইঞ্জিল অনুবাদ করতে শুরু করেন তখন সে পীরকালীতুসের স্থানে 'ফারাকালীতুস' লিখে দেন। তাতে বুঝা যায়, যে পুস্তক থেকে অনুবাদ করা হয়েছে তাতে পীরকালীতুসই ছিল।[১]

উপরোক্ত আলোচনাকে বাদ দিলেও আমাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা সে সুসংবাদে আগত ফারকালীতের অনেক গুণে কথা বলা হয়েছিল। সে সব গুণ পুরোপুরিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সত্য ও বাস্তবভাবে হুবহু মিলে যায়।

প্রথমঃ আমি যতক্ষণ না যাব তিনি আসবেন না।

দুই ঃ তিনি আমাকে সাক্ষ্য দিবেন।

তিন ঃ তিনি ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা করবেন, পাপ-পঙ্কিলতা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

চার ঃ তিনি আমার উপর যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

পাচ ঃ তিনি সত্যপথ দেখাবেন।

ছয় ঃ তিনি আগত দিনের ভবিষ্যদ্বাণী করবেন।

সাত ঃ তিনি নিজের পক্ষ হতে কোন তথ্য জানাবেন না, বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে যে তথ্য দিবেন তিনি তা-ই বলবেন।

আট ঃ তিনি বিশ্বনেতা হবেন।

নয় ঃ তিনি আমার সব কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবেন।

দশ ঃ তোমাদের জন্য তখনকার অসম্ভব ও জটিল বিষয়ে তিনি সম্ভবও সহজ ও করবেন। এবং তিনি বিধি-বিধানের অসম্পূর্ণ বিষয়কে পূর্ণতা দান করবেন। এই দশটি গুণের সব কয়টিই হযরত নবী (সা)-এর বেলায় সত্যও বাস্তব ছিল।

---

১. তাফসীরে হাক্কানী।

১.নবী করীম (সা)-এর আগমন হযরত ঈসা (আ)-এর বিদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। একজন নবী বিদায় হবার সাথে আরেকজন নবী আগমন নির্ভরশীল তখন হতে পারে যখন দ্বিতীয়জন শেষনবী হবেন। অন্যথায় একজন নবীর বিদায়ের সাথে পরবর্তী নবীর আগমন নির্ভরশীল হতে পারে না। কেননা পরবর্তী নবী শেষনবী না হলে প্রথম নবীর বর্তমানে পরবর্তী নবী আগমন করাতে কোন সমস্যা নেই। প্রথম নবী বিদায়ের সাথে ২য় নবী আগমনের শর্ত যখনই জুড়ে দেয়া হবে তখনই পরবর্তী নবী শেষনবী হবেন তা ধরে নেয়া যায়। মোটকথা হযরত ঈসা (আ)-এর সুসংবাদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, আগত ফারকালীত ও রূহে হক শেষ নবী হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ-

"মুহাম্মাদ (সা) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষনবী"। (সূরা আহযাব ঃ ৪০)

হযরত মাসীহ (আ) খাতিমুন্নবী ছিলেন না। কেননা ইয়াহূদী ও নাসারাগণ ত তাঁর পরেও একজন নবীর প্রতীক্ষায় ছিল। আর রূহের আগমন হযরত ঈসা (আ)-এর বিদায় বা প্রস্থানের সাথে শর্তযুক্ত ছিল না। রূহের আগমন হযরত ঈসা (আ)-এর বর্তমানেও হতে পারে।

২. নবী করীম (সা) হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন ঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْ فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ - وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -

"তারা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করতে পারেনি, পারেনি শূলে চড়াতে। কিন্তু তারা সন্দেহের মধ্যে পড়েছে। যারা হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে বিতর্ক করে, নিশ্চয়ই তারা সন্দেহের মধ্যে আছে। এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই শুধুমাত্র কিছু ধারণা ব্যতীত। আর তারা তাঁকে হত্যা করেনি তা নিশ্চিত, বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী পরাক্রমশালী।" (সূরা নিসা ঃ ১৫৭)

৩. ইনসাফ ও হিদায়াত নিশ্চিত করেছেন।

৪. তিনি হযরত ঈসা মাসীহ (আ)-কে অস্বীকারকারীদের শাস্তি প্রদান করেছেন। কারো সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করেছেন আবার কাউকে দেশান্তর করেছেন। যেমন খায়বারের ইয়াহূদী ও বনূ নযীরের ইয়াহূদী ও বনূ কায়নুকার ইয়াহূদীদের ঘটনাবলী থেকে তা বুঝা যায়। রুহুল কুদুস কাউকে কোন বিষয়ে বাধ্য করেননি, কাউকে শাস্তি

দেননি। অর্থাৎ নাসারাদের দাবি অনুযায়ী 'ফারকালীত' রূহুল কুদুস বা হযরত মাসীহ (আ) কিন্তু হযরত মাসীহ কোন শাসন প্রতিষ্ঠান করেননি। সরকার পরিচালনা করে পুরস্কার ও তিরস্কারের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। এমনকি তাঁর হাওয়ারীগণও কোন শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। তারা মানুষকে উপদেশাবলী প্রদান করে দাওয়াতী কাজ করতেন। সেখানে শাসনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বস্তুত কোন অবস্থায়ই হযরত মাসীহকে 'ফারকালীত' হিসেবে প্রমাণ করা যায় না। যবূরের অবাধ্যতার বর্ণনা সম্বলিত আয়াতের প্রসংগে তাদের বিরোধিতার কারণ বলা হয়েছে যে, "তারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি।" এ কথার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, 'ফারকালীত' ও সাহায্যকারী উকীল ও সুপারিশকারী হযরত ঈসা (আ)-এর অস্বীকারকারীদের বর্তমানে প্রকাশিত হবেন। অন্যদিকে রূহুল কুদুস মাসীহের প্রকাশ ও আর্বিভাবে হাওয়ারীদের সামনে হয়েছে। হাওয়ারীগণ মাসীহকে অস্বীকার করতেন না, বরং তাঁর অনুগত ও সহযোগী ছিলেন। তবে হাওয়ারীগণ অস্বীকারীদেরকে কোন শাস্তি দেননি এবং শাস্তি প্রদানে তারা সক্ষমও ছিলেন না।

৫. রাসূলুল্লাহ (সা) সততা ও হিদায়েতের রাজপথ নির্দেশ করেছেন যা ইতিপূর্বে এতটা যোগ্যতার সাথে সম্ভব হয়নি। তাঁর শরী'আতের জোরালো বিশ্বাসসম্মত বিধানাবলী তার সফলতা ও যোগ্যতার প্রমাণ।

৬. ভবিষ্যত ও অনাগত দিনের এত অসংখ্যক সংবাদ তিনি দিয়েছেন যার কোন নযীর পাওয়া যায় না। তাঁর সংবাদ ও সুসংবাদের সব কিছু হুবহু প্রতিফলিত হয়েছে ও হবে। কিয়ামত পর্যন্ত-এর ব্যতিক্রম হবে না।

৭.-এর বড় কারণ হল, তিনি নিজের থেকে কিছু বলেননি, বরং আল্লাহ থেকে নির্দেশিত হয়ে বলেছেন। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

৮. তিনি ছিলেন সমস্ত জগতের নেতা। দুনিয়ার সকল মানব সম্প্রদায়ের জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। সকল মানবজাতি তাঁর নেতৃত্ব ও দাওয়াতের আওতায় ছিল। নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড ও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য তিনি প্রেরিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন না।

৯. নাসারারা হযরত মাসীহ (আ)-এর শিক্ষাকে বিলুপ্ত করে ফেলেছে, আর তিনি তাদেরকে সে শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তাওহীদ ও তিন খোদার বিষয়টি ছিল। তিনি মাসীহ (আ)-এর মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি রদ করে দিয়েছেন এবং তাঁর আসমানে উত্তোলনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَنُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلاَيَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

"তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন একটি কথার দিকে এস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। আর তা হল, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদত করব না এবং আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক করব না। আর আমরা পরস্পর কাউকে আল্লাহ ব্যতীত মবূদ বানাব না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ -

"আর মাসীহ বললেন ঃ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার রব ও তোমাদেরও রব। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে আল্লাহ তা'আলার তার উপর জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না"। (সূরা মায়িদা ঃ ৭২)

১০. মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের পর তিনি যেসব শিক্ষা দিয়েছেন যা হযরত মাসীহ (আ)-এর যামানায় বনী ইসরাঈলগণ রপ্ত করতে পারেনি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী বিষয়ক বিদ্যা দীনের শরী'আত বা বিস্তারিত বিধানাবলী, জীবন ও জগত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিধান, প্রকৃতি, জলস্থল, সাগর-নদী, আকাশ, খনি সব বিষয়ের বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছে। ইতিপূর্বেকার আসমানী বিধানাবলী ছিল অসম্পূর্ণ। মহানবী (সা)-এর উপস্থাপিত দীন ও বিধান সবকিছুকে পূর্ণতা দান করেছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টিকে এভাবে বলেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمُ دِيْنًا -

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন-বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত (অহীকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

হযরত নবী (সা)-কে কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য এমন পূর্ণাঙ্গ সাংবিধান ও ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে যা দুনিয়ার যোগ্যতা ও সফলতার জন্য মাপকাঠি। এ ব্যবস্থার অধিকার ও সুব্যবস্থাবলী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিক্ষণতা দেখে পৃথিবী অবাক হয়ে যায়। অনাগত জীবনের ঘটনাবলী ও নতুন প্রেক্ষাপটের জন্য প্রযোজ্য ব্যবস্থা হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক উপস্থাপিত ও নির্ধারিত বিধানাবলীর মাধ্যমে জানা যেতে পারে। ইয়াহূদী ও নাসারা পণ্ডিতদের নিকট এ বিষয়ে কোন বিধানাবলী নেই যার ভিত্তিতে জাতি ও উম্মাতের আইনজীবীগণ ফায়সালা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। বর্তমানে নাসারাদের নিকট

এমন কোন শরী'আত বা বিধানাবলী নেই যার ভিত্তিতে কোন বিধান কার্যকর করা যায়। তবে হ্যাঁ, বর্তমান যুগের নাসারাদের নিকট শিল্প, লিপিকলা, প্রযুক্তি ও কারিগরীবিদ্যা ও বৈষয়িক জ্ঞান ও কৌশল ভালভাবে আছে। কিন্তু সমাজে আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন আসমানী বিধান তাদের নিকট নেই– যার ভিত্তিতে তারা সমাজ ও সরকার পরিচালনা করতে পারে। পশ্চিমা জাতি ও দেশে যেসব সংবিধান ও আইন রয়েছে, তা তাদের কিছু চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতের কল্পনা প্রসূত ব্যবস্থা। ইসলামী শরী'আত বা বিধানাবলীর ন্যায় আসমানী কোন আইন ও সংবিধান তাদের নিকট নেই। মাসীহী আলেমগণ ইঞ্জিল ও তাওরাতে এসব সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীকে রূহুল কুদুস-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করে থাকেন। যিনি হযরত ঈসা (আ)-এর আসমানে গমনের ৪৭ দিন পর হাওয়ারীদের মাঝে অবতরণ করেছিলেন। তাদের এ বক্তব্য কয়েকটি কারণে অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন বলে মনে হয়।

১. রূহ্ নাযিল হওয়া হযরত মাসীহ (আ)-এর বিদায়ের সাথে নির্ভরশীল ছিল না, কেননা রূহ্ ত হযরত মাসীহের সাথে সর্বদাই ছিল।

২. রূহ হিদায়েত ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি, এবং হযরত মাসীহের উপর ঈমান না আনার অপরাধে কোন ইয়াহূদীকে শাস্তি প্রদান করেনি। পক্ষান্তরে হযরত নবী (সা) কাফির-মুশরিকদের সাথে জিহাদ করেছেন এবং ইয়াহূদীদেরকে অনেক শাস্তি দিয়েছেন এবং তাদের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন। দুনিয়ার কোন জনসমষ্টিকে শাস্তি দিতে হলে সরকার ব্যতীত সম্ভব নয়। আগত ফারকালীত ও তার সাহায্যকারীগণ দুনিয়ার শাসক ও বাদশাহ হবেন। যিনি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবেন। আর তাওরাতের ১৪তম অধ্যায়ের ৩০ নং পর্বে পৃথিবীর নেতা আগমনের উল্লেখ আছে, তাতে দুনিয়ার শাসক হবার কথা বুঝায়। যার শাসন ও কর্তৃত্ব প্রভাবের কথা পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

৩. হযরত মাসীহ (আ)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য তাকিদ দেয়া অযৌক্তিক। কেননা হাওয়ারীগণ ইতিপূর্বেই রূহুল কুদুসের প্রতি ঈমান রাখতেন। অতএব "তিনি যখন আগমন করবেন তখন তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনবে।" এ কথার কি যুক্তি থাকতে পারে? হযরত মাসীহের তাকীদ ও সতর্কবাণী থেকে বুঝা যায়, আগত ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করাও তোমাদের জন্য অসম্ভব নয়। তাই বলা যায়, ফারকালীত দ্বারা যদি রূহকে বুঝানো হত, তাহলে এ বিষয়ে এত গুরুত্বারোপ ও সতর্কবাণীর প্রয়োজন ছিল না। কেননা যাদের হৃদয়ে রূহ আগমন করবে তাদের জন্যও রূহকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। রূহুল কুদুসের নাযিল হওয়া বিশ্বাসের জন্য সহায়ক। তেমনিভাবে রূহুল কুদুসের আগমন নবীর জন্য ও নবুওয়াতের প্রতি আস্থার জন্য জোরালো প্রমাণ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগত বিষয়ের প্রতি মানুষের গভীর বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। প্রবল কল্পনাশক্তি যে বিশ্বাসকে আহত করতে পারে না।

৪. এসব সুসংবাদের ধরন ও প্রকৃতি থেকে বুঝা যায়, আগত ফারকালীত হযরত ঈসা (আ) থেকে ভিন্ন একজন ব্যক্তিত্ব হবেন। ১৬তম আয়াতের শব্দে আছে, তাঁকে দ্বিতীয় একজন সাহায্যকারী দেয়া হবে। এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, তিনি আলাদা সত্তায় ও আকৃতিতে আবির্ভূত হবেন। অতএব 'ফারকালীত' বলে যদি রূহুল কুদুস বুঝান হয় তা হলেও হযরত ঈসা (আ) ও রূহুল কুদুস একই ব্যক্তি হন, আলাদা ব্যক্তি নন। কেননা নাসারারা মনে করে যে, রূহুল কুদুস ও হযরত ঈসা (আ.) একই সত্তা এবং রূহুল কুদুস যখন হাওয়ারীদের মধ্যে আগমন করেছেন তখন ভিন্ন আকৃতিতে আগমন করেননি, বরং যেভাবে কারো উপর জ্বিন সওয়ার হলে সে নিজ মুখে জ্বিনের বক্তব্য পেশ করে থাকে, ঠিক হাওয়ারীদের হৃদয়েও রূহুল কুদুস এভাবে ভর করে আগমন করে বক্তব্য রেখেছেন।

৫. সুসংবাদে আরও ছিল, "আমি তোমাকে যা বলেছি তিনি তা স্মরণ করিয়ে দেবেন।" অথচ নাসারাদের কোন কিতাবে এ কথার প্রমাণ নেই যে রূহুল কুদুস আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়ে হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

৬. সেই সুসংবাদেও এ কথাও ছিল, "তিনি আমার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করবেন।" আর এই গুণ শুধুমাত্র হযরত নবী (সা)-এর বেলায় সত্য হতে পারে। কেননা তিনি আগমন করে ইয়াহূদী ও মুশরিকদের সামনে হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, যারা ছিল নবী হযরত ঈসা (আ)-এর অস্বীকারকারী। আমাদের নবী (সা) একমাত্র নবী যিনি হযরত ঈসা (আ)-এর রিসালাতের ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে রূহুল কুদুস হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীদের মাঝে অবতরণ করেছেন যেহেতু হাওয়ারীগণ পূর্ব থেকেই হযরত মাসীহ (আ)-কে স্বীকার করতেন, এজন্য তাদের জন্য সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন ছিল না। সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি তো অস্বীকারকারীদের সামনেই গুরুত্ব পায়। বিশ্বাসীদের সামনে সাক্ষ্যের তেমন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু নবী (সা)-এর জন্য এ সাক্ষ্য প্রদান ছিল বিপরীত। তিনি ইয়াহূদীদের সামনে যারা হযরত ঈসা (আ)-কে অস্বীকার করত ও দুশমনী রাখত, তাদের সামনে পরিষ্কারভাবে হযরত ঈসা (আ) এর রিসালাত ও নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এবং তাঁকে হত্যা করার দাবি ও শূলবিদ্ধ করার কথারও প্রতিবাদ করেছেন। একই সাথে হযরত ঈসা (আ) এর আকাশে উত্থানের বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৭. হযরত মাসীহ (আ) ফারকালীত সম্পর্কে বলেছেন, আমার মধ্যে তাঁর কিছু নেই। এ বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় তাঁর বক্তব্য রাসূল (সা)-এর বেলায়ই প্রযোজ্য। কেননা মাসীহ আর রূহুল কুদুসও অভিন্ন। অতএব একথাও সেখানে প্রযোজ্য হতে পারে না।

৮. এছাড়া একথাও চিন্তা করার বিষয় যে, এই রূহ আগাম কোন বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন যার ভিত্তিতে রূহকেই সে সুসংবাদের বাস্তবায়ন বলা যাবে?

৯. এ সুসংবাদের বক্তব্য ও ধরন অনুযায়ী বুঝা যায় যে, আগত দ্বিতীয় ফারকালীত ও দ্বিতীয় সাহায্যকারী মানুষের আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে আগমন করবেন। আর হযরত ঈসা (আ)-এর মত মানুষের বেশে সত্যের দাওয়াত দেবেন ও জনসাধারণকে সান্ত্বনার বাণী শোনানোর জন্য আগমন করবেন। এজন্য ফারকালীত বলতে রূহুল কুদুসকে শনাক্ত করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। কেননা রূহুল কুদুসও আলাদা মানুষরূপে না এসে জ্বিন্নের মত অন্য মানুষের হৃদয়ে নাযিল হয়েছিল (যেমনটি নাসারাগণ ব্যাখ্যা করে থাকেন)।

১০. হযরত ঈসা (আ) আকাশে উঠে যাওয়ার পর সাধারণ নাসারাগণ ফারকালীতের জন্য প্রতীক্ষারত ছিল এবং তারা মনে করত যে, একজন মহান নবী আগমন করবেন। এমন কি ঈসায়ী দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুন্তাস ঈসায়ী নামে এক ব্যক্তি দাবি করল ঃ আমি ফারকালীত যার সংবাদ হযরত মাসীহ (আ) দিয়েছিলেন। অনেক লোক তার উপর ঈমানও এনেছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ময়ূর মাসীহী তার ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন। এই পুস্তক ১৮৪৮ সালে মুদ্রিত হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল ইয়াহূদী ও নাসারাদের আলেমগণ 'ফারকালীত' বলতে কোন মানুষকেই বুঝিয়েছেন, রূহুল কুদুসকে নয়।

'লুবুবুত তাওয়ারিখ-এর লেখক যিনি একজন খ্রিস্টান লিখেছেন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ একজন নবীর প্রতিক্ষায় ছিল। এজন্য নাজ্জাশীরা হযরত জাফর (রা) থেকে হযরত নবী (সা)-এর সংবাদ পেয়ে ঈমান আনেন এবং তিনি মন্তব্য করেন, তিনিই সেই নবী যাঁর সংবাদ হযরত ঈসা (আ) ইঞ্জিল কিতাবে দিয়েছেন। আর নাজ্জাশী ইঞ্জিল কিতাবের যেমন আলেম ছিলেন, তেমনিভাবে তিনি ছিলেন একজন বাদশাহ। এজন্য তিনি ভয়-ভীতির পরোয়া করতেন না (তাই সত্যের ঘোষণা ও তথ্য অকপটে তুলে ধরেছেন)। যেমনিভাবে বাদশাহ মাকূকাশ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পত্রের জবাবে লিখেছেন ঃ

سلام عليك أما بعد فقد قرأتُ كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا اليه وقد علمت أن نبيا قد بقى وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك ـ

"আপনাকে সালাম, আমি আপনার পত্র পড়েছি। পত্রে আপনি যা উল্লেখ করেছেন আমি তা বুঝেছি এবং আপনি যে আহ্বান জানিয়েছেন তাও বুঝেছি। আমার জানা ছিল একজন নবী আগমন করার বাকী আছেন আর আমি মনে করেছিলাম তিনি সিরিয়া থেকে প্রকাশিত হবেন। তবে আমি আপনার দূতকে সম্মান করেছি।"

মাকূকাশ যদিও ইসলাম গ্রহণ করেন নি, তবে একথা স্বীকার করেছেন যে, একজন নবী আগমন করার এখনো বাকী আছে। জারদ ইবন আলী যিনি নিজ সমাজে

একজন বড় আলেম ছিলেন (খ্রিস্টান)। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেন,তখন বলেন ঃ

و الله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق لقد وجدت وصفك فى الانجيل وبشربك ابن البتول فطول التحية لك والشكر لمن أكرمك لا أثر بعد عين ولاشك بعد يقين يدك أشهد أن لا اله الا الله وانك محمد رسول الله ـ

"আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আপনি হক নিয়ে আগমন করেছেন। আপনি সত্য বলেছেন। নিশ্চয়ই আমি আপনার গুণাবলী ইঞ্জিল কিতাবে পেয়েছি। হযরত মাসীহ ইবন মরিয়ম আপনার সুসংবাদ দিয়েছেন। আপনাকে স্বাগতম, খোশ-আমদেদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাকে যারা সম্মান করেছে, তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রত্যক্ষ করার পর চিহ্নের (প্রমাণ) প্রয়োজন নেই, বিশ্বাসের পর আর দ্বিধা নেই। আপনি হাত মুবারক বাড়িয়ে দিন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

এর ভিত্তিতেই রোমের সম্রাটসহ প্রভাবশালী শাসক এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনেক আলেম তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। উক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হল যে, ইঞ্জিলে হযরত মহানবী (সা)-এর নাম ও সুসংবাদ লিখিত ছিল, যা দেখে অনেকে তাঁর উপর ঈমান এনেছেন এবং অনেক তাঁর আগমনে প্রতীক্ষায় ছিলেন। তবে আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন এবং দুনিয়ার স্বার্থপরতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি, তারা তাঁর প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের দৌলত অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىْ لَوْلَا هَدٰنَا اللّٰهُ ـ

১১. ১৬তম আয়াতের বক্তব্য যে, "তিনি সব সময় তোমাদের সাথে থাকবেন। এ কথার অর্থ এমন নয় যে 'ফারকালীত' সবসময় তোমাদের সাথে থাকবে। কেননা নাসারাদের বক্তব্য অনুযায়ী ফারকালীত মানে রূহুল কুদুসও তাদের সাথে সবসময় ছিলেন না; বরং এ কথার মর্ম হল, তাঁর শরী'আত বা বিধান ও দীন সব সময় থাকবে। এ দীনকে রহিত বা সংস্কার করে আর কোন দীন আসবে না।

১২. চতুর্থ অধ্যায়ের ১৭তম আয়াতের বক্তব্য ঃ "সত্য আত্মা দুনিয়া হাসিল করতে সমর্থ হবে না, কেননা দুনিয়া তাঁকে দেখবে না জানবেও না।" একথার মর্ম হল ঃ দুনিয়াতে তাঁর যথার্থ মর্যাদা বুঝা যাবে না। তিনি সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব হবেন।

খ্রিস্টানদের কতিপয় সন্দেহ ও সংশয়ের অপনোদন

এক. রূহুল হক এবং রূহুল কুদুস বলে তৃতীয় আকনূম বুঝায়, অতএব রূহুল হক ও রূহুল কুদুস বলে শেষনবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কিভাবে বুঝান যথার্থ হয়?

জবাব ঃ আধুনিক ও প্রাচীন যুগের কখনোই আকনূম তৃতীয় শব্দটি রূহের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না, বরং সালেহ, তালেহ, হাদী, মুদিল শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইউহান্না তাঁর প্রথম পত্রে (চতুর্থ অধ্যায়) বলেন ঃ

১. হে প্রিয়জন, প্রত্যেক রূহকেই বিশ্বাস করবে না। রূহকে পরীক্ষা করবে যে, সে আল্লাহর কাছ থেকে আগত নাকি অন্য কিছু।

২. খোদার পক্ষ হতে কে আসল তাকে তোমরা এভাবে বুঝতে পারলে যে রূহ স্বীকার করবে যে, ইসূ মাসীহ্ শরীরীরূপে আগমন করেছেন, তিনি খোদার তরফ হতে এসেছেন।

৩. আর যে ইসূ রূহকে স্বীকার করবে না সে খোদার পক্ষ হতে আসেনি।

৬ষ্ঠ আয়াতে আছে। "এভাবে আমি সত্য রূহ এবং ভ্রান্ত রূহকে জেনে নিই।" এখানে রূহ বলে সত্যের উপদেশদাতা এবং ভুল পথের আহবানকারীকে বুঝান হয়েছে। কেউই আকনূম সালিসকে এখানে বুঝাননি।

দুই ঃ এখানে সুসংবাদে হাওয়ারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। অতএব রূহের অবতরণ হাওয়ারীদের বর্তমানে তাদের জীবদ্দশায় হতে হবে। অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব তাদের কয়েকশত বছর পরে হয়েছে।

জবাব ঃ হাওয়ারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলার কারণ হল যেহেতু সে সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। এজন্য এভাবে বলা হয়েছে। অন্যথায় এর উদ্দেশ্য শুধু তাঁরা নন। যেমন মথির ইঞ্জিলে ৩৬নং আয়াত থেকে ৬৪ নম্বর আয়াতের মধ্যে আছে ঃ "আমি তোমাদেরকে একথা বলছি যে, তারপর তোমরা ইবন আদমকে আকাশের মেঘের মধ্য থেকে আসতে দেখবে। ইতিমধ্যে দু'হাজার বছর বিগত হয়েছে অথচ যাদের সামনে একথা বলা হয়েছে, তারা এ দৃশ্য দেখেনি যে, হযরত ঈসা (আ) আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন। তাই যেভাবে এখানে যারা হযরত ঈসা (আ)-কে নাযিল হতে দেখবেন, তারাই এ সংবাদের লক্ষ্য। তেমনিভাবে এ সুসংবাদের লক্ষ্যও তারা, যারা রূহুল হক ও ফারকালীতের আবির্ভাবের সময় বর্তমান থাকবেন।"

তিন ঃ ইউহান্নার ইঞ্জিলের চতুর্থ অধ্যায়ে যে নেতার আলোচনা এসেছে, সে প্রসংগে কোন কোন অন্ধ ও গোঁড়া খ্রিস্টান তামাশা করে বলে থাকে যে, নেতা বলতে এখানে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে।

জবাব ঃ নেতা বলতে 'শয়তান' অর্থ করা সুস্পষ্ট মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া কিছু হতে পারে না। গোঁড়ামী ও প্রতিহিংসার ভিত্তিতে বিশ্বনেতা শব্দকে শয়তান অর্থে ব্যবহার

করা অভিধান ও পরিভাষা সবদিক থেকেই ভুল এবং ধরন ও প্রকৃতির বিপরীত। কেননা প্রথম থেকে শেষ আলোচনা পর্যন্ত 'ফারকালীত' বা রূহুল হকের গুণাগুণের আলোচনা আছে। যখন ফারকালীতের আবির্ভাব হবে তখন তাঁর উপর ঈমান আনার উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং তাঁর পক্ষে এভাবে বলা হয়েছে ঃ "কেননা দুনিয়ার নেতা আসছে।"

জগতের নেতা বলতে বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বুঝাতে হবে। অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) এখানে শয়তান অর্থ নেয়া হলে তার আগমন মর্যাদার কারণ কিভাবে হতে পারে? এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, পৃথিবীর নেতা বলতে ফারকালীত ও রূহুল হকই বুঝায়। যাঁর হাতে দুনিয়ার পাপী ও অপরাধীরা শাসন ও বিচারের মাধ্যমে শাস্তি পাবে। ইউহানার ইঞ্জিলে ১৬তম অধ্যায়ে একাদশ পাঠে যা আছে, তাতে পৃথিবীর নেতাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয় এবং এটা বিকৃতি ও পরিবর্তন। বক্তব্যের ধরন প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পূর্ণ উল্টো। একদিকে বলা হচ্ছে, ফারকালীতের মান-মর্যাদার কথা, অন্যদিকে তাঁকে শয়তান সনাক্ত করা, তা কি করে সম্ভব হতে পারে? তারপরে আবার খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ এসব দ্বারা রূহুল কুদুস অর্থও নিয়ে থাকেন। এসব কিছু মূর্খতা বোকামী ও শয়তানী ভিন্ন আর কিছু নয়। তারপর হযরত মাসীহ-এর ঘোষণা যে, "বিশ্বনেতা আগমন করবেন" একথাও পরিষ্কার যে, তিনি এখনো পৃথিবীতে আগমন করেন নি। শয়তানের বিষয়ে ইয়াহূদী-নাসারা ও মুসলমান সকলেই একমত যে, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই শয়তান পৃথিবীতে বহাল তবিয়তে আছে। লোকেদের সাথে বিভিন্ন প্রকৃতির শয়তান সক্রিয় রয়েছে। এখানে যেখানে শয়তানের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, শয়তান আসবে, তা এতদিন শয়তান কি ছিল না অথবা পূর্বে শয়তান কোথায় চলে গিয়েছিল, তৃতীয়ত, নেতার কথা মথির ইঞ্জিলে দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত মাসীহ ইবন মরিয়ম (আ) বলেছেন ঃ "হে বায়তুল লাহাম ইয়াহুদার এলাকা, তুমি ইয়াহুদার শাসকদের মধ্যে অবশ্যই ছোট নও। কেননা তোমার মধ্যে হতে একজন নেতা আসবেন যিনি আমার উম্মত বনী ইসরাঈলকে পরিচালনা করবেন।"

এখানে নেতা বলতে হযরত ঈসা (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। যেমন সপ্তম ও পরবর্তী আয়াত পড়লে তা ভালভাবে বুঝা যায়। অন্যদিকে আসমানী কিতাবে নেতা ও শাসকের শব্দ আল্লাহ তা'আলার উপরও কখনো বুঝানো হয়েছে। তবে নেতা বলে শয়তানকে বুঝানো কোন অবস্থায়ই সঠিক হতে পারে না।

মথির ইঞ্জিলের ১৩তম অধ্যায়ের সুসংবাদ

আয়াত ৩নং তিনি তাদের সামনে একটি উদাহরণ পেশ করে বললেন যে, আসমানের বাদশাহ এই সরিষার বীজের মত, যা কোন মানুষ হাতে নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে বপন করেছে। (৩২) বীজ থেকে ছোট চারা গজিয়েছে। আস্তে আস্তে যখন বড় হল,

তখন ফলের থেকে বড় হল। এক সময় বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। পাখিরা এসে সে গাছের ডালে বাসা করে।

আসমানী বাদশাহী বলতে ইসলামী শরী'আতকে বুঝায়। যা প্রাথমিক অবস্থায় সরিষার মত ছিল। তারপর কিছু দিনের মধ্যে যমীন এতটা প্রসারতা লাভ করল যে, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে ও উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রতিটি প্রান্তরে পৌঁছে গেল।

আল-কুরআন এ সুসংবাদ সম্পর্কে ইশারা করে বলা হয়েছে ঃ

وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْأَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ـ

"তাদের উদাহরণ ইঞ্জিলে আছে। যেমন ফসলের মত, তিনি যমীন থেকে চারা বের করেন। তারপর তাকে করেন, তা মোট হয়ে গেলে নিজের কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাড়ায়। তা দেখে কৃষক খুশি হয়ে যায়। এর মাধ্যমে (ইসলামের ফসলের মাধ্যম) কাফিরদেরকে নাখোশ করা হয়।" (সূরা ফাতহ ঃ ২৯)

এমনও হতে পারে এ উদাহরণের দ্বারা কালেমায়ে তায়্যিবাকে পবিত্র গাছের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।

اَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ـ

"হে নবী! আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ তা'আলা একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। পবিত্র কালেমার উদাহরণ একটি পবিত্র গাছের, যার শিকড় মযবূত আর ডালপালা আকাশে সম্প্রসারিত, সব সময় আল্লাহর হুকুমে ফল দান করে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য উদাহরণ পেশ করে থাকেন। যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ২৪)

মথির ইঞ্জিল ঃ সুসংবাদ, প্রথম পর্ব

আসমানী বাদশাহী এমন এক ঘরের মালিকের মত যিনি খুব সকালে বের হয়েছেন যেন আঙ্গুরের বাগানে শ্রমিক নিযুক্ত করতে পারেন। তিনি দৈনিক এক দিরহাম পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে শ্রমিক নিযুক্ত করে বাগানে পাঠালেন। তারপর তিনি কিছু বেলা হবার পর বাজারে গিয়ে কিছু শ্রমিককে বেকার অবস্থায় পেয়ে তাদেরকেও বাগানে পাঠালেন এবং বললেন, কাজ করে যাও, তোমরাও পারিশ্রমিক পাবে। তারপর তিনি মধ্য দিনে ও বিকেলেও একই অবস্থায় আরও শ্রমিকদেরকে বাগানের কাজে নিয়োগ করলেন। তারপর তিনি দিনের মাত্র একঘণ্টা বাকী থাকতেও বাজারে দাঁড়িয়ে থাকা

শ্রমিকদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন? তারা জানাল, আমাদেরকে কেউ কাজে নিযুক্ত করে নি, আমরা বেকার। তখন তিনি তাদেরকেও বাগানের কাজে নিযুক্ত করেন। সন্ধ্যা বেলায় বাগানের মালিক সকল শ্রমিককে ডেকে প্রত্যেককে সমপরিমাণ এক দিরহাম করে পারিশ্রমিক প্রদান করেন। যখন তিনি সকল শ্রমিককে ডেকে পাঠান এবং এক দিরহাম করে পারিশ্রমিক প্রদানের ঘোষণা দেন এবং সকলকে সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করেন, তখন তারা বাগানের মালিকের নিকট অভিযোগ করে, যারা মাত্র এক ঘন্টা কাজ করেছে তাদেরকে এক দিরহাম দেয়া হল আর আমরা যারা সকাল থেকে সারা দিন কাজ করেছি, আমরাও এক দিরহাম পেলাম! আমরা সারাদিন রৌদ্র ও গরম সহ্য করে কঠোর পরিশ্রম করেও যা পেলাম, একঘণ্টা কাজ করে আমাদের সমান পাওয়া কি আমাদের উপর বে-ইনসাফী নয়? মালিক তাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের সাথে কোন বে-ইনসাফী করা হয়নি। কেননা তোমাদের সাথেও এক দিরহাম দেয়ার চুক্তিতেই তোমাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে যারা কম সময় কাজ করেছে, তাদেরকে এক দিরহাম দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে তোমাদের আপত্তি করার কি কোন সুযোগ আছে? আমি আমার সম্পদ যদি কাউকে বেশি দেই তা হলেও অন্য কেউ তো আপত্তি করতে পারে না। এভাবে প্রথম ব্যক্তি শেষের হবে এবং শেষের ব্যক্তি প্রথম হবে।

ঘরের মালিক হলেন রাব্বুল আলামীন। আঙ্গুরের বাগান হল দীনে ইলাহী আর শ্রমিক হচ্ছে উম্মাতসমূহ। শ্রমিকদের শেষ দল বলতে যাদেরকে বলা হয়েছে, তারা হল আখিরী নবীর উম্মাত, যারা এক ঘণ্টা কাজ করেছে। তারা সকলের শেষে হয়েও সকলের প্রথমে থাকবে।

সহীহ বুখারীতে আছে ঃ

عَن ابن شهاب عن سالم به عبد الله عن أبيه انه أخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاءكم فيما صلف قبلكم من الامم كما بين صلوة العصر الى غروب الشمس اوتى أهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوافاعطوا قيراطًا قيراطًا ثم اوتى أهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلواة العصر ثم عجزوافاعطوا قيراطًا قيراطًا ثم اوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين الى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين واعطينا قيراطًا قيراطًا ونحن اعثر عملا قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيئ قالوا لا قال فهو فضلى اوتيه من أشاء (صحيح بخارى باب المواقيت)

"ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি সালিম ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনি বলতে শুনেছেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের অবস্থান ও তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের পৃথিবীতে অবস্থানের উদাহরণ হচ্ছে। আসরের নামায থেকে মাগরিবের নামাযের সময় পর্যন্ত। তাওরাত ওয়ালাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছে, তারা সে অনুযায়ী কাজ করেছে। যখন দিনের অর্ধেক হল তখন তারা ক্লান্ত হয়ে কাজ করতে অক্ষম হয়ে গেল (তারা কাজ সম্পন্ন করতে পারল না)। অতএব তাদেরকে এক কিরাত করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হল। তারপর ইঞ্জিল ওয়ালাদেরকে ইঞ্জিল দেয়া হল তারা আসরের নামায পর্যন্ত কাজ করল। তারপর তারা ক্লান্ত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়ল। তখন তাদেরকেও এক কিরাত পরিমাণ করে পারিশ্রমিক দেয়া হল। তারপর আমাদেরকে কুরআন দেয়া হল। আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করলাম, তখন আমাদেরকে দু'কিরাত পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হল। পূর্বের দু'কিতাবের ধারকগণ বললেন ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এক কিরাত পরিমাণ পরিশ্রম দেয়া হল, আর তাদেরকে দু'কিরাত পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হল। অথচ আমরা অধিক সময় পর্যন্ত কাজ করেছি। আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বললেন ঃ আমি কি পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে যুলুম করেছি? তারা বলল, না, তা করেন নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটি হলো আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা আমি আমার অনুগ্রহ অধিক দিয়ে থাকি।" (বুখারী নামাযের ওয়াক্ত অধ্যায়)

মথির ইঞ্জিলের বক্তব্য প্রথমকে শেষের এবং শেষেরকে প্রথম করার যে কথা, তা বুখারীর হাদীসও প্রমাণিত।

حدثنا أبوهريرة رضِى اللّٰه عنه عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা সকলের শেষের, তবে সকলের অগ্রগামী نحن الاخرون السابقون। যুগের নিয়মে আমরা সকলের শেষে রয়েছি। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর ফযলে সকলের অগ্রগামী হবে।

সুসংবাদ ঃ বার্নাবাসের ইঞ্জিল

نقل القسيس سيل فى مقدمة ترجمة للقران العظيم من انجيل برناباس وطبعت ١٨٥٤ وانتشرت ثمَّ طبعوا الكتاب مرة ثانية فاخرجوها وحذفوها وهى مانصها اعلم يابرنابا ان الذنب وان كان صغيرا يجزى الله عليه لان الله تعالى غير راضى عن الذَّنب ولمَّا

اجتنى امتى وتلاميذى لاجل الدُّنيا سخط اللّه لاجل هذا الامر و اراد باقتضاء عدله ان يجزيهم فى هذا العالم على هذه العقيدة الغير اللائقة ليحصل لهم النجاة من عذاب جهنم ولايكون لهم اذية هناك وانى وان كنت بريئًا لكن بعض الناس لما قالوا فى حقّى انَّهُ اللّه وابن الله كره الله هذا القول واقتضت مشيته بان لاتضحك الشياطين يوم القيمة على ولاتستَهزِونَ بِ فَاستحسن بمقتضى لطفه ورحمة ان يكون الضحك والاستهزاء فى الدنيا بسبب يهوداه ويظن كل شخص انى صلبت لكن هذه الاهانة والاستهزاء يبقيان الى ان يجئُ مُحمّد رَسول الله فإذا جاء فى الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط وترتفع هذه الشبهة من قلوب الناس انتهت ترجمة بحروفها قال فى اظهار الحق فان اعترضوا ان هذا الانجيل رده مجالس علماء هم فنقول لاعتبار لردهم وهذا من الاناجيل القديمة ويوجد ذكره فى كتب القرن الثانى والثالث فعلى هذا قبل ظهور نبينا صلى الله عليه وسلم بمائتى سنة ولايقدر احد ان يخبر بمثل هذا الامر من غير الهام كما لايخفى على ذو الافهام قال والبشارة الثانية قال الفاضل الحيدد على القرشى فى كتابه المسمى خلاصة سيف المسلمين الذى هوفى لسان الاردو اى الهندى فى صحيفة الثالثة والستين ان القسيس اوسكان الارمنى ترجم كتاب اشعيا عليه السلام باللسان الارمنى فى سنة ١٦٦٦ع وطبعت سنة ١٧٣٣ع وفيه الباب الثانى والاربعين هذا الفقرة ونصه ـ وسبحوا اللّه تسبيحًا جديدًا واثر سلطنة على اظهره واسمه أحمد ـ

“পাদ্রী সাইল তাঁর পবিত্র কুরআনের তরজমার ভূমিকায় বার্নাবাসের ইঞ্জিল থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এ ইঞ্জিল ১৮৫৪ সালে মুদ্রিত হয়েছিল। তারপর দ্বিতীয়বার মুদ্রণের সময় সুসংবাদটি বাদ দিয়েছেন। পাদ্রী সাইল সুসংবাদটি ইঞ্জিল থেকে বর্ণনা করেছিলেন। তা হল ঃ হে বার্নারা! পাপ ছোট হলে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময় দিবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা পাপকে অপসন্দ করেন। যখন আমার উম্মত ও আমার ছাত্রগণ দুনিয়ার জন্য পাপ করে, তখন আল্লাহ এজন্য রাগান্বিত হন। ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভ্রান্ত আকীদার কারণে দুনিয়াতে

শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করলেন, যেন তারা পরকালে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পায়। সেখানে যেন তাদের কোন কষ্ট না হয়। যদিও আমি তাদের এসব বাতিল আকীদার সাথে সম্পর্কহীন। তবুও যেহেতু তাদের কেউ আমাকে আল্লাহ ও আল্লাহর পুত্র বলে, আর আল্লাহ এসব কথা খুবই অপসন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাশা ও ইচ্ছা অনুযায়ী সব কিছু হয়। কিয়ামতের দিন যেন আমাকে নিয়ে শয়তান কৌতুক বা হাসাহাসি না করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ ও রহমতে চাইলেন ইয়াহূদীদের কারণে এসব হাসি দুনিয়াতেই থাকুক। তাদের সকলে এ ধারণা পোষণ করে যে, আমাকে শূলিতে ঝুলানো হয়েছে। কিন্তু এ অপমান হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। যখন তিনি পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন তিনি মু'মিনদেরকে ভুল ধারণা থেকে মুক্ত করবেন। তাদের হৃদয় থেকে বাতিল ধারণা বিদূরিত হবে.....।

গায়বের সংবাদ-ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলী
সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ -

"[এ নূহ (আ) এর ঘটনা] গায়বের খবর যা আমি তোমাকে অবহিত করেছি। অহী নাযিলের পূর্বে তুমি এ বিষয়ে অবহিত ছিলে না, তোমার সম্প্রদায়ও অবহিত ছিল না। অতএব [তুমিও নূহ (আ)-এর মত কাফিরদের বিষয়ে] সবর কর। অবশ্য শুভ পরিণাম মুত্তাকিদেরই হবে।" (সূরা হূদ)

হযরত নূহ (আ)-এর সময়ে কাফিরেরা কিছু সময় পর্যন্ত খুব হৈ-হুল্লড় করেছিল। কিন্তু তাদের শেষ পরিণতি ডুবে মরা ছিল। অন্যদিকে নূহ্ (আ)-এর সাথীরা সফলকাম হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দালাইলে নবুওয়াত ও রিসালাতের নিদর্শন যা কুরআন ও হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে আছে। এসব ঘটনা সংঘটিত হবার পূর্বে সংবাদ দেয়া হয়েছে। যা ছিল অভিজ্ঞতা, অনুমান ও বুদ্ধি-বিবেকের বাইরে। তারপর তাঁর সংবাদের ঘটনাবলী হুবহু যথাসময়ে সংঘটিত হয়েছে। যেমন ঃ বদরযুদ্ধের সময় যুদ্ধ শুরুর একদিন পূর্বে বলেছিলেন ঃ আগামীকাল অমুক এ স্থানে এবং অমুক ঐ স্থানে নিহত হবে। নিহতস্থলে নিশানও লাগানো হয়েছিল। পরের দিন দেখা গেল, প্রতিটি চিহ্নিত স্থানে প্রতিটি নিহত ব্যক্তির লাশ পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়া ও ইরাকের বিজয় সংবাদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি যে ক্রমধারা অনুযায়ী খবর দিয়েছিলেন, ঠিক সে ক্রমিকানুসারেই উক্ত বিজয় হয়েছিল। এজন্যই লোকেরা তাঁর সত্যপথের উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন

করেছে। তাঁর সত্য মত ও পথের প্রমাণ স্বরূপ তাঁর সত্য ও বাস্তব প্রমাণাদি তাঁর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনে প্রত্যক্ষকারীদেরকে বাধ্য করে। বারবার অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি গায়বের যে সংবাদ দিয়েছেন, তা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। এজন্য তাঁকে সত্যবাদী ও সঠিক বলে বিশ্বাস করতে সকলে বাধ্য হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, তাঁর অন্যান্য সংবাদও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে। কেননা একজন মানুষের পক্ষে নিজস্ব জ্ঞান দিয়ে এমন ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করা সম্ভব নয় যা একজন মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বাইরে। অতএব এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীই বুঝায় যে, তিনি গায়বের মালিকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তা এজন্য যে, গায়বের মালিকের নির্দেশনা ব্যতীত এ ধরনের বিষয়ে কোন মানুষের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। তা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, অমুক সময়ে এ বিষয় সংঘটিত হবে আর তাঁর বলা অনুযায়ী তা-ই হচ্ছে এটা গায়বের মালিকের কথা জানা ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব হতে পারে না। আর এজন্যই এ সত্যের পতাকাবাহী হিদায়াতের কাণ্ডারীর উপর ঈমান আনা জরুরী। যেভাবে কোন রাজা-বাদশাহ্ কখনো কোন মন্ত্রী-উযীরকে তার একান্ত গোপনীয় রহস্যময় কিছু বিষয় অবহিত করেন। আর সে উযীর যদি সে বিষয়ে প্রয়োজনে বিশেষ লোকদের নিকট তা দিয়ে সতর্ক করেন এবং অবহিত করেন, তখন সচেতন লোকেরা বুঝে যে, এ উযীর বাদশাহর খুবই নিকটের ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব।

এভাবে গায়বের মালিক আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো তাঁর রাসূলকে অহীর মাধ্যমে কোন গায়বী বিষয় অবহিত করেন, যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, এ ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আর লোকেরা আরও উপলব্ধি করবে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও সম্মানিত রাসূল। এজন্য তিনি তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণ এমন সব সংবাদ দিয়েছেন যা সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে ঊর্ধ্বে। মানুষ বিশ্বাস করে যে, এসব কথা আলিমুল গায়েব আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন। তিনি অবহিত না করলে তা বলা সম্ভব হত না। আর এজন্য মুনাফিকেরা ভয়ে থাকত, কখন জানি তাদের গোপন মুনাফিকী প্রকাশ করে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা সে কথাটিই পবিত্র আল–কুরআনে বলেছেন ঃ

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ -

"মুনাফিকরা ভয় পায় যে, তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের উপর এমন সূরা নাযিল হবে যাতে (প্রকাশিত হবে) তাদের অন্তরে যা কিছু আছে।" (সূরা তাওবা ঃ ৬৪)

সাধারণ মানুষের চাহিদা হল, কোন পথ প্রদর্শক ও হিদায়াতকারী এসে তাদেরকে নির্দেশনা দিবে। আর সাধারণ মানুষ হাদীকে মান্য করতে পারবে। কেননা এ ধরনের

ঘটনাবলী যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতার বাইরের বিষয়, তা ঘটনার অনেক পূর্বে সংবাদ দেয়া বে-নিয়ায ও সার্বভৌম মহান সত্তার নির্দেশ ব্যতীত অসম্ভব।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ভবিষ্যদ্বাণী

বৈশিষ্ট্য

অতীতের অনেক আম্বিয়ায়ে কিরাম অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যেমন বনী ইসরাঈলের নবীগণ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা তাঁদের সংবাদে নেই। কেননা তাঁদের সংবাদে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে অনেক কিছু বুঝবার ও বুঝানোর অবকাশ ছিল। কিন্তু মহানবী (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল খুবই স্পষ্ট ও সরাসরি। যেমন ঃ রোম সাম্রাজ্যের বিজয়, খিলাফতে রাশেদা, ইয়ামন বিজয়, সিরিয়া বিজয়, ইরাক বিজয় এবং কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্যের উপর দখল ও কর্তৃত্বসহ সকল সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীই ছিল স্পষ্ট ও সরাসরি। তাতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া এসব সংবাদ ছিল আলোড়ন সৃষ্টিকারী। যা দেখে ও শুনে পৃথিবীবাসী অবাক ও আশ্চর্য হয়ে যেত, ভাষা ও মুখ স্তব্ধ হয়ে যেত। তিনি ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলী ও বিপদাপদ সম্পর্কে যখন বর্ণনা দিতেন, তখন মনে হত যেন তিনি চাক্ষুষ দেখে তা বর্ণনা করছেন। এখান আমরা কুরআনে বর্ণিত কিছু আগাম সংবাদ এবং তারপরে হাদীসে উল্লেখিত কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করব।

১ আল-কুরআন সংরক্ষিত থাকার সংবাদ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ -

“আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করব।” (সূরা হিজর ঃ ৯)

কারো পক্ষে কুরআনে সামান্যতম সংযোজন-বিয়োজন ও বিকৃতি করা সম্ভব নয়। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয়েছে। ইতিমধ্যে চৌদ্দশ বছর গত হয়েছে, আল-হামদু লিল্লাহ, কুরআনের একটি হরকতও পরিবর্তন হয়নি। এভাবে অবিকৃত অবস্থায় কুরআন এ দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষিত রয়েছে, যে অবস্থা কুরআন মহানবী (সা) এর উপর নাযিল হয়েছে, সে অবস্থায়ই বর্তমান আছে। শুধু মুসলমান নয়; বরং দুনিয়ার সকলে কুরআনের এ মু'জিযার কথা স্বীকার করে। ইসলামের দুশমনেরা কুরআনের অবিকৃতরূপকে বিকৃত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল-হামদু লিল্লাহ তারা একটি শব্দ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, তা একশত ভাগ সত্যে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে তাওরাত ও ইঞ্জীল এর ব্যাপারে যে বিকৃতি হয়েছে, তা ইয়াহূদী ও নাসারাদের নিকটও স্বীকৃত।

২. কুরআনের চিরন্তন মু'জিযার ভবিষ্যদ্বাণী

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَن يَّأتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

"হে নবী! আপনি লোকদেরকে বলুন, যদি মানুষ ও জিন্ন সকলে একত্রিত হয়ে কুরআনে মত রচনা আনতে চেষ্টা করে, তবে কুরআনের মত তা করতে সক্ষম হবে না, যদিও তারা পরস্পরকে এ কাজে সহযোগিতা করে।" (বনী ইসরাঈল ঃ ৮)

৩. নবীর নিরাপত্তার ভবিষ্যদ্বাণী

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ـ

"আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দিবেন।" নবুওয়াতের প্রথমদিকে নবী (সা) বন্ধু ও সাহায্যকারীবিহীন ছিলেন। আরবের সকলে এমনকি সমস্ত পৃথিবী তাঁর দুশমন ছিল। সে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিরাপত্তার ওয়াদা করেন যে, আপনি পেরেশান হবেন না, আল্লাহ তা'আলা আপনার হিফাযতকারী। দুশমন আপনার নিরাপত্তা নষ্ট করে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল-হামদু লিল্লাহ আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুশমন থেকে রক্ষা করেছেন। এমন কি হিজরতের সময় যখন কাফিরেরা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করল, তখন তিনি হযরত আলী (রা)-কে তাঁর পবিত্র বিছানায় শায়িত রেখে সূরা ইয়াসীনের প্রথমদিকের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে–এক মুষ্টি মাটি কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করে তাদের সামনে দিয়ে বের হয়ে যান। তারপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাড়িতে যান। তাঁকে সাথে নিয়ে সাওর গুহায় তাশরীফ নিয়ে যান। এ বিষয়ে এই আয়াতে নাযিল হয়েছেঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْيُخْرِجُوْكَ ـ

(সূরা আনফাল ঃ ৩০)

৪. ইসলাম বিজয়ী হবার সংবাদ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

"তিনি সে সত্তা, যিনি নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও হক দীন দিয়ে, যেন রাসূল তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মুশরিকেরা তা অপসন্দ করে।" (সূরা ফাতহ ঃ ২৮)

আল-হামদু লিল্লাহ্, আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা পূরা করেছেন। ইসলাম বিজয়ী হয়েছে ইয়াহূদী, নাসারা, মজূসীসহ সকল মতবাদের উপরে। বিজয়ী হয়েছে মর্তিপূজাসহ সকল বাতিল ধর্মের উপর। কোন ধর্ম ও মতবাদের নৈতিক শক্তি নেই যারা দলীল-প্রমাণ দিয়ে ইসলামের মুকাবিলা করতে পারে।

৫. রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের সংবাদ

الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ – وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ -

“রূম পরাজিত হয়েছে। (অর্থাৎ রূমের নাসরারা)। আরবের নিকটের যমীনে (পরাজিত হয়েছে)। তারা পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। পূর্বের বিষয়টাও আল্লাহর ইখ্তিয়ারে ছিল, পরেরটিও আল্লাহর ইখ্তিয়ারের আওতায়। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছায়ই পরাজয় এসেছে, পরে আল্লাহর ইচ্ছায়ই বিজয় আসবে এবং সে দিন মুসলমানগণ খুশি হবে (যে দিন রোম পারস্যের উপর বিজয়ী হবে) আল্লাহর সাহায্যে। (মুসলমানগণ কাফিরদের উপর বিজয়ী হবে হুদায়বিয়ার চুক্তি করে)। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি পরাক্রমশালী ও মেহেরবান। আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন (পারস্য ও মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন) আল্লাহ তা'আলা ওয়াদার খেলাফ করেন না, কিন্তু বেশি ভাগ মানুষ তা বুঝতে পারে না।” (সূরা রূম ঃ ১-৬)

এসব আয়াতে বিরাট এক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হিজরতের পূর্বে এসব আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছে। ঘটনার বিবরণ হল, একবার রোমীয় ও ইরানীদের মধ্যে যুদ্ধ হল। ইরানীরা রোমীদের উপর বিজয়ী হয়। এ সংবাদে মক্কার পৌত্তলিকেরা আনন্দিত হয়ে মুসলমানদেরকে তিরস্কারের সুরে বলতে লাগল, ইরানীরা আমাদের মত মূর্তিপূজারী, তারা আহলে কিতাব রোমীদেরকে পরাজিত করেছে। অতএব আমরাও মুসলমানদেরকে পরাজিত করে বিজয়ী হব। মুসলমানগণ তাদের কথা শুনে যখন মন খারাপ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। যেখানে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে যে, যদিও এ সময়ে রোমীরা পরাজিত হয়েছে, তবে দশ বছরের মধ্যেই রোমীরা পারস্যবাসীদের উপর বিজয়ী হবে। এটি আল্লাহর ওয়াদা যা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। তারপর সাত বছর পুরো হবার আগেই কুরআনে ভবিষ্যদ্বাণী পুরো হয়েছিল। রোমীরা ইরানীদের উপর বিজয়ী হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আল্লাহ তা'আলার এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছিল।

(৬) খেলাফতে রাশেদা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ وَلَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ـ (সূরা নূর ঃ ৫৫)

এ আয়াতে আল্লাহ তৎকালীন সালেহীন মু'মিনদেরকে অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামকে তিনটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এক ঃ তোমাদেরকে এমন খিলাফত ও বিশাল রাজত্ব দেয়া হবে যা ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত দাঊদ (আ)-কে বে-নযীর খেলাফত ও রাজত্ব দেয়া হয়েছিল।

দুই ঃ খিলাফতে রাশেদার যুগে দীন ইসলামকে তিনি এমন শক্তি, প্রতিপত্তি ও শাসন ক্ষমতা দান করবেন যার মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল দীনের উপর ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

তৃতীয় ঃ মুসলমানদের অন্তর থেকে কাফিরদের ভয় বিলকুল মুছে যাবে এবং তারা নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ও নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করবে। আর এ ধরনের বক্তব্য অনেক হাদীসে আছে। তারপর আল-হামদু লিল্লাহ খুলাফায়ে রাশেদার হাতে এসব প্রতিশ্রুতি পূরো হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম কায়সার ও কিস্‌রার ধনভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। যখন এসব বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তখন সাহাবায়ে কিরাম সর্বহারা বা সহায়সম্বলহীন কঠিন জীবনযাপন করছিলেন। বৈষয়িক উপকরণ না থাকায় কাফিরদের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলেন। রাতে শয়ন করার সময়ও ভীত থাকতেন। না জানি কেউ আমাদের উপর হামলা করে বসে। যুদ্ধ করার মত শক্তি-সামর্থ্যও ছিল না। শাসন ও কর্তৃত্ব করার মত কোন সামাজিক শক্তিও ছিল না। চারপাশের সমস্ত গোত্রই ইসলাম ও মুসলমানের দুশমন ছিল। সকলে ছিল মুসলমানের রক্ত পিপাসু। ইরানে অগ্নিপূজকদের রাজত্ব ছিল, রোমে ছিল ঈসায়ীদের সরকার। দু'টি দেশই আর্থ-সামাজিক ও সামরিক শক্তির দিক থেকে ছিল পরাশক্তি। অন্যদিকে মুসলমানগণ ছিলেন সহায়-সম্বলহীন। শুধু তা-ই নয়, কায়সার ও কিস্‌রার মুকাবিলা করার মত কোন রাজশক্তিও দুনিয়ায় ছিল না। এমনি বৈরী প্রেক্ষাপটে ত্রিশ বছরের খিলাফত ও সরকারের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যা প্রকাশ্য উপকরণের ভিত্তিতে নির্ভরশীল না হয়ে গায়েবী সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই হিজায, নজদ, ইয়ামন, খায়বার ও বাহরাইনসহ আরবের অধিকাংশ রাজ্য মুসলমানদের দখলে এসেছিল। আর নাজ্জাশী মুসলমান হয়েছিলেন। ফলে হাবশা শত্রুভূমি থেকে দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছিল। হিজর ও সিরিয়ার কোন কোন ঈসায়ী গোত্র জিযিয়া দিতে শুরু করেছিল।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে পারস্যের কিছু এলাকা, বসরা এবং সিরিয়ার কিছু এলাকা মুসলমানদের দখলে আসে। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতের সময় সিরিয়া ও সমগ্র মিসর, পারস্যের বেশিরভাগ দেশ মুসলমানগণ জয় করেন। কায়সারের চূড়ান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুধু তার প্রভাব ক্ষয় করতেই ব্যয় হয়েছে। কায়সার চারদিকে হাত-পা ছুঁড়েও প্রাসাদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। পারস্যের বেশির ভাগ এলাকা যা কায়সারের অধীন ছিল, তা কায়সারের পরাজয়ের পর হযরত ফারূক আযমের অধীনে চলে আসে। কায়সারের ভাণ্ডার ও ধন-সম্পদ হিসাব করে মুসলমানদের মধ্যে করা বণ্টন হয়। এসব এলাকায় ইসলাম ও তাওহীদের ডংকা বাজতে লাগল। কোন কোন এলাকা থেকেও শিরক ও কুফরের নাম-নিশানাও মুছে গিয়েছে এবং কোন কোন এলাকায় কুফর পরাজিত হয়েছে। নিরাপদ পরিবেশে মুসলমানগণ আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন। হযরত উসমান (রা)-এর যামানায় মুসলমানগণ বিজয়ের পতাকা নিয়ে আফ্রিকার উত্তর সীমান্তের দেশ মরক্কো পেরিয়ে স্পেন, কায়রোয়ান ও অতলান্তিক সাগরের তীরে গিয়ে পৌঁছেছে।

পূর্বদিকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত সব দেশ বিজিত হয়েছিল। উসমান গনী (রা)-এর খিলাফতের যামানায় কিস্‌রার সরকারের বিলুপ্তি ঘটে। তাদের কোন নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকেনি। হিজরী ৩০ সনে কিস্‌রা মৃত্যুবরণ করে। তখন থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজস্ব মদীনার ভাণ্ডারে আসতে থাকে। সমগ্র বিশ্ব তখন মুসলমানদের অনুগত ছিল। আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে পৃথিবীর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব মুসলমানদের হাতে ছিল। যেমন নাদির শাহ যখন হিন্দুস্তানের সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে পরাজিত করল, তখন মনে হয়েছে যে, গোটা হিন্দুস্থানে নাদির শাহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অথচ তখন দাক্ষিণাত্যে তার আনুগত্য ছিল না। তেমনিভাবে যখন রূম সাম্রাজ্য পরাজিত হল, তখন রূম সাম্রাজ্যের অধীন ফ্রান্সও পরাজিত হল। তখন মনে হয়েছে ইসলামের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামের এমন শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল ও বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, যেন গোটা পৃথিবীর সমগ্র দেশ ও সরকার মুসলমানদের অধীন হয়ে গেছে।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর ওয়াদা মুতাবিক এত অল্প সময়ের মধ্যে শতশত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। নাসারা অগ্নিউপাসক ও মুশরিকেরা হাজারো চেষ্টা-তদবির ও প্রাণান্তর চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে ইসলামের মুকাবিলা করেও পরিশেষে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টাও আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাদের চরম বিরোধিতা, শত্রুতা ও প্রতিরোধ শুধু ব্যর্থই হয় নি, বরং ইসলামের উন্নতি ও বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। ইসলামের পতাকাবাহীগণ

পৃথিবীর ভূভাগের ৫০ শতাংশ ভূমির সীমায় পৌঁছে বিজয়ের পতাকা উড়িয়েছে। গ্রীকের সীমায় পৌঁছেছে। তারপর তুর্কিস্তানের উত্তরের সীমান্তে পৌঁছেছে। এভাবে এ বাহিনী এগিয়ে সত্তর ভাগ সীমানা পেরিয়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত এলাকায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হযরত আলী (রা)-এর যামানায় যদিও নতুন কোন দেশ বিজিত হয়নি, কিন্তু ইসলামের উন্নতি ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি। কেননা হযরত আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর বিবাদ ছিল দু'ভাইয়ের মতপার্থক্য। তবে কুফরের মুকাবিলায় তাঁরা দু'ভাই এক ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের বিজয় কাহিনী নিয়ে অনেক বিশাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার থেকে দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় ইসলামের যে উন্নতি হয়েছে। এর নযীর পাওয়া যাবে না। কায়সার ও কিস্‌রার রাজত্ব উল্টে গেছে। যমীনের অর্ধেক অংশ বিজিত হয়েছে। তাঁরা দীনে হক ও ইসলামকে শিরক ও কুফরের উপর বিজয়ী করেছেন। পৃথিবীতে ইনসাফ ও সুবিচার দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

৭. খায়বার বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

৮. পারস্য ও রোম বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِىْ قُلُوْبِهِمْ - فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَاْخُذُوْنَهُ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا - وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا - وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا -

(সূরা ফাতহ ঃ ১৮-২১)

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বায়'আতে রিদওয়ান বা হুদাবিয়ার সন্ধিতে যারা শরীক হয়েছিল, তাদেরকে নিকটবর্তী খায়বার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। যা আল্লাহ তা'আলার বাণী واثابهم فتحا قريبا এবং রোম বিজয়ের প্রতিশ্রুতির প্রতি এবং واخرى لم تقدروا عليها বলে পারস্য ও রোম-এর বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল-হামদু লিল্লাহ, এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে। খায়বার মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায়ই বিজিত হয়েছে। পারস্য ও রূম হয়েছে হযরত উমর (রা)-এর যামানায়।

৯. আরবের গোত্রসমূহের পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ * اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ـ

আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় হয়েছে। আরবের গোত্রগুলো এত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল যে, তাদের ইসলামের মুকাবিলা করার জন্য মাথা উঁচু করার শক্তিও ছিল না। হিজরী ৪র্থ বছরে ইয়াহূদী বনী নযীর পরাজিত ও নির্বাসিত হয়েছিল। আর ৫ম হিজরীতে বনী কুরায়যা নিহত হয়েছে। ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয় হয়েছে এবং ইয়াহূদীগণ পরাজিত হয়ে মুসলমানদেরকে জিযিয়া কর প্রদানে বাধ্য হয়েছিল।

১০. মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ـ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ـ (সূরা নাসর)

৮ম হিজরীতে মক্কায় বিজয় হয়। নয় ও দশ বছরে চারদিকের আরব গোত্রসমূহ এবং সিরিয়া ও ইরাকের জনসাধারণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঈমান আনয়ন করে ও দলে দলে দীন ইসলামে শমিল হয়।

১১. পরিখার যুদ্ধ বা আহযাব যুদ্ধের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَازَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ـ

অন্যদিকে হাদীসে আছে ঃ

سيشتد الاخر اجتماع الاحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم ـ

"শীঘ্রই আরবের বিভিন্ন গোত্র একত্রিত হয়ে তোমাদের উপর হামলা করবে, তবে শেষ পর্যন্ত তোমরাই তাদের উপর বিজয়ী হবে।"

বাস্তবে তা-ই হয়েছিল, আহযাব যুদ্ধে আরবের বিভিন্ন গোত্র সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছিল। আল-হামদু লিল্লাহ, পরিশেষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদা সত্যে পরিণত হল। মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করলেন ও কাফিররা পরাজিত হয়ে ফিরে চলে যায়।

১২. ইয়াহূদীদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী যে, তারা মৃত্যু কামনা করবে না

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ

(সূরা আহযাব ঃ ২৪)

হযরত নবী (সা) ইয়াহূদীদেরকে বলেছিলেন ঃ "যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয়জন, তা হলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, তারপর সাথে সাথে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ঃ তোমরা কখনোই মৃত্যু কামনা করবে না। বাস্তবে তা-ই হয়েছিল। তারা মৃত্যু কামনা করতে পারে নি। এ বিষয়ে সূরা জুমু'আতেও এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ

১৩. ভীতি সঞ্চারের ভবিষ্যদ্বাণী

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ـ

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫১)

যেমন হামরাউল আসাদ যুদ্ধে অবস্থা এমন হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের অন্তরে প্রবল ভয়ের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। অথচ তারা উহুদে সবেমাত্র বিজয়ী হয়েছিল। তথাপি তাদের পুনরায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে সাহস হয়নি। একই অবস্থা হয়েছিল আহযাব বা খন্দক যুদ্ধে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

(সূরা আহযাব ঃ ৯)

হাদীসে আছে ঃ نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور ـ

"আমাকে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে আর আদ জাতি ঘূর্ণিঝড়ে বরবাদ হয়েছে।"

১৪. মুরতাদ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ - يُجَاهِدُوْنَ

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَايَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

(সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-এর জীবদ্দশায় আগাম সংবাদ দিয়েছেন যে, সামনের দিনগুলোতে মুসলমানদের থেকে কিছু মানুষ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাবে। তখন মুরতাদদের মুকাবিলা করার জন্য কিছু মুসলমান দাঁড়িয়ে যাবে ও যুদ্ধ করবে। যুদ্ধকারী এসব মুসলমান আল্লাহ্র প্রিয়জন হবে। তারপর হযরত সিদ্দীকে আকবর আবূ বকর (রা)-এর যামানায় মুরতাদ ফিতনা প্রকাশ পায়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কিরাম মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন।

১৫. হযরত নবী (সা)-এর ওফাত সংবাদ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا -

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এ সূরাতে হযরত নবী (সা)-এর শেষ বিদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন দলে দলে মানুষ ইসলামে দাখিল হবে। তখন তুমি বুঝবে যে, তোমাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। এবার তুমি আল্লাহর তাসবীহ্ ও প্রশংসায় ব্যস্ত হও এবং ইস্তিগফার করতে থাক ও আখিরাতের সফরের প্রস্তুতি নিতে থাক।

কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী এতক্ষণ আলোচনা হয়েছে। এখন হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা হবে।

হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত হুযায়ফা ইবন ইয়ামন (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হযরত নবী (সা) তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলীর উল্লেখ করলেন। যে যে যতটুকু স্মরণ রাখতে পেরেছে, স্মরণ রেখেছে। অন্যথায় ভুলে গেছে। এ সম্পর্কে আমার সঙ্গি-সাথীরা অবহিত আছেন। তাঁর প্রদত্ত সংবাদের অনেক কিছু আমি ভুলে গিয়েছি। তবে যখন সেসব সংবাদের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, তখন তা স্মরণ হয়ে যায়। অর্থাৎ সংঘটিত হবার পর আমার মনে পড়ে যায়, এটির কথাও নবী (সা) বলেছিলেন– যেমন অনুপস্থিত কোন লোকের স্মরণে তার ছবি স্মৃতিপটে ভেসে উঠে। তারপর যখন তার সাথে দেখা হয় তখন পরিচিত হওয়া যায় যে, সে অমুক ব্যক্তি। (যারকানী, ফাত্হুল বারী, পৃ. ২০৮)

এখন আমরা সংক্ষেপে এমন কিছু বিষয়ের কথা তুলে ধরব যা ঘটবার পূর্বেই হযরত নবী (সা) বলেছিলেন। এ বিষয়ে হাদীসগ্রন্থ ও সংকলন গ্রন্থের সূত্র উল্লেখ করব, যেন কেউ বিস্তাতিরভাবে জানতে চাইলে তার সুযোগ থাকে।

১. খিলাফতে রাশেদার সংবাদ অসংখ্য হাদীসে উল্লেখ আছে।

২. খিলাফতে রাশেদার মেয়াদকাল ত্রিশ বছর হবার সংবাদ। (যারকানী, পৃ. ২২৩ ৭ম খণ্ড)

৩. প্রথম দুই খলীফার সংবাদ যে, তোমরা আবূ বকর ও উমরের অনুসরণ করবে।

৪. খিলাফতে রাশেদার বিষয়ে অধিক হারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে খিলাফতে রাশেদা ক্রমধারা জানা যায়।

৫. ইসলামী সাম্রাজ্যের বিশালত্ব ও ব্যাপক বিজয়ের সংবাদ তিনি দিয়েছেন। তিনি ফরমায়েছেন ঃ আমাকে হাতের মুষ্টিতে যতদূর যমীন দেখানো হয়েছে, আমার উম্মাতের রাজত্ব ততটুকু পর্যন্ত ব্যাপক হবে। (যারকানী, ৭ খ, পৃ. ২১০)

৬. কায়সার ও কিস্‌রার পতনের সংবাদ দিয়েছেন (যারকানী, ৭ খ, পৃ. ৩০৭)

৭. খিলাফতে রাশেদার পর রাজবংশের শাসনের সংবাদও তিনি জানিয়েছেন। (যারকানী, ৭ খ, পৃ. ২২১)

৮. এছাড়া তিনি বিভিন্ন শহর ও রাজত্বের উপর মুসলমানদের বিজয় সংবাদ দিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে ঃ সিরিয়া, ইরাক, মিসর, বায়তুল মুকাদ্দাস ও ইস্তাম্বুল।

৯. বদরের যুদ্ধের পূর্বদিন তিনি দুশমন বাহিনীর নিহতদের নাম ও স্থান উল্লেখ করেছেন। যার নামের সাথে যেস্থান তিনি উল্লেখ করেছেন, তারা ঠিক সেখানেই নিহত হয়েছে।

১০. উবাই ইবন খালফ সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী (সা) তাকে হত্যা করবেন।

১১. খন্দক যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আজকের পর কুরায়শগণ আমাদের উপর আর হামলা করার সাহস করবে না; বরং আমরাই তাদের উপর চড়াও হব।

১২. তিনি মদীনায় থেকে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছেন। (যারকানী, ৭ খ, পৃ. ২০৬)

১৩. মুতার যুদ্ধে যুখন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি শহীদ হলেন, ঠিক সেসময় মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) চলমান অবস্থার বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করেন এবং তাঁদের শাহাদাতের সংবাদ অবহিত করেন।

১৪. তিনি শি'আবে আবূ তালিব উপত্যকা থেকে সংবাদ দেন যে, কুরায়শরা মুসলমানদেরকে সামাজিক বয়কট করার জন্য নিজেরা যে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেছিল, যা তারা কা'বাঘরে ঝুলিয়ে রেখেছিল, তার লেখা শুধুমাত্র আল্লাহর নাম ব্যতীত পোকায় খেয়ে ফেলেছে। (যারকানী, ২১০ পৃ.)

১৫. ইন্তিকালের পূর্বে তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-কে সংবাদ জানান যে, তাঁর ইন্তিকালের পর আহলে বায়তের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ফাতিমা তাঁর সাথে পরকালে মিলিত হবেন।

১৬. রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুর রোগের সময় তাঁর বিবীদেরকে বলেছিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে অধিক দান-সাদাকাকারী, সে প্রথমে আমার সাথে পরকাল মিলিত হবে। তাতে দেখা গেল হযরত যয়নাব (রা) যিনি পবিত্র বিবীদের মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন, তিনি সমস্ত বিবীদের প্রথমে ইন্তিকাল করেন।

১৭. হযরত উমর (রা) সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, উমর হল ফিতনার তালা ও প্রতিরোধক। অর্থাৎ যতদিন উমর (রা) জীবিত থাকবেন ফিতনা বের হতে পারবে না। তারপর দেখা গেল, বাস্তবে তা-ই হল। হযরত উমর (রা)-এর অবর্তমানে ফিতনা-ফাসাদ মুসলমানদের মধ্যে সূত্রপাত হতে লাগল।

১৮. তিনি হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের আগাম সংবাদ জানিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ তুমি দুশমনের আঘাতে শহীদ হবে এবং তুমি জান্নাতী হবে। বাস্তবে হুবহু তা-ই হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে আছে, তোমার মাথায় এক বদবখত লোক আঘাত করবে। তাতে তোমার শরীর রক্তাক্ত হয়ে যাবে; বাস্তবে তাই হয়েছে।

১৯. জামাল যুদ্ধের আগাম সংবাদও তিনি দিয়েছিলেন।

২০. সিফফীন যুদ্ধের ভবিষ্যত সংবাদও দিয়ে জানিয়েছিলেন।

২১. হযরত আয়েশা (রা)-এর অভিযানে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছিলেন।

২২. হযরত আম্মার (রা)-কে তিনি সংবাদ দিয়েছিলেন, বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে। তারপর বিদ্রোহী দলের হাতেই হযরত আম্মার (রা) শহীদ হয়েছিলেন।

২৩. হযরত ইমাম হাসান (রা) সম্পর্কে হযরত নবী (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে মুসলমানদের দু'টি বিরাট দলের মধ্যে মীমাংসার ব্যবস্থা করবেন।

২৪. হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের সংবাদও তিনি পূর্বেই জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাকে আমার উম্মাতের লোকেরা হত্যা করবে।

২৫. সাবিত ইবন কায়সের শাহাদাতের সংবাদ।

২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর কঠিন পরীক্ষার সংবাদ।

২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে একটি রাজবংশের পিতা হবার সংবাদ (আব্বাসীয় খিলাফত)।

২৮. আসওয়াদ আনসী, নামক মিথ্যা নবীর দাবিদারের সংবাদী সে মিথ্যা নবীর দাবি করেছিল। নবী (সা) তার নিহত হওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সে যে রাতে নিহত হয়, মদীনায় নবী (সা) তার খবর সাহাবায়ে কিরামকে জানান।

২৯. পারভেজের নিহত হবার সংবাদ।

৩০. হযরত আব্বাস (রা)-এর স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট রেখে আসা সম্পদের সংবাদ। হযরত আব্বাস (রা) বদর যুদ্ধে বন্দী হন। যখন তাঁর নিকট মুক্তিপণ চাওয়া হল, তখন তিনি জানান, মুক্তিপণ দেয়ার মত অর্থ তাঁর সংসারে নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আপনি উম্মুল ফযলের নিকট যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্ব রাতে যে অর্থ রেখে এসেছিলেন, তা দিয়ে মুক্তিপণ দিন। অথচ এ বিষয়টি কারো জানা ছিল না।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) আরও অনেক সংবাদ দিয়েছেন। যেমন হাদীস অস্বীকারকারীদের সংবাদ, দাজ্জাল, খারিজী, মিথ্যা নবীসহ অনেক আগাম সংবাদ তিনি জানিয়েছিলেন। কিয়ামতের আলামতসহ অনেক বড় বড় বিস্ময়কর ঘটনার খবরও তিনি দিয়েছেন। তাঁর দেয়া সংবাদের অনেক কিছুই কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর অহীর সহযোগিতা ব্যতীত দেয়া সম্ভব নয়। সক্ষিপ্তভাবে এখানে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু আলোচনা হল।

أللهم صل على سيدنا محمد وعلى واله وصحبه وسلم

বরকতময় মু'জিযার দান

প্রত্যেক নবী ও রাসূল-এর ব্যক্তিসত্তা ও গুণাবলীর সাথে মু'জিযা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু নবী করীম (সা) যেভাবে সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠনবী ছিলেন, তেমনিভাবে তাঁর মু'জিযার মধ্যে পূর্ণতা ও বরকতের প্রাচুর্য ছিল, যা অন্য নবীদের মু'জিযার মধ্যে এত ব্যাপকভাবে ছিল না। যেমন, সামান্য খাদ্যেও একটু পানি দিয়ে একদল বিশাল বাহিনী তৃপ্তি সহকারে আহার করেছে। এ ধরনের অবস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নস্থানে হয়েছিল।

১. খন্দক যুদ্ধের সময় হযরত জাবির (রা)-এর গৃহে মাত্র এক ১টি রুটি দিয়ে নবীসহ অনেক সাহাবী তৃপ্তি সহকারে আহার করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২. হযরত আবূ তালহা (রা)-এর বাড়িতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-সহ দু'তিন-জনকে দাওয়াত করেছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের জন্য প্রস্তুত আহার দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)

সকল সাহাবীকে পেটপুরে খাইয়েছিলেন (যাদের সংখ্যা একশতের মত ছিল)। (বুখারী ও মুসলিম)।

৩. একবার তিনি এক সা'-(সাড়ে তিন সের) ওজনের বকরীর গোশ্‌ত দিয়ে আশি (৮০) জন ব্যক্তিকে তৃপ্তি সহকারে আপ্যায়ন করিয়েছেন। (বায়হাকী)

৪. হুদায়বিয়াতে কূপে পানি ছিল না। তিনি তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানি শুকনো কূপে ঢেলে দিলেন। ঝরণার মত পানি এসে ভরপুর হয়ে গেল। যার পানি ১৫০০ (পনেরশত) মানুষ নিজেরা খেয়েছেন, ব্যবহার করেছেন এবং পশুকে খাইয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

৫. একবার মহানবী (সা)-এর সেনাবাহিনীতে সাহাবীদের পানি সংকট দেখা দিল। তিনি তাঁর উযূর ছোট পাত্রে যেখানে ভালভাবে পুরো হাত ঢুকানো যায় না, তিনি তাতে হাত মুবারক রাখলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে পানি বের হতে লাগল যে, সকল সাহাবী পান করলেন ও উযূ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৬. তাবুকে একবার কূপ শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর অযূর অবশিষ্ট পানি তাতে ঢেলে দিলেন। তখন এত ব্যাপক হারে পানি এসে কূপ ভর্তি হয়ে গেল যে, সকলে পানি ব্যবহার করে তৃপ্তি লাভ করলেন।

৭. একবার মহানবী (সা)-এর দরবারে এক পেয়ালা দুধ আনা হলো। তখন তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে হুকুম দিলেন ঃ সকল আহলে সুফ্‌ফাকে ডেকে আন। তাঁদের সংখ্যা তখন সত্তর থেকে আশির মধ্যে ছিল। এত ব্যাপক সংখ্যক ক্ষুধার্ত সাহাবী তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন। তারপরও পেয়ালায় পূর্বের পরিমাণ দুধ অবশিষ্ট ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

৮. হযরত যায়নাব (রা)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) বিবাহ করেন, তখন হযরত আনাস (রা)-এর মা হযরত উম্মু সুলায়ম (রা) সামান্য আহার প্রস্তুত করে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পেশ করলেন। তিনি অনেক সাহাবীকে দাওয়াত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন দশজন করে একসাথে বসে যাও এবং খেতে শুরু করো। দশজন দশজন করে প্রায় তিনশত সাহাবী এ সামান্য খাদ্য থেকে গ্রহণ করে তৃপ্তি সহকারে আহার করেছেন। শেষে প্রথম থেকে কিছু বেশি খাদ্য অবশিষ্ট ছিল। সুবহানাল্লাহ্। (সহীহ্ মুসলিম)

দু'আ কবূল হওয়া

মু'জিযার মধ্যে অন্যতম দিক হচ্ছে ঃ মহানবী (সা) যেসব দু'আ করেছেন তা কবূল হয়েছে।

এ ধরনের মু'জিযাকে ভাষাঅস্ত্রও বলা হয়। ভাষা অস্ত্র বলে বুঝানো হয় কণ্ঠ থেকে যে কথা বের হয়, বাস্তবে তা কার্যকরী হয়ে যায়। যেভাবেই বিষয়টিকে দেখা হোক না কেন, এটি তাঁর আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হওয়ার ও সাহায্য পাওয়ার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কণ্ঠ ও ভাষা দিয়ে যা প্রকাশ করেন, তা হুবহু হয়ে যায়। হযরত নবী (সা) তাঁর পবিত্র যবানে যা বলেছেন, কঠিন পাথর ভেদ করেও তা-ই অংকিত হয়েছে। তিনি যার ব্যাপারে যা কিছু বলেছেন, তা তার জন্য হুবহু তা-ই হয়েছে। যেমনঃ

১. হযরত আনাস (রা)-এর জন্য তিনি দু'আ করেছেন, যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দারিদ্র্য দূর করে ধনী বানিয়ে দেয়। নবীজির দু'আয় তিনি আজীবনের জন্য ধনী হয়ে গেছেন।

২. হযরত নবী (সা)-এর দু'আর বরকতে সাহাবী হযরত আবদুর রহমান (রা) সাধারণ অবস্থা থেকে লক্ষপতি ধনীতে পরিণত হয়েছিলেন।

৩. হযরত সা'দ (রা)-এর জন্য তিনি দু'আ করেছেন যে, হে আল্লাহ্ তুমি সা'দের দু'আ কবূল করো। এরপর হযরত সা'দ আল্লাহর নিকট যে দু'আ করতেন আল্লাহ্ তা কবূল করতেন।

৪. হিজরতের সময় হযরত নবী (সা)-এর পিছনে দুশমন হিসেবে সুরাকা অগ্রসর হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটবর্তী হলে তিনি দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ সুরাকার ঘোড়াকে যমীনে দাবিয়ে দাও। সাথে সাথে হাঁটু পর্যন্ত ঘোড়া মাটিতে দেবে যায়। যখন সুরাকা ঈমান এনে ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং তিনি পুনরায় দু'আ করেন তখন ঘোড়া যমীন থেকে বের হয়।

৫. বাল্য বয়সে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) জন্য ইল্‌ম ও খিদমতের জন্য তিনি দু'আ করেছেন। যার বদৌলিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর কণ্ঠ দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝরণাধারা জারী হয়েছিল।

৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর জন্য হযরত (সা) স্মরণশক্তি ও মেধার জন্য দু'আ করেছিলেন। যার ফলে পরবর্তী সময়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) যা কিছু শ্রবণ করতেন, কিছুই ভুলতেন না।

৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মায়ের ঈমান ও হিদায়াতের জন্য দু'আ করেছেন। ফলে তিনি হিদায়াত পেয়েছেন। (বুখারী)

৮. একবার মহানবী (সা) এক ব্যক্তির গৃহে তাশরীফ নিলেন। ঘরের লোকদেরকে একটি চাদর জড়িয়ে দু'আ করলেন। তাঁর দু'আর সাথে ঘরের দরজাও আমীন আমীন বলতে লাগল। তিনবার আমীন বলেছে।

৯. মক্কার কুরায়শরা যখন হযরত নবী (সা)-এর চরম বিরোধিতা ও তাঁর প্রতি কঠোর যুলুম শুরু করল, তখন এক পর্যায়ে তিনি তাদের জন্য বদদু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! তাদের উপর দুর্ভিক্ষ নাযিল কর। তাঁর দু'আর ফলে কুরায়শদের উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হয়েছিল।

১০. মদীনা মুনাওয়ারায় একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিল। জুমু'আর দিনে এক ব্যক্তি খুতবার সময় দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করার আবেদন করলেন। তিনি দু'আ করলেন সাথে সাথে বৃষ্টি হতে শুরু করল।

রোগীকে সুস্থ করার মু'জিযা[১]

১. খায়বার যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা)-এর চোখ উঠা রোগ হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর চোখে নবী (সা)-এর মুখের লালা লাগিয়ে দেন। সাথে সাথে তাঁর চোখ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। তারপর আর কখনো হযরত আলী (রা)-এর চোখে রোগ হয়নি। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য কাযী ইয়াযের 'শারহে শিফা' ও 'শারহে মাওয়াহিব' দেখা যেতে পারে।

২. হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা)-এর চোখ আঘাতে বের হয়ে পড়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) হাত মুবারক দিয়ে চোখটি তুলে লাগিয়ে দিয়েছেন। ফলে চোখটি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে গেল। এমনকি দ্বিতীয় চোখটির চেয়ে এ চোখটি অধিক ভাল মনে হল।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আতীক ইয়াহূদী নেতা আবূ রাফিকে হত্যা করে ফেরার পথে সিঁড়ি থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলেন। ভাঙ্গা পায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথে পা এমনভাবে ঠিক হয়ে গেল যেন আদৌ পা ভাঙ্গেনি। (বুখারী, আবূ রাফে হত্যা অধ্যায়)

৪. সাওর পাহাড় গুহায় হিজরতের পথে হযরত আবূ বকর (রা)-কে সাপে কেটেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) মুখের লালা লাগিয়ে দেয়ায় সাথে সাথে তিনি সুস্থ হয়ে যান।

৫. একবার এক অন্ধ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসেন। তিনি তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে বলেন ঃ উযূ করে দু'রাক'আত নামায পড়ে আমার উসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। আল্লাহ তোমার প্রয়োজন পূরো করবেন। অন্ধ ব্যক্তি নির্দেশ অনুযায়ী তা করল। বর্ণনাকারী উসমান ইবন হানীফ বলেন ঃ আমরা তখনো মজলিস থেকে উঠিনি, এতক্ষণে সে অন্ধ সাহাবী দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। (তিরমিযী ও হাকেম)

১. মুল্লা আলী কারী (র) প্রণীত শারহে শিফা, ১ খ, পৃ. ৬৫০।

৬. হাবীব ইবন আবূ ফুদায়ক-এর পিতার চোখে পর্দা পড়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু পাঠ করে ফুঁ দিয়ে দিলেন। সাথে সাথে তার দৃষ্টি ফিরে এল। (তিরমিযী, বায়হাকী ও ইবন আবূ শায়বা)

৭. বিদায় হজ্জের সময় এক মহিলা তাঁর এক বোবা ছেলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং বললেন! আমার ছেলেটি কথা বলতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) পানি চাইলেন, পানি দিয়ে তিনি হাত ধুলেন, কুলি করলেন। তারপর বললেন ঃ এ পানি ছেলেটিকে পান করাও, কিছু পানি তার গায়ে ছিঁটাও। পরবর্তী বছর মহিলাটি ছেলেটিকে নিয়ে এল। তখন ছেলেটি পূর্ণ সুস্থ ও কথা বলতে পারে। (ইবন মাজাহ)

৮. হযরত মুহাম্মদ ইবন হাতিব (রা) ছোট বয়সে মায়ের কোল থেকে আগুনে পড়ে গিয়েছিলেন। তাতে তার শরীরের কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) পুড়ে যাওয়া স্থানে মুখের লালা লাগিয়ে দিলে সাথে তা ভাল হয়ে যায়। (আবূ দাঊদ ও মুসনাদে আহমাদ)

৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর দুর্বল স্মৃতিশক্তির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, আমি আপনার থেকে যেসব কথা শ্রবণ করি, তা ভুলে যাই। তখন নবী (সা) তাঁকে বললেন ঃ তোমার চাদর বিছাও, তারপর তিনি চাদরে দু'হাত দিয়ে কিছু রাখলেন। তারপর বললেন, তুলে নাও এবং তোমার বক্ষে লাগাও। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি তাই করলাম। তারপর আমি আর কোন কথাই ভুলি না। (বুখারী ও মুসলিম)।

১০. এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে জানালেন যে, তার ভাইকে জ্বিনে আছর করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে উপস্থিত করতে বললেন। রুগীকে উপস্থিত করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে তাকে ফুঁক দিলেন। সে সময়েই সে সুস্থ হয়ে গেল। জ্বিনের কোন প্রভাব তার মধ্যে রইল না। (ইবনে মাজাহ)

দশটি পূর্ণাঙ্গ মু'জিযা

রুগীকে সুস্থ করার বিষয়ে মহানবী (সা)-এর আরও অনেক মু'জিযার কথা আছে। কোন ক্ষেত্রে তিনি কিছু পড়ে ফুঁক দিয়েছেন। কখনো বা তিনি লালা বা থুথু লাগিয়েছেন অথবা হাতে মুছে দিয়েছেন, তাতে রোগী সাথে সাথে সুস্থ হয়ে গেছে।

মৃতকে জীবিত করা

প্রকৃতপক্ষে আম্বিয়ায়ে কিরাম মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। মানুষের অন্তরের ও রূহের চিকিৎসা করার জন্য তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে

কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামের হাত দিয়ে এমন শারীরিক রোগের চিকিৎসাও করেছেন যা অনেক চিকিৎসকও করতে অক্ষম ছিল। আর আল্লাহ তা'আলা কখনো আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে মৃতকেও জীবিত করে দেন। যার মাধ্যমে মানুষ নবীদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে বুঝতে পারে। আর এ ধরনের মু'জিযা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হযরত ঈসা (আ)-কে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিভিন্ন প্রকারের মু'জিযা দান করেছিলেন। রুগীকে সুস্থ করা এবং মৃতকে জীবিত করার মু'জিযার থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বঞ্চিত করেননি। তাঁর হাতে কয়েকজন মৃতও জীবিত হয়েছিল। (যারকানী)

ইমাম কুরতবী (র) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'তাযকিরা'-তে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত নবী (সা)-এর হতে বহু সংখক মৃতকে জীবিত করেছিলেন। (আল্লামা মুল্লা আলী কারী, শারহে শিফা দ্র.)

১. হযরত আনাস (রা) থেকে (দুর্বল সূত্রে বর্ণিত) হাদীসে আছে, এক অন্ধ বুড়ির একটি যুবক ছেলে মারা যায়। মৃতের লাশের উপর চাদর ঢেকে দেয়া হল। অন্ধ বুড়ী ছেলের মৃত্যুতে খুবই দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হলো। সে চিৎকার করে বলতে লাগল হে পরওয়াদিগার আল্লাহ তা'আলা! তুমি নিশ্চয়ই জান আমি শুধু তোমার জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং পূর্তিপূজা বর্জন করেছি। তোমার মহব্বতে আমি তোমার রাসূলের নিকট হিজরত করে চলে এসেছি। হে আল্লাহ! আমার উপর মূর্তিপূজারীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার সুযোগ দিও না। আমার উপর এমন বিপদ আপতিত কর না যা বরদাশ্‌ত করার শক্তি আমার নেই। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) এবং তাঁর সাথে বারোজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ করে দেখা গেল, সে যুবক জীবিত হয়ে মুখের কাফন সরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর সে আমাদের সাথে আহার করল। সে যুবক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পরেও জীবিত ছিল। তাঁর জীবিত অবস্থায় তার মা মারা যান। ইবন আদী ও ইবন আবূদ দুনিয়া বায়হাকী ও আবূ নুয়াইম বর্ণিত। (বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন যারকানী, ৫ খ, পৃ. ১৮৩)

২. দালায়েলে বায়হাকীতে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। লোকটি বলল ঃ আমি আপনার উপর ঈমান আনব যদি কয়েকদিন পূর্বে মারা যাওয়া আমার মেয়েকে জীবিত করে দিতে পারেন। তিনি বললেন, তার কবর আমাকে দেখিয়ে দাও। লোকটি তাঁকে কবরস্থানে নিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়েটির নাম নিয়ে ডাকলেন। জ্বি হাযির বলে ডাকে সাড়া দিয়ে মেয়েটি জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে আসল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী

পিতামাতার সাথে পৃথিবীতে আসতে পছন্দ কর? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলার নিকট থাকা পিতামাতা থেকে উত্তম। আমি দুনিয়া থেকে পরকালকে বেশী ভাল পেয়েছি। (শিফা, কাযী ইয়ায, পৃ. ১৬০; যারকানী- ৫ খ, পৃ. ১৮২)

৩. হযরত আয়েশা (রা) রিওয়ায়েত করেছেন, বিদায় হজ্জের সময় একবার রাসূলুল্লাহ (সা) ভারাক্রান্ত মনে আমার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর তিনি খুশীমনে আবার ফিরে আসলেন। আমি প্রশ্ন করে জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার পিতামাতাকে জীবিত করে দেয়ার দু'আ করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জীবিত করে দিলেন তাঁরা আমার উপর ঈমান এনেছেন। তারপর পুনরায় পরলোকে গমন করেছেন। মুহাদ্দিসগণ মৃতকে জীবিত করার এসব হাদীসকে খুবই যাঈফ বা দুর্বল সূত্রে বর্ণিত বলে উল্লেখ করলেও মর্যাদার বিষয়ে এসব হাদীস বর্ণনাকে জায়িয বলেছেন। (যারকানী)

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা যারকানী বলেন ঃ পিতামাতাকে জীবিত করার বিষয়ে তিনটি মত মুহাদ্দিসীনের মধ্যে রয়েছে ঃ

এক. এ হাদীসটি মাউযূ অর্থাৎ জাল হাদীস। এ বক্তব্য ইবন জাওযীর;

দুই. এ হাদীসটি যাঈফ। এ মত ইমাম ইবনে কাসীরের ;

তিন. ইমাম কুরতুবীর মত হচ্ছে এ হাদীস মাউযূ নয়, বরং যাঈফ।

হাফিয শামসুদ্দীন (র)-এ বিষয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গে একটি কবিতা রচনা করেছেন।

حبا الله النبى مزيد فضل * على فضل وكان به رؤفا ـ
فاحيا امه وكذا اباه * لايمان به فضلا لطيفا
فسلم نا لقد بذا قدير * وان كان الحديث به ضعيفًا ـ (زرقانى)

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) উপরোক্ত তৃতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন।

وجماعة ذهبوا الى احياءه * أبويه حتى امنوا لاتخرفوا
وروى ابن شاهين حديثا مسندا * فى ذاك لكن الحديث مضعف
(زرقانى)

৪. হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, খায়বারে এক ইয়াহূদী মহিলা বিষ মিশ্রিত বকরীর ভূনা গোশ্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাদীয়া স্বরূপ পেশ করে। তিনি তা থেকে কিছু আহার করেন এবং উপস্থিত সাহাবীগণও তা থেকে কিছু খেয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা হাত উঠিয়ে নাও। এ

ভূনা বকরী আমাকে জানিয়েছে যে, যে বিষ মিশ্রিত। কাযী ইয়ায (র) বলেছেন, এ ঘটনা বিষাক্ত বক্‌রী নামে প্রসিদ্ধ। হাদীসের ইমামগণ তাঁদের প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আকীদা বিশারদগণ এ বিষয়ে বিতর্ক করেছেন। ইমাম আবূল হাসান আশ'আরী এবং কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতে এ মুর্দা বকরীর মধ্যে কথা, বর্ণমালা ও ধ্বনি পয়দা করে দিয়েছেন। যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা গাছ-পাথরকে কথা বর্ণ ও ধ্বনি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বকরীর গোশতকে নিজ অবস্থায় ও আকৃতিতে রেখে তার মধ্যে কথা বলার শক্তি পয়দা করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সে গোশ্‌তের মধ্যে জীবন পয়দা করেছেন। জীবন পাওয়ার পর গোশ্‌ত কথা বলেছে। (শিফা, কাযী ইয়ায, পৃ. ১৫৯)

৫. হযরত নবী (সা) মসজিদে নব্বীতে খেজুর গাছের একটি খুঁটিতে হেলান দিয়ে খুত্‌বা দিতেন। তারপর যখন মিম্বার বা সিঁড়ি তৈরি হল, তখন তিনি মিম্বারে খুত্‌বা দিতে শুরু করেন। সে সময় খেজুর গাছে খুটি বিরহ বেদনায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বার থেকে নেমে গিয়ে খেজুর খুঁটিটির সাথে শরীর লাগিয়ে পরশ লাগালেন। তখন সে কান্নায় বিরতি দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ খুঁটি সবসময় আমার খুত্‌বা শুনেছিল। এখন সে আমার খুত্‌বা শুনা থেকে বঞ্চিত হয়ে কাঁদতে লাগল। (বুখারী) কাযী ইয়ায, ও মুহাদ্দেসীন বলেন-এ হাদীস সহীহ্ ও ব্যাপক সূত্রে বর্ণিত। বেশ কয়েকজন সাহাবী এ হাদীসের বর্ণনাকারী।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, খুটির কান্নায় মু'জিযা হযরত ঈসা (আ)-এর মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মৃতকে জীবিত করা মানে হল মৃত তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা। কিন্তু কাঠের খুঁটি ত নির্জীব প্রাণহীন বস্তু। তার মধ্যে কখনো প্রাণীর জীবনের নাম-নিশানাও ছিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরহে কান্না অতি অবাক করা ঘটনা। (ইমাম শাফিঈ, বায়হাকী) তেমনিভাবে মু'জিযা হিসেবে গাছ ও পাহাড় থেকে 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলা এবং হযরত নবী (সা)-এর হাতের ইশারায় মূর্তিদের লুটিয়ে পড়া, তাঁর মজলিসে খাদ্য থেকে তাসবীহের আওয়াজ আসা, মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা থেকে কম কিছু নয়। তারপর তাঁর আহ্বানে গাছ চলে আসা এবং আবার নিজ স্থানে ফিরে যাওয়া। এসব কিছু মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা থেকে কোন অংশে ছোট বলা যায় না।

যা হোক, মৃতকে জীবিত করা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যদিও সনদ হিসেবে এগুলোকে সহীহ্ সূত্র বলা হয় না তথাপি এতটুকু বলা যায়

যে, মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা মহানবী (সা)-এর জন্য পাওয়া যায়। এসব বর্ণনাকে একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় না।

হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযা

হযরত ঈসা (আ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা যা কুরআনে বলা হয়েছে তা হল وَاَنْفَخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ তিনি মাটির ঢেলায় ফুঁ দিতেন তখন তা আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যেত। বর্ণিত আছে। এসব ছোট পাখি কিছু দূর পর্যন্ত উড়ে যেত, তারপর মরে যেত। তাতে প্রকৃত পাখি ও এসব মু'জিযার পাখির মধ্যে পার্থক্য বুঝা যেত। তবে এ মু'জিযার কথা চার ধরনের ইঞ্জিলের সবকটিতে উল্লেখ নেই। তারপর কথা হচ্ছে ঃ চড়ুই পাখির মু'জিযা মৃতকে জীবিত করা থেকে অধিক মর্তবার। কেননা মৃত মানুষ যে অবস্থায় মারা গেল তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আনা অতটা অবাক করা বিষয় হতে পারে না, বরং অস্তিত্বহীন প্রাণীকে মাটির ঢেলা থেকে প্রাণীতে রূপান্তরিত করা অধিক আশ্চর্যজনক।

মৃতকে জীবিত করার পর অসুস্থকে সুস্থ করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। আর রুগীকে সুস্থের মু'জিযার পর কাশ্‌ফ বা ভবিষ্যত বিষয়ের সংবাদের মু'জিযা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ـ

"আমি তোমাদেরকে জানাব তোমরা কি খাও এবং নিজেদের ঘরে কি জমা করে রেখেছ।"

এ মু'জিযা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্যই শুধু খাস ছিল না, আরও নবী যারা বনী ইসরাঈলী ছিলেন এ ধরনের আগামীতে সংঘটিতব্য বিষয়ের এবং আগাম সংবাদ দিয়েছেন। যেমন পবিত্র আল-কুরআনে রূমীদের বিজয়ের সংবাদ সাত–আট বছর পূর্বে দেয়া হয়েছে এবং খায়বার ও সিরিয়া বিজয়ের খবরও পূর্বে দেয়া হয়েছিল। নাসারাগণ হযরত ঈসা (আ)-এর ২৭টি মু'জিযার কথা বলে থাকে। যার মধ্যে প্রধানতম হল ঃ মৃতকে জীবিত করা। এ মু'জিযার ঘটনা ইঞ্জিলে তিনটিমাত্র উল্লেখিত হয়েছে।

এক ঃ প্রথম মুর্দা নাইন শহরের অধিবাসী ছিল তার শবযাত্রা শুরু হয়েছিল। তার মা রোদন করছিল। হযরত মাসীহ্ শবাযাত্রা থামিয়ে দিলেন ও বললেন ঃ হে যুবক! উঠে পড়! মুর্দা উঠে বসল এবং কথা বলতে লাগল। সে হযরত মাসীহ্ ও তার মাকে চুমু দিল। উপস্থিত সকলে হতভম্ব হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আপনি বড় নবী, যিনি আমাকে জীবিত করে উঠিয়েছেন। (দেখুন, ইঞ্জিল, ৭ম অধ্যায় ১১ থেকে ১৭ পাঠ)

দ্বিতীয় ঘটনা, এক মৃত মেয়েকে জীবিত করা। যা মথির ইঞ্জিলের ৯ম অধ্যায়ের ১৮ থেকে ২৪ পাঠে উল্লেখ আছে।

তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে ঃ তাঁর প্রিয়জনকে জীবিত করা যিনি সম্পর্কে মরিয়মের ভাই ছিলেন। তার মৃত্যুর পর দাফন কাফনের চার দিন গত হয়েছিল। হযরত মাসীহ তাশরীফ নিলেন এবং বড় আওয়াজে ডাকলেন। হে যা'যার। বের হয়ে এস! সেত ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিল, সে এখন কাফনে হাত-পা বাধা অবস্থায় বের হয়ে আসল। তার মুখমণ্ডল রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল। তিনি বললেন, ঢাকনা সরিয়ে তাকে যেতে দাও। উক্ত ঘটনার বিবরণ ইউহান্নার ইঞ্জিলের ১১ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

ইয়াহূদীরা এসব মু'জিযার ব্যাপারে বলে থাকে, এ তিন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মরেনি। বেহুঁশ অবস্থায় তাদের দম আটকে গিয়েছিল। অনেক সময় অধিক বেহুঁশীর কারণে কাউকে মৃত বলে মনে করা হয়। এজন্যই বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় সরকারীভাবে ডাক্তারী পরীক্ষা করে কাউকে মৃত ঘোষণা না করা হলে তাকে দাফন করার অনুমতি দেয়া হয় না।

ইসলামের অনুসারীদের কথা হল ঃ হযরত মাসীহ্ (আ)-এর মৃতকে জীবিত করার বিষয়টি কুরআনের বিবরণের ভিত্তিতে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি। অন্যথায় নাসারা আলেমদের নিকটও এসব মু'জিযা বা ঘটনার এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য পরম্পরা সূত্র নেই, যা তারা পেশ করতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সমস্ত মু'জিযা সহীহ পরম্পরা সূত্রের মাধ্যমে বর্ণিত আছে। দুর্বল ও মুরসাল সূত্রে বর্ণিত কিছু থাকলেও ভিন্ন পরম্পরা সূত্রেও তা বর্ণিত হয়েছে। কোন বিষয় বিভিন্ন সূত্রে ও পদ্ধতিতে বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তা ভিত্তিহীন নয়। সনদের আধিক্য পরম্পর বর্ণনাকে শক্তিশালী করে। এভাবে যাঈফ বর্ণনাও সবল বা সহীহ্ বর্ণনার মর্যাদায় চলে যায়। ইয়াহূদী ও নাসারাদের নিকট না আছে এ ধরনের পরম্পরা বর্ণনার সূত্র, না আছে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ। এজন্য বাইবেলের এসব মু'জিযার রিওয়ায়াতকে কোন মানসম্পন্ন বর্ণনা বলা যায় না।

নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আসমানী কিতাবের সকল আলিমের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, নবুওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মানিত মর্যাদাবান কিছু বান্দাকে নবী করে মানুষের সমাজে প্রেরণ করেন। তাঁদের নিকট অহী নাযিল করেন। যেন তাঁরা মানুষকে সত্য ও হকের দিকে পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে স্থায়ী মুক্তি ও শান্তির পথ ও পদ্ধতি অবগত করেন। আহলে কিতাবের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবুওয়াতের যে ভিত্তি সাব্যস্ত করেছেন, তা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে পুরোপুরি বর্তমান। শুধু তাই নয়, বরং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াত ও তার দালায়েলে রিসালাত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের থেকে অধিক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

তাঁর নবুওয়াত বর্ণনা বা রিওয়ায়াতের দিক থেকে অধিক সহীহ, পবিত্র ও সংশয়-সন্দেহ থেকে মুক্ত। নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রধান দিক হচ্ছে ঃ বিশ্বাস, প্রত্যয় বা আকীদা, ইবাদত, আদাব-আখ্‌লাক এবং বিধি-বিধান, সামাজিকতা।

দ্বিতীয় হচ্ছে ঃ দালাইলে নবুওয়াত বা রিসালাতের প্রমাণ অর্থাৎ মু'জিযা।

তৃতীয় দিক হল ঃ ভবিষ্যদ্বাণী।

৪র্থ হচ্ছে ঃ বিশ্ব সংস্কার এবং পঞ্চম হল হিদায়াতের বাণী। আর হযরত মুহাম্মদ (সা) এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সমস্ত নবী (আ)-এর মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন।

নাসারাদের গুমরাহ হওয়ার কারণ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সমস্ত নবী (আ)-এর নবুওয়াতের নিদর্শন ও মু'জিযা দান করেছেন। যেন এসব নিদর্শন ও মু'জিযা নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য প্রমাণ বা দলীল হয়। তেমনিভাবে হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা অনেক মু'জিযা যা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত তাঁকে দান করেছেন। নাসারারা এসব নিদর্শন ও কুদরত দেখে তারা এসবকে আল্লাহর দেয়া কুদরত মনে না করে হযরত ঈসা (আ)-এর নিজস্ব কুদরত বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। বস্তুত এসব কুদরত ছিল আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত। তারা বিশ্বাস করতে লাগল যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা হযরত মাসীহের ভিতরে অনুপ্রবেশ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ), তিনি তার সাথে মিশে গিয়েছেন। তিনি আর খোদা এক হয়ে গেছেন।

মুসলমানদের সমাজেও কুসংস্কার দেখা যায় যে, আউলিয়ায়ে কিরামের ব্যাপারে তারা অতি ভক্তি করে। যেমন তারা তাদের প্রয়োজনীয় হিদায়াত ও বিপদ-আপদে আউলিয়ায়ে কিরামকে ডেকে থাকে। তারা মনে করে থাকে, নেক বান্দাদেরকে এসব বিষয়ে কিছু করার ক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে। তারা যাকে চায় উপকার বা ক্ষতি করতে পারে। এ ধরনের লোকেরা সালেহীন বান্দাকে খোদা বা মাবূদ মনে করে না, বরং এসব বুযর্গকে খোদার বান্দাই মনে করে, এজন্য তাদেরকে ইসলামের সীমার বাইরের হিসেবে মনে করা হয় না। কিন্তু এ ধরনের বিষয় নাসারা ও শিরকের সাথে মিলে যায়। তাদের এ ধরনের কাজ বিশ্বাসের দিক থেকে তাদেরকে মুশরিক না বললেও অথবা মুসলিম জাতিসত্তা থেকে বাইরে না গেলেও এসব অবশ্যই শিরক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম সকলেই আল্লাহর প্রিয় মর্যাদাবান বান্দা। তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হল যে, তাঁরা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহকে চেনার পথ দেখাবেন। মানুষের চরিত্র-নৈতিকতাকে পরিশুদ্ধ করবেন। তাঁদের হাতে প্রকাশিত

যেসব মু'জিযা ও প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত ঘটনাবলী রয়েছে, তা নবীদের জন্য তাদের নবুওয়াতে প্রমাণ ও নিদর্শনস্বরূপ। কিন্তু নাসরারা এসব মু'জিযাকে নবুওয়াতের প্রমাণ মনে না করে খোদায়ীর প্রমাণ মনে করেছে। তারা বুঝেনি যে, এসব কাজ হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম নিজ ইখ্‌তিয়ারে করতে পারেননি, বরং খোদায়ী কুদরতের কারিশমাঁ যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নবীদের মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য নবীদের হাতে আল্লাহ্ তা'আলা তা প্রকাশ করেছেন। এসব মু'জিযা প্রকাশের ক্ষেত্রে নবীদের ইচ্ছা ও ক্ষমতা তেমন কোন ভূমিকা পালন করেনি।

আল্লাহ্ তা'আলা জীবন ও জগতের ব্যাপারে এমন কোন স্বাধীন নিজস্ব ক্ষমতা প্রদান করেননি যা তাঁরা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যখন খুশি করতে পারেন। এমনকি নিজ আত্মীয়-পরিবারের সদস্য ও পিতামাতাকে হিদায়াত করার সরাসরি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হননি। তাঁরা যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করতে সক্ষম ছিলেন না। হযরত নূহ্ (আ) আপন ছেলেকে হোদয়েত করতে পারেন নি। তেমনিভাবে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর পিতা বা চাচা আযরকে হিদায়াত করতে পারেননি। হযরত নবী (সা)-এর আপন চাচা আবূ তালিব এবং আবূ লাহাবকে হিদায়াত করার ক্ষমতা তাঁর হয়নি। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

إِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ -

"নিশ্চয়ই তোমার প্রিয়জনকে হিদায়াত করার ইখ্‌তিয়ার তোমার নেই কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন।" (সূরা কাসাস ঃ ৫৬)

এ ধরনের অনেক আয়াত পবিত্র কুরআনে আছে যে, কারো উপকার ও ক্ষতি করার একক ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। আর যে সত্তা উপকার ক্ষতি করার যোগ্যতা রাখে না, সে ইবাদতের যোগ্যও হতে পারে না।

হযরত নবী (সা)-এর পর খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন আমলে তাঁরা কায়সার ও কিস্‌রার ক্ষমতার আসন উল্টিয়ে দিয়েছিলেন এবং অর্ধ পৃথিবী জয় করেছিলেন। বিজয়ের পর যুলুম ও শিরকের জড় ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং অনৈকিতা-অশ্লীলতা হতে যমীনকে পবিত্র করেছিলেন। হকের তাওহীদ ও দ্বীনে ইলাহী ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সফলতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে নাসারাদের সরকার তাওহীদের পরিবর্তে তিন খোদার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মদপান ও অনৈতিকতার বেশুমার দরজা তারা খুলে দিয়েছে, তা দুনিয়াবাসীকে নিকট পরিষ্কার।

এমন কি নবীগণ নিজেদের ক্ষতি করার ক্ষমতাও লাভ করেননি। কখনো নবীদেরকেও প্রতিপক্ষের হাতে অনেক ক্ষতি ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁরা

নিজেদেরকে একক ক্ষমতায় সেসব কষ্ট ও বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন নি। এমন কি নবীদেরকে কখনো নিহত হতেও হয়েছে। এ বিষয়ে আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ رَشَدًا ـ

"হে নবী আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমি তোমাদের কল্যাণ ও উপকারের যেমন মালিক নই, তেমনিভাবে তোমাদের হিদায়াতেরও মালিক নই।" (সূরা জিন্ন ঃ ২১)

দীনের তিনটি বুনিয়াদী নীতিমালা

দীনের কিছু বুনিয়াদী নীতিমালা রয়েছে, যেসব নীতিমালা নিয়ে সকল নবী পৃথিবীতে আগমন করেছেন। আর এসব নীতিমালার ওপর মানুষের কল্যাণ ও সফলতা নির্ভরশীল। মূলনীতিগুলো হল ঃ তাওহীদ, রিসালাত, কিয়ামত। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তামাম দুনিয়ায় গুমরাহীতে ডুবে ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর কুরআন নাযিল করলেন। তিনি হিদায়াত ও সংস্কার কর্মসূচী নিয়ে আগমন করলেন। মৌলিক ও শাখা সব গুমরাহী ও কুসংস্কারেরই তিনি সংশোধন করেছেন। উক্ত তিনটি মৌলিক বিষয়ে যে গুমরাহী ছিল, সর্বপ্রথম তিনি তা সংশোধন করেছেন।

প্রথম মৌলিক নীতি তাওহীদ

দীনের সবচেয়ে বড় ও মৌলিক ভিত্তি হল তাওহীদ। তাওহীদের ব্যাপারে সেসময় সকল জাতি ও সমাজ গুমরাহ হয়ে গিয়েছিল।

ইয়াহূদী ঃ ইয়াহূদীরা যদিও নবীদের শিক্ষা ও দাওয়াতের সাথে পরিচিত ছিল, কিন্তু তারাও তাওহীদের বিষয়ে গুমরাহ হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহ তা'আলাকে মানুষের মত মনে করতো যে, আল্লাহ্ কখনো কখনো ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে যান। মানুষকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি লজ্জিত ও নাযুক অবস্থায় পড়েন। কখনো খোদ ইসরাঈলীদের হাতের পুতুল অথবা ইসরাঈলী প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন না। ইসরাঈলদেরকে বরকত না দিয়ে খোদার কোন উপায় নেই।

নাসারা ঃ নাসারারা সরাসরি শিরকের শিকার হয়েছে এবং তিন খোদার শিরকী আকীদা আবিষ্কার করেছে। আল-কুরআনে তাওহীদের তালীম তুলে ধরেছে এবং তিন খোদার বাতিল আকীদাকে প্রতিহত করেছে।

দ্বিতীয় নীতি নবুওয়াত ঃ মুশরিকরা নবুওয়াতের অস্বীকারকারী ছিল। কেননা তারা নবুওয়াতকে মানব প্রকৃতির জন্য অসম্ভব বলে মনে করে। ইয়াহূদীরা যদিও নবুওয়াতের বিষয়কে স্বীকার করে কিন্তু তারা নবীদেরকে মিথ্যা অপবাদ, ধোঁকা ও

প্রতারণার মাধ্যমে রক্তাক্ত করতেও কার্পণ্য করে না। তারা নবীরা কবীরা গুনাহ বা কঠিন পাপে জড়িয়ে যেতে পারেন বলেও মনে করে। শুধু তাই নয়, ইয়াহূদীরা নবুওয়াতকে তাদের বনী ইসরাঈলের জন্য খাস বৈশিষ্ট্য ও অধিকার বলে মনে করে। নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ নবূওয়াতকে বনী ইসরাঈলের বাইরে নিতে পারবেন না। তেমনিভাবে নাসারারাও মনে করে বনী ইসরাঈলের বাইরে কেউ নবী হতে পারে না। নাসারারা হযরত ঈসা (আ) এবং হাওয়ারীদেরকে ব্যতীত আর কাউকে নিষ্পাপ মনে করে না। নাসারারা ইয়াহূদীদের উল্টো হযরত মাসীহকে খোদা মনে করে এবং খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআনুল করীম মুশরিক, ইয়াহুদী ও ইসরাঈলীদের নবুওয়াতের বিষয়ে বাতিল আকীদার সংস্কার ও সংশোধন করেছে।

তৃতীয় মৌলিক আকীদা কিয়ামত ঃ অর্থাৎ পুরস্কার ও তিরস্কার বিষয়ে আকীদা

দীনের তৃতীয় বুনিয়াদ হল আখিরাতের উপর ঈমান আনা এবং আমলের ভিত্তিতে শাস্তি ও পুরস্কার এবং হিসাবের বিষয়ে বিশ্বাস করা। মুশরিকরা এবং মূর্তিপূজারীরা আকীদার কঠোরতারকে স্বীকার করে না এবং শাস্তি ও পুরস্কারের বিশ্বাস করে না। ঈসায়ীরা পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়ে বাতিল বিশ্বাস পোষণ করে। তারা মনে করে, মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া যাবে। তারা বিশ্বাস করে, মুক্তিদাতা হযরত ঈসা (আ) নিজে মুক্তিপণ হয়ে মানুষদেরকে পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) তাদের সকলে মুক্তিপণ আদায় করবেন। ইয়াহূদীদের আকীদা হল, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের পক্ষে আর জান্নাত শুধু বনী ইসরাঈলের জন্য।

ইসলামের শিক্ষা

পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল, ঈমান ও আমলে সালেহের ভিত্তিতে তা হবে। ঈমান ও কুফরের বিষয়ে যে শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান আছে, এক্ষেত্রে বংশ, জাতীয়তা, সম্প্রদায়, এসব কোন কিছুতেই কোন প্রাধান্য বা পার্থক্য করা হবে না; বরং সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে ঈমান ও নেক আমলের সাওয়াব বা পুরস্কার এবং মন্দকার্মের জন্য শাস্তি ও তিরস্কারের ব্যবস্থা হবে। শাস্তিতেও ইনসাফ পুরোপুরি কার্যকরী করা হবে। সামান্যতম ব্যতিক্রম বা বেশি বদলা নেয়া হবে না। পুরস্কার ও অনুদানেও ইনসাফ করা হবে এবং দয়া ও সহানুভূতির প্রাধান্য থাকবে। একটি ভালকাজের বিনিময়ে দশগুণ পাওয়া যাবে। আল্লাহর মরযী অনুযায়ী তা আরও বেশিও হতে পারে। কুরআনুল করীমে এ বিষয়টিকে অর্থাৎ হিসাব ও জবাবদিহীতাকে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে বারবার পুনরুল্লেখ করেছে। বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র ও অনুপম আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে যুক্তি-প্রমাণ সহকারে প্রতিষ্ঠিত করে উল্লেখ করেছে।

যেমন ঃ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ

"তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?" (সূরা মু'মিনূন ঃ ১১৫।)

অন্য আয়াতে বলেন ঃ

اَيَحْسَبُ الاِنْسَانُ اَنْ يَتْرَكَ سُدًى - اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى - اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى -

"লোকেরা কি মনে করে যে, তাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে? তুমি কি হে মানুষ! একবিন্দু শুক্র ছিলে না, তারপর আনাকে (ঝুলন্ত রক্তের টুকরা) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বিন্যস্ত করে বানিয়েছেন পুরুষ ও নারী করে। তারপর তিনি কি সক্ষম হবেন না পুনরায় মৃতকে জীবিত করতে?" (জীবিত করে তোমার নিকট হিসাব নিতে) (সূরা কিয়ামা ঃ ৩৬-৪০।)

দার্শনিকেরা কিয়ামতের কথা স্বীকার করে শুধুমাত্র আত্মিক কিয়ামতের কথা বলে থাকে। তারা শারীরিকভাবে পরকাল স্বীকার করতে চায় না। ইসলাম আত্মা ও শরীরের সাথে দ্বিতীয় জীবনের কথা শিক্ষা দেয়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীগণ শুধুমাত্র রূহানী কিয়ামত ও রূহানী হাশর হবে বলে মনে করেন। তাদের দৃষ্টি শারীরিক ভোগ-বিলাসিতা তুচ্ছ বিষয়, আর তা পশুত্ব ছাড়া কিছু নয়। অথচ তারা নিজেরা শারীরিক ভোগ-বিলাসিতায় খুবই মত্ত থাকে। তারা বুঝতে পারে না, মানুষ শরীর ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। এ সম্মিলিত সত্তার মানুষ আল্লাহর বিধানের আওতায় পড়ে। এজন্য শাস্তি ও পুরস্কার দু'টোর উপরই কার্যকরী হওয়া উচিত।

অতএব যে দীন সবদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ এবং ভিত্তি, মৌলিকতা, শাখা-প্রশাখাসহ যৌক্তিক ও প্রমাণ-দলীল সহ পূর্ণতা যেখানে রয়েছে, সে ব্যবস্থার অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা সে কথাই বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا -

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ - وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ - وَهُوَ فِىْ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

মহানবী (সা)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

মহানবী (সা)-এর বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও কামালিয়াত বলতে যা বুঝায় তা হল ঃ আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তাঁকে কিছু বিষয় দান করেছেন যা অন্যান্য নবীদেরকে দান করেননি। হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "আমাকে এমন কিছু বিষয় দেয়া হয়েছে যা ইতিপূর্বে কোন নবী কে দেয়া হয় নি।"

১. আমাকে সমস্ত পৃথিবীর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে নবীগণ শুধুমাত্র নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন আর আমি গোটা মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا،

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ -

আমি শেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই। আমার মাধ্যমে নবীর ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ -

অন্য আয়াতে আছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

৩. আমাকে জাওয়ামিউল কালেম অর্থাৎ ব্যাপক অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রাঞ্জল শব্দ প্রয়োগে বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে। যেমন তাঁর হাদীসের কোন শব্দ ব্যাপক অর্থ বুঝান হয়। মহানবী (সা)-এর হাদীসসমূহ সামগ্রিকভাবে-এর অনুপম উদাহরণ। এসব হাদীস তথা মহানবী (সা)-এর বক্তব্য হচ্ছে ঃ সকল পরিশুদ্ধ আকীদা, সহীহ্ আমল, চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও দীন-দুনিয়ার বিধি-বিধান, আইন-সংবিধান ও নিয়মনীতির সামষ্টিক রূপ।

৪. আমাকে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব দান করে বিজয় ও সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। এক মাসের দীর্ঘ পথ দূরের দুশমনও আমার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। এটি গায়েবী সহযোগিতা যে, এক মাসের দূরত্বের দুশমনের হৃদয়েও তাঁর ভয় ও প্রভাব সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَنُلْقِي فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ـ

অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ ـ

৫. সমস্ত যমীনকে আমার ও আমার উম্মাতের জন্য সিজ্দা করার স্থান করা হয়েছে এবং পবিত্র করা হয়েছে। অর্থাৎ সব স্থানে নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, মসজিদ হোক বা মসজিদ না হোক। আমার জন্য উযূ গোসলের বিকল্প হিসেবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার বিধান দেয়া হয়েছে। সব স্থানে তায়াম্মুম করার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়েছে। আমার জন্য মাটিকে পবিত্রকারী করা হয়েছে।

৬. আমার জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোন নবীর জন্য গনীমতের মাল হালাল ছিল না।

৭. আমার অনুসারী উম্মাতের সংখ্যা সকল নবীর অনুসারী উম্মাতের চেয়ে অধিক হবে। হাদীসে আরও আছে, কিয়ামতের দিন সমস্ত উম্মাত একশত বিশ কাতারে শামিল হবে। এর মধ্যে আশি কাতারই হবে আমার উম্মাতের।

৮. আমাকে মহান শাফা'আতের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন প্রথম যুগের ও শেষ যুগের সকল উম্মাত আমার শরণাপন্ন হবে। আমি সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে শাফা'আত করব।

৯. আমি সব নবীর প্রথমে আমার উম্মাতকে নিয়ে পুলসিরাত পার হব।

১০. আমি সকলের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করব। আবূ বকর আমার ডানে এবং উমর আমার বাঁয়ে থাকবে। জান্নাতে সকল নবীর জন্য হাউয থাকবে কিন্তু আমার হাউয সকলের হাউয থেকে বড় ও সুসজ্জিত থাকবে।

امين واخردعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلاه والسلام على حبيبه سيد الاولين والاخرين وعلى اله وأصحابه وعلماء امته وأولياء زمرته أجمعين وعلينا معهم ياأرحم الراحمين ويا أكرم الاكرمين وأجواد الاجوادين وخيرالمسئولين وياخيرالمعطين، امين يارب العلمين ـ

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/১৪২(উ)—৩২৫০